মানিক গ্রন্থাবলী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ফাল্গুন

১৩৫৮

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির

১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট ঃ কলিকাতা—১২

মানিক গ্রন্থাবলী

(দ্বিতীয় ভাগ)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩৫৮

বসুমতী - সাহিত্য - মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট ঃ কলিকাতা—১২

অহিংসা

—:*:—

এক

সদানন্দ সাধুর আশ্রমের তিনদিকটা তপোবনের মত। বাকী দিকটাতে একটা নদী আছে। আশ্রম ঘিরিয়া অবশ্য তপোবনটি গড়িয়া ওঠে নাই, স্থানটি তপোবনের মত নির্জ্জন আর শান্তিপূর্ণ দেখিয়াই আশ্রম গড়িয়া তোলা হইয়াছে। আশ্রমের বয়স আর কত হইবে, বছর পাঁচেকের বেশী নয়। তপোবনের বড় বড় গাছগুলির কোন কোনটা হয়ত শতাব্দীরও বেশী সময় ধরিয়া নিবিড় ছায়া বিলাইয়া আসিতেছে।

তপোবনের সমস্তটা আশ্রমের সম্পত্তি নয়। দলিলপত্রের হিসাবে দেখা যায়, আশ্রমের ভূমির পরিমাণ শ'খানেক বিঘার কাছাকাছি! তপোবন আরও বিস্তীর্ণ—উত্তরে বাসুপুরের গা-ঘেঁষা প্রকাণ্ড কলাবাগান এবং দক্ষিণে সাতুনার বাগ্দী পাড়া পর্য্যন্ত এলোমেলোভাবে ছড়ানো আরও বড় আমবাগানটা ধরিলে আশ্রমের ভূমির দশ বার গুণ। তবে দলিলপত্রে ছাড়া আশ্রমের সীমানা ভাল করিয়া কোথাও দেখানো নাই কিনা, তাই বন, উপবন, আমবাগান, কলাবাগান, সমস্তই আশ্রমের তপোবন বলিয়া মনে হয়।

নদী পূর্ব্বদিকে।

একটি শাখানদীর এই উপশাখাটিকে স্থানীয় লোক আদর করিয়া ডাকিত রাধা বলিয়া, বোধহয় আদরের আতিশয্যেই একটা ই'কার জুটিয়া এখন হইয়াছে রাধাই।

বড় আশ্চর্য্য নদী। প্রতি বছর বাঁচে আর মরে। আকাশে যেই কালো কালো মেঘ জমিয়া থম থম করে, লোকে জল আটকানোর জন্য চালের ফুটা আর ছাতির ফুটা মেরামত না করিয়া আর উপায় খুঁজিয়া পায় না, রাধাই নদীতে অমনি দেখা দেয় ঘোলা জলের স্রোত। ক'মাস ধরিয়া রোদে যে বালি তাতিয়াছে, সে বালি যায় ঢাকিয়া, স্থানে স্থানে যে আবদ্ধ জল পচিয়া উঠিতেছিল সে জল যায় ভাসিয়া। সকলে অবাক হইয়া একবার তাকায় আকাশের দিকে, একবার তাকায় রাধাই নদীর দ্রুতবর্দ্ধনশীল জীবনসঞ্চারের দিকে। বড় রহস্যময় মনে হয় ব্যাপারটা সকলের কাছে। বৃষ্টি আর হইয়াছে কতটুকু, কদিনের ছাড়া ছাড়া বর্ষণে পথঘাট ভাল করিয়া ভেজে নাই পর্য্যন্ত। কোন পুকুরে জল বাড়ে নাই, কোন ডোবায় জল জমে নাই। রাধাই এত জল পাইল কোথায়?

দূরদেশে কোথায় ইতিমধ্যে প্রবল বর্ষা নামিয়াছে, কোন্ বড় নদী সেই জল বহিয়া আনিয়া কোন্ শাখানদীকে দিয়াছে, আর কোন্ শাখানদীর দানে তাদের এই নদীতে দেখা দিয়াছে নবযৌবনের আবির্ভাব, এত সব রহস্যের সন্ধান কজনে আর রাখে। চোখের সামনে মরা নদীকে বাঁচিতে দেখিয়া সকলে বিস্মিত হয়।

নদীর একেবারে ধারে প্রকাণ্ড চালাটায় বিকালের দিকে সাধুজীর দর্শনকামীদের সমাগম হয়। আশ্রমের সকলে তো উপস্থিত থাকেই, কাছাকাছি গ্রাম হইতে অনেকে আসে, দূরের গ্রাম ও সহর হইতেও আসে। সদানন্দ সকলকে দর্শনও দেয়, দর্শনের মনোমত ব্যাখ্যাও শোনায়।

এবার যেদিন প্রথম রাধাই নদীর বুকে স্রোত দেখা দিল, সেদিন অহিংসা ও প্রেমের কথা বলিতে বলিতে সদানন্দ হঠাৎ আনমনে চুপ করিয়া গেল। নদীর স্রোতের দিকে পলকহীন চোখে এমনভাবে চাহিয়া রহিল যে, কারও বুঝিবার উপায় রহিল না, অন্যমনস্ক সে ইচ্ছা করিয়া হইয়াছে। আজ কথা জমিতেছিল না। যার কথা মনের মধ্যে কাঁটার মত বেঁধে, মধুর মত মাখা হইয়া যায়, মধুপের মত গুঞ্জন করে, শুনিতে শুনিতে থাকিয়া থাকিয়া হয় রোমাঞ্চ, আজ যেন তার কথায় জোর নাই, সুর নাই—নিছক কতকগুলি নীরস ভোঁতা শব্দমাত্র পরিবেশন করিতেছে। অস্বস্তি বোধ করিতে করিতে এতক্ষণে কারণটা টের পাইয়া সকলে স্বস্তি লাভ করে। তাই বটে, সাধুজী

আজ অন্যমনস্ক হইয়া আছেন। কথায় সাধুজীর মন নাই।

পুরুষরা চুপ করিয়া রহিল, মেয়েদের মধ্যে শোনা গেল ফিস ফিস কথার গুঞ্জন। এখানে মেয়ে পুরুষের বসিবার পৃথক ব্যবস্থা নাই, সদানন্দ পুরুষ ও নারীর পার্থক্য স্বীকার করে, পৃথক রাখিবার প্রয়োজন স্বীকার করে না। এই সভায় যারা বসে, তাদের মধ্যে যেমন ছোট-বড় নাই, আপন-পর নাই, তেমনি মেয়ে-পুরুষও নাই। অন্ততঃ সাধুজীর তাই নির্দ্দেশ। তবু, মেয়েরা দল বাঁধিয়া একপাশে তফাতে সরিয়া বসে, ব্যবধানটা ঘুচাইবার চেষ্টাও পুরুষদের মধ্যে কখনও দেখা যায় না। চালার নীচে স্থানাভাব ঘটিলেও নয়।

চালার কাছে খানিকটা যায়গা গাছপালা কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এখানে গাছের ছায়া নাই। তপোবনের মাথা ডিঙ্গাইয়া বাঁকাভাবে রোদ আসিয়া মেয়েদের বসিবার যায়গায় পড়িয়াছে, বড় তেজ এখানকার রোদের। ঘামে সকলে ভিজিয়া গিয়াছে, তবু সরিয়া ছায়ায় গিয়া বসিবার সাহস কারও নাই। একটি কমবয়সী বিধবা, গায়ের রঙটা যার আশ্চর্য্য রকমের ফর্সা, মুখখানা সিঁদুরের মত রাঙা করিয়া চোখ বুজিয়া পাশের ঘোমটা-টানা বৌটির গায়ে নির্লজ্জ ভঙ্গিতে হেলান দিয়া আছে। হয় মূর্চ্ছা গিয়াছে, নয় যাওয়ার উপক্রম করিয়াছে।

আনমনে নদীর দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতেই সদানন্দ বলিল, 'মেয়েদের গায়ে রোদ লাগছে বিপিন।'

বিপিন সদানন্দের বন্ধু, শিষ্য এবং আশ্রমের জেনারেল ম্যানেজার। একদিন সে সদানন্দের নাম ধরিয়াও ডাকিত, হাসিতামাসাও করিত। আজও অন্তরালে করিলে কিছু আসিয়া যায় না, কিন্তু দশজনের সামনে আনমনে হঠাৎ ভুল করিয়া বসিবার ভয়ে প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে সব সময়েই সে শিষ্যত্বের খোলসটা বজায় রাখিয়া চলে।

বিপিন হাত জোড় করিয়া বলিল, 'কি করব প্রভু?'

'ছায়ার ব্যবস্থা করে দাও।'

'দিই প্রভু।'

হোগলার বেড়া আনিয়া চালার খুঁটিতে ঠেস দিয়া দাঁড় করাইয়া বিপিন অল্পক্ষণের মধ্যেই ছায়ার ব্যবস্থা করিয়া দিল। আগেও কদিন মেয়েরা রোদে কষ্ট পাইয়াছে, রৌদ্র নিবারণের এমন সহজ উপায় থাকিতে আগে কেন এ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই, কে তা অনুমান করিবে। হয়ত কারও খেয়াল হয় নাই—সদানন্দেরও নয়। হয়ত তফাতে জমাট বাঁধিয়া বসিবার জন্য মেয়েদের উপর সদানন্দের রাগ হইয়াছিল, তাই কদিন তাদের রোদে ভাজা ভাজা করিয়া শাস্তি দিয়াছে। আজ বিধবা মেয়েটির রাঙা মুখখানা দেখিয়া মায়া হইয়াছে। কিন্তু রাগ কি সদানন্দের আছে? শাস্তি কি কারোকে সে দেয়? মায়া কি তার হয়? শুধু তাকে দর্শন করিয়া আর তার দর্শনের ব্যাখ্যা শুনিয়া কে তা অনুমান করিতে পারিবে।

মেয়েরা ছায়া পাওয়া মাত্র সদানন্দ মুখ ফিরাইল। মেয়েদের মৃদু গুঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে থামিয়া গেল। প্রেম ও অহিংসা সম্বন্ধে না জানি সাধুজী এবার কি বলিবে?

'নদীতে এবার অনেক আগে জল এল, না বলাই?'

কোথায় প্রেম ও অহিংসা, কোথায় রাধাই নদীতে জল আসা। কোথায় সতরঞ্চি জোড়া ভদ্রলোকের ভিড়, কোথায় এককোণে মাটির আসনে সাতুনার মূর্খ দোকানদার বলাই। বলাই নামে একজন যে আসিয়া আসরের একপাশে বসিয়াছে, তাই বা এতক্ষণ কজনে খেয়াল করিয়াছিল? বলাই কৃতার্থ ও নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

তার হইয়া জবাব দিল শ্রীধর। অনেক বয়স হইয়াছে শ্রীধরের, ষাটের কাছাকাছি। সতুনায় সে সম্পন্ন গৃহস্থ, তিন তিনটা রোজগেরে ছেলে লইয়া মস্ত সংসার পাতিয়াছে। রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিতে সে অদ্বিতীয়। সুতাবাঁধা চশমা আঁটিয়া প্রতিদিন সন্ধ্যার পর বাড়ীতে সে রামায়ণ মহাভারতের বাছাবাছা অংশ পাঠ করে, মাঝে মাঝে থামিয়া অতি সরল ও সহজবোধ্য কাহিনীর রসালো ব্যাখ্যা করিয়া শোনায়। তার বাড়ীতে প্রায়ই এরকম সভা বসে,—তবে এত বড় নয়। আর সে সভায় ভদ্রলোক আসে না, সে শুধু চাষী-মজুর তেলি—তাঁতি কামার-কুমারের সভা।

বিপিনের অনুকরণে হাত জোড় করিয়া শ্রীধর বলিল, 'চারবাদলা নেমে গেছে আজ্ঞা।'

চারবাদলা নামার সঙ্গে রাধাই নদীতে জল আসার সম্পর্ক কি? চারবার বৃষ্টি হইয়া গেলেই রাধাই নদীতে জল আসে। চিরদিনের নিয়ম।

টিপ্ টিপ্ করিয়া দু'চার ফোঁটা জলই পড়ুক আর ঝম্ ঝম্ করিয়া সৃষ্টি-ভাসান বাদলাই নামুক, চারবার বর্ষণ হইয়া গেলে নদীতে জল আসিবেই আসিবে। সদানন্দ মৃদু হাসে। জবাব দিয়াছে শ্রীধর, কিন্তু স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলকে তিরস্কার করিয়া বলে, এসব ধারণা পোষণ করা কেন, এ ধরণের সব কুসংস্কার? সাধুজীর স্নেহ-মধুর আবেগভরা ধমক শুনিয়া মনে হয়, আর যেসব কুসংস্কার তাদের আছে, সেসব যেন কিছু নয়, এটাই তাদের কুসংস্কারের চরম। মনে মনে এই কুসংস্কার পুষিয়া রাখিয়া ইহকাল পরকাল সব তারা নষ্ট করিয়াছে।

তারপর শুষ্ক নদীতে হঠাৎ স্রোত দেখা দিবার কারণ সে ব্যাখ্যা করে। ব্যাখ্যা করিতে করিতে আসে রহস্যময়ী প্রকৃতির কথা। প্রকৃতির আসল রহস্য কোথায়, মানুষ যে তার সন্ধান জানে না, একি সহজ আপশোষের কথা! অজানার মধ্যে মানুষ প্রকৃতির রহস্যকে খুঁজিয়া মরে—রাধাই নদীতে জল সঞ্চারের কারণ না জানায় ভাবে, এই বুঝি তবে প্রকৃতিদেবীর দুর্ব্বোধ্য লীলার অভিব্যক্তি। জানামাত্র যখন অজানার সমস্ত রহস্যের আবরণ খসিয়া যায়, অজানার জন্য মাথা ঘামান কেন? জানার মধ্যে, যে যতটুকু জানে তারই মধ্যে, প্রকৃতির সবটুকু রহস্যের খনি নিহিত থাকে। রাধাই নদীতে জলস্রোত আসিবার কারণ নাই বা জানিলে, জলস্রোত যে আসিয়াছে, এটুকু তো জান? এই জানাটুকুর মধ্যে সন্ধান কর, রহস্যানুভূতির অজ্ঞাত জগতের দিগন্তে অন্তর্জ্ঞানের ছায়া নিরবচ্ছিন্ন অস্তিত্বের সঙ্কেতে তোমায় সাড়া দিতেছে দেখিতে পাইবে।

সকলে মসগুল হইয়া শোনে। এতক্ষণে আসর জমিয়াছে। শুধু সদানন্দের বলিবার কৌশলে প্রত্যেকের মনে হয় দুর্ব্বোধ্য কথাগুলি যেন জলের মত বুঝিয়া ফেলিয়াছে। কি বুঝিয়াছে, একথা কেউ ভাবে না, বুঝিতে পারিয়াছে, এই ধারণার উন্মাদনায় বিভোর হইয়া থাকে। বিপিনের শীর্ণ ম্লান মুখে আনন্দের ছাপ পড়ে। আজ প্রণামী জুটিবে ভাল।

মাঝে মাঝে দু'একজন নতুন শ্রোতা আসিয়া চুপি চুপি আসরের একপাশে বসিয়া পড়িতেছিল। দেরী হওয়ায় তারা গ্রাম হইতে ব্যস্তসমস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছে, কিন্তু তপোবনে ঢুকিবার পর আর তাদের ব্যস্ততা নাই। সমস্ত তপোবন পার হইয়া চালায় পৌঁছিতে হয়, সেই অবসরে তপোবন তাদের শান্ত করিয়া দিয়াছে। না, তাড়াহুড়া করিবার কিছু নাই। সাধুজীর কথা যদি শেষ হইয়া যায়, তাতেই বা কি? আরেকদিন সময় মত আসিলেই হইবে। সদানন্দের কথা শুনিবার আগ্রহে যারা ছুটিয়া আসে, তাদের সকলের মনেই তপোবন কম-বেশী প্রায় এই রকম প্রভাব বিস্তার করে, সমস্ত অধীরতা যেন জুড়াইয়া যায়, আশা-আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা থাকে না। পতঙ্গ যেমন মধুতে ডুবিয়া চাপল্য হারায়, তপোবনের উদ্ভিদগুলির রক্ষণা-বেক্ষণে যে নিবিড় শান্তি আছে, তার অদৃশ্য স্তনত্বের কবলে আসিয়া পড়ামাত্র মানুষের মনের বিভিন্ন গতিগুলি তেমনি সংযত হইয়া যায়।

তবে সকলের নাগাল তপোবন পায় না। কত অনন্যমনস্ক জীব আছে জগতে, কত মন ইন্দ্রিয়ের মৃদুতর উপচারগুলি নির্ব্বিচারে প্রত্যাখ্যান করে, কত মানুষ নিজের চারিদিকে লইয়া বেড়ায় দুর্ভেদ্য আবরণ।

আট বেয়ারার হুম্ হুম্ শব্দে তপোবনকে কিছু-ক্ষণের জন্য নিছক জঙ্গলে পরিণত করিয়া একটি পাল্কী একেবারে আশ্রমের ভিতরে আসিয়া থামিল, সদানন্দের তিনমহাল কুটীরের সামনে। আসর বসিবার চালা হইতে সদানন্দের কুটীর বেশী তফাতে নয়, একটা বাঁশ ঝাড় এবং কয়েকটা জাম ও বকুল গাছের জন্য চোখে পড়ে না।

না দেখিয়াও অনুমান করা গেল কে আসিয়াছে। মহীগড়ের রাজা ছাড়া আট বেয়ারার পাল্কীতে আর যারাই চাপুক, আশ্রমে তারা আসে না। সদানন্দের কথা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। বিপিন ব্যস্ত হইয়া নিবেদন করিল, 'রাজাসাহেব দর্শনলাভ করতে এসেছেন প্রভু।'

'এখানে আসতে বল।'

'এখানে প্রভু?'

সদানন্দের আকস্মিক বিদ্রোহ বিপিন প্রত্যাশা করে নাই, মুখে অনেকগুলি রেখা সৃষ্টি করিয়া সে চাহিয়া রহিল। হোক গুরুদক্ষিণা, আশ্রমের ভূমি তো রাজাসাহেবের দান, নিজে সে আশ্রমে পায়ের ধূলা দিয়াছে তাই কি যথেষ্ট নয়? তার প্রজাদের এই আসরে তাকে ডাকিয়া আনার তো কোন মানে হয় না! যার কলমের এক খোঁচায় আশ্রম উঠিয়া যাইতে পারে, সে শিষ্য হইলেও তাকে একটু, খুব সামান্য একটু, খাতির করিলে দোষ কি?

রাধাই নদীর ঘোলাটে জলস্রোতই যেন আজ সদানন্দকে আনমনা করিয়া দিতেছে। বিপিনের প্রশ্নের মানে বুঝিতে দুবার শুনিতে হয় না, মুখের রেখা, চোখের দৃষ্টির মানে বুঝিতে দুবার চাহিতে হয় না। আনমনা হইয়া না-বুঝার ভাণ করাই সব চেয়ে সহজ।

'হ্যাঁ, বল গে' আমি এখানে আছি।'

বহুকাল শিষ্যত্বের অভিনয় করিতে করিতে কিভাবে যেন বিপিনের সংযম অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। তা ছাড়া মানুষটা সে বড় চালাক, ভাবিয়া চিন্তিয়া ফন্দি না আঁটিয়া কখনও সে কিছু করে না, যদি বা করে, অন্তরালে করে। জীবনের সমস্ত অসংযম তার গোপনীয়। সদানন্দের বোকামিতে রাগে গা জ্বলিয়া গেলেও তাই সে শুধু বলিল, 'প্রভু?'

সদানন্দ চুপ। আনমনে কথা বলার চেয়ে নীরবে আনমনা হওয়া ঢের সহজ। একটু অপেক্ষা করিয়া বিপিন কুটীরের দিকে চলিয়া গেল। আর ফিরিয়া আসিল না। সূর্য্য নামিয়া গেল তপোবনের গাছের আড়ালে, মেয়েদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল, সকলকে পা ছুঁইয়া প্রণাম করিবার ও প্রণামী দিবার অনুমতি দিয়া সদানন্দ ঠায় বসিয়া রহিল রক্তমাংসের দেবতার মত। দেবতার মতই তার মূর্ত্তি, বটতলার ছবির মহাদেবের ছাঁচে ঢালিয়া যেন তার সৃষ্টি হইয়াছে। আসন করিয়া বসায় ভুঁড়ি গিয়া প্রায় ঠেকিয়াছে পায়ে এবং তাতেই যেন মানাইয়াছে ভাল। নয় তো এই বৃষস্কন্ধ বিশালদেহ পুরুষের চওড়া বুক আর পেশীবহুল সুডৌল বাহু দেখিয়া মনে হইত, দেহের শক্তি ভিন্ন আর বুঝি তার কিছু নাই। কথায় তাহা হইলে মানুষ মুগ্ধ হইত, কারও ভক্তি জাগিত কিনা সন্দেহ। মাথায় জটা নাই বলিয়াই ভক্তেরা অনেকে মনে মনে আপশোষ করে। যার সৌম্য প্রশান্ত মূর্ত্তি স্থৈর্য্যের নিখুঁত প্রতীক, জটা ছাড়া কি তাকে মানায়?

সদানন্দের কুটীরের সদর আর কিছুই নয়, বড় একখানা ঘর। মেঝে লাল সিমেণ্ট করা, দেয়াল গেরুয়া রঙের,—বাদামী ভাবটা একটু প্রকট। আশ্রমের ছোট বড় সমস্ত ঘরই এই ধরণের, উপরের ছাউনি ছাড়া বাকী সব চুণসুরকি ইটকাঠের ব্যাপার। কিন্তু বিপিনের ভাষায় এগুলি সব কুটীর।

সদরের ঘরখানায় কতকটা বৈঠকখানার কাজ চলে, মাঝে মাঝে ভক্ত ও দর্শনার্থীদের ছোটখাট সভাও বসে। তবে সে সভা হয় অনেকটা ঘরোয়া মজলিসের মত, সকলে অনেক বিষয়ে স্বাধীনতা পায়। সদানন্দকে যেমন ব্যক্তিগত সুখদুঃখ দ্বিধা-সন্দেহ নিবেদন করা চলে; তেমনি চলে নিজেদের মধ্যে ঘরোয়া আলাপ আলোচনা, এমন কি উঁচু গলায় তফাতের মানুষকে জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করা চলে, কেমন আছ ভায়া। শিষ্য ও ভক্তের ব্যক্তিত্বকে এখানে সদানন্দ প্রশ্রয় দেয়, নদীর ধারে আটচলার নীচে এদের সঙ্গে তার যে ব্যবধানটা থাকে প্রায় দেবতা ও অধঃপতিতের, এখানে সেটা হয় অবতার ও মানুষের। কত তুচ্ছ বিষয়েই মাথা ঘামায় সদানন্দ, কত তুচ্ছ মানুষের কত তুচ্ছ পারিবারিক জীবনের কত তুচ্ছ খবরই যে জানিতে চায়। আগ্রহ দেখায় না বটে, দুঃসংবাদে বিচলিত হয় না, সুসংবাদে খুসীও হয় না, তবু নির্ব্বিকার সহিষ্ণুতার সঙ্গে কান পাতিয়া সব কথা তো শোনে, মুখ ফুটিয়া তো বলে 'তাই নাকি' অথবা 'বেশ বেশ'।

সদর পার হইয়া আসিলে অন্দরের উঠান, ফুলের চারায় ও ফলের গাছে বাগানের মত। এক-পাশে প্রকাণ্ড একটা বাঁধানো ইঁদারা, জল বড় মিষ্টি আর ঠাণ্ডা। গরমের দিনে সূর্য্য যখন মাথার উপরে থাকে আর ইঁদারার নতুন সিমেণ্ট করা গোলাকার চওড়া বাঁধটা হইয়া থাকে আগুন, হামাগুড়ি দিয়া একটিবার শুধু ক্ষণেকের জন্য ভিতরে উঁকি দিলে মনে হয়, জলে ডুবিয়া মরাই বুঝি ভাল: পূর্ণিমার চাঁদের আলোতেও অত নীচের জল তো দেখা যায় না, গরমের দিনে রাত্রে তাই যেভাবেই হোক মরার সাধ জাগানোর জন্য খালি গায়ে ঠাণ্ডা সিমেণ্টে গা এলাইয়া দিতে সাধ যায়। ফুরফুরে হাওয়া থাক, অথবা দারুণ গুমোট হোক, রাশি রাশি ফুলের ঘন মিশ্রিত গন্ধে প্রথমে মন কেমন করিয়া ঘুম আসিয়া পড়ে, এইটুকু যা অসুবিধা। একদিনও কি সদানন্দ পুরা একটা ঘণ্টা জাগিয়া থাকিতে পারিয়াছে!

উঠানের একদিকে সদর, বাকী তিনদিকেই প্রায় ঘর—কোন ঘরের সামনে বারান্দা আছে, কোন ঘরের সামনে নাই। অন্দর পার হইয়া নদীর দিকে অন্তঃপুর। অন্তঃপুরেও উঠান আছে, তবে অন্দরের উঠানটির তুলনায় আকারে অনেক ছোট আর আগাগোড়া সিমেণ্ট করা। না আছে ফুলের চারা, না আছে ফলের গাছ, শুধু ঝকঝকে তকতকে মাজাঘষা পরিচ্ছন্নতা। এক কোণে কেবল একটা তালগাছ আকাশে মাথা তুলিয়াছে, হঠাৎ দেখিলে

মনে হয় বুঝি জীবন্ত কিছু, চিরদিনের জন্য সদানন্দের অন্তঃপুরে বন্দী হওয়ায় ব্যাকুল আগ্রহে মাথা উঁচু করিয়া বাহিরের জগতে উঁকি দিতেছে। গাছটায় ফল ধরে না, কোনদিন নাকি ধরিবেও না।

অন্তঃপুরে ঢুকিবার একটি খিড়কী পথ আছে, নদীর দিকে প্রাচীরের গায়ে বসানো ছোট একটি দরজা। ঘরের জানালা দিয়া সারাদিন সদানন্দ আজ রাধাই নদীতে জলের আবির্ভাব দেখিয়াছিল, তারপর খিড়কির দরজায় বাহির হইতে শিকল তুলিয়া দিয়া গিয়াছিল আটচালার সভায়। এখন মন্থরপদে ফিরিয়া আসিয়া শিকলতোলা দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, বাহিরের মায়া-মদপায়ী মাতালের মত ভুঁড়ির উপর দুটি হাত রাখিয়া সামনে পিছনে একটুখানি টলিতে টলিতে। বিড় বিড় করিয়া কি যে বলিতে লাগিল, নিজের কানেই তা গেল না। নিজের কথা শুনিবার স্পৃহাও আর নাই। মনে তার শান্তি নাই কেন, এত মানুষকে সে শান্তি বিলাইতেছে? এত ক্ষোভ কেন তার, এমন আকস্মিক ক্রোধের সঞ্চার? কারও সে ক্ষতি করে নাই, কারও উপরে তার হিংসা নাই, বিদ্বেষ নাই,—বিপিনের কাণ্ডে মাঝে মাঝে রাগও হয়, ঘৃণাও জাগে বটে, কিন্তু বিপিনকে সে ভালই বাসে, এ জগতে বিপিন তার সবচেয়ে আপন, একমাত্র প্রাণের বন্ধু। এমন জ্বালাভরা অস্থিরতা তবে সে বোধ করে কেন? ভাবিতে ভাবিতে বাহিরের মায়ার নেশা যেন গাঢ় হইয়া আসে, আশ্রমে ঢুকিতে অনিচ্ছা বাড়িয়া যায়। শিকল খুলিয়া সদানন্দ তাই গায়ের জোরেই অন্তঃপুরে ঢুকিয়া পড়ে, সশব্দে ভিতর হইতে খিল বন্ধ করিয়া দেয়।

উঠানের তালগাছে ঠেস দিয়া একটি স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া সদানন্দের বিরক্তির সীমা থাকে না। রাগ করিয়া বলে, 'কে গা তুমি? কি করছ এখানে?'

'চুপ্। আমি কেউ না।'

কথাগুলি জড়ানো কিন্তু গলাটি মিষ্টি—অল্প-বয়সী মেয়ে। দক্ষিণের বড় ঘরের বারান্দায় আর পশ্চিমের ছোট ঘরখানার রোয়াকে দুটি লণ্ঠন জ্বলিতেছে, মেয়েটির গায়ে আলো পড়িয়াছিল যথেষ্ট। সদানন্দ চাহিয়া দেখে নাই, নতুবা বুঝিতে পারিত, মেয়েটি আশ্রমের কেউ নয়। এত কম-বয়সী মেয়েও আশ্রমে কেউ থাকে না, আশ্রমের মেয়েদের বেশভূষাও এরকম নয়।

কাণ্ডটা বিপিনের, বুঝিতে পারিয়া সদানন্দের বিরক্তি আরও বাড়িয়া গেল। আগে হইতে কিছু না জানাইয়া বিপিন যে কোথা হইতে এরকম এক একটি খাপছাড়া মেয়েকে আশ্রমে আনিয়া হাজির করে! গত বৈশাখের মাঝবয়সী স্ত্রীলোকটিকে ধরিলে এটি বিপিনের সাত নম্বরের ম্যাজিক। পাল্কীতে তবে মহীগড়ের রাজাসাহেব আসে নাই, আসিয়াছেন ইনি। বৈশাখের ব্যাপারে সদানন্দ ভয়ানক রাগ করায় বিপিন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, আর এসব ঘটিবে না, কোনদিন নয়। ক'মাসের মধ্যেই বিপিন প্রতিজ্ঞার কথাটা তাহা হইলে ভুলিয়া গিয়াছে। ভুলিয়া যাওয়ার আগে একটু আভাস দেওয়াও দরকার মনে করে নাই, তাকে যে কথা দিয়াছিল সেটা মানিয়া চলা সম্ভব হইবে না। দুঃখে অপমানে নিজেকে সদানন্দের একান্ত অসহায় বলিয়া মনে হয়। বিনামূল্যে কিনিয়া বিপিন যেন তাকে ক্রীতদাস করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু এবার সে ছাড়িবে না, এবার একটা চরম বোঝাপড়া করিতে হইবে বিপিনের সঙ্গে।

খুব বেশী বিব্রত বোধ না করিলে, অন্তঃপুরের উঠানে খাপছাড়া নিঃসঙ্গ তালগাছটার গুঁড়িতে মেয়েটাকে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সদানন্দের হয়তো মনে হইত, মন্দ মানায় নাই। কবে কে দা' কুড়াল কিছু একটা অস্ত্র দিয়া আঘাত করিয়াছিল গাছটার গুঁড়িতে, সেই ক্ষতের চিহ্ন, মাটি ঘেঁষিয়া কয়েকটা সরু সরু শিকড়ের ইঙ্গিত, সিমেণ্টে বিপিন কবে আনমনে পানের পিক ফেলিয়াছিল তার প্রায় মুছিয়া যাওয়া দাগ, হাত দেড়েক তফাতে নর্দমার কাছে এক বালতি জল আর একটা ঘষামাজা ঘটি আর এই আবেষ্টনীর মধ্যে অতিরিক্ত একটি মেয়ে। কিন্তু রাগে সদানন্দ অন্ধকার দেখিতেছিল।

রাগ চাপিয়া কোনরকমে সে বলিল, 'এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন বাছা, ঘরে গিয়ে বোসো?'

'আমি যদি এখানে দাঁড়িয়ে থাকি, তোমার কি?'

জড়ানো সুরে কথাগুলি বলিয়া গাছের আশ্রয় ছাড়িয়া সদানন্দের ঝকঝকে তকতকে সিমেণ্ট করা উঠানে হিলতোলা জুতা ঠুকিয়া মেয়েটি আগাইয়া আসিল কাছে, খপ করিয়া ধরিয়া ফেলিল সদানন্দের হাত। হয়তো টাল সামলানোর জন্য।

'তুমি সাধুজী, না?'

মুখে তীব্র মদের গন্ধ। যে গন্ধে সদানন্দের চিরকাল বমি আসে। জবাব না পাইয়াও আহ্লাদে মেয়েটি যেন গলিয়া গেল, দুহাতে সদানন্দের গলা জড়াইয়া গদগদ হইয়া বলিল, 'শোন, আমি কেউ নয় বললাম না এক্ষুনি তোমাকে, তা সত্যি নয়। আমি মাধবী, মাধবীলতা—লতাটা কেটে বাদ দিয়েছি একদম।'

বলিয়া খিল খিল করিয়া মাধবীর কি হাসি! গলায় জড়ানো হাতের বাঁধন খুলিয়া সদানন্দ তাকে ঠেলিয়া দিয়া ঘরে চলিয়া গেল। পড়িয়া গিয়া আঘাতের ব্যথায় মাধবীলতা ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

মাধবীলতার কান্না শুনিয়া পুবের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল বিপিন আর সাহেবী পোষাক-পরা একটি যুবক। দুজনে ধরাধরি করিয়া মাধবীলতাকে লইয়া গেল ঘরে। মাধবীলতা কাঁদিতে কাঁদিতে কেবলি নালিশ করিতে লাগিল, 'সাধুজী আমায় মেরেছে, ঠেলে ফেলে দিয়েছে। আমি এখানে থাকব না, আমায় নিয়ে চল।'

আটবেয়ারার পাল্কী চাপিয়া মহীগড়ের রাজা আজ আসে নাই। আসিয়াছে রাজপুত্র। মাধবী-লতাকেও সঙ্গে আনিয়াছে সে-ই। আনিয়াছে পাল্কীর মধ্যে এককোণে লুকাইয়া। একেবারে অন্দরে ঢুকিয়া পাল্কী থামিয়াছে, রাজাসাহেব স্বয়ং রাণীসাহেবাকে সঙ্গে করিয়া আশ্রমে আসিলে যেখানে থামে। রাজপুত্রের গায়ে ভর দিয়া মাধবীলতা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে।

অন্দর তখন একরকম ফাঁকাই ছিল, তবু মহীগড়ের রাজার বদলে রাজপুত্র আর রাণীর বদলে মাধবীলতার আগমন কারও নজরে পড়িয়াছে কিনা বলা শক্ত। এ রকম অবস্থায় তাকে আশ্রমে কয়েকদিনের জন্যও রাখা সঙ্গত হইবে কিনা, বিপিন ও রাজপুত্রের মধ্যে এতক্ষণ সেই পরামর্শই চলিতেছিল। বিপিন বার বার অনুযোগ দিয়া বলিতেছিল, এরকম প্রকাশ্যভাবে মাধবীলতাকে আশ্রমে আনা সত্যই বড় অন্যায় হইয়াছে রাজপুত্রের। আগে একটা খবর যদি সে পাঠাইত বিপিনকে, বিপিন সব ব্যবস্থা করিয়া দিত, এতটুকু হাঙ্গামাও হইত না, রাজপুত্রের ভাবনারও কিছু থাকিত না।

রাজপুত্রের নাম নারায়ণ। দীর্ঘ বলিষ্ঠ সুদর্শন চেহারা, মাঝে মাঝে মুখে অনাচার অত্যাচারের যে ছাপটুকু পড়ে, সেটা স্থায়ী হয় না, দুদিন বিশ্রাম করিলেই মুছিয়া যায়, মুখে আবার স্বাস্থ্যের অমলিন জ্যোতি ফুটিয়া ওঠে। এমন মুখখানা উত্তেজনা ও ভয়ে অস্বাভাবিক রকম পাণ্ডুর দেখাইতেছে, চাউনি দেখিলেই টের পাওয়া যায় মানুষটা এখন বিহ্বল।

বিপিনের অনুযোগের জবাবে সেও অনেকবার বলিয়াছে, 'কি করব বলুন, এমন একগুঁয়ে, বলবার নয়। সব ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলেছিলাম, ওর জন্যেই সব ভেস্তে গেল। শেষ মুহূর্তে কোথায় যাই, তাই এখানে ছুটে এলাম।'

বিপিন তখন আশ্বাস দিয়া বলিয়াছে, 'যাক্ কি আর হবে, ভাববেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

মাধবীলতাকে শান্ত করিতে বেশী সময় লাগিল না, ছোট ঘরখানায় চৌকীর উপর বিছান ময়ূরআঁকা মাদুরে সে গুম্ খাইয়া বসিয়া রহিল। রাজপুত্র নারায়ণ তখন পুবের ঘরে আসিয়া সদানন্দকে প্রণাম করিল। সদানন্দ কোনদিন কাহাকেও আশীর্ব্বাদ করে না, বিড়বিড় করিয়া মুখে একটা আওয়াজ করে মাত্র। আজ তাও করিল না।

ঘরের আলোটা সদানন্দ কমাইয়া দিয়াছিল, বিপিন বাড়াইয়া দিল। দেখা গেল, নারায়ণের মুখের পাংশু বিবর্ণভাবটা বড় বেশীরকম স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সদানন্দকে সে কোনদিনই বিশেষ খাতির করে না, ভয় ভক্তি করার দরকারও কোনদিন বোধ করে নাই। আজ তার সবটুকু তেজ আর বেপরোয়াভাব উবিয়া গিয়াছে।

বিপিন নিবেদন করিল, 'রাজাসাহেব আসেননি প্রভু। নারায়ণবাবু একটি নিরাশ্রয় মেয়েকে আশ্রমে ভর্তি করে দিতে এনেছেন। মেয়েটির কেউ নেই প্রভু।'

'থাকবার ব্যবস্থা করে দাও। আর তোমরা যাও বিপিন।'

'আসনে বসবেন প্রভু?'

'যেতে বললাম যাও না বিপিন, আমায় একট একা থাকতে দাও।'

বিপিনের মুখ দেখিয়া রাগ বোঝা যায় না, কেবল তার কপালে কয়েকটা রেখার সৃষ্টি হয় আর চোখের পলক পড়া অনিয়মিত হইয়া যায়। নারায়ণকে সঙ্গে করিয়া বিপিন ঘর হইতে চলিয়া গেল। ঘণ্টা দুই পরে সে যখন আবার ঘরে আসিল, সদানন্দ ঘুমের ভাণ করিয়া খাটের উপর গদির বিছানায় পড়িয়া আছে। গায়ে ঠেলা দিয়াও তার ঘুম ভাঙাইতে না পারিয়া চাপা গলায় তাকে একটা কুৎসিত গাল দিয়া বিপিন চলিয়া গেল। সদানন্দের বড় ক্ষুধা পাইয়াছিল, সেবার ব্যবস্থাটাও

আজ একটু বিশেষ রকমের হইয়াছে, কাছাকাছি একটা গ্রাম হইতে মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে কে যেন আজ নানারকম সুখাদ্য পাঠাইয়া দিয়াছে আশ্রমে। বিপিনের সঙ্গে বোঝাপড়ার ভয়ে না খাইয়াই আকাশ পাতাল ভাবিতে ভাবিতে সদানন্দ এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুম ভাঙ্গিল খুব ভোরে, ভাল করিয়া তখনও চারিদিক আলো হয় নাই। পাশ না ফিরিয়াই বোঝা গেল কে যেন পিঠের সঙ্গে মিশিয়া শুইয়া আছে। মশারি ফেলিতে সদানন্দের মনে ছিল না, কে যেন মশারি ফেলিয়া সযত্নে গুঁজিয়া দিয়াছে। উঠিয়া বসিয়া সদানন্দ একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। মাধবীলতার শুইবার ভঙ্গিটি মনোরম নয়, তাছাড়া তার নিজের দেহের উপর মাঝ রাত্রি পর্য্যন্ত তার নিজেরই ছটফটানির ঝড় বহিয়া গিয়াছে। কিন্তু এদিকে সদানন্দও প্রায় একযুগ হইল সকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া পিঠের সঙ্গে মেশা কুণ্ডলীপাকানো পুঁটুলীর মত নারীদেহ চাহিয়া দেখে নাই। হঠাৎ চোখ ফিরাইতে পারিল না।

তাছাড়া, বিপিন যে মাধবীলতাকে আশ্রমে আনিয়াছে, এ অপমানের জ্বালা আছে, প্রতিকার নাই, প্রতিকারহীন অপমানের আছে শুধু প্রতিশোধের কামনা। বিপিন যে কতদূর ছোটলোক, এই চিন্তার ছেদ দিয়া দিয়া ছাড়া ছাড়া ভাবে সদানন্দ ভাবিতে থাকে, আহা, মেঘলা ভোরে মেয়েটি শীতে কেমন জড়সড় হইয়া গিয়াছে দ্যাখো। গরমে নিজের দেহ যে ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে, এটা সদানন্দের খেয়ালও হয় না। শীতের জন্যই মাধবীলতার এমন অদ্ভুত শোয়ার ভঙ্গি, এই অকাট্য যুক্তির কাছে গরমের অনুভূতি হার মানে। এইভাবে মাধবীলতাকে দেখিতে দেখিতে মনের আকাশ-পাতাল আলো-অন্ধকার কি ভাবে যেন ধীরে ধীরে ঝাপসা হইয়া কোথায় মিলাইয়া গেল, অতীত হইতে ভবিষ্যতের দিকে প্রবাহিত হওয়ার বদলে সময় বর্ত্তমানকে কেন্দ্র করিয়া পাক খাইতে খাইতে আবর্ত্ত রচনা করিতে লাগিল। মনটা বিদ্রোহ করিয়া বসিল সদানন্দের, একবার চাহিল রুদ্ধ দরজার দিকে, একবার চাহিল জানালা দিয়া খানিক তফাতে রাধাই নদীর দিকে, তারপরে দুহাত বাড়াইয়া পুতুলের মত মাধবীলতাকে তুলিয়া লইল বুকে।

তখন অবশ্য মাধবীলতার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু সে কিছুই বলিল না। পুতুলটি যেন অন্য কেউ, এমনিভাবে কৌতূহলী চোখ মেলিয়া মহাপুরুষ নামে বিখ্যাত প্রৌঢ়বয়সী দৈত্যটির পুতুল-খেলার মুখভঙ্গি দেখিতে লাগিল।

দুই

[লেখকের মন্তব্য : ভাবিয়া দেখিলাম, গল্পের মধ্যে ইঙ্গিতে পরিস্ফুট করিয়া তোলার পরিবর্ত্তে মাধবীলতা সম্বন্ধে সদানন্দের আবিষ্কার ও মনোভাব পরিবর্ত্তনের কথাটা আমার বলিয়া দেওয়াই ভাল। সংক্ষেপে বলাও হইবে, নীরস অশ্লীলতার ঝাঁঝও এড়ানো চলিবে। সদানন্দের ধারণা হইয়াছিল, মেয়েটি ভাল নয়। মাধবীলতার প্রতিবাদহীন আত্মদান এই ধারণাকে সমর্থনও করিত। কিন্তু সদানন্দ জানিতে পারিল, মাধবীলতা কুমারী।

একটা কথা স্পষ্ট বলিয়া রাখি। মাধবীলতা ভাল কি মন্দ, এটা তার প্রমাণ দিবার চেষ্টা নয়, আমার মতামতের কথা বলিতেছি না। সদানন্দের ধারণার কথা হইতেছে। আমার মন্তব্য হইতে মাধবীলতা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হিসাবে বড় জোর এইটুকু অনুমান করিয়া লইবার অনুমতি দিতে পারি যে, পুরুষ সম্বন্ধে মাধবীলতার অভিজ্ঞতা ছিল না। নয় তো অবসাদে যতই কাবু হইয়া পড়ুক, চাঁদ-হারাণো মাঝরাত্রির অন্ধকারে অচেনা অজানা যায়গায় আনাচে কানাচে যত ভয়ই জমা থাক, বিপিন আর নারায়ণের চেয়ে বিখ্যাত সাধু সদানন্দকে যতই নিরাপদ মনে হোক, সদানন্দের শয্যায় গিয়া সদানন্দের পিঠ ঘেঁষিয়া শুইয়া পড়িবার মধ্যে কোন যুক্তি থাকে না। মশারি ফেলিয়া দিলে যে মশা কামড়াইবে না, এ জ্ঞানটা তো মাধবীলতার বেশ টনটনে ছিল।]

আশ্রমের খানিক তফাতে নদীর ধারে একটা মোটা কাঠের গুঁড়িতে সদানন্দ মাঝে মাঝে বসিয়া থাকে। সেইখানে বিপিন তাকে আবিষ্কার করিল। তখনও সূর্য্য আকাশে বেশী উঁচুতে ওঠে নাই। নদীর জল রাতারাতি আরও বাড়িয়াছে, ঘোলাটে জলের স্রোতে এখনও অনেক জঞ্জাল ভাসিয়া যাইতেছে, শুকনো নদীতে অনেকগুলি মাস ধরিয়া যেসব আবর্জ্জনা জমা হইয়াছিল। কাছাকাছি ছোট একটি আবর্ত্তে কয়েকবার পাক খাইয়া একটা মরা কুকুর ভাসিয়া গেল। বড় আপশোষ হইতেছিল সদানন্দের, অনুতাপমিশ্রিত গ্লানিবোধ। তবু শরীর মন যেন হাল্কা হইয়া গিয়াছে। করুণা ও মমতার

ব্যথায় হৃদয় ভারাক্রান্ত, তবু আনন্দের একটা অক্ষয় প্রলেপ পড়িয়াছে, মৃদু ও মধুর। ব্যাপারটা সদানন্দ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। অন্যায়ের শাস্তি ও পুরস্কার কি এমনিভাবে একসঙ্গে আসে?

বিপিন পাশে বসিতে বিরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু বিপিন বোঝাপড়া করিতে আসে নাই, ভাব করিতে আসিয়াছে। এ কাজটা বিপিন ভাল পারে না, বন্ধুত্বের ফাটল ঝালাই করার কৌশল তার জানা নাই। রাজপুত্রের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া সদানন্দের ঘরে মাধবীলতার রাত কাটানো লইয়া একটু পরিহাস করিতে যায়, তারপর সদানন্দের মুখ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সুর বদলাইয়া বলে, 'বড় ছেলেমানুষ তুই, রাগিস কেন? তুই ছাড়া আর কারও ঘরে ওকে থাকতে দিতাম? তোর কাছে ছিল বলেই নারাণ বাবুরও ভাবনা হয়নি, আমারও ভাবনা হয়নি।'

এতবড় তোষামোদেও সদানন্দ খুসী হইল না দেখিয়া বিপিন মনে মনে রাগিয়া গেল। বিপিন রাগিলেই সদানন্দ সঙ্গে সঙ্গে সেটা টের পায়, দুজনের মধ্যে একটা আশ্চর্য্য ঘনিষ্ঠতা আছে তাদের, একটা অতীন্দ্রিয় যোগাযোগ আছে, বোধ হয় ইন্দ্রিয়ের যখন বিকাশ হইতে থাকে—সেই শৈশব হইতে পরস্পরকে তারা ভালবাসিয়া আর ঘৃণা করিয়া আসিতেছে, এজন্য। কতবার ছাড়াছাড়ি হইয়াছে জীবনে, কিন্তু এ জগতে নূতন আর একটি বন্ধুও তারা খুঁজিয়া পায় নাই। ছাড়াছাড়ি যখন হইয়াছে, অপর জন মরিয়া আছে না বাঁচিয়া আছে এ খবরও যখন তারা দীর্ঘকাল পায় নাই, কারও মন এতটুকু খারাপ হয় নাই, আবার যখন দেখা হইয়াছে তখনও হয় নাই আনন্দ। কয়েকটা দিনরাত্রি কেবল তখন একসঙ্গে কাটিয়া গিয়াছে—পরস্পরের মধ্যে মসগুল হইয়া, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলিয়া আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ করিয়া থাকিয়া।

সদানন্দ ঘাড়ে হাত রাখিবামাত্র বিপিন ঘাড় ফিরাইয়া অন্যদিকে তাকায়, একেবারে অবিশ্বাস্য মনে হয় বিপিনের এই ভাবপ্রবণতা, তার ক্রোধে অভিমানের এতখানি ভেজাল।

'তুই যা ভাবছিলি তা ঠিক নয় সদা, মেয়েটা সত্যি ভাল। ওকে না জানিয়ে নারাণবাবু চলে গেছে বলে সেই থেকে খালি কাঁদছে।'

'নারাণ আর আসবে না?'

'আসবে,—ওবেলা, নয় তো কাল সকালে। চার পাঁচদিনের মধ্যে একটা ব্যবস্থা করে মাধবীকে নিয়ে চলে যাবে, এ কটা দিন একটু যত্নে সয়ে কাটিয়ে দে সদা, দোহাই তোর। আর কেউ হলে কি আশ্রমে উঠতে দিতাম? রাজা সায়েবের ছেলে, দুদিন পরে নিজে সব কিছুর মালিক হবে, ওকে তো চটান যায় না, তুই বল, যায়?'

সদানন্দ গম্ভীরমুখে বলিল, 'বড়লোকের পা-চাটা আর টাকা রোজগারের ফন্দি আঁটবার জন্য আশ্রম করেছিলি বিপিন? তা হলে ব্যবসা করলেই হত?'

বিপিন তর্ক করিল না, হাত জোড় করিয়া হাসিয়া বলিল, 'এ ব্যবসা মন্দ কি প্রভু?'

সদানন্দ মাথা নাড়িয়া বলিল, 'তামাসা রাখ, ভাল লাগে না। দিন দিন তুই যে কি ব্যাপার করে তুলছিস, বুঝতে পারি না বিপিন। যে উদ্দেশ্য নিয়ে আশ্রম করা হয়েছিল, সব চুলোয় গেছে, তোর খালি টাকা টাকা! টাকা ছাড়া কিছু হয় না বলেছিলি, টাকা তো অনেক হয়েছে, আবার কেন? এবার আসল কাজে মন দে না ভাই—এসব ছেড়ে দে। আর টাকাই যদি তোর বড় হয়, তুই থাক তোর আশ্রম নিয়ে, আমি চলে যাই। দিন দিন আমার মনের শান্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আমার আর সয় না।'

নালিশটা নতুন নয়, সদানন্দের বলিবার সকরুণ ভঙ্গিতে বিপিন আশ্চর্য্য হইয়া গেল। একটু ভাবিয়া সে একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল জোরে, যতদূর সম্ভব মর্ম্মাহত হওয়ার ভঙ্গিতে বলিতে লাগিল, 'টাকা? টাকা দিয়ে আমি করব কি? তুই কি ভাবিস টাকার লোভে আমি টাকা রোজগারের ফন্দি আঁটি? কতবার তোকে বলেছি সদা, তুই বুঝবি না কিছুতে, টাকা ছাড়া কিছু হয় না। কত লোক আশ্রমে এসে থাকতে চায়, থাকবার ঘর নেই, ঘর তুলবার টাকা নেই। দক্ষিণের আম বাগানটা কিনে ফেলা দরকার, টাকা আছে কিনবার? এবার যদি নারাণবাবু কিনে দ্যান। তুই আদর্শ জানিস সদা, কিসে কি হয় জানিস না। বড় কাজ করতে চাইলেই কি করা যায়? করতে জানা চাই। ভেবে দ্যাখ, এই যে আশ্রমটা হয়েছে, এতগুলি লোক আশ্রমে বাস করছে, দলে দলে লোক এসে তোর উপদেশ শুনে যাচ্ছে, আমি ফন্দি না আঁটলে এটুকুও কি হত? রাস্তায় রাস্তায় চীৎকার করে গলা ফাটিয়ে ফেললেও কেউ তোর কথা শুনতো না। ভাল উদ্দেশ্যে দুটো মিথ্যে কথা, একটু ভড়ং, এসবে

দোষ হয় না। নারাণবাবু একটা মেয়েকে বার করে এনেছে তো আমাদের কি? আমরা আশ্রমে উঠতে দিলেও বার করে আনত মেয়েটাকে, না দিলেও বার করে আনত। আমরা শুধু এই সুযোগে আশ্রমের একটু উন্নতি করে নিচ্ছি এসব কথা নিয়ে মাথা ঘামাস না, তোর কাজ তুই করে যা, আমার কাজ আমি করে যাই, একদিন দেখবি আমাদের এই আশ্রমের নাম সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছে।'

বিপিনের মত বড় বক্তৃতার জবাবে সদানন্দ শুধু বলিল, 'আশ্রমের নাম সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে যাবার জন্য আমার তো ঘুম আসছে না।'

'ঘুম তোর খুব আসে, মোষের মত ঘুমোস সারারাত। তোর মত শুয়ে বসে আরামে দিন কাটাতে পারলে আমারও ঘুম আসত।'—বলিয়া বিপিন রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

খানিক পরে সদানন্দ ভিতরে গেল। ছোট ঘরের চৌকীতে সেই ময়ূরআঁকা মাদুরে মাধবীলতা চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। বিপিন বোধ হয় তাকে চা আর খাবার আনিয়া দিয়াছে, কিন্তু সে খায় নাই। কথা বলিতে গিয়া প্রথমে সদানন্দের গলায় শব্দ আটকাইয়া গেল, তারপর এমন কথা বলিল যার কোন মানে হয় না।

'এখানে একা বসে আছ?'

একটু ইতস্তত: করিয়া চৌকীতেই একপাশে বসিল। মুখখানা তার অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর ও ম্লান হইয়া গিয়াছে। মাধবীলতা একবার চোখ তুলিয়া চাহিল, সরিয়াও বসিল না, কথাও বলিল না। সদানন্দের ইচ্ছা হইতেছিল অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে তার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দেয় আর কিছুক্ষণের জন্য তার আঙুলগুলি যেন হইয়া যায় পাখীর পালকের চেয়ে কোমল।

'খাবার খাওনি কেন?'

'খিদে পায় নি।'

'কাল রাত্রে খেয়েছিলে কিছু?'

মাধবী মাথা নাড়িল।

'তা হলে খেয়ে নাও কিছু। চা'টা বোধ হয় [illegible]য়ে গেছে, গরম করে দিতে বলব?'

'না, কিছু খাব না। বমি হয়ে যাবে।'

মাধবীলতা যেন একটু বিস্ময়ের সঙ্গে সদানন্দের মুখের ভাব দেখিতে থাকে। সদানন্দের মনে হয়, তুচ্ছ খাওয়ার কথা লইয়া এত বেশী মাথা ঘামানোর জন্য বিরক্ত হইয়া চোখের দৃষ্টি দিয়া সে তাকে ভর্ৎসনা করিতেছে। সদানন্দ কাঠের পুতুলের মত বসিয়া রহিল। মাধবীলতাকে তার কি বলার আছে? ভাবিতে গিয়া মনে পড়িল, একটা কথা বলা যায়, মাধবীলতার ভুলের কথা।

'এমন কাজ কেন করলে মাধবী, কেন বাড়ী ছেড়ে এলে? দুদিন পরে নারাণ যখন তোমাকে ফেলে পালাবে, কি করবে তখন তুমি? সমস্ত জীবনটা নষ্ট করে ফেলেছ নিজের, একটু ভুলের জন্য। এমন ছেলেমানুষী করে!'

শুনিতে শুনিতে মাধবীলতার দু'চোখ জল্ জল্ করিতে থাকে, মুখ আরক্ত হইয়া যায়। ইতিমধ্যে সে কখন স্নান করিয়াছে, ভাল করিয়া মোছা হয় নাই বলিয়া চুল এখনও ভেজা। ভেজা চুলের জলপটি থাকা সত্ত্বেও এমন মাথা গরম হইয়া যায় মাধবীলতার যে, প্রথমে সে খাবারের প্লেট আর চায়ের কাপটা সদানন্দকে ছুঁড়িয়া মারে, তারপর বাঘিনীর মত ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আঁচড়াইয়া সদানন্দের মুখে রক্ত বাহির করিয়া দেয়। তারপর সদানন্দের কোলে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করে।

এই ধরণের কাণ্ড সদানন্দ আরও প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এক যুগেরও বেশী আগে আরেকজনকে এমনিভাবে শান্ত ও সংযত অবস্থা হইতে চোখের পলকে উন্মাদিনীতে পরিণত হইয়া যাইতে দেখিত মাঝে মাঝে। তবে সে এভাবে খাবারের প্লেট, চায়ের কাপ ছুঁড়িয়া মারিত না, কোলে মুখ গুঁজিয়া এভাবে কাঁদিতও না, দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া নিজেকে আহত করিয়া ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইত। হঠাৎ সদানন্দের মনে হইল, এতক্ষণে সে যেন বাস্তব জগতে নামিয়া আসিল, এতক্ষণে বোঝা গেল ব্যাপারখানা কি। হাত বাড়াইয়া র‍্যাক হইতে একটি গেরুয়া কাপড় টানিয়া আনিয়া মুখে আঁচড়ের রক্ত আর গায়ে লাগা চা ও খাবার খানিক খানিক মুছিয়া ফেলিল। মাধবীলতার গায়ে মাথায় পাখীর পালকের মত কোমল আঙুল বুলাইবার সাধটা এখন মেটানো যায়, কিন্তু ওধরণের কবিত্বপূর্ণ সাধ আর সদানন্দের নাই। মাধবীলতার পিঠে একখানা হাত রাখিয়া সে তাকে কাঁদিতে দিল। কাঁচা রক্তমাংসে গড়া এতটুকু একটা কোমল মেয়ে, এত কাণ্ডের পর ওকে কাঁদিতে না দিলে চলিবে কেন?

কান্না কমিয়া আসে, মাধবী মুখ তোলে না, আরও জোরে সদানন্দকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। বাপ মার আশ্রয় ছাড়িয়া সে আসিয়াছে কিনা কে

জানে, বাপ মা তার আছে কিনা, তাও সদানন্দের জানা নাই, তবু এটুকু সদানন্দ অনুমান করিতে পারে, তারই মত একজনের আশ্রয় ছাড়িয়া মাধবীলতা আসিয়াছে। হয়তো সে ছিল নির্মম, স্নেহ তার কাছে মাধবীলতা পায় নাই, শুধু নির্যাতন সহিয়াছে, হয়তো সে ছিল পরম স্নেহবান, তার আদরে জীবনের সমস্ত বৈচিত্র্য গলিয়া গিয়া মাধবীলতার জীবন একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সেই ছিল একমাত্র আশ্রয়, আর কারও কথা মাধবীলতা জানে না। প্রেমিক? এতটুকু মেয়ে, কুমারী মেয়ে, সে প্রেমের কি জানে, প্রেমিকের দাম তার কাছে কতটুকু? খেলার সাথী হিসাবে শুধু তার প্রয়োজন হয় একটু, না হইলেও চলে, একটু মন কেমন করার মধ্যেই সে অভাবের পূরণ হয়।

'মুখ তোলো মাধবী, উঠে বোসো। ভয় নেই, আমি সব ঠিক করে দেব।'

মাধবী উঠিয়া বসিল। আঁচলে ভাল করিয়া চোখ মুছিবার পর তার মুখ দেখিয়া কে বলিবে এইমাত্র সে ক্ষেপিয়া গিয়াছিল।

'আশ্রমে অনেক মেয়ে থাকে, চল, তোমাকে তাদের কাছে দিয়ে আসি।'

মাধবীলতা সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'চলুন।'

সদানন্দ একটু হাসিয়া বলিল, 'আগে মুখ ধুয়ে কাপড়টা বদলে এসো, গালে তোমার সন্দেশ লেগে আছে, কাপড়ে চা ভর্ত্তি।'

মুখ ধুইয়া কাপড় বদলাইয়া মাধবী প্রস্তুত হইলে, সদানন্দ তাকে সঙ্গে করিয়া খিড়কী-পথেই বাহির হইল। বিপিন বোধহয় সদরের দিকে কোথাও আছে, তার সামনে পড়িবার ইচ্ছা ছিল না। গোলমাল বিপিন করিবেই, তবে সেটা এখন মাধবীলতার সামনে না ঘটাই ভাল। আশ্রমের দুটি অংশের মধ্যে পায়ে পায়ে দু'তিনটি আঁকা বাঁকা সরু পথ আপনা হইতে গড়িয়া উঠিয়াছে। আর কোন পথ নাই। মাধবীলতা যেন বেশ উৎসাহের সঙ্গে জোরে জোরে পা ফেলিয়া চলিতে থাকে, তপোবনের শোভা দেখিয়া সে যেন খুসী হইয়াছে, ভিজা মাটিতে পা ফেলিয়া যেন আরাম পাইতেছে। বলা মাত্র সে যে তার সঙ্গে নূতন একটা আশ্রয়ে যাইতে রাজী হইয়া যাইবে, এটা সদানন্দের কাছে আশ্চর্য্য ঠেকে নাই। এখন তার ভাবনা, ঝোঁকের মাথায় রাজী হইয়া গেলেও, শেষ পর্য্যন্ত আশ্রমে সে থাকিতে চাহিবে কি না। হয়তো নারায়ণ আসিয়া ডাকিলে তার মনে হইবে, আশ্রমে থাকিয়া জীবনটা নষ্ট করার বদলে তার সঙ্গে চলিয়া যাওয়াই ভাল।

তখনও আশ্রমের সকলের ধ্যানধারণা সাধন-ভজন শেষ হয় নাই। গুরুদেবের পদার্পণে অনেকেরই কয়েক মিনিটের মধ্যে শেষ হইয়া গেল বটে, কয়েকজন আরও বেশী আসন কামড়াইয়া চোখ বুজিয়া রহিল। গুরুদেব খোঁজ করিয়া জানিবেন, সকলে ইতিমধ্যেই আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়াছে কিন্তু তারা ধ্যানধারণায় এখনও মশগুল, গুরুদেবের আবির্ভাব পর্য্যন্ত টের পায় না, এমন আত্মহারা। জানিয়া গুরুদেব নিশ্চয় খুসী হইবেন, এরাই তাঁর খাঁটি শিষ্য। আশ্রমে এ রকম অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ জন সাতেক অন্ধ ভক্ত বাস করে, অন্য সকলের তুলনায় এদের ভক্তির বাড়াবাড়িতে সদানন্দকে মাঝে মাঝে রীতিমত বিব্রত হইতে হয়। দুজন বিধবা মহিলা আছে এইরকম, কি যেন একটা সম্পর্কও আছে দুজনের মধ্যে, পিসী ভাইঝির সম্পর্কের মত। একজনের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, শুষ্ক শীর্ণ চেহারা, অত্যন্ত রুক্ষ মেজাজ। বৌরা সকলে ধীরে ধীরে খোলস ছাড়িয়া একে একে অবাধ্য হইতে আরম্ভ করায় এবং ছেলেরা সকলে একজোট হইয়া বৌদের পক্ষ নেওয়ায়, ছেলে বৌ নাতি নাতনীতে ভরা প্রকাণ্ড সংসার ছাড়িয়া আশ্রমে আসিয়া ডেরা বাঁধিয়াছে।

অপরজনের বয়স কম, বছর ত্রিশেক হইবে। গোলগাল ফর্সা রসালো চেহারা, হঠাৎ অপদস্থ হইলে মানুষের মুখের ভাব যেমন হয়, সব সময় মুখে সেইরকম একটা সকাতর লজ্জার ভাব ফুটিয়া থাকে। সংসারত্যাগী বয়স্কা মহিলাটির সঙ্গে সে থাকে এবং সকল বিষয়ে তাকে অনুকরণ করিয়া চলে। ঘুম হইতে ওঠে একই সময়ে, স্নান ও জপতপ সারে একই সময় ধরিয়া, আহার করে একই খাদ্য,—পরিমাণটা পর্য্যন্ত সমান রাখিতে চেষ্টা করে।

বয়স্কা মহিলাটি অন্য সব অনুকরণে সায় দেয়, গোলমাল করে কেবল খাদ্যের পরিমাণটা লইয়া। বলে, 'মরণ তোমার! আমি অম্বুলে রুগী, যা দাঁতে কাটি তাতেই বুক জ্বলে, আমার সাথে পাল্লা দিয়ে খেলে তুই বাঁচবি কেন শুনি? নে, দুধটুকু গিলে ফ্যাল্ ঢক করে।'

অপরজন মিনতি করিয়া বলে, 'বমি হয়ে যাবে পিসীমা—অত দুধ খেলে নিশ্চয় বমি করে ফেলব।'

দুধ তাকে খাইতে হয়, সমস্তটাই। খানিক পরে একটা খোঁচাও খাইতে হয়, 'কৈ লো রত্‌নী, বমি হয়ে যাবে? বাঁচতে সাধ না থাকে, বিষ খেয়ে মরবি যা, নয়তো গলায় দড়ি দে—না খেয়ে শুকিয়ে মরা চলবে না বাবু আমার কাছে।'

এর নাম রত্নাবলী। পিসীমা কখনও ডাকে রত্‌নী, কখনও বলে রতন। পিসীমার নাম উমা। সদানন্দ ছাড়া এজগতে তার নাম ধরিয়া ডাকিবার আর কেউ নাই,—একজন ছিল. মাঝে মাঝে নাম ধরিয়া ডাকিত, মস্ত সংসারটা গড়িয়া দিয়া অনেক-দিন আগে বিদায় লইয়াছে, যে সংসার ছাড়িয়া উমা এখানে আসিয়াছে, ছেলে বৌ নাতি নাতনীতে ভরা বিরাট সংসার।

মাধবীলতাকে সদানন্দ এদের কাছে জমা করিয়া দিল। বলিল 'মেয়েটি আজ আশ্রমে ভর্ত্তি হল, মেয়েটির কেউ নেই উমা।'

রত্নাবলী খুসী হইয়া উঠিল, উমা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মাধবীলতার দিকে চাহিতে লাগিল। বোঝা গেল, আশ্রমে হঠাৎ এই বয়সী একটি মেয়ের আবির্ভাবে তার মনে নানা প্রশ্নের উদয় হইতেছে, সদানন্দের কাছে সেগুলি মুখে উচ্চারণ করিবার সাহস তার নাই।

ঘরের সম্মুখে কার্পেটের আসন পাতিয়া সদানন্দকে বসিতে দেওয়া হইয়াছিল। কোলের উপর ডান হাতের তালুতে বাঁ হাতের তালু রাখিয়া মেরুদণ্ড সিধা করিয়া দেবতার মত সদানন্দ বসিয়াছে, আনন্দ বেদনার অতীত ধীর স্থির বিকারহীন একস্তূপ মূর্ত্তিমান শক্তির মত—সংহত ও সচেতন। সোজা উমার মুখের দিকে চাহিয়া বজ্র-গম্ভীর ধমকের আওয়াজে সদানন্দ বলিল, 'তুমি কি ভাবছ উমা?'

আর কি ভাবছ উমা, ধুলায় গড়া ভঙ্গুর পুতুলের মত উমা চুরমার হইয়া গিয়াছে। পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িয়া উমা অসম্বদ্ধ প্রলাপ বকিতে থাকে, মুমূর্ষু জন্তুর মত জীর্ণশীর্ণ দেহটা থরথর করিয়া কাঁপে। গুরুদেবের সম্বন্ধে অন্যায় কথা মনে আসিয়াছে, গুরুদেব সঙ্গে সঙ্গে তাহা জানিতে পারিয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, একি আকস্মিক সর্ব্বনাশের সূচনা!

রত্নাবলীর মুখ পাংশু হইয়া গিয়াছে, আশ্রমবাসী আরও যে কয়জন নরনারী ইতিমধ্যে আসিয়া সমবেত হইয়াছিল, তাদের মুখও বিবর্ণ। মাধবীলতা সভয় বিস্ময়ে একবার ভূলুণ্ঠিতা উমার দিকে, একবার সদানন্দের মুখের দিকে চাহিতে থাকে। মানুষের উপর যে মানুষের এতখানি প্রভাব থাকে, একটিমাত্র ধমকে যে কেহ উমার বয়সী নারীকে পায়ের নীচে লুটাইয়া দিতে পারে, মাধবীলতার তা জানা ছিল না। তার নিজের বুকের মধ্যেও ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করিতেছে দেখিয়া সে আরও অবাক হইয়া গেল।

সদানন্দ মৃদুস্বরে বলিল, 'উঠে বোসো উমা।'

উমা উঠিয়া বসিলে তেমনি মৃদু ও শান্ত কণ্ঠে বলিল, 'মনকে সংযত রেখো। মন হল ঘরের মত, ধুলো-বালি এসে জমা হয়, ঝাঁট দিয়ে সে সব সর্ব্বদা সাফ করে নিতে হয়, নইলে ঘর যেমন আবর্জ্জনায় ভরে ওঠে, মনও তেমনি কুচিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়।'

উমা মাথা নীচু করিয়া শুনিয়া যায়। সদানন্দের সাংঘাতিক নির্ম্মমতার এই প্রকাশ্য অভিব্যক্তি মাধবীলতাকে ভীত ও সকাতর করিয়া তোলে। যে যেখানে যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থাতেই পাথরের মূর্ত্তির মত নিশ্চল হইয়া সদানন্দের কথা শুনিতেছিল, দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া মাধবীলতা মেঝেতেই বসিয়া পড়িল।

তখন সদানন্দ প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করিয়া বলিল, 'মেয়েটি তোমাদের কাছে থাকবে উমা, তোমরা ওকে দেখাশোনা কোরো। বোসো তোমরা,—আর সকলে কোথায়?'

একজন শিষ্য তাড়াতাড়ি আশ্রমের সকলকে ডাকিয়া আনিতে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই আশ্রমের সকলে উমা ও রত্নাবলীর কুটীরের সম্মুখে আসিয়া জমা হইল, আসনে বসিয়া যে ঈশ্বরকে ডাকিতেছিল, সেও। ঈশ্বরকে ডাকার চেয়ে গুরুদেবের ডাক বড়।

তিন

মাধবীলতাকে নিয়া বাহিরে কিছু হৈ চৈ হইল না। রাজপুত্র নারায়ণের আশঙ্কাটা দেখা গেল নিছক তার নিজেরই কল্পনা,—অন্যায়ে অনভিজ্ঞ মনের স্বাভাবিক ভীরুতার ফল। যাদের কাছ হইতে চুরি করিয়া আনা হইয়াছে মাধবীলতাকে, চোর বা বমাল সম্বন্ধে তাদের কিছুমাত্র মাথা ব্যথার লক্ষণ টের পাওয়া গেল না। দিন গেল, সপ্তাহ গেল, মাস গেল, জীবনের আকস্মিক গতি-পরিবর্ত্তনের ধাক্কায় আহত ও বিব্রত মাধবীলতার

রক্তমাংসের ক্ষয় বন্ধ হইয়া বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখে ফিরিয়া আসিতে লাগিল স্বাভাবিক ইক্ষুদণ্ডের রং,—তাদের কোন সাড়া শব্দই পাওয়া গেল না, যাদের কথা ভাবিয়া মাধবীলতাকে প্রকাশ্যে আশ্রমে আনার জন্য বিপিন নারায়ণকে অনুযোগ জানাইয়াছিল, অত পরামর্শ দরকার হইয়াছিল দুজনের।

নারায়ণ গোলমাল করিল না। হয়ত সাহস পাইল না, হয়ত ভাবিয়া দেখিল গোলমাল করা মিছে, অথবা হয়ত ঘাড়ের বোঝা নামিয়া যাওয়ায় নিঃশ্বাস ফেলিল স্বস্তির। আশ্রমে ভর্ত্তি করার জন্যই মেয়েটিকে সে আনিয়াছে, প্রথমে এই কথা বলা হইয়াছিল সদানন্দকে, তার কাছে এই ঠাটই বজায় রাখিয়া চলিতে হইল আগাগোড়া। দেখা গেল, ঠাট বজায় রাখিতে সদানন্দও কম ওস্তাদ নয়। এসো বাবা বোসো, বলিয়া রাজপুত্রকে সে বসাইল কাছে। রাজপুত্রের বেলা নির্ব্বিকার ভাবটা কমাইয়া একটু স্নেহ জানাইবার জন্য বিপিনের যে অনুরোধ ও উপদেশ এতকাল কিছুতেই স্মরণ রাখিতে পারিত না, আজ যেন সেই অনুরোধ ও উপদেশের মর্য্যাদা সুদে আসলে দিবার জন্যই নির্ব্বিকার ভাবটা বিসর্জ্জন দিয়া জানাইল গভীর স্নেহ। বলিল 'হ্যাঁ যাও, বেড়িয়ে এসো গে' একটু নদীর ধার থেকে দুজনে। কবে আবার দেখা হয় তোমাদের ঠিক তো নেই। কেন যাবে না মাধু, যাও। শীগগির ফিরো—সন্ধ্যার আগে।'

মাধবীলতাকে চোখের দেখা দেখিতে না দিয়াই সদানন্দ রাজপুত্র নারায়ণকে ফিরাইয়া দিতে পারিত, কারও ক্ষমতা ছিল না বাধা দেয়। বিপিন তো রাগ করিয়াছেই, না হয় আরও খানিকটা বেশী রাগ করিত। কিন্তু দুজনকে নির্জ্জনে একটু আলাপ করিতে দেওয়াই সদানন্দ ভাল মনে করিল। দুজনের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার বলিয়া নয়,—বোঝাপড়া হইবে না, এরকম অবস্থায় বোঝাপড়া হয় না, বোঝাপড়ার কিছু নাই। একটু আবোল তাবোল বকিবার সুযোগ পাক দুজনে। সদানন্দের জোর-জবরদস্তির অভিযোগ যেন ঘুণাক্ষরেও মনে না জাগে কারও; মাধবীলতা আশ্রমে থাকিতেছে স্বেচ্ছায়, নারায়ণ তাকে আশ্রমে রাখিয়া যাইতেছে স্বেচ্ছায়, এর মধ্যে আর কারও কর্ত্তৃত্ব নাই। বিপিনও হয় তো একটু ঠাণ্ডা হইবে ব্যাপার বুঝিয়া, জোর দিয়া বলা চলিবে বিপিনকে যে, মাধবী থাকতে চাইলে, আমি কি করব বপিন?

এত সব ভাবিয়া সদানন্দ দুজনকে নদীর ধারে বেড়াইতে পাঠাইয়া দিল। তবু একান্ত যুক্তিহীন-ভাবেই মনটা একটু উতলা হইয়া রহিল বৈ কি! বর্ষার গোড়ায় একি অপরাহ্ণ আসিয়াছে আজ। দীপ্তি সম্বরণ করিয়া বর্ণচ্ছটা বিতরণের আর কি দিন জুটিত না অকালে ক্লান্ত সূর্য্যের। মন্থর গতিতে নদী-তীরের কোনখানে ওরা দুজনে পৌঁছিয়াছে, কি বলাবলি করিতেছে নিজেদের মধ্যে। কত অভিমান আর অনুনয় না জানি রাজপুত্র প্রকাশ করিতেছে কথায়, সুরে, মুখের ভাবে, চোখের বিষাদে। অনুযোগ হইয়া উঠিতেছে মিনতি। মন যদি না মানে মাধবীর? মোড় যদি ঘুরিয়া যায় তার মনের? যদি সে তুলনা করে এই বিরাট-দেহ শ্রীহীন দরিদ্র প্রৌঢ়ের সঙ্গে রূপবান ধনবান সঙ্গী যুবকটির, আর তুলনা করিয়া যদি তার মনে খটকা বাধে যে কি হইবে ধার্ম্মিকের মুখোস পরা নরপিশাচটার আশ্রমে বাস করিয়া, তার চেয়ে রাজপুত্রের হাত ধরিয়া উধাও হইয়া যাওয়া ঢের ভাল, যাহোক তাহোক ফলাফল? সকাতর ক্লিষ্ট ঔৎসুক্যের সঙ্গে সদানন্দ দুজনের ফিরিয়া আসার প্রতীক্ষা করে, নিজেকে নিজেই মনে মনে বলে, আমি কি, আঁ?—অত্যন্ত আত্মাদর যেন দীনভাবের আধিক্যে কোথায় তলাইয়া যায় কিছুক্ষণের জন্য এবং এতক্ষণে প্রকৃত পুণ্যবানের মত অস্থায়ীভাবে বিনা প্রতিবাদে মাধবীলতা সম্পর্কে নিজেকে বিশ্বাস করিয়া ফেলে—পাপী। তেজস্বী কম নয় সদানন্দ। গোঁয়ার নয় বলিয়া বিপিন জানে মানুষটা সে নরম,—খুঁটিনাটিতে যে সর্ব্বদা হার মানে, মোটামুটিতে কবে তার প্রচণ্ড তেজস্বিতা প্রকাশ পাইয়াছিল সে কথা মনে করিয়া রাখে কে? তেজস্বীর কাছে দুঃখ বেদনা সহজে আমল পায় না। কিন্তু অন্যায়ের ক্ষণিক উৎসমুখে নিবিড় মমতার এক অপরূপ মাধুর্য্য উৎসারিত হইয়া বিলীন হইয়া গিয়াছে, তার আপশোষ বড় দুরন্ত। আহা, কি মিষ্টিই ছিল মাধবীলতাকে উমার জিম্মা করিয়া দিয়া আসিবার পর হইতে, প্রায় সমস্ত রাত্রির অযাচিত জাগরণের ছটফটানি রীতিমত আরম্ভ হওয়া পর্য্যন্ত, সেই বীভৎস করুণ পাশবিক মায়ার স্বাদ। অনাস্বাদিতপূর্ব্ব সেই মাধুর্য্যের লোভেই হাল ছাড়িয়া দিয়া ধৈর্য্যহীন ক্লেদাক্ত দুঃখে কী কাবুই হইয়া পড়ে মহা তেজস্বী সদানন্দ।

সন্ধ্যা পার হইয়া যায়, দুজনের ফিরিবার নাম নাই। নিজের সঙ্গে নিজের বিষাক্ত আত্মীয়তা

স্থাপনের মজাটা সদানন্দ পরিষ্কার টের পাইতে থাকে। তারপর যখন খবর আসে নারায়ণ চলিয়া গিয়াছে, মাধবীলতা উমা ও রত্নাবলীর কুটীরে ফিরিয়া গিয়াছে, তখন খুসী হইবার ক্ষমতাও থাকে না, এমনি নিস্তেজ আর ভোঁতা হইয়া পড়ে।

সব চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা, বিপিনও গোলমাল করিল না। অন্ততঃ সদানন্দ যেরকম ভাবিয়াছিল, সেরকমভাবে করিল না। পরের উত্তেজনা নিজের মধ্যে গ্রহণ করিয়া উত্তেজিত হওয়ার মত প্রথমটা একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই ঠাণ্ডা হইয়া গেল। ফাট' ফাট' বোমার মত অবস্থায় সদানন্দের কাছে আসিয়া দাবী করিল, এর মানে? —সদানন্দ জবাব দেওয়া মাত্র বোমার মত ফাটিয়া গেল। বাস্। আর কিছুই নয়। নিজের বিস্ফোরণে নিজেই যেন সে দারুণ আহত হইয়াছে, রাগ করিবারও আর ক্ষমতা নাই।

তারপর আশ্রমের কারও কাছে কিছু না বলিয়া সে যে কোথায় চলিয়া গেল, সেই জানে। মাধবীলতার সঙ্গে নদীর ধারে একটু পায়চারি করিয়া নারায়ণ যেদিন ফিরিয়া গেল, বিপিন আশ্রমে অনুপস্থিত। আরও দুদিন পরে সে ফিরিয়া আসিল। গম্ভীর চিন্তিতমুখে সদানন্দকেই জিজ্ঞাসা করিল, 'মাধবী নারাণবাবুকে কি বলেছে?'

'আমি তো জানি না বিপিন। মাধবী যেতে চায় না, আমিই বলে কয়ে দুজনকে নদীর ধারে পাঠিয়ে দিলাম। ওদের মধ্যে কি কথা হয়েছে, আমি কি করে বলব?'

বিপিন হঠাৎ হাসিয়া বলিল, 'তোর পাতানো মেয়ে, তুই ছাড়া কে বলবে? বাবা বলে ডাকে না তোকে?'

বিপিন কিছু সন্দেহ করিয়াছে নিশ্চয় এবং এটা তার নিছক সন্দেহমূলক কদর্য্য পরিহাস নয়। কিন্তু সদানন্দ ধরা দিল না। উদাসভাবে হাই তুলিয়া বলিল, 'পাতানো মেয়ে আবার কিসের!'

ভিতরটা রি রি করিতে লাগিল। একটা যেন খণ্ডযুদ্ধ হইয়া গেল বিপিনের সঙ্গে, যাতে জয় পরাজয়ের পার্থক্য নাই, তবু জয়ী হইলেই বেশী ক্ষতি। বিপিন হাত কচলায় আর ঠিক যেন মুখের হাসিটাকেই চিবাইতে চিবাইতে অশ্রুনিরোধের অভিনয় করিতে থাকে। কিছু ভাবিতেছে এমন কথা মনেও করা যায় না, জিহ্বা যেন আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে চুপ চাপ থাকিবার ভঙ্গিটা এমন খারাপ। হঠাৎ 'হুঁ' বলিয়া যেন ভাবিতে লাগিল তামাসা করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিবে কি না।

সদানন্দ ধৈর্য্য হারাইয়া বলিল, 'কি ভাবছিস শুনি?'

'কিছুই ভাবছি না।'

কথাটা কিন্তু সত্য নয়। বিপিন যা ভাবিতেছিল, বলিবে কি না ঠিক করিতে পারিতেছিল না। সঙ্কোচটা কিসের, তাও সে নিজেই ভাল বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। কিসে যেন বাধিতেছে —একটা অর্থহীন অকারণ বাধা। খানিক পরে হঠাৎ মরিয়া হইয়া বলিয়া বসিল, 'মাধবীকে ফিরিয়ে রেখে আসি তবে কাল পরশু?'

'কোথায়?'

'যেখান থেকে এসেছে, ওর মামার বাড়ী।'

সদানন্দ মাথা নাড়িয়া জোরের সঙ্গে বলিল, 'না। এইখানে থাকবে মাধবী, কোথাও যাবে না।'

ছোট একটি নুড়ি পাথর বিপিন হাতে নাড়াচাড়া করিতেছিল, উপরের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া আবার সেটিকে লুফিয়া লইয়া সে হঠাৎ মুচকি হাসিয়া বলিল, 'কেন মিছে বালির ঘর বাঁধছ বাবা! রাজপুত্তুরকে ছেড়ে তোমার দিকে ঝুঁকবে, তেমন মেয়েই ও নয়। গুরু সেজে বড় জোর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে গালটা টিপে দিতে পার, তার বেশী কিছু—'

'তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে বিপিন?'

বিপিন ধৈর্য্যহারা হইয়া বলিল, 'মাথা আমার খারাপ হয়নি, হয়েছে তোর। কচি একটা মুখ দেখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলে গেছিস্! ঢং করে রত্নীর ওখানে রাখা হল কেন, নিজের কাছে রাখলেই হত, বুকে করে?'

সদানন্দকে কথাটি বলিবার সুযোগ না দিয়া বিপিন গটগট করিয়া চলিয়া গেল। সেদিন আর কাছেই ঘেঁষিল না সদানন্দের। খবর আসিল মাধবীলতাকে সে অনেকক্ষণ নানা বিষয়ে জেরা করিয়াছে। চালচলনে যেন কেমন একটু রহস্যের আমদানী হইয়াছে বিপিনের। কাজ ও কথা হইতেছে খাপছাড়া, প্রতিক্রিয়া হইতেছে অপ্রত্যাশিত। পরদিন দেখা হইলে সদানন্দ তাকে একটু বুঝাইয়া বলিতে গেল যে, দোষটা যখন সদানন্দের, আশ্রমে থাকিবার জন্য মাধবীলতাকে পীড়ন করাটা কি সঙ্গত হইবে? একথায় বিপিন রাগ করিবে সদানন্দ তা জানিত, কিন্তু

রাগটা যে তার এমন অদ্ভুত রকমের হইবে, সে তা কল্পনাও করে নাই।

'শেষ পর্য্যন্ত মাধবীকে পীড়ন করব, তাও ভাবতে পেরেছিস সদা? ভয় নেই, তোর প্রেমের পথে কাঁটা হয়ে থাকব না, আমি বিদায় হচ্ছি।'

মুখচোখের কি ভঙ্গি বিপিনের, সর্ব্বাঙ্গে কি থর থর কম্পন! দেখিলে মনে হয় ভিতর হইতে কি যেন তাকে জ্বালাও দিতেছে, ধরিয়া নাড়াও দিতেছে। সদানন্দ তার বাহুমুল চাপিয়া ধরিল। ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোর অসুখ করেছে নাকি বিপিন?'

বিপিন বলিল, 'হাত ছাড়। আমার হাতটা লোহা দিয়ে তৈরী নয়।'

তারপর আর কিছুই বিপিন বলিল না, কোথায় যেন চলিয়া গেল। চলিয়া গেল? কোথায় চলিয়া গেল বিপিন তার এই আশ্রম ছাড়িয়া, তার প্রাণের বন্ধু সদানন্দকে ছাড়িয়া? কারোকে প্রশ্ন করিবার উপায় নাই, সদানন্দকে চুপ করিয়া থাকিতে হয়। বিপিন কোথায় গিয়াছে সদানন্দই যদি না জানে, সে তবে কেমন কথা হয়? গুরুদেবকে না জানাইয়া গিয়াছে নাকি বিপিন! সদানন্দের মনের মধ্যে নানা চিন্তা পাক খায়, নানা দুর্ভাবনা ঘনাইয়া আসে, বাহিরে গম্ভীর হইয়া থাকে, যথারীতি নিজের কাজ করিয়া যায়। নিয়ম কানুন বাঁধাই আছে আশ্রমে, কোন ব্যবস্থারও অভাব নাই, তবু বিপিন না থাকিলে যেন চলে না, আশ্রমের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার অবাধ গতি ঠেকিয়া ঠেকিয়া থামিয়া থামিয়া চলিতে থাকে—অসুবিধা সৃষ্টি হয়, গোলমাল বাধিয়া যায়, অনুষ্ঠান নিখুঁত হয় না, ঠিক যেন গৃহিণীবিহীন বৃহৎ সংসার। বিশেষভাবে সব ঠিকঠাক করিয়া দিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য কোথাও গেলেও বিপিনের অনুপস্থিতি সব সময়েই অনুভব না করিলে চলে না, এবার তো সে কিছু না বলিয়া কহিয়া হঠাৎ চলিয়া গিয়াছে।

কেহ কেহ সদানন্দকে বিপিনের খবর জিজ্ঞাসা করে।

সদানন্দ সংক্ষেপে ভাসা ভাসা জবাব দেয়, 'আসবে, দু'চার দিনের মধ্যে আসবে।'

দু'তিনটা দিন কাটিয়া যাওয়ার পর বিপিনের জন্য সদানন্দের মন কেমন করিতে থাকে। অনেক রকম মনোভাবের মিশ্রণে প্রথমে মনের মধ্যে যে খিচুড়িটা তৈরী হইয়াছিল, সেটা হজম হইয়া যাওয়ার পর ক্ষুধার মতই অভাববোধটা ক্রমেই যেন হইয়া উঠিতে থাকে জোরালো। এটা একটু আশ্চর্য্য। কতবার তো ছাড়াছাড়ি হইয়াছে বিপিনের সঙ্গে, মাস কাটিয়াছে, বছর কাটিয়াছে, বিপিনের জন্য এরকম মন খারাপ হইয়াছে কবে? তবে এভাবে ছাড়াছাড়ি হয় নাই কোন বার। একসঙ্গে চলিতে চলিতে দুজনের পথ চলিয়া গিয়াছে দুদিকে, দুজনে তাই চলিয়াও গিয়াছে দূরে। এবার বিপিন রাগ করিয়াছে, মনে আঘাত পাইয়াছে, ত্যাগ করিয়া গিয়াছে তাকে। কে ভাবিতে পারিয়াছিল এমন হইবে? রাগিয়া কলহ করিবে না, বোঝাপড়ার চেষ্টা করিবে না, নূতন নূতন মতলব আঁটিয়া প্রকারান্তরে নিজের জিদ বজায় রাখিবার চেষ্টা করিবে না, কেবল বলিবে চললাম, আর বলিয়া গট্ গট্ করিয়া চলিয়া যাইবে! এমন কি ঘটিয়াছে যার জন্য এমন ভয়ানক আঘাত পাইল বিপিন, এমন কাণ্ড করিয়া বসিল?

সদানন্দের সবচেয়ে দুর্ব্বোধ্য মনে হয়, সমস্ত ফেলিয়া গেল বিপিন, কিন্তু এই চরম চালটা কোন দিক দিয়া কাজে লাগানর চেষ্টা করিল না। চলিয়া যাওয়ার ভয় দেখাইয়া কাবু করিয়া চলিয়া যাওয়ার শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মাধবীলতা সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকিতে রাজী হওয়ার সুযোগ দিয়া সদানন্দকে বশ করিবার চেষ্টা করিলে এবং চলিয়া যাওয়ার পরেও সদানন্দকে মত পরিবর্ত্তন করিয়া তাকে ডাকিয়া ফিরাইয়া আনিবার উপায় সৃষ্টি করিয়া রাখিয়া গেলে, তবেই যেন কাজটা বিপিনের প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইত। এভাবে চলিয়া যাওয়া তো সম্ভব বলিয়াই মনে হয় না বিপিনের পক্ষে।

বিপিনের কি চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছিল? ভাল লাগিতেছিল না আশ্রমের শিষ্য, ম্যানেজার, মন্ত্রী, সংগঠক ও বন্ধুর জীবন? এ ধরণের সন্দেহ মনে আসিলে সদানন্দ সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়িয়া ফেলে। আশ্রম সম্বন্ধে বিপিনের মমতার কথা তার চেয়ে কে ভাল করিয়া জানে। যেখানেই গিয়া থাক বিপিন, আশ্রমের জন্য মন যে তার ছটফট করিতেছে, তাতে সন্দেহ নাই।

বিপিন ফিরিয়া আসিবে। রাগের মাথায় দুদিনের জন্য কোথাও গিয়াছে, আবার ফিরিয়া আসিবে। একদিকে মন কেমন করা যেমন চাপা যায় না, অন্যদিকে বিপিনের ফিরিয়া আসিবার আশাটাও অসংখ্য যুক্তি ও অন্ধবিশ্বাসের আশ্রয়ে পরিপুষ্ট হয়। সমগ্রভাবে বিচার করিয়া নিজের

অবস্থাটা সদানন্দ মোটামুটি বুঝিতে পারে। বিপিন যেমন হোক, বিপিনকে ছাড়া চলিবে না।

বুঝিতে পারিয়া রাগ হয়। এই আশ্রমের এতগুলি মানুষের মধ্যে যাকে ইচ্ছা একটি মুখের কথায় সে মাটিতে লুটাইয়া দিতে পারে, শতাধিক মানুষ বাহির হইতে সপ্তাহে তিন দিন তার উপদেশ হাঁ করিয়া শুনিয়া যায়, দেশের চারিদিকে নিকটে ও দূরে জানা অজানা কত ভক্ত তার ছড়াইয়া রহিয়াছে, বিপিনকে ছাড়া তার চলিবে না? এ তো ভাল কথা নয়।

আশ্রম পরিদর্শন ও পরিচালনার ভারটা সদানন্দ নিজের হাতে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করে। বিপিন গিয়াছে যাক। সকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া বিপিন আশ্রমে নাই ভাবিয়াই বুকটা ছ্যাৎ করিয়া ওঠে—করুক। আশ্রমবাসী ও আশ্রমবাসিনীদের উপদেশ ও নির্দ্দেশ দিতে, দর্শনার্থীকে দর্শন দিতে, আশ্রমের কাজ ও জিনিষপত্রের হিসাব রাখিতে, নদীর ধারে কাঠের গুঁড়িটাতে বসিয়া আশ্রমের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পরিকল্পনা গড়িয়া তুলিতে, এমন কি রাত্রে বিশ্রামের জন্য শয়ন করিতে পর্য্যন্ত বিপিনকে মনে পড়িয়া মন খারাপ হইয়া যায়—যাক্। বিপিন যেমন চলিয়া গিয়া বুঝাইয়া দিয়াছে তাকে ছাড়া তার চলিবে না, সেও তেমনি আশ্রমকে নিখুঁতভাবে চালাইয়া, আশ্রমের উন্নতি করিয়া দেখাইয়া দিবে বিপিনকে ছাড়াও তার চলে।

কয়েকদিনের মধ্যেই সে টের পাইল, উন্নতি দূরে থাক, বিপিন এতকাল যেভাবে চালাইয়া আসিয়াছে, ঠিক সেইভাবে আশ্রম চালনার কাজটাও যেমন কঠিন, তেমনি জটিল। বিপিন যে বলিয়াছিল, সে কিছু বোঝে না, কেবল তার আদর্শ নিয়া থাকে, মনের মধ্যে আদর্শ পোষণ করা এক কথা আর সেটা কার্য্যে পরিণত করা আলাদা কথা—এবার বিপিনের সে কথার আসল মানেটা হাড়ে হাড়ে টের পাইতে লাগিল। কিন্তু সদানন্দ ক্ষুব্ধও হইল না, নিরুৎসাহও হইল না। এমন তো হইবেই। কাজ করার অভ্যাস চাই, জানা চাই কি হইলে কি হয়, কি করিতে কি করা দরকার। এক হিসাবে ভালই হইয়াছে বিপিনের চলিয়া যাওয়াতে। বিপিনের উপর বড় বেশী নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছিল, বড় বেশী দূরে সরিয়া যাইতেছিল আশ্রমের পরিচালনা ও সংগঠনের খুঁটিনাটি হইতে। এবার সব বুঝিয়া মনের মত করিয়া আশ্রম চালাইতে পারিবে, আশ্রমকে গড়িয়া তুলিতে পারিবে।

বিপিনের অনুপস্থিতির জন্য যতটা না হোক, সদানন্দের অপটু ম্যানেজারির ফলে আশ্রমে আরও বেশী বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে লাগিল। বিপিন ফিরিয়া আসিল দশ বার দিন পরে, এই সময়ের মধ্যেই কত নিয়ম যে ভাঙ্গিয়া পড়িল, কত ব্যবস্থা যে উল্টাইয়া গেল, সৃষ্টি হইল নূতন নিয়ম। ফলটা শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়াইত বলা যায় না। পরিবর্ত্তনের সময় বিশৃঙ্খলা আসিবেই। আশ্রমে সে একটা গোলমাল সৃষ্টি করিয়াছে, আশ্রমবাসী নরনারী একটু ভ্যাবাচেকা খাইয়া গিয়াছে, টের পাইয়াও সদানন্দ বিশেষ ব্যস্ত হয় নাই। সাজিয়া ঢালিতে গেলে এসব যে অবশ্যম্ভাবী, সে তা জানে। সদানন্দের ব্যবস্থায় আশ্রমের জীবন হয়ত এতদিনের কতগুলি কৃত্রিমতার খোলস ছাড়িয়া আরও উঁচু স্তরেই উঠিয়া যাইত শেষ পর্য্যন্ত, কে বলিতে পারে। অন্ততঃ কড়া বিধিনিষেধগুলি যে শিথিল হইয়া আসিত, তাতে সন্দেহ নাই ভাল করিয়া গড়িবার উদ্দেশ্যে সদানন্দের ভাঙ্গন ভালরকম আরম্ভ হইবার আগেই বিপিন ফিরিয়া আসিল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আশ্রমও যেমন ছিল হইয়া গেল তেমনি।

সদানন্দ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'বাঁচলাম ভাই। বলা নেই কওয়া নেই, কোথা গিয়েছিলি তুই? আশ্রম চালান কি আমার কাজ।'

'বাহাদুরী করতে তোকে কে বলেছিল? যা আরম্ভ করেছিলি তুই—চমৎকার।'

কথাটার খোঁচা লাগিল সদানন্দের। একবার ইচ্ছা হইল সত্য সত্যই বাহাদুরী করিয়া বলে, কয়েকটা মাস পরে ফিরিয়া আসিলে আশ্রমের উন্নতি দেখিয়া বিপিনের তাক লাগিয়া যাইত। বিপিন রাগিয়া যাইবে ভাবিয়া ইচ্ছাটা দমনও করিল, নিরীহভাবে একটু শান্ত হাসিও হাসিল।

কোথায় গিয়াছিল বিপিন? আমবাগানটা বাগাইতে—একেবারে দানপত্র পাকা করিয়া আসিয়াছে। একটা খবর দেয় নাই কেন বিপিন? কেন দিবে, সদানন্দ যখন চায় যে বিপিন আর তার এত সাধের আশ্রম সমস্ত চুলোয় যাক। কি গরজ বিপিনের খবর দিবার। না না, ঠিক তা নয়, খুব ব্যস্তও ছিল বটে বিপিন, একটু মজাও দেখিতেছিল বটে। হঠাৎ সে জন্মের মত বিদায় হইয়া গেলে সদানন্দ কি করে দেখিবার সাধটা বিপিনের অনেক দিনের।

চার

বর্ষাকালে সদানন্দ অবসর পায় বেশী। বড় চালাটার নীচে সর্ব্বসাধারণের জন্য সভা বসে মাঝে মধ্যে, লোকজন আসেও খুব কম। সামান্য জলকাদা ভক্তদের উৎসাহ কমাইয়া দেয় দেখিয়া সদানন্দ ক্ষুণ্ণ হয়। নানারকম খটকা জাগে মনে। লোকে কি তার কথা শুনিতে আসে হুজুগে পড়িয়া, সময় কাটানর জন্য? একটু কষ্ট স্বীকার করিবার দরকার হইলেই অনায়াসে আসাটা বাতিল করিয়া দেয়? কিন্তু আশ্রমের ভাণ্ডারে দান হিসাবে প্রণামী তো তাকে প্রায় সকলেই দেয়,—কেউ দেয় যতবার আসে ততবারই, কেউ দেয় মাঝে মাঝে। ঘরের কড়ি পরকে দেওয়া ত্যাগ বৈকি। বিনিময়ে পুণ্য অবশ্য তারা পায়। কিন্তু বর্ষাকালে পুণ্যের দরকারটা এত কমিয়া যায় কেন ওদের? পুণ্যও কি বাজারের ভাল মাছ তরকারীর সামিল ওদের কাছে, জলকাদা ভাঙিয়া যোগাড় করার চেয়ে ঘরে যা আছে তাই দিয়া কাজ চালাইয়া দেয়? সবচেয়ে বেশী ক্ষোভ হয় সদানন্দের, বর্ষার জল ভক্তদের কাছে তাঁর আকর্ষণকে জলো করিয়া দিতে পারে বলিয়া। অহংকার বড় আহত হয়। এদিকে আশ্রমের কাজেও বর্ষাকালে শৈথিল্য আসে। নিজের নিজের কুটীরে বসিয়া উপাসনা জপতপ পুজার্চ্চনা যার যত খুসী করে, যার যত খুসী করে না, সকলকে একত্র করিয়া সদানন্দ উপদেশ বিতরণ করিতে আসে কম। কোনদিন বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে, কোনদিন থাকে মুষলধারে বর্ষণ। সদানন্দ হয়ত মেঘে ঢাকা আকাশকে উপেক্ষা করিয়া নদীর ধারে খানিকটা ঘুরিয়া আসে, হয়ত বাহির হইয়া যায় কেবল বৃষ্টিতে ভিজিতে। অথবা হয়ত নিজের ঘরে শুইয়া পড়ে বই। আশ্রমের নরনারীদের উপদেশ দিতে যায় খুব কম।

মাধবীলতা মাঝে মাঝে আসে। উপদেশ শুনিয়া যায়।

হিল তোলা জুতা খট্ খট্ করিয়া হাজির হয় সে একেবারে সদানন্দের অন্তঃপুরে। এটা আশ্রমের নিয়ম-বিরুদ্ধ। কিন্তু সদানন্দ নিজেই যখন অনুমতি দিয়াছে, নিয়ম অনিয়মের প্রশ্ন কে তুলিবে। বিপিন তুলিতে পারে, সদানন্দকে পাগল করিয়া দিতে পারে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলিয়া, কিন্তু সে চুপ করিয়া থাকে। একদিন দুপুরবেলা মাধবীলতা আসিবার পর সদানন্দকে জানাইয়া হঠাৎ সে চলিয়া গিয়াছিল বাহিরে, বলিয়া গিয়াছিল ফিরিতে সন্ধ্যা হইবে। আধঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিয়াছিল হঠাৎ।

না, বুকে সদানন্দ মাধবীলতাকে টানিয়া নেয় নাই। খাটের একপ্রান্তে পা ঝুলাইয়া মাধবীলতা যে ভাবে বসিয়াছিল, এখনও বসিয়া আছে তেমনি ভাবেই, তেমনি মনোযোগের সঙ্গে শুনিতেছে সদানন্দের কথা। কেবল সদানন্দের দৃষ্টি বড় কোমল, বাস্তব মমতার স্পষ্ট অভিব্যক্তি যেন কোন কিছুর রূপ ধরিয়া দু'চোখে ফোয়ারার মত উৎসারিত হইয়া উঠিবে, মুখের কথা শেষ হওয়ার শুধু অপেক্ষা।

মাধবীলতার মুখখানা টস্ টস্ করিতেছে জীবনীশক্তির রসে। আর হ্যাঁ, চোখ দিয়াও টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতেছে বটে মেয়েটার।

'মাধবী বলছিল এখানে থাকতে ওর ভাল লাগছে না বিপিন। কদিন থেকে ওর মনটা খুব খারাপ হয়ে আছে—রাত্রে ঘুমোতে পারে না।'

'তাই নাকি!' বলিয়া বিপিন এমন একটা আপশোষের শব্দ করিল যে, ঘরের করুণ আবহাওয়াটা বীভৎস প্রতিবাদে ওই সামান্য শব্দটুকুরও মধ্যে বজ্রের মত গর্জ্জিয়া উঠিল। 'কি বল্লি?' বলিয়া সদানন্দ যে গর্জ্জন করিয়া উঠিল, সে শব্দটা তুলনায় শোনাইল যেন ক্ষীণকণ্ঠের ফিসফিসানি কথা।

তারপর কিছুক্ষণ তিনজনেই চুপ। একটা ভুল করিয়া ফেলিয়াছে, ঘর হইতে চলিয়া গিয়া আরেকটা ভুল বিপিন করিল না। ঠিক সময় মতই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিল, 'অন্য কথা ভাবছিলাম।'

সদানন্দ বলিল, 'ও!'

'এখানে থাকতে তোমার ভাল লাগছে না মাধবী?'

'লাগছে। কিন্তু মাঝে মাঝে মনটা বড় খারাপ হয়ে যায়।'

কেন? মাঝে মাঝে মন খারাপ হইয়া যায় কেন মাধবীর? বাড়ীর জন্য? না, বাড়ীতে এমন কে আছে মাধবীর, যার জন্য মন কাঁদিবে। তবে? মাধবী শুধু মাথা নাড়ে, মুখ ফুটিয়া শুধু বলে জানি না। বাহিরে আকাশ ছাইয়া মেঘ করিয়াছে, ঘরের ভিতরটাও যেন ঐরকম ভারাক্রান্ত হইয়া ওঠে। চুরি করিয়া আনা একটি যুবতী মেয়ের মন খারাপ হয় কেন, প্রশ্ন করিয়া আবিষ্কার করা

কি সহজ ব্যাপার! অন্য কোথাও যাইতে চায় মাধবী? না, এইখানেই মাধবী থাকিবে, চিরকাল থাকিবে, যতদিন তার দেহে প্রাণ থাকে ততদিন।

সদানন্দ ও বিপিন মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। গুমোটে সদানন্দ ঘামিয়া গিয়াছে, এবার বিপিন ঘামিতে আরম্ভ করে ভিতরের উত্তেজনায়। ভুল বিপিন সহজে করে না, মাধবীলতার সম্বন্ধে কেবলি ভুল হইয়া যাইতেছে। ছোট একটা টুলে বসিয়াছিল বিপিন, জানালা দিয়া বাহিরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া সে মৃদুস্বরে বলে, 'আশ্রমে আটকা পড়ে গেছ কিনা, সেইজন্য খারাপ লাগছে। কদিন বাইরে থেকে ঘুরে এলে বোধ হয় ভাল লাগত। নারাণবাবু আমায় নেমতন্ন করেছেন পর্শু, যাবে আমার সঙ্গে মহীগড়ে? বেশ জায়গাটা।'

মাধবীলতা মাথাও নাড়ে, মুখেও বলে, 'না।'

বিপিনকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে শুনিয়া সদানন্দ একটু অবাক হইয়া যায়, রাজপুত্র নারায়ণের জন্য মাধবীলতার মন কেমন করিতেছে না, এজন্য বিপিনের খুসী হওয়ার কারণটা তাঁর বোধগম্য হয় না।

'চল, একটু বেড়িয়ে আসি আমরা নদীর ধার থেকে।' বলিয়া বিপিন উঠিয়া দাঁড়ায়, সদানন্দের দিকে চাহিয়া বলে, 'আমরা যাই প্রভু?'

সদানন্দ গম্ভীরভাবে বলে, 'যাও।'

সেইদিন হইতে বিপিনের সঙ্গে কি ভাব মাধবীলতার! সদানন্দ স্পষ্ট বুঝিতে পারে, দুজনের মধ্যে কি যেন একটা বোঝাপড়া হইয়া গিয়াছে, গড়িয়া উঠিয়াছে কেমন এক নূতন ধরণের আত্মীয়তা। বিপিন শীত মানে না, গ্রীষ্ম মানে না, বর্ষা মানে না, বছরের সকল ঋতুতেই সে সমান ব্যস্ত, কাজে তার কখনও ঢিল পড়ে না। আমবাগানে গাছ কাটিয়া কুটীর তুলিবার স্থানগুলি বর্ষা শেষ হইবার আগেই সাফ করিয়া ফেলিবে ঠিক করায়, তার কাজ বাড়িয়াছে। পূজার মধ্যে সমস্তগুলি কুটীর তুলিয়া আশ্রমের নূতন অংশটিকে সে সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিবে। কিন্তু এত কাজের মধ্যেও বিপিন মাধবীলতার সঙ্গে গল্প করিবার সময় পায়, তাকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে যাইবার সময় পায়, সে যাতে আশ্রমের ছোটখাট কাজ করিয়া সময় কাটাইতে পারে, তার ব্যবস্থা করিয়া দিবার সুযোগও পায়।

সদানন্দের কাছে আসে মাধবীলতা, মাঝে মাঝে আসে। শান্ত শিশুর মত চুপ করিয়া বসিয়া তার কথা শোনে, একটা অভিনব নম্রতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তার সঙ্গে আলাপ করে। আর সমস্তক্ষণ মুখখানা তার টস্ টস্ করিতে থাকে জীবনীশক্তির রসে। তবে চোখ দিয়া অন্য কিছু আজকাল আর টস্ টস্ করিয়া গড়াইয়া পড়ে না।

সন্তর্পণে একদিন সদানন্দ তাকে জিজ্ঞাসা করে, 'বিপিনের সঙ্গে তোমার বেশ আলাপ হয়েছে, না?'

'বেশ লোক উনি। আমায় খুব স্নেহ করেন।'

'আশ্রমে থাকতে তোমার এখন ভাল লাগছে?'

'তা লাগছে। ভাল সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।'

'কি ব্যবস্থা করে দিয়েছেন?'

'এই—যাতে সময় কাটে, আশ্রমের কাজ কর্ম্ম করতে পাই, ঘুরে বেড়াতে পাই—'

মাঝে মাঝে দুটি একটী প্রশ্ন করিয়া জবাবগুলি সদানন্দ গম্ভীর মুখে শুনিয়া যায়। একটা দিক ধীরে ধীরে তার কাছে পরিষ্কার হইয়া যায়। তার কাছ হইতে মাধবীলতাকে দেখাশোনা করার হুকুম পাইয়া এতদিন দেখাশোনার একেবারে চরম করিয়া ছাড়িয়াছিল উমা ও রত্নাবলী, সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখিয়া কি ভয়ানক আদর যত্নটাই দুজনে যে করিয়াছিল তাকে! সে যেন শিশু, সে যেন ভঙ্গুর, সে যেন দুষ্প্রাপ্য কিছু, সেবায় স্নেহে খাতিরে শাসনে মাথায় করিয়া না রাখিলে চলিবে না। বিপিন তাকে মুক্তি দিয়াছে। এক রকম কিছুই করে নাই বিপিন, উমা আর রত্নাবলীকে বলিয়া দিয়াছে—মাধবীলতা যা করিতে চায় তাই যেন করিতে পায় আর মাধবীলতাকে দিয়াছে কয়েকটা দায়িত্ব। আশ্রমের এক প্রান্তে আছে গোয়ালঘর, সকালে বিকালে দুধ দোয়ার সময় সে হাজির থাকিবে, যে কুটীরে যতটা দুধ যাওয়ার কথা, বাঁটিয়া দিবে। আশ্রমের মেয়েরা দুজন দুজন করিয়া রান্না করে, মাধবী তাদের তরকারী কুটিয়া সাহায্য করিবে, আর যদি কেউ অসুস্থ থাকে আশ্রমে, তার জন্য প্রস্তুত করিবে দরকারী পথ্য। এমনি সব ছোট ছোট কয়েকটী কাজ।

'আপনি আমায় বলছিলেন না আশ্রমের উদ্দেশ্যের কথা, ভাল বুঝতে পারিনি। বিপিনবাবু ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছেন।'

'কি বলেছেন বিপিনবাবু?'

কথা আর কথার ভঙ্গী মাধবীলতাকে একটু দমাইয়া দিল। সন্দিগ্ধভাবে বলিল, 'কিভাবে সুখে শান্তিতে বেঁচে থাকা যায়, মানুষকে তাই বুঝিয়ে দেওয়া, ধর্ম্মের মধ্যে যে বিকার এসেছে, সংশোধন করা, সমাজ-গঠনে—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি। জীবন, ধর্ম্ম, সমাজ, দেশ, এই সবের জন্য বড় বড় কাজ করা আশ্রমের উদ্দেশ্য।'

'এভাবে বলছেন যে? তাই উদ্দেশ্য নয় আশ্রমের?'

আহা, চোখ দুটি ছল ছল করে মাধবীলতার। আঘাত পাইবে জানিয়া টস্ টস্ করিয়া জল ঝরানোর জন্য চোখ দুটিকে যেন প্রস্তুত করিয়া নিতেছে। হঠাৎ একটা তীব্র সন্দেহের স্পর্শে সদানন্দের মন হাত দিয়া আগুন ছোঁয়ার মত ছ্যাৎ ছ্যাৎ করিয়া ওঠে। মনে হয়, মাধবীলতা যেন ভাণ করিতেছে। বোকামির ভাণ, সরল বিশ্বাসের ভাণ, শব্দ-সংজ্ঞাগুলির অর্থ না বুঝিয়াও তৎসংক্রান্ত চিরন্তন আদর্শবাদের যে অসংখ্য পূজারিণী আছে, সেও তাদেরই একজন,—

অথবা তার নিজেরই ভুল? যেটা মাধবীর ভাণ মনে হইতেছে, মাধবী আসলে তাই, সে নিজেই মাধবীলতা সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে? মাধবী প্রশ্নভরা শঙ্কিত দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে দেখিয়া সে বলিল, 'মোটামুটি তাই। একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে আশ্রমের, এখানে কিছুদিন থাকলেই আস্তে আস্তে সেটা বুঝতে পারবে। আরেকদিন তোমাকে ভাল করিয়া বুঝিয়ে দেব।

মাধবীর স্বস্তি ও কৃতজ্ঞতাবোধ অত্যন্ত স্পষ্ট। নিজের অস্বস্তি ও দুর্ব্বোধ্য জ্বালাবোধ সদানন্দকে পীড়া দিতে থাকে। সে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়ে। মাধবীলতা সম্বন্ধে সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল সে, সেই করিয়া দিয়াছিল তার আশ্রমবাসের ব্যবস্থা। মাধবী অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল, মন খারাপ হইয়া গিয়াছিল মাধবীর, রাত্রে ঘুম হইতেছিল না। চোখের পলকে বিপিন তার জীবনকে সহজ ও সানন্দ করিয়া দিয়াছে। আশ্রমের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের কথা কতবার সদানন্দ বলিয়াছে মাধবীকে, বুঝিতে না পারিয়া মনে মনে কাতর হইয়া পড়িয়াছে মাধবী। বিপিন দু'কথায় সব তাকে বুঝাইয়া দিয়াছে, হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে মাধবী।

'পা টিপে দেব?'

সদানন্দের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাতে মাধবীর ঔৎসুক্য মুছিয়া যায়, চোখ নামাইয়া জড়সড় হইয়া সে বসে। প্রথমে এখানে আসিয়া শেষরাত্রে সদানন্দের পিঠের সঙ্গে মিলিয়া যেভাবে কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়াছিল, লজ্জায় সঙ্কোচে যেন তেমনি কুণ্ডলী পাকাইয়া যাইবে। কৈফিয়ৎ দেওয়ার মত ভয়ে নিজে হইতে সে বলে, 'বিপিনবাবু বলছিলেন, আপনার একটু সেবা করতে। আপনি নাকি কারও সেবা যত্ন নেন না, বড় কষ্ট হয় আপনার।'

'না, পা টিপতে হবে না। বৃষ্টি আসছে, তুমি এবার যাও মাধবী।'

আহত হইয়া মাধবী চলিয়া যায়। রাগে সদানন্দের গা জ্বালা করিতে থাকে। মাধবীকে এ কি করিয়া দিয়াছে বিপিন; নিজে আড়ালে থাকিয়া এ কি সম্পর্ক সে গড়িয়া তুলিতেছে তার আর মাধবীর মধ্যে? বিপিনের সঙ্গে কথা বলিবার সময় কত হাসে মাধবী, আশ্রমের জীবন নাকি তার হাল্কা হাসিখুসীতে ভরিয়া উঠিয়াছে, অজস্র কথা বলে, মনের আনন্দে চঞ্চলপদে ঘুরিয়া বেড়ায়, কাজের ফাঁকে ফাঁকে গুণগুণ করিয়া গানও নাকি শোনা যায় তার সময় সময়। প্রথম প্রথম সদানন্দের কাছেও তো প্রায় এই রকমই ছিল মাধবী, আকস্মিক অবস্থা পরিবর্ত্তনের ধাক্কায় একটু যা কেবল হইয়া পড়িয়াছিল কাবু। এখন সামনে পড়িলে মনোভাবের সবগুলি উৎসমুখে সে যেন তাড়াতাড়ি ছিপি আঁটিয়া দেয়, খোলা রাখে কেবল সভয় শ্রদ্ধাভক্তির উৎসটা, আর—

এইখানে একটু খট্‌কা লাগে সদানন্দের। আর কি? আর কি উথলাইয়া পড়ে তার সান্নিধ্যগত মাধবীর সর্ব্বাঙ্গীণ অস্তিত্ব হইতে? পরিণত নারীর সেবা ও স্নেহের সাধ? কিন্তু সেটা কেমন হয়! সেই সহজ ও সাধারণ সাধটা তাকে কেন্দ্র করিয়া মাধবীর মধ্যে যদি অস্বাভাবিক রকম জোরালো হইয়া উঠিয়াও থাকে, এইভাবে কি তা আত্মপ্রকাশ করে, এমন দুর্ব্বোধ্য ও রহস্যময় প্রণালীতে? সর্ব্বদা যেন আত্মসচেতন মাধবী, সর্ব্বদা সংযত—গভীর দীনভাবে সর্ব্বাঙ্গে তার একটানা ছেদহীন রোমাঞ্চ।

বৃষ্টি নামি' নামি' করিয়া বহুক্ষণ আকাশে আটকাইয়া ছিল। হয়ত শেষ পর্য্যন্ত বৃষ্টি আজ নামিবেই না। একবার ডাকিয়া পাঠাইলে কেমন হয় মাধবীকে, একটু সেবা করিবার অনুমতি দিলে? কোমরে আঁচল জড়াইয়া হয় তো মাধবী কুটীরের মেঝে ঝাঁট দিতেছে—শাড়ী সেমিজ এলোমেলো,

চুল এলোমেলো, কথা এলোমেলো হাসি এলোমেলো। ডাক পৌঁছিলে হাত ধুইয়া কোমরে বাঁধা আঁচল খুলিবে, চুলটা তাড়াতাড়ি ঠিক করিয়া লইবে, কথা ও হাসি দিবে বন্ধ করিয়া। তার সেই হিলতোলা জুতাটি পায়ে দিয়া এই উঠান পর্য্যন্ত আসিবে তাড়াতাড়ি—ঠক্ ঠক্ শব্দ স্পষ্ট কাণে আসিবে সদানন্দের। তারপর জুতা শাড়ীটা এখানে ওখানে একটু টানিয়া, দুহাতে কপাল হইতে আলগা চুল কয়েকটি শেষ বারের মত উপরের দিকে ঠেলিয়া তুলিয়া ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া বলিবে, ডাকছিলেন ?

সদানন্দ উঠিয়া অন্দরে গেল। অন্দরে কেউ নাই। সদরে গিয়া দাঁড়াইতে চোখে পড়িল, কিছু-দূরে ছোট ফুলের বাগানটিতে আশ্রমের কয়েকটি মেয়ে ফুল তুলিতেছে। তাদের একজন মাধবী। তাইতো বটে, বিশ বাইশ বছর আগে একজনকে কোমরে আঁচল জড়াইয়া ঘর ঝাঁট দিতে দেখিয়াছিল বলিয়া মাধবীকেও যে ঘরই ঝাঁট দিতে হইবে তার কি মানে আছে।

সদানন্দকে চুপ চাপ দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া মেয়েরা কাছে আসিল। অঞ্জলি ভরিয়া পায়ে ফুল ঢালিয়া করিল প্রণাম। নীরবে নির্ব্বিকারভাবে প্রণাম গ্রহণ করিয়া সদানন্দ ভিতরে চলিয়া গেল। পায়ে ঢালিয়া দেওয়া ফুলগুলি কুড়াইয়া মেয়েরা আবার ফিরিয়া গেল ফুল তুলিতে।

পরদিন দুপুরবেলা সদানন্দ নিজেই ডাকিয়া পাঠাইল মাধবীলতাকে।

মাধবী ঘরে ঢুকিবামাত্র তার হাত ধরিয়া টানিয়া লইল বুকে। মাধবী বিবর্ণমুখে কাঠ হইয়া রহিল, এটা বাধাও নয়, প্রতিবাদও নয়, সদানন্দও তা জানে। কিন্তু কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে কি আকাশ পাতাল পার্থক্য। হাতের বাঁধন আপনা হইতেই ধীরে ধীরে শিথিল হইয়া গেল।

'আমাকে তুমি ভয় কর মাধবী ?'

মাধবী অস্ফুটস্বরে বলিল, 'না'।

মাথায় হাত বুলাইয়া সদানন্দ তাকে একটু আদর করিল, এ ছাড়া স্নেহ মমতা জানানোর শারীরিক প্রক্রিয়া আর কি আছে। একটু আদর করিয়াই বুক হইতে নামাইয়া দিল—মেয়েটার দম প্রায় আটকাইয়া আসিয়াছে।

'কাল তোমায় বকেছিলাম বুঝি ?'

মাধবী পুনর্জীবিতার মত অদ্ভুতভাবে হাসিয়া বলিল, 'হ্যাঁ। কাল যে হঠাৎ কেন রেগে গেলেন—'

'রাগিনি—আমি কখনও রাগি না। তুমি আমার সেবা করতে চাও—কি সেবা করবে বল ত ?'

'আপনি যা বলবেন।'

'পাকা চুল তুলে দেবে ?'

মাধবী হাসিল। পাকা চুল বাছিয়া দিবার সময় তার কোলে মাথা রাখিয়া সদানন্দ চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল সমস্তক্ষণ। মাধবী চলিয়া যাওয়ার পর মনে হইল, অসময়ে আজ যেন ঘুম আসিয়াছে। উঠিয়া জানালায় গিয়া দাঁড়াইল। রাধাই নদীর বুক আরও ভরিয়া উঠিয়াছে। কালের মত আজও নামি' নামি' করিয়া আকাশে আটকাইয়া রহিয়াছে বৃষ্টি। স্তিমিত দৃষ্টিতে বিকলের মত সদানন্দ চাহিয়া থাকে। এত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সদানন্দের, এত তেজ ও সংযম, জীবনকে বিশ্লেষণ করিতে করিতে কি তীক্ষ্ণ হইয়াছে তার বিচারবুদ্ধি, এখন যেন জানিবার বুঝিবার ক্ষমতাটুকুও আর নাই। অন্ধ আবেগের মত, অমর সংস্কারের মত, কেবল একটা কথা মনে জাগিতেছে, তবে কি সত্যই দেবতা কেউ আছেন অন্তরালে, মানুষ যাকে সৃষ্টি করে নাই, পাপ পুণ্য যাচাই-এর একটি করিয়া কষ্টিপাথর প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দিয়া মানুষকে যিনি স্বাধীনতা দিয়াছেন কিন্তু বিচারের ক্ষমতাটা রাখিয়াছেন নিজের হাতে, অহরহ পাপ পুণ্যের ওজন করিয়া মানুষকে যিনি শাস্তি আর পুরস্কার দিতেছেন—? নয়তো মাধবীকে বাহু বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়া তার কেন মনে হইতেছে নিজে সে মুক্তি পাইয়াছে—একটা অদৃশ্য দানবের নিবিড় আলিঙ্গনের অকথ্য যন্ত্রণা হইতে ?

সন্ধ্যার সময় আশ্রমের সকলকে আধ্যাত্মিক উন্নতির সাধনার সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনের সম্পর্ক লইয়া উপদেশ দিবার কথা ছিল। সদানন্দ গেল না। পরদিন আশ্রমের সকলকে জানাইয়া দেওয়া হইল, সাতদিন গুরুদেব বিশেষ সাধনায় ব্যাপৃত থাকিবেন, কেহ দর্শন পাইবে না।

বিপিন বলিল, 'মাঝে মাঝে তোর পাগলামী দেখে—'

'তুই আমার সর্ব্বনাশ করবি বিপিন।'

'মাঝে মাঝে তোর পাগলামী দেখে—'

পাঁচ

বাগবাদা গাঁয়ের সেই যে মহেশ চৌধুরী, যার ছেলে বিভূতি গিয়াছে আসল সরকারী জেলে, যার দুটি মেয়ে গিয়াছে শ্বশুরবাড়ী নামক নকল সামাজিক জেলে, যার উপর রাজা সায়েবের ভয়ানক রাগ,

আশ্রমে যে একেবারেই আমল পায় না, সুযোগ পাইলেই সকলের সামনে যাকে অপদস্থ করিবার জন্ম সদানন্দকে বিপিন বিশেষভাবে বলিয়া রাখিয়াছে, মানুষটা সে একটু খাপছাড়া কিন্তু তুচ্ছ নয়। তুচ্ছ নয় বলিয়াই অবশ্য তার উপর রাজা সায়েবের এত রাগ, আশ্রমে তাকে অপাংক্তেয় করিয়া রাখিবার জন্ম বিপিনের এত চেষ্টা। চারিদিকের অনেকগুলি গ্রামে মহেশ চৌধুরীর যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি আছে, যেটা গড়িয়া তুলিবার জন্ম কারও চেষ্টা করিতে হয় নাই, মহেশ চৌধুরীর জীবনযাপনের একনিষ্ঠ প্রক্রিয়া বহুকাল ধরিয়া তিলে তিলে যার জন্ম দিয়াছে। লোকে তাকে শ্রদ্ধা করে, বিশ্বাস করে, ভালবাসে। কিভাবে জানিয়াছে, কেন জানিয়াছে, জেরা করিলে কেহ বলিতে পারিবে না, কিন্তু সকলেই জানে, মনে মনে মহেশ চৌধুরী সকলের মঙ্গল কামনা করে, লোকটার ভক্তি ও নিষ্ঠা আন্তরিক, সকল সময় সকল বিষয়ে নির্ভয় নিশ্চন্ত মনে লোকটাকে বিশ্বাস করা যায়। লোকটা বুদ্ধিমান কিন্তু চালাক নয়, ভিতরে বাহিরে মিল আছে লোকটার—দৈনন্দিন জীবনের কারবারে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে অসংখ্য দেওয়া-নেওয়া চলে, তার মধ্যে মহেশ চৌধুরীর কাছে পাওনা গ্রহণ করিতে আশাভঙ্গের সম্ভাবনা নাই।

[লেখকের মন্তব্য: কোন মানুষ সম্বন্ধে জনসাধারণের ধারণা অসংখ্য ব্যক্তিগত ধারণার সমষ্টি, কিন্তু ধারণাগুলি নির্দ্দিষ্ট পর্য্যায়ভুক্ত, সীমাবদ্ধ, বৈচিত্র্যহীন। যার ব্যক্তিত্বের দু'টি একটি বিশিষ্ট দিক মাত্র অত্যন্ত স্পষ্ট ও স্থূলভাবে মানুষের কাছে আত্মপ্রকাশ করে, যার সম্বন্ধে মানুষ নিজের ধারণা-কটির মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পায়, নিজের মনে যতগুলি বিভিন্ন 'টাইপ' সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা মানুষের থাকে, তার মধ্যে কোন একটি টাইপের সঙ্গে মানুষ যাকে মোটামুটি মিলাইয়া লইতে পারে, কেবল তারই ব্যক্তিত্বকে মানুষ স্বীকার করে। ব্যক্তিত্ব আসলে পরাশ্রয়ী, ব্যক্তিত্বের বিকাশে পরধর্ম্মানুশীলনের প্রয়োজন, এই জন্ম জোরালো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের পক্ষে এটা ভয়াবহও বটে! যার ব্যক্তিত্বের প্রভাব যত বেশী, তাকে তত বেশী পরের ইচ্ছায় চলিতে হয়, নেতার চেয়েও সে পরাধীন। ব্যক্তিত্বকে প্রভাবশালী করিবার মূলমন্ত্র পরের মনে ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া সে ছোট আমি বড়, তার যা কিছু আছে কম, আমার সে সব আছে অনেক বেশী। সুতরাং পরের ছোট-বড় কম-বেশীর সংস্কার ও ধারণা অনুসারে আমার ব্যক্তিত্ব নিয়ন্ত্রিত না হইলে সেটা নিছক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে পরিণত হয় মাত্র। এ পর্য্যন্ত মোট কথা, কোন জটিলতা নাই। গোলমাল আরম্ভ হয় বিশ্লেষণ যখন সেই স্তরে পৌঁছায়, যেখানে ব্যক্তিত্বের সংগঠনে প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন মালমশলাগুলি পৃথক করিতে হয়, সমগ্র প্রক্রিয়াটার পিছনে কতখানি ক্রিয়াশক্তি অচেতন ও কতখানি সচেতন তাও পৃথক করিতে হয়।

আমার এসব কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই। সদানন্দ ও মহেশ চৌধুরীর ব্যক্তিত্বের একটি মৌলিক সামঞ্জস্যের কথা আমি সোজাসুজি আপনাদের বলিয়া দিতে চাই। সদানন্দ, বিপিন, মাধবীলতা, এদের ব্যক্তিত্বের যেসব দিক আমি ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছি এবং চাই গল্পের মধ্যেই তা আপনা হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং উঠিতেছে। কিন্তু মহেশ চৌধুরী ও সদানন্দের ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে সামঞ্জস্যটা আমি দেখাইতে চাই, গল্পের মধ্যে আপনা হইতে সেটা পরিস্ফুট করিয়া তোলা আমার সাধ্যাতীত। কারণ, দুজন মানুষকে কাছাকাছি টানিয়া আনিয়া অথবা দুজনের মধ্যে একটি মধ্যস্থ খাড়া করিয়া একজনের ব্যক্তিত্বরূপী সচেতন মননশক্তির সঙ্গে অপরজনের ব্যক্তিত্বরূপী অচেতন মননশক্তির পার্থক্য সহজেই স্পষ্ট করিয়া তোলা যায়, কিন্তু সামঞ্জস্য কোন রকমেই দেখান যায় না। যাই হোক, বিশ্লেষণের প্রয়োজন নাই। কেবল বলিয়া দিই। মহেশ চৌধুরীর মধ্যে যে অচেতন মননশক্তি সকলের প্রীতি অর্জ্জন করিয়াছে এবং সদানন্দের মধ্যে যে সচেতন মননশক্তি সকলের মধ্যে জাগাইয়াছে সভয় শ্রদ্ধা, মূলতঃ তার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।]

মহেশ চৌধুরী প্রত্যেক দিন আশ্রমে যাতায়াত করে, সাধারণতঃ বিকালের দিকে। সকালেও মাঝে মাঝে আশ্রমে তার আবির্ভাব ঘটে, খুব ভোরে। রাত্রে সে ঘুমায় কিনা অনেকের সন্দেহ আছে, প্রাতঃভ্রমণে বাহির হয় একরকম শেষ রাত্রে। লাঠি হাতে চার মাইল পথ হাঁটিয়া হাজির হয় আশ্রমে, আবছা আলো অন্ধকারে এদিকে খোঁজে ওদিকে খোঁজে, রাত্রি শেষে কার সঙ্গে যেন খেলিতেছে লুকোচুরি খেলা, খেলার সাথীটি তার কুটীরের পিছনে, গাছের আড়ালে,

ঝোপের মধ্যে কোথাও গা ঢাকা দিয়াছে। খুঁজিতে খুঁজিতে যায় নদীর ধারে। কোন দিন হয়ত সদানন্দের সঙ্গে দেখা হইয়' যায়। তৎক্ষণাৎ প্রণাম করিয়া মহেশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে সদানন্দ যদি প্রথমে কথা বলে তো বলে, নতুবা মহেশ চৌধুরী মুখ খোলে না।

'কে, মহেশ ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ প্রভু। বড় জ্বালা প্রভু মনে, বড় কষ্ট পেয়েছি সমস্ত রাত। তাই ভাবলাম, ভোরবেলা প্রভুর চরণ দর্শন করে-

সদানন্দের ধারণা জ্বালা তারও আছে। সে বলে, 'তোমায় না আশ্রমে আসতে বারণ করে দিয়েছি ?'

'না এসে পারিনা প্রভু।'

'বটে ? বেশ, বেশ। তোমার মত আর দু'একটি ভক্ত জুটলেই আশ্রম ছেড়ে আমায় বনে জঙ্গলে পালাতে হবে। তা তোমার আসল মতলবটা কি বল ত শুনি ?'

'চরণে ঠাঁই চাই প্রভু—মনে শান্তি চাই।'

পাগল ? মাথা খারাপ মহেশ চৌধুরীর ? এরকম অন্ধ ভক্ত সদানন্দের আরও আছে, কিন্তু এমন নাছোড়বান্দা কেউ নাই। বাড়াবাড়ির জন্য ধমক দিলে ভাবপ্রবণ ভক্ত দমিয়া যায়, মুখ হইয়া আসে কালো, ভক্তিও যেন উবিয়া যায় খানিকটা। কিন্তু মহেশ চৌধুরী কিছুতেই দমে না, কিছুতেই হাল ছাড়ে না। সদানন্দের অবজ্ঞা, অবহেলা, কড়া কথা, এসবও যেন তার কাছে পরম উপভোগ্য। বড় রাগ হয় সদানন্দের—বড় আনন্দ হয়। মনে হয়, আসলে মহাপুরুষ সে কেবল এই একজন মানুষের কাছে, প্রায় দেবতার সমান। আর সকলে তাকে ঠকায়, শুধু দাম দেয়, শুধু তার দাবী মেটায়। তারই বলিয়া দেওয়া মন্ত্রে পূজা করে তার। কিন্তু মহেশ চৌধুরী কিছু জানে না, কিছু মানে না, নিজের রচিত একটি মাত্র মন্ত্র বলিয়া সে পূজা করে —তুমি আমায় চাও বা না চাও দেবতা, আমি তোমায় চাই।

একটু ভয়ও করে সদানন্দের মহেশ চৌধুরীর কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে, তার সঙ্গে কথা বলিতে। বাস্তব অভিজ্ঞতার মালমশলায় জীবনের যে আদর্শ সে সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে নিজের জন্য, সে আদর্শ অবাস্তব কল্পনা কিনা, অর্থহীন স্বপ্ন কিনা, আজও এবিষয়ে সদানন্দের সন্দেহ মেটে নাই। যে আত্মপ্রত্যয়ের নীচে এ সন্দেহ চাপা থাকে, মহেশ চৌধুরীর দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে, চোখের দৃষ্টিতে, মুখের কথায় তা যেন উবিয়া যাইতে থাকে—দেবতার সামনে পূজারীর মত মহেশ চৌধুরী দাঁড়াইয়া থাকে, পোষা কুকুরের মত তাকায়, স্তব করার মত কথা বলে—তবু। মনে হয়, আর যত ভক্ত তার আছে, যাদের মধ্যে অনেকে মনে মনে তার সমালোচনাও করে কম বেশী, তাদের ভুলাইতে কোনদিন তার কষ্ট হইবে না, ভুলিবার জন্য শিশুর মত তারা উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে, কিন্তু এই অন্ধ ভক্তটিকে ভুলানোর ক্ষমতা তার নাই। মহেশ চৌধুরীর পূজা গ্রহণ করিলে বর দিবার সময় ফাঁকি চলিবে না, ভেজাল চলিবে না। অবাস্তব পাগলামীর পুরস্কারকে করিয়া তুলিতে হইবে বাস্তব। কাব্যের জন্য কবিকে যেমন নারীকে দিতে হয় খাঁটি রক্তমাংসের দেহটি।

'তোমার ছেলে ছাড়া পেয়েছে মহেশ ?'

'আজ্ঞে না। ও কি আর ছাড়া পাবে !'

'এ্যাঁ ? সে কি কথা—ছাড়া পাবে বৈকি, দুদিন পরেই ছাড়া পাবে। ভেবো না।'

এই কি বাস্তব পুরস্কারের নমুনা ? ইচ্ছার বিরুদ্ধে দুটি মিষ্টি কথা বলা, একটু অনিশ্চিত আশ্বাস দেওয়া, হিসাব করিলে যার দাম কাণা কড়িও হয় না, কিন্তু মহেশ চৌধুরীর কাছে যা অমূল্য ?

কোনদিন সদানন্দ কথা না বলিয়া পাশ কাটিয়া চলিয়া যায়, মহেশ চৌধুরী ঠায় দাঁড়াইয়া যতক্ষণ দেখা যায় তাকে দেখে, তারপর আবার আপন মনে তপোবনে ঘুরিয়া বেড়ায় আর সদানন্দের সম্মুখে পড়ে না। এখানে সে অনাহূত অবাঞ্ছিত আগন্তুক, বিপিনের শাসনে আশ্রমের কেউ তার সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত বলে না, মাঝে মাঝে রীতিমত অপমানও জোটে, তবু মোহাচ্ছন্নের মত সে আশ্রমের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, ধীরে ধীরে আশ্রমের জাগরণ লক্ষ্য করে।

সদানন্দের অজ্ঞাতবাসের খবরটা মহেশ চৌধুরী পাইল সাতুনার শ্রীধরের বাড়ীতে। বাগবাদায় নিজের বাড়ী হইতে আশ্রমে যাওয়ার পথে শ্রীধরের বাড়ী পড়ে, মহেশ চৌধুরী এখানে কিছুক্ষণ বসিয়া যায়। বিশ্রামও হয়, জানাশোনা অনেকের সঙ্গে কথা বলাও হয়, অনেকের খবরও পাওয়া যায়। আজ শ্রীধরের সদরের বড় ঘরটার দাওয়ায় লোক জুটিয়াছে অনেক। যারা অপরাহ্নে যাইবে ভাবিয়া-

ছিল, সদানন্দ সাতদিন দর্শন দিবে না শুনিয়া তাদের মধ্যে অনেকেই শ্রীধরের এখানে আসিয়া জুটিয়াছে। শ্রীধর একটি নূতন বই সংগ্রহ করিয়াছে কোথা হইতে, কামরূপের এক রোমাঞ্চকর প্রামাণ্য উপন্যাস। কাল চারটি পরিচ্ছেদ পাঠ করা হইয়াছিল, আজ সকলে আসিয়া জুটিলেই বাকী অংশটুকু পড়া আরম্ভ হইতে পারিবে।

মহেশ চৌধুরী বলিল, 'কেউ দর্শন পাবে না?'

শ্রীধর বলিল, 'বিপিনবাবু তাই বললেন চৌধুরী মশাই। প্রকৃত ভক্ত ছাড়া কেউ দর্শন পাবে না—প্রভুর জন্য যে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে পারে, জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারে, কেবল সেই দর্শন পাবে

'প্রভুর জন্য তোমরা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে পার না, জীবন বিসর্জ্জন দিতে পার না শ্রীধর?'

উৎসুক দৃষ্টিতে মহেশ চৌধুরী সকলের মুখের দিকে চাহিতে থাকে, সকলে অস্বস্তি বোধ করে, চোখ নামাইয়া নেয়। বৃদ্ধ শ্রীধরের স্তিমিত চোখ দুটি বোধ হয় তামাকের ধোঁয়াতেই বুজিয়া যায়।

'আমি প্রভুর চরণ দর্শন করতে যাব শ্রীধর।'

সকলে স্তব্ধ হইয়া থাকে। অহংকারের কথা নয়, মহেশ চৌধুরীর অহংকার আছে কিনা সন্দেহ। সকলে তা জানে। কিন্তু একটা কথা প্রায় সকলের মনেই খচ্ খচ্ করিয়া বিঁধিতে থাকে, কঠিন একটা সমস্যা। সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারে, জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারে, এত বড় ভক্তই যদি মহেশ চৌধুরী হয়, সদানন্দ তাকে আমল দেয় না কেন, কেন তাকে শিষ্য করে না? এই সমস্যা আজ বহু দিন সকলকে পীড়া দিতেছে, এ বিষয়ে নিজেদের মধ্যে তারা অনেক আলোচনা করিয়াছে, মনে মনে অনেক মাথা ঘামাইয়াছে। কারও মনে এ সন্দেহও জাগিয়াছে যে, মানুষটা মহেশ চৌধুরী কি আসলে তবে ভাল নয়, তার নীতি ধর্ম্ম ভক্তি নিষ্ঠা সব লোক-দেখানো ভালমানুষী?

মহেশ চৌধুরী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলে, 'যাই, একবার ঘুরে আসি আশ্রম থেকে।'

কয়েকজন কৌতূহলভরে তার সঙ্গ নিলে সে তাদের ফিরাইয়া দেয়, বলে, 'না, আজ আর তোমাদের গিয়ে কাজ নেই ভাই। প্রভু যখন বারণ করে দিয়েছেন, মিছিমিছি গোলমাল না করাই ভাল।'

আশ্রমে গিয়া মহেশ চৌধুরী যাকে সামনে পাইল তাকেই প্রভুর চরণ দর্শনের জন্য ব্যাকুলভাবে আবেদন জানাইতে লাগিল। কেউ জবাব দিল, কেউ দিল না। তখন মহেশ চৌধুরী গিয়া ধরিল বিপিনকে।

বিপিন বলিল, 'সাতদিন পরে আসবেন।'

মহেশ চৌধুরী মিনতি করিয়া বলিল 'আপনি একবার প্রভুকে গিয়ে বলুন, প্রভুর জন্য আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করব, জীবন বিসর্জ্জন দেব। আপনি বললেই প্রভু আমায় ডেকে পাঠাবেন।'

বিপিন রাগিয়া বলিল, 'কে আপনাকে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে, জীবন বিসর্জ্জন দিতে সেধেছে মশায়? কেন আসেন আপনি আশ্রমে? যান যান, বেরিয়ে যান আমার আশ্রম থেকে।'

কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া মহেশ চৌধুরী ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরিয়া গেল। ফিরিয়া আসিল শেষ রাত্রে।

সদানন্দের সদরের কুটীরের সামনে কদম গাছটার তলায় বসিয়া পড়িল। কুটীরের আড়াল হইতে সূর্য্য উঠিলেন মাথার উপরে, তারপর আকাশ ঢাকিয়া মেঘ করিয়া আসিয়া ঘণ্টাখানেক বৃষ্টি হইয়া গেল, তারপর আবার কড়া রোদ ঢালিতে ঢালিতে সূর্য্য আড়াল হইলেন অন্য একটি কুটীরের আড়ালে, গাছতলা হইতে মহেশ নড়িল না। রোদে পুড়িয়া জলে ভিজিয়া খাওয়া ছাড়িয়া কি তপস্যা করিতে বসিয়াছে গাছতলায়? এত যায়গা থাকিতে এখানে তপস্যা করিতে বসা কেন? আশ্রমের সকলে সম্মুখ দিয়া যাওয়ার সময় বিস্ময় ও কৌতূহলভরা দৃষ্টিতে তাকে দেখিতে থাকে,—তাকে দেখিবার জন্য কেউ আসে না বটে, কিন্তু এদিক দিয়া যাতায়াত করার প্রয়োজন আজ যেন সকলের বাড়িয়া যায়।

বেলা বাড়িলে তিন চার বার মহেশ চৌধুরীর বাড়ী হইতে লোক আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছিল। বর্ষণের আগে আসিয়াছিল কেবল চাকর গোমস্তা, বর্ষণের পর আসিল মহেশের ভাগ্নে শশধর। গাছতলায় মাটিতে উপবিষ্ট মামার জলে ভেজা মূর্ত্তি দেখিয়া বেচারা কাঁদিয়া ফেলে আর কি! কিন্তু সেও মহেশের তপস্যা ভঙ্গ করিতে পারিল না। তবে দেখা গেল ছেলেটার বুদ্ধি আছে। নিজে হার মানিয়া সে ফিরিয়া গেল বটে, কিন্তু বিকালবেলা হাজির হইল একেবারে মামীকে সঙ্গে করিয়া।

ভাগ্নে কেবল কাঁদিয়া ফেলার উপক্রম করিয়াছিল, স্বামীর অবস্থা দেখিয়া স্ত্রী কাঁদিয়াই আকুল। কেন তার মরণ হয় না? যার স্বামী পাগল, ছেলে পাগল, সে কেন সংসারে বাঁচিয়া থাকে নিত্য নতুন

যন্ত্রণা সহ্য করিতে? কাঁদিতে কাঁদিতে হাতের বালা দিয়া বিভূতির মা কপালে আঘাত করিল। রক্ত বাহির হইল একটু—ডান চোখের জলের ধারাটা লাল হইয়া গেল।

মহেশ চৌধুরী কাতরভাবে বলিল, 'শোন শোন, আহা এমন করছ কেন? বাড়ী ফিরে যাও, আমি ঠিক সময়ে যাব।'

খোলা জায়গায় ফাঁকা গাছতলায় এমন নাটকের অভিনয় চলিতে থাকিলে দর্শকের সমাগম হইতে দেরী হয় না। একে একে আশ্রমের প্রায় সকলেই আসিয়া হাজির হয়, এলোমেলো ভাবে চারিদিকে দাঁড়াইয়া দুজনকে দেখিতে থাকে। পুরুষেরা ব্যাপারটা অনেকটা হাল্কাভাবেই গ্রহণ করে, মেয়েদের মধ্যে দেখা দেয় চাপা উত্তেজনার চাঞ্চল্য, অনেকে ছোট্ট হাঁ করিয়া চোখ বড় করিয়া চাহিয়া থাকে, শেষ বেলার আলোয় দাঁত করে ঝক্ ঝক, চোখ করে চক চক। আশ্রমে দাঁত মাজার নিয়ম বড় কড়া, দাঁতে ময়লা থাকিলে সদানন্দ রাগ করে, মেয়েদের দাঁত তাই সত্যই ঝক ঝক করে—কারও কম, কারও বেশী। রত্নাবলীর দাঁতগুলি বোধহয় সকলের চেয়ে বেশী সুন্দর আর বেশী ঝকঝকে, চোখও তার বড় আর টানা। তবু গাছতলার ব্যাপার দেখিতে দেখিতে গায়ের আঁচল টানিয়া টানিয়া সে দুহাতে পুঁটলী করিতে থাকে, তারপর রক্তপাত ঘটা মাত্র আঁচল সমেত হাত দিয়া চাপা দেয় নিজের মুখ। কাঁদে কিনা বলা যায় না, কিন্তু সর্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপে। কী কুৎসিত যে দেখায় তার পরিপুষ্ট অঙ্গের অনাবৃত অংশের ঢেউ তোলা কাঁপুনি! শশধর অভিভূত হইয়া চাহিয়া থাকে। মাধবীলতা তাড়াতাড়ি মহেশ চৌধুরীর স্ত্রীর কাছে গিয়ে আঁচল দিয়া তার কপালের রক্ত মুছিয়া দেয়।

তারপর আবির্ভাব ঘটে বিপিনের। রাগ করিয়া লাভ নাই, সে তাই রাগ করে না, আশ্চর্য্য হইবার ভাণ করিয়া বলে, 'আপনি যাননি এখনো?'

মহেশ চৌধুরী বলে, 'আজ্ঞে না। আপনাকে তো বলেছি, একবার প্রভুর চরণ দর্শন করতে না দিলে আমি উঠব না।'

'তা হলে সাতদিন আপনাকে এখানে থাকতে হবে।'

'তাই থাকব।'

বিপিন একটু হাসিল, 'আপনার ভক্তিটা কিন্তু বড় খাপছাড়া চৌধুরী মশায়। প্রভুর আদেশ অমান্য করতে আপনার বাধবে না, প্রভুর চরণ দর্শনের জন্য আপনি ব্যাকুল।'

মহেশ চৌধুরী নিশ্চিন্তভাবে বলিলেন, 'ও আদেশ আমার জন্য নয়।'

মাধবীলতা বলিল, 'না সত্যি, উনি জানিয়েছেন, সাতদিন কেউ দর্শন পাবে না। সাতদিন উনি এক মনে সাধনা করবেন কিনা।'

'আমি আড়াল থেকে একবার দর্শন করেই চলে আসব।'

'তা কি হয়?'

সন্ধ্যা হইল, রাত্রি বাড়িতে লাগিল, মহেশ চৌধুরী গাছতলায় মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া রহিল। নিরীহ, শান্ত, ভীরু মানুষটা যে আসলে এমন একগুঁয়ে, সদানন্দ ছাড়া এতকাল আর কে তা জানিত! তাকে কিছু খাওয়ানোর চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়া গেল। মাধবীলতা আর রত্নাবলী কোন রকমে তার স্ত্রীকে একটু দুধ খাওয়াইয়া শশধরকে ডাকিয়া নিয়া গেল আশ্রমের রাত্রির আহার্য্যের ব্যবস্থায় ভাগ বসাইতে। রাত্রে আশ্রমে রান্না হয় না, কিন্তু পেট ভরাইতে শশধরের অসুবিধা হইল না,—দুধ, ছানা, মিষ্টি, ফল-মূল, এ সবের অভাব নাই। খাওয়ার পর সে আসিয়া আবার মামা মামীর কাছে বসিয়া রহিল গাছতলায়। রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত আশ্রমের দু'এক জনকে সেখানে দেখা গেল, তারপর একজনও রহিল না। রাত্রি দশটার পর কারও কুটীরের বাহিরে থাকা বারণ—বিপিন ও সদানন্দ ছাড়া।

রাত প্রায় এগারটার কাছাকাছি গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিও নামিল, ছাতি মাথায় বিপিনও হাজির হইল গাছতলায়। দাঁতে ব্যথা হওয়ায় বিপিন গলা, মুখ, চোয়াল, কাণ, সমস্ত ঢাকিয়া সযত্নে কম্ফর্টার জড়াইয়াছে। ঠাণ্ডা লাগিলে তার দাঁতের ব্যথা বাড়ে। মুখের ঢাকা একটু সরাইয়া সে বলিল, 'আপনারা দাওয়ায় উঠে বসবেন যান। মাদুর আর বালিশ দিচ্ছি।' মহেশ চৌধুরী স্ত্রীকে বলিলেন, 'যাও না দাওয়ায়, যাও না তোমরা? বৃষ্টিতে ভিজে যে মারা পড়বে তুমি! যাও, দাওয়ায় যাও।'

বিভূতির মা বলিল, 'আর তুমি?'

'এক কথা একশ'বার কেন বলছ? বললাম না প্রভুকে দর্শন করতে না দিলে আমি উঠব না এখান থেকে? তুমি এখানে বসে থেকে কি করবে, তাতে লাভটা কি হবে শুনি?'

'তুমি এখান থেকে না উঠলে আমিও উঠব না।'

সন্ধ্যা হইতে এ বিষয়ে দুজনের মধ্যে অনেক তর্ক, রাগারাগি হইয়া গিয়াছে, মহেশ চৌধুরী আর কিছু বলিল না, কেবল শশধরকে হুকুম দিল দাওয়ায় গিয়া বসিতে। শশধর দাওয়াতে গেল, বিপিন মাদুর আর বালিশ আনিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ মাদুর বিছাইয়া শুইয়াও পড়িল। আপশোষ করিয়া বলিল, 'বর্ষাকালে একি ঠাণ্ডা মশায়, এঁ্যা? একি শালার শীতকাল নাকি?'

বিপিনের সহানুভূতি জাগিবার লক্ষণ নাই দেখিয়া, গলা নামাইয়া আবার বলিল, 'বৌটা এসেছে কাল—ছমাস বাপের বাড়ী ছিল। কি গরমটা গেছে কাল রাতে, তা বৌ বলে কি, না বাবু, বাদলার দিন ঠাণ্ডা লাগবে। ব'লে—'

'আপনি বাড়ী ফিরে যান না?'

শশধর উঠিয়া বলিল।—'আমি? মামী কাল বাড়ী ফিরেই কি করবে জানেন? কাণটি ধরে বলবে, বেরো বাড়ী থেকে। কেবল আমাকে নয় মশায়, নিজের জন্য কি আমি ভাবি,—বৌটাকে শুদ্ধু। গায়ে দেবার দিতে পারেন কিছু,—কাপড় চোপড় যাহোক?'

বিপিন একটা চাদর আনিয়া দিল। কিন্তু বাদল রাতে সদানন্দের সদর দাওয়ায় চাদর মুড়ি দিয়া আরাম করিবার অদৃষ্ট বেচারীর ছিল না। বিভূতির মা ডাকিয়া বলিল, 'ও শশী, ভদ্রলোকের কাছ থেকে ছাতিটা চেয়ে রাখ, আর জিজ্ঞেস্ কর আরো যদি ছাতি থাকে একটা—'

একটা কেন, আরোও তিনটা ছাতি ছিল, সবগুলি আনিয়া দাওয়ায় শশধরের কাছে ফেলিয়া বিপিন ভিতরে চলিয়া গেল। দাঁতের অসহ্য যন্ত্রণায় তার মাথার মধ্যে তখন ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল, ইচ্ছা হইতেছিল মাটিতে শুইয়া হাত পা ছুঁড়িতে থাকে, আর চীৎকার করিয়া কাঁদে।

ছাতি নিয়া শশধর গাছতলায় গেল। একটি ছাতি খুলিয়া দিল মামীর হাতে, আরেকটি ছাতি খুলিয়া মহেশ চৌধুরীকে দিতে গেলে সে বলিল, 'না, আমার ছাতি চাই না।'

স্ত্রী বলিল, 'কেন? এখেনে ধন্নে দিয়েছো, না খেয়ে বসে থাকবে, তা না হয় বুঝলাম—বিষ্টি যখন পড়ছে, ছাতিটা মাথায় দিতে দোষ কি?'

মহেশ চৌধুরী বলিল,—'নিজে থেকে আমি করব না।'

তখন মহেশ চৌধুরীর স্ত্রী আবার এমনভাবে নিজের মরণের জন্য আপশোষ আরম্ভ করিল যে, মনে হইল, আবার বুঝি আজ অপরাহ্নের মত বালার আঘাতে নিজের কপাল কাটিয়া রক্ত বাহির করিয়া ছাড়িবে। কিন্তু খানিক আপশোষ করিয়া নিজের ছাতিটা বন্ধ করিয়া শশধরকে ফেরত দিল, বলিল, 'যা তুই, দাওয়ায় শো' গে যা শশী।'

শশধর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'থাক, আমিও বসে বসে ভিজি এখানে, আমিই বা বাদ যাব কেন।'

তারপর মিনিট দুই সব চুপচাপ। এ অবস্থায় গাছের পাতায় বাতাসের মৃদু শোঁ শোঁ শব্দ আর গাছের পাতা হইতে জল ঝরিবার ক্ষীণ জলো জলো আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দ কাণে শোনাও পাপ। মনে অবশ্য অনেক কথা টগবগ করিয়া ফুটিতে থাকে এবং সেগুলি স্মৃতিও নয়।

'সারাটা জীবন আমায় তুমি জ্বালিয়ে খেলে, আমার শনিগ্রহ তুমি। আমার সব ব্যাপারে তোমার বাহাদুরী করা চাই, হাঙ্গামা বাধানো চাই। যদি শান্তি পাবার জন্যে গাছতলায় ধন্না দিয়ে পড়ে থাকি, তোমার কি তাতে, কেন তুমি এসে আমার মন বিগড়ে দেবে, কে ডেকেছিল তোমায়? স্বামীভক্তি দেখানো হচ্ছে—স্বামীর একটা কথা শুনবে না, স্বামীভক্তি দেখাতে গাছতলায় এসে ভেজা চাই। কি অদ্ভুত সতীরে আমার! স্বামীর শান্তি নষ্ট করে সতীত্ব ফলানো!'

বৃষ্টি আর বাতাস দুয়েরই বেগ বাড়িতে থাকে। মহেশ চৌধুরীর রাগ আর জ্বালাবোধ কিন্তু না বাড়িয়া এই সামান্য ভর্ৎসনার মধ্যেই একেবারে ক্ষয় হইয়া যায়। আরও অনেকক্ষণ জের টানিতে পারিত, বলিতে পারিত আরও অনেক কথা, কিন্তু কিছু না বলিয়া একেবারে চুপ হইয়া গেল। অন্ধকারে এত কাছাকাছি বসিয়াও কেহ কারও মুখ দেখিতে পাইতেছে না। গাঢ় অন্ধকারে শুধু একটি আলোর বিন্দু চোখে পড়ে। কিছুদূরের একটি কুটীরে কে যেন একটি আলো জ্বালিয়া জানালা খুলিয়া রাখিয়াছে। জাগিয়া আছে না ঘুমাইয়া পড়িয়াছে মানুষটা, কে জানে! এত রাত্রে চোখে ঘুম নাই, এমন শান্তিহীন অভাগা কে আছে সাধু সদানন্দের আশ্রমে? সদানন্দের যে শিষ্য, সদানন্দের আশ্রমের কুটীরে যে বাস করিবার অধিকার পায়, জীবনের সব জ্বালা পোড়ার ছোঁয়াচ তো সঙ্গে সঙ্গে তার মন হইতে মুছিয়া যাইবে, সন্ধ্যার সঙ্গে শিশুর

মত দু'চোখ ভারি হইয়া আসিবে শিশুর চোখের ঘুমে? আলোর বিন্দুটি নিভিয়া গেলে মহেশ চৌধুরী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। তাই বটে। কোন দরকারে কেউ আলো জালিয়া রাখিয়াছিল—ঘুম আসিতেছিল না বলিয়া নয়। দুই হাত জড়ো করিয়া মহেশ চৌধুরী মনে মনে সদানন্দের চরণে মাথা লুটাইয়া প্রণাম করে। হে মহেশ চৌধুরীর জীবন্ত দেবতা, মহেশ চৌধুরীর কল্যাণের জন্যই তুমি তাকে অবহেলা করিয়া দূরে ঠেলিয়া রাখ, দুঃখের আগুনে পুড়িয়া মহেশ চৌধুরীর মন যেদিন নির্মল হইবে, সেই দিন পায়ে ঠাঁই দিয়া মহেশ চৌধুরীর সমস্ত দুঃখ দূর করিয়া তাকে তুমি শান্তি দিবে, একথা জানিতে কি বাকী আছে মহেশ চৌধুরীর? এই ধৈর্য্যের পরীক্ষায় শিষ্য না করিয়া শিষ্যের মতই তাকে যে প্রকারান্তরে আত্মশুদ্ধির কঠোর সাধনায় নিযুক্ত করিয়াছ, সেই সাধনায় সিদ্ধি লাভের জন্য মহেশ চৌধুরী জীবন দিতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু আজ এই বিপদে তুমি তাকে রক্ষা কর। তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না প্রভু মহেশ চৌধুরীকে বাড়ীতে ফিরাইয়া নেওয়ার জন্য, মহেশ চৌধুরীর সাধনা ব্যর্থ করার জন্য, একজন কি অন্যায় আবদার আরম্ভ করিয়াছে। রাত-দুপুরে গাছতলায় সম্মুখে বসিয়া নীরবে বৃষ্টির জলে ভিজিতেছে? স্ত্রী বলিয়া নয়, ছেলের মা বলিয়া নয়, একজন স্ত্রীলোকের এত কষ্ট চোখে দেখিয়া স্থির থাকার মত মনের জোর যে মহেশ চৌধুরীর নাই প্রভু।

সদানন্দ অবশ্য তখন ঘুমাইতেছিল। আজ বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়াছে। কিন্তু জানা থাকিলেও মহেশ চৌধুরীর কিছু আসিয়া যাইত না। পাথরের দেবতার কাছেও মানুষ প্রার্থনা জানায়—ঘুমন্ত মানুষ তো জীবন্ত। নয় কি?

পরদিন চারিদিকে খবর ছড়াইয়া গেল, মহেশ চৌধুরী সস্ত্রীক সাধু বাবার আশ্রমে ধন্না দিয়াছে। চারিদিক হইতে নরনারী দেখিবার জন্য আসিয়া জড়ো হইতে লাগিল—সদানন্দের আশ্রমে আসিয়া তারা আজ মহেশ চৌধুরীর দর্শনপ্রার্থী।

শেষ রাত্রে বৃষ্টি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, সকালবেলা ভিজা পৃথিবীতে সোনালী রোদ উঠিয়াছে। মহেশ চৌধুরী ও তার স্ত্রী দুজনের গায়ে রোদ পড়িয়া দেখাইতেছে যেন মূর্ত্তি-ধরা বিশৃঙ্খলা ও অবাধ্যতা, কিন্তু অপার্থিব জ্যোতি দিয়া আবৃত। দুজনের গায়ে আবরণের মত পড়িবে বলিয়া রোদের রঙটা আজ বেশী গাঢ় হইয়াছে নাকি?

রত্নাবলী ও উমা আসিয়াছিল সকলের আগে, রোদ উঠিবারও আগে। রত্নাবলী চোখ বড় করিয়া বলিয়াছিল,—

'সমস্ত রাত এখানে ছিলেন?'

মহেশ চৌধুরী বলিয়াছিল, 'থাকবার জন্যেই তো এসেছি মা।'

মহেশ চৌধুরীর কথা বলিবার ধরণ পর্য্যন্ত এক রাত্রে বদলাইয়া গিয়াছে।

'মারা পড়বেন যে আপনারা?'

মহেশ চৌধুরী করুণ চোখে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া রহিল। দেবতা কি প্রার্থনা শুনিবেন, এই বিপদে তাকে পথ দেখাইয়া দিবেন না?

কাল শেষ রাত্রির দিকে কতবার যে তার মনে হইয়াছে সব শেষ করিয়া দিয়া স্ত্রীর হাত ধরিয়া কোন একটি আশ্রয়ে চলিয়া যায়। মনে হইয়াছে, এমন-ভাবে একজনকে কষ্ট দিবার কোন অধিকার তার নাই, সে তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেই বা এ জগতে কার কি আসিয়া যাইবে, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেই বা কার কি আসিয়া যাইবে, সব কি তার নিজেরই বিকৃত অহংকারের কথা নয়? সাধুজীর চরণ দর্শন না করিয়া উঠিবে না বলিয়া গাছতলায় ধন্না দিয়াছে, চরণ দর্শন হইবার আগে উঠিয়া গেলে লোকের কাছে একটু নিন্দা হইবে, লোকে বলিবে মহেশ চৌধুরীর মনের জোর নাই। নিজের কাছে নিজের দামটাও একটু কমিয়া যাইবে বটে, মনে হইবে বটে যে, আমি কি অপদার্থ, ছি। কিন্তু নিজের কথা ভাবিয়া আরেকজনকে যন্ত্রণা দিলে, মারিয়া ফেলিবার সম্ভাবনা ঘটাইলে, তাতে কি নিজের অপদার্থতা আরও বেশী প্রমাণ হইয়া যাইবে না, নিজের মধ্যে অশান্তি বাড়িয়া যাইবে না?

রোদ উঠিবার পর আসিল মাধবীলতা। কে জানে কেন, এ আশ্রমে কোন ব্যাপারে সকলের চেয়ে মাধবীলতার সাহসটাই সবচেয়ে বেশী হইতে দেখা যায়। বোধ হয় কোন কোন ব্যাপারে সে সকলের চেয়ে ভীরু বলিয়া।

আসিয়াই মহেশকে সে দিতে আরম্ভ করিল বকুনি। বলিল, 'মাথা খারাপ হয়ে থাকে, অন্য কোথাও গিয়ে পাগলামী করুন না? আমরা আপনার কাছে কি অপরাধ করেছি?'

'অপরাধ? অপরাধের কথা কি হল মা?'

মহেশ চৌধুরী হাত জোড় করিল।

তফাতে শতাধিক নরনারী ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, মাধবীলতার মুখের রঙ যেন রোদের সঙ্গে মিশ খাইয়া যাইবে।

'তবে আমাদের এত কষ্ট দিচ্ছেন কেন? এটা তো হাট নয়, আশ্রম তো এটা? দেখুন তো চেয়ে—কি লোক জমতে সুরু করেছে? এর মধ্যে আশ্রমের কাজ চলে কি করে, আমরাই বা থাকি কি করে? একটু শান্তি পাবে বলে যারা আশ্রমে আসে—', সাহস মাধবীলতার একটুও কমে নাই, তবে আবেগটা বাড়িতে বাড়িতে একটু অতিরিক্ত হইয়া পড়ায় গলাটা রুদ্ধ হইয়া গেল।

মহেশ চৌধুরী বলিল, 'তোমাদের অসুবিধা হচ্ছে মা? আচ্ছা আমি ওদের যেতে বলছি।'

'যেতে গরজ পড়েছে ওদের!'

কিন্তু তারা গেল। মহেশ চৌধুরী ঘুরিয়া বসিয়া সকলকে চলিয়া যাইতে অনুরোধ জানাইল, বলিল যে, এই গাছতলায় তার মরণ হইবে, এটা যদি তারা না চায়, তবে যে যার বাড়ী ফিরিয়া যাক। ভঙ্গি দেখিয়া প্রথমে মাধবীলতার মনে হইয়াছিল মহেশ চৌধুরী বুঝি লম্বা বক্তৃতা দিবে, কিন্তু একটু অনুযোগ দিয়া ও নিজের মরণের ভয় দেখাইয়া কয়েকটি কথায় সে বক্তব্য শেষ করিয়া দিল এবং এমনভাবে কথাগুলি বলিল, যেন শ্রোতারা সকলেই তার শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়। কিছুক্ষণের মধ্যে সকলে আশ্রমের সীমানা পার হইয়া চলিয়া গেল। বাড়ী সকলে গেল না, আশ্রমের কাছেই খবরের লোভে ঘুরাফিরা করিতে লাগিল, কিন্তু গাছের জন্য আশ্রমের ভিতর হইতে তাদের আর দেখা গেল না। মাঝে মাঝে দু'একজন করিয়া আশ্রমের ভিতরে ঢুকিয়া মহেশকে দেখিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল, আশ্রমের মধ্যে আর ভিড় হইল না।

বিপিন ভিতর হইতে ব্যাপারটা লক্ষ্য করিতেছিল। দাঁতের ব্যথা এখনো তার সম্পূর্ণ কমে নাই, কিন্তু হয় রোদ উঠিয়াছে বলিয়া অথবা ব্যাপারটা দেখিয়া উত্তেজনা হইয়াছে বলিয়া, মাথায় জড়ান সমস্ত কাপড় খুলিয়া ফেলিয়া সে চুপ করিয়া বিছানায় বসিয়া রহিল।

মাধবীলতা একটা পাক দিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা, আপনি কি চান?'

'প্রভুর চরণ দর্শন করিতে চাই।'

শুনিয়া মাধবীলতা আবার পাক দিয়া আসিতে গেল।

বেলা বাড়িতে থাকে, ভিজা জামা ও কাদা-মাখা পরণের কাপড় ক্রমে ক্রমে শুকাইয়া যায়, গুমোট হয় দারুণ। মহেশ একসময় স্ত্রীকে বলে, 'আচ্ছা, এবার তো তুমি ফিরে যেতে পার?'

বিভূতির মার চোখ জবাফুলের মত লাল হইয়াছে, চোখের পাতা বুজিয়া বুজিয়া আসিতেছে। শুধু মাথা নাড়িল।

মহেশ চৌধুরী খানিকক্ষণ গুম্ খাইয়া থাকিয়া বলিল, 'চল, আমিও যাচ্ছি।'

শুনিয়া বিভূতির মার লাল চোখে পলক পড়া বন্ধ হইয়া গেল—'সাধুজীর চরণ দর্শন না করেই যাবে?'

'কি করব? নারীহত্যার পাতক তো করতে পারি না।—জ্বর এসেছে না তোমার?'

হয়ত আসিয়াছে জ্বর, হয়ত আসে নাই, সেটা আর এখন বড় কথা নয়, বিভূতির মা এখন আর বাড়ী ফিরিয়া যাইতে চায় না। এখানে বসিবার সময় বলিয়াছিল বটে যে, স্বামী লইয়া ফিরিয়া যাইবে কিন্তু এখন আর সদানন্দের চরণ দর্শনের আগে সেটা করিতে চায় না। স্বামীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে ভয়ে? ভয় সেটাই বটে, কিন্তু মহেশ যা ভাবিতেছে, তা নয়, স্বামীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে ভাবনায় তো বিভূতির মার ঘুম আসিতেছে না! এখন বড় ভয় এই যে, এত কাণ্ডের পর তার পাগল স্বামী সদানন্দের দর্শনলাভ না করিয়াই বাড়ী ফিরিয়া গেলে, তার সঙ্গে সে ঘর করিবে কি করিয়া? সেই তিলে তিলে দিনের পর দিন দগ্ধানোর চেয়ে এইখানেই একটা হেস্ত-নেস্ত হইয়া যাক্!

যুক্তিটা যে খুবই জোরালো, তাদের সম্পর্কের হিসাব ধরিলে প্রায় অকাট্য, মনে মনে মহেশ তা অস্বীকার করিতে পারিল না, কিন্তু অনাহারে অনিদ্রায় রোদে পুড়িয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া গাছতলায় বসিয়া বসিয়া দিবারাত্রি কাটানোর পর যুক্তিতে বেশী কিছু আসিয়া যায় না, পরের কাছে বিনয়ে কাদা হইয়া হাতজোড় করা যায় কিন্তু নিজের লোকের অবাধ্যতায় গা জ্বলিয়া যায়। মহেশ চৌধুরীর দাঁতে দাঁত ঘষিবার প্রক্রিয়াটা কাছে দাঁড়াইয়া কেউ লক্ষ্য করিলে চমকাইয়া যাইত।

'তুমি থাক তবে, আমি ফিরে চললাম।'

'যাও।'

'আমি চলে গেলেও তুমি একা বসে থাকবে?

'কি করব না ব'সে? এখন গেলেই চিরকাল তুমি আমায় দুষবে, বলবে আমার জন্য তুমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছিলে।'

'তোমায় দুষবো?'

'দুষবে না?'

খানিকক্ষণ হতভম্বের মত স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া মহেশ চৌধুরী বলিল, 'আমি নিজেই যখন চলে যাচ্ছি, তোমায় দুষব কেন?"

এবার বিভূতির মা যেন একটু রাগ করিয়াই বলিল, 'ভাখো, তোমার সঙ্গে আমার সে সম্পর্ক নয়, ওসব মারপ্যাঁচ আমাদের মধ্যে চলবে না,—রাস্তার লোককে ওসব বলে বুঝিও। নিজেই চলে যে যাচ্ছ তুমি, কার জন্ম যাচ্ছ শুনি? বাড়ী গিয়ে যে ছটফট করবে, সেটা জলে তলে দখাবে কাকে শুনি? তোমায় চিনতে তো আমার বাকী নেই। তুমি হলে…তুমি হলে…'মাথা নত করিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল।

'কেঁদো না' বলিয়া মহেশ চৌধুরী বিহ্বলের মত বসিয়া রহিল। এ জগতে কোন প্রশ্নেরই কি শেষ নাই? মানুষ বিচার করিবে কি দিয়া? খুঁজিলেই সত্যের খুঁত বাহির হয়,—নিজে খোঁজ বন্ধ করিয়া দিলেও রেহাই নাই, প্রতিনিধি যদি খোঁজে, নিজের জ্ঞান-বুদ্ধির হিসাবে তাতেও খুঁত বাহির হওয়া আটকায় না। নিজে যা হোক কিছু ঠিক করিয়া নিতে পারিলেই অন্যে তা মানিবে কেন, অন্যেও যাহোক কিছু ঠিক করিয়া নিতে গিয়া নূতন কিছু আবিষ্কার করিবেই। সুতরাং এখন কর্ত্তব্য কি? যা ভাল মনে হয় তাই করা?

কি করা ভাল?

হে মহেশ চৌধুরীর জীবন্ত দেবতা—

না, দেবতার কাছে আবদার চলিবে না। দেবতার কি জানে মহেশ চৌধুরী? দেবতা ও তার সম্পর্কের মধ্যে কোন্‌টা মারপ্যাঁচ আর কোন্‌টা মারপ্যাঁচ নয়, তা কি সে নিঃসন্দেহে জানিতে পারিয়াছে, যেমন জানিতে পারিয়াছে স্বামী নামক দেবতা সম্বন্ধে তারই সম্মুখে উপবিষ্টা তারই এই স্ত্রীটি? এরকম না জানিলেই বা কর্ত্তব্যনির্ণয় চলিবে কেন? মহেশ চৌধুরীর ক্লেশ বোধ হয়। দেবতাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছে কিন্তু দেবতার সঙ্গে নিজের সংযোগটা কেমন, সে সম্বন্ধে নিজের পরিষ্কার ধারণা নাই, এ কেমন আত্মসমর্পণ? চোখ কান বুজিয়া বিচার বিবেচনা না করিয়া নিজেকে দিলেই কি আত্মসমর্পণ হয়? কোন প্রত্যাশা না থাকিলেই? তবে সদানন্দের সম্বন্ধে কর্ত্তব্যনির্ণয় করিতে তার এত কষ্ট হয় কেন, কর্ত্তব্যনির্ণয় করিয়াও এক মুহূর্ত্তের জন্তও কেন নিঃসন্দেহ হইতে পারে না যে যা ঠিক করিয়াছে তাই ঠিক? তার সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে তার স্ত্রীর কেন একবারও দ্বিধা করিতে হয় না, ভুল করিবার ভয়ে ব্যাকুল হইতে হয় না? মহেশ চৌধুরী কি তবে স্ত্রীলোকেরও অধম? অথবা—?

একটা প্রশ্ন যেন মনের তলায় কোনখানে উঁকি দিতে থাকে, মহেশ চৌধুরী ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। কেমন একটা রহস্যময় দুর্ব্বোধ্য অনুভূতি হইতে থাকে। আসল কথা, বিভূতির মার শেষ কথাগুলিতে সে একেবারে চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিল, সকল বিষয়ের মূল্যনির্ণয়ের অভ্যস্ত মানসিক প্রক্রিয়াটা একেবারে গোড়া ধরিয়া নাড়া খাইয়াছিল। সমস্ত চিন্তার মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল মনে হইতেছিল, একথাটা তো মিথ্যা নয়, ওর সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক, এ জগতে আর কারও সঙ্গে তো তা নেই, কোনরকম মারপ্যাঁচ ওর সঙ্গে আমার তো চলতেই পারে না! কি আশ্চর্য্য!

তারপর মাধবীলতা এক সময়ে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'চলুন আপনারা সাধুজীর চরণ দর্শন করবেন।'

মহেশ যেন বিশেষ অবাকও হইল না, কৃতার্থও বোধ করিল না। সহজভাবে কেবল বলিল, 'অনুমতি দিয়াছেন?'

একথার জবাবে মাধবী বলিল, 'প্রণাম করেই চলে আসবেন কিন্তু, কথাবার্ত্তা বলে জ্বালাতন করবেন না।'

'আমরা দুজনেই যাব তো?'

'হ্যাঁ, আসুন।'

কিন্তু বিভূতির মা স্বামীকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছে, সদানন্দের চরণ দর্শন করিতে আসে নাই, সে উঠিল না। বলিল, 'আমি এখান থেকেই মনে মনে প্রণাম জানাচ্ছি, তুমি যাও, প্রণাম করে এসো।'

একা যাইতে মহেশের ভাল মন সরিতেছিল না; একসঙ্গে এত দুর্ভোগ সহ্য করিবার পর সাফল্যটা ভোগ করিবে একা? একটু অনুরোধ করিল, বুঝাইয়া বলিবার চেষ্টা করিল যে, এমন একটা অনুগ্রহ পাইয়া কি হেলায় হারাইতে আছে? কিন্তু বিভূতির মা কিছুই বুঝিল না। তখন মাধবীলতার সঙ্গে মহেশকে একাই ভিতরে যাইতে হইল। কাপড়ে কাদা লাগিয়াছিল, এখন শুকাইয়া পাঁপড়ের মত শক্ত হইয়া উঠিয়াছে। মহেশ একবার ভাবিল কাপড়টা বদলাইয়া সদানন্দের সামনে যায়, তারপর আবার ভাবিল, থাক, হাঙ্গামায় কাজ নাই। সদানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থাটা বিপিনের বদলে

মাধবীলতার মধ্যস্থতায় হইতেছে কেন, একথাও মহেশের মনে হইতেছিল। ভাবিল, তার কাছে নিজে নত হইতে বিপিনের হয়ত লজ্জা করিতেছিল, তাই মেয়েটাকে দূতী করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছে।

কিন্তু সদানন্দের অভ্যর্থনা এ ধারণা তার মন হইতে বলপূর্ব্বক দূর করিয়া দিল। রাগে আগুন হইয়া সদানন্দ বলিল, 'এর মানে? আমি না বারণ করে দিয়েছি, সাত দিন কেউ আমার দর্শন পাবে না?'

সদানন্দ নদীর দিকে জানালার কাছে পাতা চৌকীতে বসিয়া ছিল, সেইখান হইতে ক্রুদ্ধ চোখে চাহিয়া রহিল। মহেশ তখন ঘরের চৌকাট পার হইয়াছে, সেইখানে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

মাধবীলতা তাড়াতাড়ি চৌকীর কাছে আগাইয়া গেল। নীচু গলায় ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, 'আপনার পায়ে ধরছি, রাগ করবেন না। অনেক ব্যাপার হয়ে গেছে, আমি সমস্ত বলছি আপনাকে। আপনি শুধু এই ভদ্রলোককে একবার প্রণাম করে চলে যেতে দিন।' বলিয়া মুখ আরও তুলিয়া সদানন্দের চোখে চোখে চাহিয়া মিনতি করিয়া বলিল, 'দেবেন না?'

সদানন্দ বলিল, 'আচ্ছা।'

'আসুন, প্রণাম করে যান।'

মহেশ নড়ে না দেখিয়া সদানন্দও ডাকিয়া বলিল, 'এসো মহেশ।'

মহেশ অবাধ্য শিশুর মত মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না প্রভু, আপনি আমায় ডাকেন নি, এই মেয়েটি আমায় ফাঁকি দিয়ে এনেছে। না জেনে আপনার কাছে আমি একি অপরাধ করলাম প্রভু! আপনি ডাকেন নি জানলে তো আমি আসতাম না।'

সদানন্দ শান্তভাবে বলিল, 'তাই নাকি? তা, এখন কি করবে?'

'আমি ফিরে যাচ্ছি প্রভু। আপনি নিজে ডাকলে এসে প্রণাম করে যাব।'

মাধবীর মুখখানা পাংশু হইয়া গিয়াছিল, সে ভীতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'আবার গাছতলায় গিয়ে ধন্না দেবেন? মরে যাবেন যে আপনারা দু'জনেই?'

মুখের চেয়ে মাধবীর চোখের পরিবর্তন ঘটিতেছিল বিচিত্রতর, এবার চোখ ছাপাইয়া জল ঝরিয়া পড়িল। কত ভাবিয়া কত হিসাব করিয়া নিজের দায়িত্বে এত বড় একটা কাজ করিতে গিয়া বুকটা ভয়ে ও উত্তেজনায় ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছিল, সদানন্দ দেবতা না দানব মাধবীর জানা নাই কিন্তু এমন ভয় সে করে সদানন্দকে যে, কাছে আসিলেই তার দেহমন কেমন একসঙ্গে আড়ষ্ট হইয়া যায়, সদানন্দ তাকে বুকে তুলিয়া লইলেও যে জন্য সে নূতন কিছুই আর অনুভব করিতে পারে না, অনায়াসে সদানন্দের মুখের দিকে প্যাট প্যাট করিয়া চাহিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু সে তো গা এলাইয়া দেওয়ার কথা, কোন হাঙ্গামাই তাতে নাই। এতকাল নিজের ও সদানন্দের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যা কিছু ঘটিয়াছে, তাতে তার নিজের কিছুই করিবার বা বলিবার থাকে নাই, সদানন্দই সমস্ত করিয়াছে ও বলিয়াছে। আজ প্রথম নিজেকে মানুষটার নিষেধ অমান্য করিতে সক্রিয় করিয়া তুলিয়া ভিতরটা তার আবেগে ফাটিয়া পড়িতেছিল। তাই, তার পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করিয়া মহেশ আবার গাছতলায় ধন্না দিতে যাইবে, এই আশাভঙ্গের সুযোগ অবলম্বন করিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। তার উদ্দেশ্যটা যথারীতি সফল হইলে, সদানন্দকে প্রণাম করিয়া মহেশ বাড়ী ফিরিয়া গেলে, অন্য কোন উপলক্ষ্যে সে অবশ্য কাঁদিত। উপলক্ষ্য না পাইলে বিনা উপলক্ষ্যেই কাঁদিত।

সদানন্দ অপলক চোখে মাধবীলতার চোখে জল ভরিয়া উপচিয়া পড়ার প্রক্রিয়াটা দেখিতেছিল। এ দৃশ্য সে আগেও দেখিয়াছে, মাধবীর চোখ তখন তার চোখের আরও কাছে ছিল। তবু এমন স্পষ্টভাবে আর কোনদিন কি মাধবীর চোখের কান্না দেখিয়াছে ইতিপূর্ব্বে?

একটু ভাবিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে সদানন্দ বলিল, 'মহেশ, আমি তোমায় পরীক্ষা করছিলাম।'

'পরীক্ষা প্রভু?'

'হাঁ। পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হয়েছ। আমি সব জানি মহেশ, তুমি আসবার একমুহূর্ত্ত আগে আমি আসন ছেড়ে উঠেছি। দরজা বন্ধ ছিল, তুমি আসবে বলে দরজা খুলে রেখেছি! তোমায় দেখে রাগের ভাণ করছিলাম, আমায় না জানিয়ে কেউ কি আমার কাছে আসতে পারে মহেশ? এখন বাড়ী যাও, ক'দিন বিশ্রাম করে আমার সঙ্গে এসে দেখা কোরো। দেখি, তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করতে পারি কি না।'

শুনিতে শুনিতে টলিতে টলিতে মহেশ চৌধুরী কোনরকমে খাড়া ছিল, সদানন্দের কথা শেষ হইলে প্রণাম করিবার জন্য আগাইতে গিয়া দড়াম করিয়া পড়িয়া গেল।

সুতরাং বিভূতির মাকেও শেষ পর্য্যন্ত ভিতরে আসিয়া সদানন্দের চরণ দর্শন করিতে হইল। শশধরও আসিল। বিপিন আসিয়া চুপ করিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল, একবার শুধু সে চোখ তুলিয়া চাহিল সদানন্দের দিকে, তারপর আর মনে হইল না যে আশেপাশে কি ঘটিতেছে, এ বিষয়ে তার চেতনা আছে।

আধঘণ্টা পরে মহেশ চৌধুরীকে একটু সুস্থ করিয়া এবং একটু গরম দুধ খাওয়াইয়া শশধর ধরিয়া বাহিরে লইয়া গেল। বাহিরে দেখা গেল বিরাট কাণ্ড হইয়া আছে—শ'দুই নরনারী সেই কদম গাছটার তলে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া। শ্রীধরকেও তাহাদের মধ্যে দেখা গেল।

মহেশকে দেখিয়া জনতা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল —মহেশ চৌধুরীকি জয়!

জনতার মধ্যে একজনও অবাঙ্গালী আছে কিনা সন্দেহ, মহেশ চৌধুরীও যে খাঁটি বাঙ্গালী সন্তান তাও কারও অজানা নাই, তবু জয়ধ্বনিতে মহেশ চৌধুরীর নামের সঙ্গে কোথা হইতে যে একটি 'কি' যুক্ত হইয়া গেল!

তারপর কয়েকজন যুবক মহেশ চৌধুরীকে কাঁধে চাপাইয়া গ্রামের দিকে রওনা হইয়া গেল। কাঁধে চাপাইল একরকম জোর করিয়াই, মহেশ চৌধুরীর বারণও শুনিল না, বিভূতির মার ব্যাকুল মিনতিও কাণে তুলিল না।

যতক্ষণ দেখা গেল, আশ্রমের সকলেই একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, তারপর ছোট ছোট দলে আরম্ভ হইল আলোচনা। বিপিনও সদানন্দের কুটীরের সামনে দাঁড়াইয়া আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করিয়াছিল, শোভাযাত্রা গাছের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেলে কাহারও সঙ্গে একটি কথা না বলিয়া সে সটান গিয়া নিজের বিছানায় শুইয়া পড়িল! সে যেন হার মানিয়াছে, হাল ছাড়িয়া দিয়াছে, অথবা দাঁতের ব্যথায় আবার কাতর হইয়া পড়িয়াছে।

মাধবীলতা সদানন্দের ঘরে ফিরিয়া গেল। তাহার ব্যাখ্যা ও কৈফিয়ৎ বাকী আছে।

সদানন্দ সাগ্রহ অভ্যর্থনা করিল, 'এসো মাধবী।'

কোথায় আসিবে মাধবী? কাছে? পাঁচ সাত হাত তফাৎ হইতে এমনভাবে ডাকিলে তাই অর্থ হয়। মহেশ চৌধুরী খানিক আগে টলিতে টলিতে সদানন্দের দিকে আগাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, মাধবীলতা কাঁপিতে কাঁপিতে পায়ে পায়ে আগাইতে লাগিল, মহেশ চৌধুরীর মত দড়াম করিয়া পড়িয়াও গেল না। কিন্তু কাছে যাওয়ারও তো একটা সীমা আছে? তাই হাতখানেক ব্যবধান থাকিতে মাধবীলতা থামিয়া পড়িল।

সদানন্দ হাত ধরিয়া তাকে পাশে বসাইয়া দিল। চিবুক ধরিয়া মুখখানা উঁচু করিয়া বলিল, 'মাধবী, তুমি তো কম দুষ্টু মেয়ে নও!'

'ওঁর স্ত্রী যে মরে যাচ্ছিলেন।'

'তাহলে অবশ্য তুমি লক্ষ্মী মেয়ে।' সদানন্দ একমুখ হাসিল।

মাধবীলতা থামিয়া থামিয়া সংক্ষেপে সমস্ত ব্যাপারটা সদানন্দকে জানাইয়া দিল, নিজের কাজের কৈফিয়তে বলিল যে, সদানন্দ পাছে রাজী না হয় এই ভয়ে একেবারে মহেশ চৌধুরীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছিল।

বলিয়া মাধবী হঠাৎ দাবী করিয়া বসিল সদানন্দের কৈফিয়ৎ, কাঁদ কাঁদ হইয়া বিনা ভূমিকায় সে প্রশ্ন করিয়া বসিল, 'কিন্তু আপনি ও কথা বললেন কেন মহেশ বাবুকে?'

'আমি তো জানতাম না মাধবী এত কাণ্ড হয়ে গেছে। তুমি ডেকে এনেছ জানলে কি আর আমি রেগে উঠতাম?'

'না, তা নয়। আপনি মিছে কথা বললেন কেন? কেন বললেন আপনি সব জানতেন, ওকে পরীক্ষা করছেন?'

সদানন্দ বিব্রত হইয়া বলিলেন, 'ওটা কি জান মাধবী—'

কিন্তু মাধবী কি ওসব কথা কানে তোলে? আকুল হইয়া সে কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল আর বলিতে লাগিল, 'কেন আপনি মিছে কথা বললেন! কেন বললেন!'

ছয়

আকাশের মেঘ কাটিয়া গিয়া রোদ উঠিল, বিপিনের দাঁতের ব্যথা কমিয়া গেল, কিন্তু তার মুখের ব্যথিত ভাবটা যেন ক্ষুব্ধ বিষাদের মেকী ইস্পাতে গড়া মুখোসের মত হইয়া রহিল কায়েমী। রাগ হইলে বীররসের মধ্যে সেটা প্রকাশ করা বিপিনের অভ্যাস নয়। সদানন্দের মত যারা তার খুব বেশী অন্তরঙ্গ, তাদের কাছে কদাচিৎ তাকে রাগ করিতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু সেও যেন কেমন এক খাপছাড়া ধরণের রাগ। রাগ বলিয়াই মনে হয় না। মনে হয়, ঠোঁট বাঁকাইয়া, মুখের চামড়া

এখানে ওখানে কুঞ্চিত করিয়া, বাঁকা চোখে চাহিবার একটা আশ্চর্য্য কৌশল সে কোন এক সময় আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিল, আয়ত্ত রাখার জন্য রাগ করার সুযোগে প্র্যাক্‌টিস্ করিতেছে। এবার বিপিনের মুখ দেখিয়া সদানন্দও বুঝিতে পারিল সে রাগ করিয়াছে, কিন্তু আগেকার রাগ করার ভঙ্গির সঙ্গে একেবারে মিল না থাকায় ভাবনায় পড়িয়া গেল।

'তোর কি হয়েছে রে বিপিন?'

'কিস্‌সু না। হবে আবার কি?'

বিপিনের কি হইয়াছে বোঝা গেল না, কিন্তু জবাবটা বোঝা গেল। বিপিন নিজেই জানে না তার কি হইয়াছে। এ রকম ব্যাপার সকলের জীবনে সর্ব্বদাই ঘটিতেছে, নিজের কিছু একটা হয় কিন্তু নিজের কাছে সেটা দুর্ব্বোধ্য থাকে, এমন কিছু গুরুতর ঘটনা এটা নয়, সদানন্দ তা জানে। তবে নিজের কি হইয়াছে বুঝিবার চেষ্টাটা প্রচণ্ড অধ্যবসায়ে দাঁড়াইয়া গেলে তখন বিপদ, অধ্যবসায়টাই সাংঘাতিক গুরুত্ব পাইয়া বসে। এবং মাঝে মাঝে কম বেশী সময়ের জন্য এ রকম অধ্যবসায় মানুষের আসে বৈকি। বিপিনের কি তাই হইয়াছে?

'কি ভাবছিস ভাই?'

ভাই? সদানন্দের সম্বোধনে বিপিনের তো রীতিমত চমক লাগেই, মনেও হয় যে সে বুঝি তাকে গাল দিয়া বসিয়াছে। এমন সম্পর্ক তো তাদের নয় যে এমন গভীর স্নেহার্দ্র সুরে ভাই বলিতে হইবে, এতখানি আবেগময় আন্তরিকতার সঙ্গে? পরস্পরকে জানিয়া বুঝিয়া তাদের বন্ধুত্ব, পরস্পরের কাছে উলঙ্গ হইয়া দাঁড়াইতে যেমন তাদের লজ্জা করে না, মনের দুর্ব্বলতা আর বিকৃতি মেলিয়া ধরিতেও তেমনি ভয় বা সঙ্কোচ হয় না, অন্ততঃ কিছুকাল আগে তাই ছিল। এভাবে দরদ দেখানো তাদের মধ্যে চলিবে কেন? কি হইয়াছে সদানন্দের আজ, সাতদিন ঘরের কোণে কাটাইবার পর? বিপিন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়, সে দৃষ্টির বিশ্লেষণ-পটুতা অসাধারণ। বিপিন উসখুস করে, সেটা তার শারীরিক অস্বস্তিবোধের চরম প্রমাণ।

তখন দুপুর বেলা, ঘণ্টা দুই আগে দুজনেরই মধ্যাহ্নভোজন হইয়াছে। অনেক ভাবিয়া, অনেক দ্বিধা করিয়া, মনকে শান্ত করিবার জন্য সাতদিন ঘরের কোণে নিজেকে বন্দী করিয়া রাখিয়া মনকে আরও বেশী অশান্ত করিয়া, অতিরিক্ত জ্বালাবোধের জন্যই মাধবীলতা সম্পর্কে অত্যাশ্চর্য্য আত্মসংযমের মধ্যে নিজেকে সত্য সত্যই মহাপুরুষ করিয়া ফেলিবার চরম সিদ্ধান্ত সদানন্দ গ্রহণ করিয়াছিল। আজ সকালে তাই হঠাৎ মাধবীলতাকে আজই রাত্রে ঘরে আনিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া বসিয়াছে। কে জানিত মাধবীলতাকে এমনভাবে সে নিমন্ত্রণ করিয়া বসিবে? সকালে নদীর ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে চোখে পড়িল স্নানরতা রত্নাবলী আর উমাকে, তাই মাধবীলতাকে খুঁজিতে সে জোরে জোরে হাঁটিতে আরম্ভ করিল আশ্রমের দিকে। মাধবীলতাকে দেখা গেল এক আমগাছের তলে। আশ্রমে যে গোয়ালা দুধ যোগায়, তার বৌ-এর সঙ্গে গল্প করিতেছে। গোয়ালা বৌ-এর কাঁখের শিশুটি প্রাণপণে স্তন চুষিতেছিল, দুধের কারবার করে বটে গোয়ালা-বৌ, নিজের বুকে যে তার সন্তানের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে দুধ জন্মে না, দেখিলেই সেটা বোঝা যায়।

সদানন্দকে দেখিয়া গোয়ালা-বৌ সরিয়া গিয়াছিল।

'রাত্রে একবার আমার ঘরে আসবে, মাধু?'

আদেশ নয়, অনুরোধ। মাধবীলতা নয়, মাধবী নয়, মাধু। পরে দুপুর বেলা বিপিনকে ভাই বলার ভূমিকার মত।

'রাত্রে? কখন?'

'যখন তোমার সুবিধা হয়।'

'সন্দেবেলা?'

'না, একটু রাত করে এসো। এই এগারটা সাড়ে এগারোটার সময়।' অনুরোধ নয়, আদেশ। এতক্ষণে মাধবীলতা বুঝিতে পারিয়াছিল, আহ্বানটা খাঁটি অভিসারের, ধর্ষণের ফলে প্রেমের জন্ম হওয়ায় এতদিন যে পূর্ব্বরাগের পালা চলিতেছিল, আজ তার সমাধি।

'আজ নয়, পর্শু যাব।' একটা হাত বাড়াইয়া মাধবী আমগাছের গুঁড়িতে স্থাপন করিয়াছিল, যেখানে ছিল পিঁপড়াদের সারি বাঁধিয়া যাতায়াতের পথ।

'না, আজ।'

আদেশ নয়, প্রায় ধমক।

'আজ নয়, পর্শু।'

মিনতি নয়, মৃদু কোমল নিরুপায় বিদ্রোহ।

সদানন্দ তখন অন্ধ আর বোকা হইয়া গিয়াছে কিনা, তাই ভাবিয়া চিন্তিয়া পাঁচ বছরের প্রিয়াকে লজেঞ্জসের লোভ দেখানোর মত কোমল কণ্ঠে বলিয়াছিল, 'তুমি কিছু বোঝ না মাধু। আজ

ত্রয়োদশী, মেঘ টেঘ না করলে চমৎকার জ্যোৎস্না উঠবে, জ্যোৎস্নায় বসে তোমার সঙ্গে গল্প করব। এসো কিন্তু।'

পরশু কি জ্যোৎস্না উঠিবে না? পরশু কি জ্যোৎস্নায় বসিয়া গল্প করা চলিবে না? কিন্তু প্রতিবাদের যতটুকু শক্তি মাধবীর ছিল, এতক্ষণে প্রায় সবটুকুই শেষ হইয়া গিয়াছে। এবার যদি সদানন্দ রাগিয়া যায়? দুঃশাসন জানিয়াও যা বোঝে নাই, সদানন্দ কি না জ'নিয়া তা বুঝিবে? তবু মাধবী অন্যভাবে চেষ্টা করিয়াছিল।

'উমাশশী, কুন্দ' ওরা টের পাবে যে? একটা কেলেঙ্কারী হবে।'

'আমি সে ব্যবস্থা করব।'

সদানন্দ নিজেই যখন ব্যবস্থা করিবে তখন আর কার কি বলিবার থাকিতে পারে? একটিবার পশ্চিমে উঠিবার সাধ যদি সূর্য্যের থাকে, একমাত্র সদানন্দের হুকুকের সুযোগেই সাধটা মিটাইবার সম্ভাবনা কি তার সব চেয়ে বেশী নয়?

এইজন্য সদানন্দ আজ পেট ভরিয়া খাইতে পারে নাই। আহারে রুচি ছিল না। এখন সদানন্দের তাই ক্ষুধা পাইয়াছে। এদিকে দাঁতের ব্যথা না থাকায় কদিন প্রায় উপবাস করিয়া থাকিবার শোধ তুলিবার জন্যই বোধহয় বিপিন এত বেশী খাইয়াছিল যে, এখন অম্বলে বুক জ্বলিতেছে। নিজেকে বিপিনের বড়ই ভোঁতা মনে হইতেছিল। সদানন্দের আদরের জবাবে সে তাই বলিল, 'ভাবছি তোর মাথা।'

তারপর ঘরে আসিল মাধবী। ঘরে ঢুকিয়াই বিপিনকে সদানন্দের সঙ্গে দেখিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

সদানন্দ বলিল, 'কি মাধবী?'

'কিছু না, এমনি এসেছিলাম।' বলিয়া বোকার মত একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া মাধবী প্রায় চলিয়া যায়, সদানন্দ তাড়াতাড়ি উঠিয়া তার কাছে গেল। —'শোন মাধু, শোন।'

কাছে গিয়া গলা নামাইয়া বলিল, 'কিছু বলবে? চল, বাইরে যাই।'

দুজনে ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল, বিপিন ঘাড় বাঁকাইয়া বাঁকা চোখে চাহিয়া রহিল খোলা দরজার দিকে।

মাধবীলতা বাহিরে আসিয়া মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, কথা বলে না। সদানন্দ চিবুক ধরিয়া তার মুখখানা উঁচু করিয়া ধরে। এটা সদানন্দের যেন অভ্যাসে দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

'কি বলবে বল?'

কি আর বলিবে মাধবী, সেই পুরাতন কথা। আবার খানিকটা সাহস সঞ্চয় করিয়া আজ রাত্রির অভিসার পিছাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিতে আসিয়াছে।

সদানন্দ জোর করিয়া মাধবীর মুখ উঁচু করিয়া রাখিয়াছিল, হঠাৎ হাত সরাইয়া নেওয়ায় মাধবীর চিবুক প্রায় কণ্ঠার সঙ্গে ঠুকিয়া গেল। কিন্তু সদানন্দের মন সত্যই একটা চিন্তার সঙ্গে ঠোক্কর খাইয়াছে। কেন যে হঠাৎ সদানন্দের মনে হইল বড় পাকা মেয়ে মাধবীলতা, বড় ঝানু, প্রায় বাজারের বেশ্যার মত। দেহটা যে বেশী-পাকা আমের মত কোমল আর রঙীন মাধবীর, আদর করিয়া তাহার দেহে হাত বুলানোর সময় আঙুল-গুলির যে পাখীর পালকের মত কোমল হইয়া যাওয়া খুবই উচিত, সদানন্দ তা জানে। কিন্তু মাধবীর ভিতরটা শুধু শক্ত নয়, পাথর। বোঁটা-ছেঁড়া ফলের মত বছরের পর বছর ধরিয়া শুকাইয়া কুঁকড়াইয়া যাইতে পারিলে যেমন হইতে পারে, সেইরকম শক্ত, এই ধরণের একটা চিন্ত. মনে আসায় সদানন্দের কাছে মাধবীর দেহটা পর্য্যন্ত রঙচটা কাঠের খেলনার মত কুৎসিৎ হইয়া গেল।

কিন্তু—

কথাটা মনে হইল মাধবীকে বিদায় দিয়া ঘরের মধ্যে বিপিনের কাছে চৌকীতে গিয়া বসিবার পর। আশ্রমে যে আসিয়াছিল কুমারী মাধবী? তাই তো?

ঠিক এই সময় সদানন্দ আর বিপিনের মধ্যে একটু কলহ হইয়া গেল। কত কলহ-বিবাদই আজ পর্য্যন্ত দুজনের মধ্যে হইয়াছে, কি তীব্র ঝাঁঝ সে সব ঝগড়ার, মনে হইয়াছে জীবনে বুঝি আর দুজনের মধ্যে মিল হইবে না, কেহ কাহারও মুখ পর্য্যন্ত দর্শন করিবে না। কিন্তু কখন আবার বিনা ভূমিকায় দুজনে স্বাভাবিকভাবে কথাবার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, নিজেদেরই তাদের খেয়াল থাকে নাই। আজিকার কলহটা একেবারেই সে রকম হইল না। দুজন পুরুষের মধ্যে, বিশেষতঃ বিপিন আর সদানন্দের মত দুজন পুরুষ বন্ধুর মধ্যে এত মৃদু, এতখানি ভদ্রতাসম্মত কলহ হইতে পারে, এতদিন কে তা ভাবিতে পারিত!

বিপিন বলিল, 'ওটাকে নিয়ে বড় বাড়াবাড়ি করছিস সদা।'

সদানন্দ বলিল, 'তুই তো সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি দেখিস।'

বিপিন বলিল, 'ওকে আশ্রমে এনেছি আমি।'

সদানন্দ বলিল, 'তাই বলে ওর ওপরে তোর অধিকার জন্মেছে নাকি?'

বিপিন বলিল, 'অধিকারের কথা নয়। ওর ভালমন্দের একটা দায়িত্ব তো আমার আছে?'

সদানন্দ বলিল, 'অ! ভালমন্দের দায়িত্ব!'

তারপর বিপিন চলিয়া গেল নিজের ঘরে, সদানন্দ বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিল নদী। এ কি কলহ? এ তো নিছক কথোপকথন, অলস মধ্যাহ্নের স্বাভাবিক আলাপ। কিন্তু নিজের নিজের ঘরে বসিয়া বিপিনের উপর সদানন্দের আর সদানন্দের উপর বিপিনের রাগে গা যেন জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। একজন আরেকজনের কত অন্যায়, কত অবিচার, কত স্বার্থপরতা আজ পর্য্যন্ত সহিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আর সত্যই সহ্য হয় না, একেবারে যেন পাইয়া বসিয়াছে।

সে দিন রাত্রে সত্যই জ্যোৎস্না উঠিল। আকাশে একেবারে যে মেঘ রহিল না তা নয়, বর্ষাকালের আকাশ তো। কিন্তু ছাড়া ছাড়া মেঘ আকাশে ভাসিয়া বেড়াইলেই তো জ্যোৎস্নার শোভা বাড়ে, অনেক দিনের বিশ্বাস এটা। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বিপিন বাহির হইয়া পড়িল, ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল আশ্রমের এক কুটীর হইতে অন্য কুটীরে। যে কোন সময় আশ্রম পরিদর্শনের অধিকার বিপিনের আছে। রাত্রির অসংখ্য বিচিত্র শব্দ আছে, কত তুচ্ছ অদৃশ্য প্রাণী শুধু শব্দের মধ্যে প্রাণের পরিচয় ঘোষণা করিয়া চলে, তবু দিনের চেয়ে রাত্রিতে স্তব্ধতা গভীরতর। দিবারাত্রি আশ্রমকে ঘিরিয়া যে নিবিড় শান্তি বিরাজ করে, বাহিরের তপ্ত মানুষকে যা জুড়াইয়া দেয় চোখের নিমেষে, রাত্রে যেন সেই শান্তির ভাব আরও বেশী অপার্থিব হইয়া ওঠে। চোখ জুড়াইয়া যায় বিপিনের চারিদিকে চোখ বুলাইয়া, মন ভরিয়া যায় মন-জুড়ানো আনন্দে, কোন কোন রাত্রে নিজেকে ভুলিয়া কয়েক মুহূর্তের জন্য স্বপ্ন পর্য্যন্ত যেন সে দেখিতে আরম্ভ করিয়া দেয়—অবাস্তব, অর্থহীন, কোমল মধুর স্বপ্ন; আদর্শের যে অবাধ্য, অপরিত্যাজ্য লেজুড়কে বিপিন ঘৃণাই করে চিরদিন।

আজ স্বপ্ন দেখা দূরে থাক, একটু গর্ব্ব পর্য্যন্ত অনুভব করিল না। নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়া আশ্রমের ছড়ানো কুটীর আর রহস্যময় ছায়ালোকবাসী নির্ব্বাক নিশ্চল দৈত্যের মত ছোট বড় গাছগুলি দেখিয়া গভীর ক্ষোভের সঙ্গে তার শুধু মনে হইল, কি অকৃতজ্ঞ সদানন্দ, কি স্বার্থপর সদানন্দ, কি বিশ্বাসঘাতক সদানন্দ! নিজে রাজ্য সৃষ্টি করিয়া নিজেকে বিসর্জ্জন দিয়া সদানন্দকে রাজা করিয়াছে যে, আজ সদানন্দ তাকেই হীন মতলববাজ মানুষ মনে করিয়া তুচ্ছ করে। অন্যমনে বিপিন এক কুটীরের অধিবাসীদের সঙ্গে দুটি একটি কথা বলিয়া অন্য কুটীরে চলিয়া যায়। কেহ শয়ন করিয়াছে, কেহ শয়নের আয়োজন করিতেছে, কেহ আসনে বসিয়া চিন্তাসাধনায় মগ্ন হইয়া গিয়াছে, কেহ বারান্দায় বসিয়া করিতেছে মেঘের গতিতে চাঁদের গতি সৃষ্টির ভ্রান্তিকে উপভোগ।

উমা আর রত্নাবলীর কুটীরের সামনে আসিয়া বিপিনের অন্যমনস্কতা ঘুচিয়া গেল। বারান্দার নীচে দাঁড়াইয়া আছে শশধর, বারান্দার থাম ধরিয়া দাঁড়াইয়া তার সঙ্গে কথা বলিতেছে রত্নাবলী।

চিনিতে পারিয়াও বিপিন জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কে?'

শশধর উৎসাহের সঙ্গে বলিল, 'আমায় চিনলেন না? সেই যে সেদিন—'

রত্নাবলী সোজাসুজি বলিল, 'উনি মহেশবাবুর ভাগ্নে।'

বিপিন বলিল, 'এত রাত্রে আপনি এখানে কি করছেন?'

বিপিনের গলার সুরে শশধরের উৎসাহ নিভিয়া গিয়াছিল, সে আমতা আমতা করিয়া বলিল, 'মহেশবাবু বললেন কিনা—'

তার হইয়া রত্নাবলী কথাটা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া বলিল, 'মহেশবাবুর খুব অসুখ, একশ চারে জ্বর উঠেছে; মাধবীকে একবার দেখবার জন্য বড় ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। শশধরবাবু তাই বলতে এসেছেন, মাধবী যদি একবার যায়—'

'এত রাত্রে? দিনের বেলা বলতে এলেই হত।'

বিপিনের আবির্ভাবেই রত্নাবলী যেন বিরক্ত হইয়াছিল, জেরা আরম্ভ করায় সে যেন রাগিয়া গেল। 'আপনি বুঝছেন না। দিনের বেলা অতটা ব্যাকুল হন নি! এখন এতবেশী ছটফট করছেন যে, শশধরবাবু ভাবলেন, মাধবীকে যেতে বলে গেছেন, এ খবরটা জানালে হয়ত একটু শান্ত হবেন। তাই এখন বলতে এসেছেন। নইলে এতরাত্রে ওঁর আশ্রমে আসবার দরকার!'

এত কথা এক সঙ্গে রত্নাবলী কোনদিন বলে না। চাঁদের আলোতেও বোঝা যায়, রত্নাবলীর দাঁতগুলি কি ধবধবে। ব্যাপারটা বিপিনের একটু জটিল মনে হইতে লাগিল। মহেশ চৌধুরীর খুব অসুখ হইয়াছে, মাধবীকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, শুধু এই ব্যাপারটুকুই কম জটিল নয়। জগতে এত লোক থাকিতে মাধবীলতাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুলতা কেন? কতটুকুই বা তার পরিচয় মাধবীর সঙ্গে। মাধবীলতাকে কথাটা জানাইতে এত রাত্রে আশ্রমে আসিয়া রত্নাবলীর সঙ্গে শশধরের গল্প জুড়িয়া দেওয়াটাও জটিল ব্যাপার বৈকি। উমা আর মাধবীলতার অনুপস্থিতির ব্যাপারটা আরও বেশী জটিল।

জিজ্ঞাসা করায় রত্নাবলী বলিল, 'ওরা খাচ্ছে।'

'এখনও খাওয়া হয় নি কেন?'

রত্নাবলী মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়া ঝাঁঝালো গলায় বলিল, 'কারণ আছে, ওসব মেয়েদের ব্যাপার আপনি বুঝবেন না। পারি না বাপু আর আপনার কথার জবাব দিতে।'

মনে মনেও কোন রকমেই বিপিন রাগ করিতে পারিতেছিল না, আশ্রমের নিয়ম ভঙ্গ করা, তার উপর এমন কড়া কথা বলা, কিছুই যেন তার কাছে গুরুতর মনে হইতেছিল না। আশ্রমের নিয়মেই যেন এসব ঘটিতেছে, আগাগোড়া যেন তার নিজেরও সমর্থন আছে। একটু ভাবিল বিপিন, তারপর কোন রকমে গলা গম্ভীর করিয়া বলিল, 'আপনি ভেতরে যান, রাত্রে কেউ কোন দরকারে আশ্রমে এলে এবার থেকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। আর আপনি বাড়ী ফিরে যান শশধরবাবু, মহেশ-বাবুকে বলুন গিয়ে মাধবীকে সঙ্গে করে নিয়ে আমি যাচ্ছি।'

'আজ রাত্রেই যাবেন?'

'অসুখ বিসুখের সময় কি দিন রাত্রির বিচার করলে চলে? সময় বুঝে মানুষের অসুখ হয় না। বুড়ো মানুষ, এমন অসুখে পড়েছেন, তাঁর সামান্য একটা ইচ্ছা যদি আমরা না পূর্ণ করতে পারি, আমাদের আশ্রমে থাকা কেন? নিজেরা সুখে থাকার জন্য আমরা আশ্রম-বাস করি না শশধরবাবু।'

শশধর অভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। বিপিন তাগিদ দিয়া বলে, 'দাঁড়িয়ে থাকবেন না, আপনি যান। বলুন গিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমরা যাচ্ছি।'

শশধর চলিয়া গেলে রত্নাবলী জিজ্ঞাসা করিল, 'এত দূর রাস্তা যাবেন কি করে? হেঁটে?'

'সে ভাবনা তো আপনাকে ভাবতে বলিনি? আপনাকে যা বললাম তাই করুন, ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন।'

রত্নাবলী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, 'আমি সঙ্গে যাব না?'

বিপিন বলিল, 'না।'

এতরাত্রে বিপিন একা মাধবীলতাকে সঙ্গে করিয়া মহেশ চৌধুরীর বাড়ী যাইবে। মহেশ চৌধুরীর বাড়ী কাছে নয়, আশ্রম হইতে প্রায় চার মাইল পথ। বিপথে মাঠ-ঘাট বন-জঙ্গলের ভিতর দিয়া গেলে পথ কিছু সংক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু এখন বর্ষাকালে দিনের বেলাও সে পথে যাতায়াত করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। আশ্রম হইতে বাগবাদা যাইতে হইলে সাতুনার গা ঘেঁষিয়া যাইতে হইবে, সাতুনা বেশী দূরে নয়। সাতুনা পর্য্যন্ত যাওয়ার আগেই পথের ধারে ছাড়া ছাড়া ভাবে কয়েকজন গৃহস্থের খানকয়েক বাড়ী আর ক্ষেতখামার পাওয়া যায়, তাদের কারও কারও গরুর গাড়ী আছে। বিপিন কি লোক পাঠাইয়া গরুর গাড়ী আনাইয়া লইবে? অথবা মাধবীকে সঙ্গে করিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিয়া দিবে, পথে ওই ছোট পাড়াটিতে হোক, সাতুনায় হোক, কারও কাছে সংগ্রহ করিয়া লইবে গরুর গাড়ী? গরুর গাড়ী না পাওয়া গেলে হাঁটিয়াই হাজির হইবে বাগবাদায় মহেশ চৌধুরীর বাড়াতে? এই সব ভাবিতে ভাবিতে রত্নাবলীর সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দেয়,—আকাশ ও পৃথিবীব্যাপী ক্লান্তবর্ষার রাত্রি রত্নাবলীকে ঘিরিয়া আছে, নির্জ্জন পথ বাহিয়া দুজন হাঁটিয়া চলিয়াছে ঘুমন্ত গ্রামের গা ঘেঁষিয়া, পথের খানিক খানিক ভিজা চাঁদের আলোয় ঢাকা আর খানিক খানিক বড় বড় গাছের ছায়ায় প্রায় অন্ধকার, কোথাও ঝোপ-ঝাড় পথের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, কোথাও দুদিকেই জলভরা ক্ষেত: হাঁটিয়া চলিতে চলিতে দু'জন কখন উঠিয়া বসিয়াছে গরুর গাড়ীতে ছাউনির মধ্যে, গাড়ীর দোলনে এদিক ওদিক টলিতে কখন তারা জড়াইয়া ধরিয়াছে পরস্পরকে, কখন শশধরের দুটি হাত অন্ধের দু'টি হাতের মত রত্নাবলীর সর্ব্বাঙ্গে ব্যাকুল আগ্রহে খুঁজিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে রত্নাবলীর সর্ব্বাঙ্গের পরিচয়—একা বিপিনের সঙ্গে একাকিনী মাধবীর এত রাত্রে মহেশ চৌধুরীর বাড়ী

যাওয়ার নানারকম অসুবিধা ও অসঙ্গতির কথা ভাবিতে ভাবিতে রত্নাবলীর গায়ে সত্যই কাঁটা দিয়া ওঠে। বিপিনের কি মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে? কাল মাধবীকে নিয়া গেলে চলিবে না মহেশ চৌধুরীর বাড়ী?

'কি ভাবছেন? খাওয়া হয়ে থাকলে মাধবীকে পাঠিয়ে দিন বাইরে।'

'আমিও যাই না আপনাদের সঙ্গে?'

বিপিন মাথা নাড়িয়া জোর দিয়া বলিল, 'না না, আপনাকে যেতে হবে না।'

'আমি সঙ্গে না গেলে মাধু আপনার সঙ্গে যাবে না।'

'মাধু যাবে কি যাবে না, সেটা আপনার কাছে না শুনে মাধুর কাছেই না হয় শুনতাম?'

রত্নাবলী অধীর হইয়া বলিল, 'বুঝেও কি বুঝতে পারেন না আপনি? এত রাত্রে আপনার সঙ্গে মাধুকে আমি যেতে দেব না। যদি চেষ্টা করেন নিয়ে যাবার, হৈ-চৈ গণ্ডগোল বাধিয়ে দেব।'

বিপিনের যে প্রতিভা ক'দিন হইতে মায়া-নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া ছিল, রত্নাবলীর মুখে একথা শুনিবামাত্র সোণার কাঠির স্পর্শে ঘুম ভাঙ্গার মত চোখের পলকে জাগিয়া উঠিল। সত্যই চোখের পলকে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ পর্য্যন্ত পাওয়া গেল বিপিনের চোখেই। রত্নাবলী স্পষ্ট দেখিতে পাইল একবার কি দু'বার পলক পড়ার মধ্যে বিপিনের চোখ যেন জ্বল্ জ্বল্ করিয়া উঠিল অন্ধকারে হিংস্র পশুর চোখের মত, তারপর হইয়া গেল জ্ঞানের ছানি পড়া বৃদ্ধের চোখের মত স্তিমিত।

'আপনাকে নিলে আর গোলমাল করবেন না?'

'না। আমি সঙ্গে গেলে—'

'ডাকব নাকি সবাইকে?'

রত্নাবলী ভয় পাইয়া বলিল, 'সবাইকে ডাকবেন? সবাইকে ডাকবেন মানে? কেন ডাকবেন সবাইকে?'

বিপিন গম্ভীর মুখে বলিল, 'পালিয়ে যাওয়ার চেয়ে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে যাওয়া কি ভাল নয়? আপনি এত সঙ্কোচ বোধ করছেন কেন, 'আপনি প্রথম নন, আপনার মত দু'একজন এ ভাবে আশ্রম ছেড়ে গিয়েছে।'

'আশ্রম ছেড়ে যাব?' এতক্ষণ রত্নাবলী দাঁড়াইয়াছিল, এবার দাওয়ার উঠিবার ধাপটিতে বসিয়া পড়িল। বলিল, 'একটু বসি, পা ধরে গেছে। কি বলছেন আপনি বুঝতে পারছি না।'

কথাটা সত্য নয়। রত্নাবলী বেশ বুঝিতে পারিতেছিল সব। অনেকদিন আগে, দেড়বছর দু'বছরের কম হইবে না, সে তখন অল্পদিন হয় আশ্রমে বাস করিতে আসিয়াছে, বিপিন একদিন এমনিভাবে অসময়ে হঠাৎ সকলকে ডাকিয়াছিল। সীতা নামে একটি শিষ্যার আশ্রমে মন টিঁকিতেছে না, সে চলিয়া যাইবে, সকলের কাছে বিদায় চাহিতেছে। সে দৃশ্য রত্নাবলীর মনে গাঁথা হইয়া আছে। কুটিরের সামনে মাটিতে বসানো দু'টি লণ্ঠনের আলো সকলের মুখে পড়িয়াছে, কারও মুখে বেশী, কারও কম। সকলে নির্ব্বাক—পাথরের মূর্ত্তির মত নির্ব্বাক। এখনকার চেয়ে শিষ্য ও শিষ্যার সংখ্যা তখন কম ছিল আশ্রমে।

সীতা কাঁদিতেছিল। দাওয়ায় বসিয়া মুখ নীচু করিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতেছিল। কয়েকদিন আগে সীতার স্বামীকে বিপিন আশ্রমেরই কি একটা কাজে দূরদেশে পাঠাইয়াছে, তিন চার দিন পরে সে ফিরিয়া আসিবে। কল্যাণী নামে আশ্রমের একটি মেয়েকে বিপিন সেই ক'টা দিন সীতার সঙ্গে তার কুটিরে থাকিতে বলিয়া দিয়াছিল। বছর বার বয়স ছিল কল্যাণীর আর ছিল কাঠির মত সরু চেহারা। একটু তফাতে দাওয়ার একটা খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া সে ভয়ার্ত্ত চোখে চাহিয়া ছিল। সীতার মুখের চেয়ে কল্যাণীর সেই দৃষ্টিই রত্নাবলীর বেশী স্পষ্টভাবে মনে আছে।

সকলেই জানিত, একঘণ্টা আগে কল্যাণীর বাবাকে অবিলম্বে আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ার নোটিশ দেওয়া হইয়াছে এবং সে গরুর গাড়ী আনিতে গিয়াছে। কল্যাণীর বাবার মত রূপবান পুরুষ রত্নাবলী কখনো ত্যাখে নাই। শান্তির খোঁজে ভদ্রলোক সদানন্দের আশ্রমে আসিয়াছিল, কিন্তু একটু স্বাধীন প্রকৃতির মানুষ হওয়ায় বিপিনের সঙ্গে ক্রমাগত খিটিমিটি বাধিয়া অশান্তির সৃষ্টি হইতে-ছিল। মানুষটাকে সকলেই পছন্দ করিত, মেয়েকে সঙ্গে করিয়া আবার সংসারে ফিরিয়া যাইতেছে জানিয়া সকলের দুঃখও হইয়াছিল, কিন্তু ঘটনার সীতা-সংক্রান্ত আকস্মিক পরিণতিতে সকলে থতমত খাইয়া গিয়াছিল।

তারপর বিপিন সীতাকে বলিয়াছিল, 'আপনি তবে তৈরী হয়ে নিন।' তখন সীতা বলিয়াছিল, 'আমি যাব না।—উনি না ফিরে এলে এক পা নড়ব না আমি এখান থেকে।

বিপিন যেন স্তম্ভিত হইয়া বলিয়াছিল, 'সে কি।'

সীতা প্রায় আর্তনাদ করিয়া বলিয়াছিল, 'উনি নেই, এভাবে আপনারা আমায় তাড়িয়ে দিতে পারেন না।'

বিপিন গম্ভীর হইয়া বলিয়াছিল, 'আপনাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে কে?'

কল্যাণীর বাবা গরুর গাড়ী আনিয়া মেয়েকে সঙ্গে করিয়া বিদায় হইয়া গিয়াছিল, সীতা কয়েকটা দিন আশ্রমে ছিল। সীতার স্বামী কিন্তু আর আশ্রমে ফিরিয়া আসে নাই। বিপিন কি তাকে আশ্রমের কাজে বাহিরে পাঠাইয়াছিল? বাহিরে থাকিতে আশ্রমের কোন কথা কানে যাওয়ায় আর সে ফিরিয়া আসে নাই? অথবা নিজেই সে আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল? এই সব ছিল তখন সকলের জিজ্ঞাস্য। এখনও এসব জিজ্ঞাস্যই রহিয়া গিয়াছে। কয়েকদিন স্বামীর প্রতীক্ষা করিয়া সীতাও যেন আশ্রম হইতে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল।

বিপিন রত্নাবলীকে লক্ষ্য করিতেছিল। আশ্রমের নিয়মতো আছেই, তাছাড়া রত্নাবলী নিজেও অত্যন্ত সাবধান, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না, রত্নাবলীর দেহটাই বড় বেহায়া। দেখিতে দেখিতে বিপিনের মনে হয় কি, এর কাছে কোথায় লাগে মাধবীলতা, গদীর কাছে কাঁথার মত? তবু মাধবীলতার আকর্ষণ কত বেশী। রত্নাবলীকে এতকাল সে কি দেখিয়াও কোনদিন চাহিয়া দেখিয়াছে? কুটীরে হোক, নদীর ঘাটে হোক, রত্নাবলী দৃষ্টিপথে পড়িলে তাকে না দেখিয়া অবশ্য থাকা কঠিন, অন্ততঃ তাড়াতাড়ি সরিয়া যাওয়ার আগে,—মেয়েদের দিকে তাকানো উচিত নয়, মনের এই ছুতাতেও অন্ততঃ—একটিবার রত্নাবলীকে দেখিতেই হয়, কিন্তু সে দেখা ওই দেখা পর্য্যন্তই। রত্নাবলী যেন আকর্ষণ করে না, কেবল মনটা বিচলিত করিয়া দেয় কিছুক্ষণের জন্য। মাধবীলতা ও রত্নাবলীর তুলনামূলক সমালোচনাটা বিপিন আগেও যে কোনদিন করিতে পারিত, কিন্তু এই মুহূর্ত্তের আগে কথাটা যেন তার খেয়ালই হয় নাই। কথাটা মনে পড়িয়া সে একটু আশ্চর্য্য হইয়া যায়। সে জানে, এখন তাকে এই দাওয়ায় বসাইয়া কুটীরের সামনে খোলা যায়গায় জ্যোৎস্নালোকে মাধবী আর রত্নাবলী যদি পরস্পরের কিছু তফাতে দাঁড়ায়, যাতে এক একটি চোখের কোণে সে এক এক জনকে আশ্রমের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া জ্যোৎস্নার আবরণ অঙ্গে চাপানোর প্রক্রিয়ায় ব্যাপৃতা দেখিতে পায়, দুটি চোখই তার অপলক হইয়া থাকিবে রত্নাবলীর দিকে কিন্তু মন তার পড়িয়া থাকিবে মাধবীলতার কাছে। অভদ্র কল্পনাটি বিপিনের রোমাঞ্চকর মনে হয়। বিপিনের নিজেরই একটা ধারণা ছিল যে, মোটামুটি হিসাবে বছর ত্রিশেক বয়স হইবার পর মানুষের আর এ ধরণের কল্পনা ভাল লাগে না, ছেলেমানুষী মনে হয়, হাসি পায়—রাজা সাহেবের বাড়ীতে দেয়ালে টাঙানো কয়েকটি নগ্না নারীর প্রকাশ্য চিত্র দেখিয়া বিপিন ওই ধারণাটি সৃষ্টি করিয়াছিল, ভাবিয়াছিল যে, এই ছবিগুলির দিকে কেউ তাকাইয়াও ছাখে না, দেখিয়া দেখিয়া আর কারও কিছুমাত্র কৌতূহল নাই,—রক্ত-মাংসের স্ত্রীলোকের বেলাও মানুষের তাই হয়, প্রথম বয়সটা কাটিয়া যাওয়ার পর নারীদেহ সম্বন্ধে মানুষের সমস্ত কৌতূহল মিটিয়া যায়। প্রথম বয়স বিপিনের বহুকাল কাটিয়া গিয়াছে, দ্বিতীয় বয়সটাও প্রায় কাটিতে চলিল, তবু রত্নাবলী ও মাধবীলতা সম্বন্ধে ছেলেমানুষী কল্পনা করিতে তার ভাল লাগিতেছে কেন, এটা অবশ্য বিপিন ভাবিয়া দেখিল না। রত্নাবলীর পাশে বসিয়া সে হঠাৎ একটা খাপছাড়া কাজ করিয়া ফেলিল—এত জোরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, বলিবার নয়। রত্নাবলী আরও ভয় পাইয়া গেল। পাশে বসে কেন বিপিন? দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কেন বিপিন? অমন করিয়া তাকায় কেন বিপিন জ্ঞানী বুদ্ধের মত?

'আপনি বড় ছেলেমানুষ রতন দেবী।'

গা ঘেঁষিয়া বিপিন বসিয়াছে। বিপিন যদি এবার গায়ে হাত দেয়? যদি জড়াইয়া ধরে? পুরুষ মানুষকে রত্নাবলী বিশ্বাস করে না। মেয়েমানুষ সব সময়েই সংযত থাকিতে পারে, কিন্তু পুরুষ মানুষের সংযম শুধু অন্যমনস্কতা, হয় তো পাঁচ সাত বছর কোন মেয়ের কথা মনেও পড়িল না, কিন্তু তার পাশে গা ঘেঁষিয়া বসিবার পর পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে হয়তো এমন পাগলামী করিয়া বসিল যার তুলনা হয় না। বিপিনের কিছু হইবে না, বিপদে পড়িবে সে। সে যদি গোলমাল করে, সকলে যদি বুঝিতেও পারে যে দোষ আগাগোড়া বিপিনের, তবু বিপিনের এতটুকু আসিয়া যাইবে না, মারা পড়িবে সে-ই।

'উমা-মাসী আসছে বোধ হয়।'

সহজভাবে স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াও কোন লাভ হইল না, রত্নাবলীর নিজের কানেই কথাগুলি শুনাইল যেন সে চুপি চুপি ফিস্ ফিস্ করিয়া প্রণয়ীকে সতর্ক করিয়া দিতেছে।

বিপিন একটু হাসিল। 'আসুন না, সকলেই তো আসবেন।'

'সকলে আসবেন কেন। ও-কথা বলছেন কেন আপনি।'

কাঁদিয়া ফেলিবার উপক্রম করিবে কি না, মনে মনে রত্নাবলী তাই ভাবিতেছিল, গলাটা তাই কাঁদ' কাঁদ' শোনাইল। মেয়েদের প্রকৃতিই এই রকম—একটা কিছু করিবে কি করিবে না, ভাবিতে ভাবিতে কাজটা অর্দ্ধেক করিয়া ফেলে। প্রকৃত-পক্ষে, এই প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের জন্যই আজ পর্য্যন্ত কোন মেয়ে নিজেকে দান করার আগে ঠিক করিয়া ফেলিতে পারে নাই আত্মদান করিবে কি না।

[লেখকের মন্তব্য : কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়িল। কিন্তু উপায় নাই, রত্নাবলীকে বুঝিতে হইলে, কথাটা মনে রাখা দরকার। কোন বিষয়ে আগে হইতে মন স্থির করিয়া ফেলিবার ক্ষমতাটাই মনের জোরের চরম প্রমাণ হিসাবে প্রায় সকলেই গণ্য করিয়া থাকে, আসলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওটা গোঁয়ারতুমিরই রকমফের। ধরা বাঁধা নিয়মগুলি জীবনে কাজে লাগে না, ধরা বাঁধা নিয়ম কি জীবনে বেশী আছে? যেগুলিকে অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম বলিয়া মনে হয়, আসলে সেগুলি মানুষের আরোপ করা বিশেষণ মাত্র, উল্টাটাও অনায়াসে খাটিতে পারিত। মানুষ কি চায়, মানুষ কি করে এবং মানুষের কি চাওয়া উচিত আর মানুষের কি করা উচিত, এর কি কোন নির্দ্দিষ্ট ফরমুলা আছে? অন্যের প্রস্তুত করা ফরমুলা চোখ কান বুজিয়া অনুকরণ করা হয় বোকামি নয় গোঁয়ারতুমি। মেয়ে এবং পুরুষের মধ্যে যারা সুবিধাবাদী, তারা বোকাও নয় গোঁয়ারও নয়। এই জন্য তারা আগে হিসাব-নিকাশ শেষ করিয়া চরম সিদ্ধান্ত করিতে পারে না, দরকার মত কাজ আরম্ভ করে কিন্তু মন সিদ্ধান্তের বাঁধনে বাঁধা পড়িতে চায় না। শশধরের বাহুর বাঁধন রত্নাবলী মানিয়া লইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু তখনও সে কি স্বীকার করিবে নারীজন্ম তার সফল হইল অথবা মস্ত একটা ভুল সে করিয়া বসিয়াছে ঝোঁকের মাথায়? দেহ অবশ্য তার অবশ হইয়া যাইবে, চোখ মেলিয়া চাহিবার ক্ষমতাও হয়তো থাকিবে না, মনে প্রায় এই ধরণেই একটা চরম সিদ্ধান্ত সমস্ত চিন্তাকে দখল করিতে চাহিবে, যে জীবনের তার অতীতও ছিল না, ভবিষ্যতও থাকিবে না, তবু সে তখনও ভাবিতে থাকিবে যে, শশধর যদি তাকে কামনা করে, নিজেকে সে কি তখন দান করিবে? নিজেকে দান করা কি উচিত হইবে তার?

আপনারা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন যে, রত্নাবলীর, এই প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের অভিব্যক্তিটা একটু অসাধারণ। সে যেন ইচ্ছা করিয়া নিজেকে ধাঁধায় ফেলিয়া দেয়। সে যেন সব সময় সচেতন হইয়া থাকে যে, কি করিবে না করিবে, ঠিক সে করিয়া উঠিতে পারিতেছে না এবং তাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না।]

বিপিন আবার মৃদু একটু হাসিয়া বলিল, 'আপনি বড় ছেলেমানুষ।' বলিয়া নিছক বাহাদুরী করার জন্যই গম্ভীর মুখে হাত বাড়াইয়া রত্নাবলীর গালটা টিপিয়া দিল। রত্নাবলী মাথায় ঝাঁকি দিল, আধহাত সরিয়া বসিল এবং ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল—আর কিছুই করিল না। একটু অপেক্ষা করিয়া রত্নাবলীর নিশ্চেষ্ট শান্তভাবে খুসী হইয়া বিপিন বলিল, 'মাধুকে নিয়ে যাচ্ছি, মহেশ-বাবুর বাড়ীতে রেখে আসবো বলে। এখন কয়েকদিন ওইখানেই থাকবে, তারপর যেখানকার মানুষ সেখানে ফিরে যাবে। ওর পক্ষে আশ্রমে থাকাও চলবে না, আমাদেরও ওকে রাখা চলবে না। আপনি বলছেন, আপনি সঙ্গে না গেলে ওকে আপনি যেতেই দেবেন না, আমি তাই ভাবলাম আপনিও বুঝি চিরদিনের মত ওর সঙ্গে আশ্রম ত্যাগ করে চলে যেতে চাইছেন। তাই সকলকে ডাকার কথা বলছিলাম। আপনি তো মাধবীর মত চুপি চুপি আশ্রমে আসেন নি, আপনি কেন চুপি চুপি আশ্রম ছেড়ে চলে যাবেন—যেতে হলে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কাঁদতে কাঁদতেই যাবেন।'

বলিয়া বিপিন হাসিতে লাগিল।

গাল টিপিয়া দেওয়ায় রত্নাবলী আধ হাত তফাতে সরিয়া গিয়াছিল, এবার প্রায় হাতখানেক কাছে আসিয়া চাপা গলায় বলিল, 'মাধু চলে যাচ্ছে আশ্রম থেকে?'

সায় দিবার ভঙ্গিতে মাথা নাড়িতে যাওয়ায় বিপিনের মুখ প্রায় রত্নাবলীর মুখের সঙ্গে ঠেকিয়া গেল। তা হোক, তাতে দোষ নাই, গোপন কথার আদান-প্রদানের সময় মানুষের মুখ কাছা-কাছিই আসে। ভিতরের কৌতূহল রত্নাবলীর

চোখ দুটিকে যেন সত্যসত্যই খানিকটা বাহিরের দিকে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিয়াছে। তেমনি চাপা গলায় সে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি করেছে মাধু? কার সঙ্গে করেছে?'

'কি করবে? কার সঙ্গে করবে? ও তো আশ্রমে চিরকাল থাকবার জন্য আসে নি—ক'দিন বেড়িয়ে গেল, এই মাত্র।'

'আমার কাছে লুকোন কেন? বলুন না? পায়ে পড়ি, বলুন।'

'কি বলব?'

রত্নাবলী হতাশ হইয়া গেল। অভিমানে সরিয়া বসিল। কি করিয়াছে মাধবী? আশ্রম হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে, এমন কি অপরাধ মেয়েটা করিয়াছে। এতকাল সঙ্গে থাকিয়াও জানিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিতে হইবে তো মাধবীকে, মাধবী চলিয়া যাওয়ার আগে।

'বসুন, ডেকে দিচ্ছি মাধবীকে।'

'আপনি বসুন, আমিই ডেকে আনছি।'

ডাক শুনিয়া মাধবীর মুখ পাংশু হইয়া গেল। বিপিনকে দিয়া সদানন্দ তাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে।

'এখুনি যেতে হবে আপনার সঙ্গে?'

'হ্যাঁ, এখুনি যেতে হবে।'

'চলুন তবে, যাই।'

যাওয়ার সময় দাওয়ায় বসিয়া রত্নাবলী ক্ষীণস্বরে একবার মাধবীলতাকে ডাকিল। মাধবী সাড়া দিল না। ছুটিয়া গিয়া উন্মাদিনীর মত সদানন্দের গায়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া তাকে খুন করিয়া ফেলিবার জন্য তার ধৈর্য্য ধরিতেছিল না। বিপিনকে দিয়া সদানন্দ তাকে ডাকিয়া পাঠায়। সে এত সস্তা, মানুষের কাছে তার মর্য্যাদা এত কম যে, প্রকাশ্যভাবে বিপিনকে দিয়া সদানন্দ তাকে অভিসারে যাওয়ার হুকুম পাঠাইয়া দিতে পারে এমন অনায়াসে।

বিপিন আশ্চর্য্য হইয়া বলে, 'ওদিকে কোথায় চলেছ?'

মাধবীলতা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে, 'ফপরদালালি করবেন না—আমি পথ চিনি।'

'শোনো, শোনো। দাঁড়াও।'

পিছনে পিছনে খানিকটা প্রায় ছুটিয়া গিয়া মাধবীলতার হাত ধরিয়া বিপিন তাকে দাঁড় করায়। মাধবী বলে, 'ও। আপনি বুঝি পাওনা মিটিয়ে নেবেন আগে? শীগগির নিন, একটু তো ঘুমোতে হবে রাত্রে?'

বিপিন কোমলকণ্ঠে বলে, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে মাধু? কি বকছ পাগলের মত?'

মাধবীলতাও কোমল কণ্ঠে বলে, 'মাথা খারাপ হবে না? যা আরম্ভ করে দিয়েছেন আপনারা, এতে মাথা ঠিক থাকে মানুষের? এর চেয়ে কুমারসাহেবের মিস্ট্রেস্ হওয়াই আমার ভাল ছিল, কিছুদিন তো মজা করে নিতাম।'

এখানটা ফাঁকা, কাছাকাছি দু'একটি মোটে গাছ আছে। এদিকে এলোমেলোভাবে ছড়ানো আশ্রমের কুটীরগুলির কয়েকটি মাত্র চোখে পড়ে, আর এদিকে চোখে পড়ে সদানন্দের কুটীর। জ্যোৎস্নালোকে কুটীর ও আবেষ্টনীর মধ্যে ফাঁকা মাঠে মাধবীলতার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে বিপিনের মনে হয়, আঙুলগুলি যদি তার পাখীর পালকের মত কোমল হইয়া না যায়, আর সে যদি মেয়েটার সর্ব্বাঙ্গে সস্নেহে আঙুল বুলাইয়া না দেয়, পৃথিবীটাই রসাতলে চলিয়া যাইবে। অকারণে নিজেকে এই মেয়েটার জন্য মহাশূন্যে বিলীন করিয়া দিবার কোনও একটা কারণ কি আবিষ্কার করা যায় না? অসহ্য কোন যন্ত্রণা সহ্য করা যায় না এই মেয়েটার জন্য? অসম্ভব কোন কার্য্য সম্ভব করা চলে না? ভাবিতে ভাবিতে মাধবীলতার মাথাটি বুকে চাপিয়া ধরিয়া বিপিন মৃদুস্বরে বলে, 'মাধু, কে তোমার ওপর অত্যাচার করছে বল, কাল তাকে আশ্রম থেকে দূর করে তাড়িয়ে দেব। এ আশ্রম আমার, দলিলপত্রে আমার নাম আছে, আমার কথার ওপর কা ও কথা কইবার অধিকার নেই। কে তোমার মনে কষ্ট দিয়েছে, একবার তার নামটি শুধু তুমি বল।'

কি উগ্র উদারতা বিপিনের। এদিকে চাপিয়া ধরিয়াছে মাধবীর মাথাটা নিজের বুকে, মুখে তাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে কে অত্যাচার করিয়াছে তার উপর, কে কষ্ট দিয়াছে তার মনে? একটু কাঁদে মাধবীলতা, একটু ফোঁস ফোঁস করে। বিপিন ব্যাকুল হইয়া বলে, 'কেন কাঁদছ মাধু? কেঁদো না। বল না তুমি কি চাও? অন্য কোথাও চলে যাবে?'

'কোথায় যাব? কার কাছে যাব?'

'যেখানে যেতে চাও, পাঠিয়ে দেব। নিজে আমি তোমার নামে বাড়ী কিনে দেব, ব্যাঙ্কে তোমার নামে টাকা জমা রেখে দেব,—'

'আপনার মিষ্ট্রেস্ হয়ে থাকতে হবে তো?'

বিপিন একটু ভাবিল। হাতের আঙুল পাখীর পালক নয় বলিয়া আপশোষ করার সময় সদানন্দ যেমন ভুলিতে পারিতেছিল না যে, মাধবীলতার ঠোঁটের নীচে দাঁত আছে, আর আঙুলের ডগায় নখ আছে আর রক্তমাংসের তলায় হাড় আছে, বিপিনও তেমনি এখন কেবলি ভুলিবার চেষ্টা করিতেছিল যে, মাধবীলতা যাকে হাতের কাছে পায়, তাকেই আঁকড়াইয়া ধরে।

ভাবিয়া চিন্তিয়া বিপিন তারপর জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কি বল?'

মাধবীলতা চুপ। বিপিন সত্যই মানুষ নয়।

'যাকগে, ওসব কথা পরে হবে। এখন চলো তোমাকে মহেশবাবুর ওখানে রেখে আসি।'

'মহেশবাবুর ওখানে?'

'হ্যাঁ। এখানে তোমার থাকা চলবে না।'

মাধবীলতা কাঁদিতে কাঁদিতে বিপিনের সঙ্গে নদীর ঘাটে গিয়া নৌকাটিতে উঠিয়া বসিল। ছোট ডিঙি নৌকা, ছাউনি নাই, হাল নাই, বসিবার ভাল ব্যবস্থাও নাই। তবু পায়ে হাঁটিয়া যাওয়ার চেয়ে নৌকায় মহেশ চৌধুরীর বাড়ী যাওয়া অনেক সুবিধা। বিপিন নৌকা বাহিতে জানে।

সাত

কয়েকদিন জ্বরে ভুগিয়া মহেশ চৌধুরী সারিয়া উঠিলেন। এ কয়দিন কত লোক আসিয়া যে তার খবর জানিয়া গেল, হিসাব হয় না। কেবল খবর জানা নয়, পায়ের ধুলা চাই। সদানন্দের আশ্রম জয় করিয়া আসিয়া মহেশ চৌধুরীও পর্য্যায়ে উঠিয়া গিয়াছেন। লোকের ভিড়েই মহেশ চৌধুরীর প্রাণ বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, মাধবীলতাকে পৌছিয়া দিতে আসিয়া কথায় কথায় এই বিপদের কথাটা শুনিয়া বিপিন ভাল পরামর্শ দিয়া গেল। পরদিন হইতে শশধর সকলকে একটি করিয়া তুলসীপাতা বিতরণ করিয়া দিতে লাগিল— উঠানের মস্ত তুলসী গাছটি দেখিতে দেখিতে দু' একদিনের মধ্যে হইয়া গেল প্রায় ন্যাড়া। যারা আসে, তাদের প্রায় সকলেই চাষী-মজুর কামার-কুমার শ্রেণীর এবং বেশীর ভাগই স্ত্রীলোক— তুলসীপাতা পাইয়াই তারা কৃতার্থ হইয়া যাইতে লাগিল।

বিপিন প্রত্যেক দিন খবর জানিতে আসে। কার খবর জানিতে আসে, মহেশের অথবা মাধবীলতার, সেটা অবশ্য ঠিক বুঝা যায় না। যদিও মহেশের কাছেই সে বসিয়া থাকে অনেকক্ষণ, আলাপ করে নানা বিষয়ে। আশ্রমে বিপিনের কাছে মহেশ বহুদিন ধরিয়া যে অবহেলা অপমান পাইয়া আসিতেছে, সে কথা কেউ ভুলিতে পারিতেছিল না, এখন মহেশের খাতির দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া গিয়াছে। আশ্রমের কদম গাছের নীচেই কি মহেশের সব লাঞ্ছনার সমাপ্তি ঘটিয়াছে? সদানন্দ কি সত্যই এতকাল মহেশকে পরীক্ষা করিতেছিলেন, বিপিন এবং আশ্রমের অন্যান্য সকলে তারই ইঙ্গিতে মহেশের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করিতেছিল? পরীক্ষায় মহেশ সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়ায় এবার বিপিন বাড়ী আসিয়া তার সঙ্গে ভাব করিয়া যাইতেছে, সেবার জন্য মাধবীলতাকে এখানে পাঠাইয়া দিয়াছে?

বিপিন আসে, নানা বিষয়ে আলোচনা করে, আর মহেশ চৌধুরীর ভক্তদের বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া ত্যাখে। কয়েক দিন পরে মহেশ চৌধুরীর আশীর্ব্বাদ-প্রার্থীদের সংখ্যাও কমিয়া যাইতে থাকে, বিপিনের উৎসাহেও যেন ভাঁটা পড়িয়া যায়। প্রতিদিন আর তাকে বাগবাদায় দেখা যায় না। আসিলেও মহেশের কাছে সে বেশীক্ষণ বসে না।

মহেশ ব্যাকুলভাবে মাধবীলতাকে জিজ্ঞাসা করে, 'বিপিনবাবু যে আর আসেন না মা?'

মাধবীলতা বলে, 'কাজের মানুষ, নানা হাঙ্গামায় আছেন, সময় পান না।'

'বড় ভাল লোক। কি বুদ্ধি, কি কর্ম্মশক্তি, কি তেজ, কি উৎসাহ—সবরকম গুণ আছে ভদ্রলোকের। এমন একটা মানুষের মত মানুষ, জানো মা, আমি আর দেখি নি।'

বিপিনের এরকম উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনিয়া মাধবীলতা হাসিবে না কাঁদিবে, ভাবিয়া পায় না। বুদ্ধি হয় তো আছে, কিন্তু বুদ্ধি থাকিলেই কি লোক ভাল হয় নাকি? ওই স্তিমিত নিস্তেজ মানুষটার কর্ম্মশক্তি, তেজ আর উৎসাহ!—যার মুখের চিরস্থায়ী বিষাদের ছাপ সংক্রামিত হইয়া মানুষের মনে বৈরাগ্য জাগে?

এখানে মাধবীলতার ভাল লাগে না। মহেশ যে ক'দিন দক্ষিণের ভিটার ঘরটিতে দেড়শো বছরের পুরাণো খাটে শুইয়া জ্বরের ঘোরে ধুঁকিতে ধুঁকিতে থাকিয়া থাকিয়া বলিত 'ওরা আমার কাছে আসছে কেন? প্রভুর কাছে পাঠিয়ে দাও ওদের', সে ক'দিন সেবার হাঙ্গামায় একরকম কাটিয়া গিয়াছিল, মহেশ সুস্থ হইয়া উঠিবার পর মাধবীলতার সব

একঘেয়ে লাগে। গ্রামের মেয়েরা দু'চার জন করিয়া সকলেই প্রায় মাধবীলতাকে দেখিয়া গিয়াছে। পাড়ার কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হইয়াছে। কিন্তু এদের মাধবীলতার ভাল লাগে না। তাই নিজেও সে এদের কাউকে কাছে টানিবার চেষ্টা করে নাই, নিজে হইতে তার গা ঘেঁসিয়া আসিয়া ভাব জানাইবার ভরসাও এদের হয় নাই। বেড়াইতে আসিয়া অভদ্র বিস্ময়ের সঙ্গে এরা মাধবীলতাকে শুধু দেখিয়াই যায়। আশ্রমবাসিনী কুমারী সন্ন্যাসিনী (বয়স কত হইয়াছে ভগবান জানেন) সাধারণ বেশে আশ্রম ছাড়িয়া আসিয়া মহেশ চৌধুরীর বাড়ীতে বাস করিতেছে, গাঁয়ের মেয়েদের কাছে সে কতকটা স্বর্গচ্যুতা অপ্সরী কিন্নরীর মত রহস্যময়ী জীব।

এখানে মানুষ নাই, বৈচিত্র্য নাই। স্নেহমমতা আদরযত্ন আছে, বিভূতির মা মেয়ের মতই মাধবীলতাকে আপন করিয়া ফেলিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু কেবল মেয়ের মত সব সময় একজনের আপন হইতে কি মানুষের ভাল লাগে? আশ্রমের জীবনের পর কেমন নীরস একঘেয়ে মনে হয়। আশ্রম নির্জ্জন, কিন্তু সে অনেক নরনারীর নির্জ্জনতা, আশ্রমের নিয়মে বাঁধা জীবন শান্ত, কিন্তু সে নিয়মও অসাধারণ, সে শান্তিও অসামান্য। কি যেন ঘটিবার অপেক্ষায় গাছপালায় ঘেরা আশ্রমের ছোট ছোট কুটীরগুলিতে প্রতিমুহূর্ত্তে উন্মুখ হইয়া থাকা যায়—মনে হয়, এই বুঝি আশ্রমের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ শান্তভাব চুরমার করিয়া প্রচণ্ড একটা অবরুদ্ধ শক্তি আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিবে, এমন একটা কাণ্ড ঘটিবে যা দেখিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া হাত-তালি দিয়া নাচা যায়। এখানে কোনদিন কোন কিছু ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

বিপিনকে মাধবীলতা জিজ্ঞাসা করে, 'উনি কি বললেন?'

'কিছু বলেন নি।'

'কিছুই না? একেবারে কিছু না?'

বিপিন মাথা নাড়িয়া বলে, 'কি বলবে? বলবার ক্ষমতা থাকলে তো বলবে। কি কুক্ষণে যে ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল মাধু।'

মাধবী ভয় ও বিস্ময়ে চুপ করিয়া থাকে। তার জন্য বিপিন আর সদানন্দের মনান্তর হইয়া গেল? জানালা দিয়া গ্রামের পথ দেখা যায়, বর্ষায় একেবারে শেষ করিয়া দিয়া গিয়াছে, এখনও ভালরকম মেরামত হয় নাই। পথের ধারে অবনী সমাদ্দারের বাড়ীর সামনে একটি গরু বাঁধা আছে। রোজই বাঁধা থাকে, ঘাসপাতা খায় আর কয়েকদিনের বাছুরটির গা চাটে। আজ বাছুরটি যেন কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। আশ্চর্য্য না? মাধবীলতা যেদিন যে-সময় কথা পাড়িল সে চলিয়া আসায় সদানন্দের কি অবস্থা হইয়াছে, সেইদিন সেই সময় বাছুরটি উধাও হইয়া গিয়া গাভীটিকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে!

'আশ্রমের কিসে উন্নতি হবে, সে চিন্তা ওর নেই, দিনরাত নিজের কথাই ভাবছে। আমার এটা হল না, আমার ওটা হল না, আমার এটা চাই, আমার ওটা চাই। ওকে নিয়ে সত্যি মুস্কিলে পড়েছি মাধু।'

'কেন, উনি বেশ লোক।'

মাধবীলতার মুখে একথা শুনিয়া বিপিন প্রায় চমকাইয়া যায়। নৌকায় উঠিবার আগে রাগের মাথায় সদানন্দের কুটীরের দিকে পা বাড়াইয়া, ষ্টেজে সরলা কোমলা বনবালার অভিনয় করিয়া করিয়া হয়রাণ হইয়া গরম মেজাজে সাজঘরে ফিরিয়া আসা বেশ্যার মত ফুঁসিতে ফুঁসিতে মাধবীলতা যেসব কথা বলিয়াছিল, বিপিন তার একটি শব্দও ভোলে নাই। জ্যোৎস্নালোকে দেখা মুখভঙ্গিও ভোলে নাই মাধবীলতার। সদানন্দের অত্যাচার মেয়েটার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, তার চোখের আড়ালে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করিবার সুযোগ সদানন্দ পাইয়াছে ভাবিয়া, সে রাগের চেয়ে অনুতাপের জ্বালাতেই জ্বলিয়াছিল বেশী। সে বিপিন, আশ্রমের কোথায় মাটির নীচে কোন্ চারার বীজ হইতে অঙ্কুর মাথা তুলিতেছে, এ খবর পর্য্যন্ত যে রাখে, তাকে ফাঁকি দিয়া সদানন্দ এত কষ্ট দিয়াছে মাধবীলতাকে! কি হইয়াছিল তার? আগেই কেন সে অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করে নাই? কেন আশ্রমকে চুলায় যাইবার অনুমতি দিয়া নিজে গা এলাইয়া দিয়াছিল অসহায় শিশুর মত?

সদানন্দের কুটীরের সামনে একটা কদমগাছের নীচে মহেশ চৌধুরীর মহাযুদ্ধ এবং মাধবীলতার মধ্যস্থতায় সে যুদ্ধের সমাপ্তির পর কয়েকটা দিন যেভাবে কাটিয়াছিল, ভাবিলে বিপিনের এখনও লজ্জা করে। শরীরটা একটু দুর্ব্বল ছিল কিন্তু দাঁতের ব্যথা ছিল না। স্নায়ু ভোঁতা হইয়া থাকা উচিত ছিল বিপিনের, শ্রান্ত অবসন্ন দেহে দু'তিনদিন পড়িয়া পড়িয়া ঘুমানোই ছিল তার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু তার বদলে কি তীব্র মানসিক

যন্ত্রণাই সে ভোগ করিয়াছে। বার বার কেবলি তার মনে হইয়াছে, সে কি ভুল করিয়াছে? ছলে বলে কৌশলে দিগন্তের কোল হইতে তার আদর্শের সফলতাকে আশ্রমের এই মাটিতে টানিয়া আনিবার সাধনা কি তার ভ্রান্তিবিলাস মাত্র? এভাবে কি বড় কিছু মানুষ করিতে পারে না? নিজের জন্য সে কিছু চায় না, এইটুকু কি তার নৈতিক শক্তিকে অব্যাহত রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট নয়? ন্যায় অন্যায়ের বিচারের চেয়ে কার্য্যসিদ্ধিকে বড় ধরিয়া লইয়াছে বলিয়াই কি তার এত চেষ্টা আর আয়োজন ব্যর্থ হইয়া যাইবে? মনে মনে নিজের দুঃখ কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারের হিসাব করিয়া বিপিন বড় দমিয়া গিয়াছে। কতটুকু লাভ হইয়াছে, কতটুকু সার্থকতা আসিয়াছে? কোন্‌দিকে কতটুকু অগ্রসর হইতে পারিয়াছে? আশ্রম বড় হইয়াছে, আশ্রমের সম্পত্তিও বাড়িয়াছে, লোকজনও বাড়িয়াছে, কিন্তু উন্নতি হয় নাই। ভাল উদ্দেশ্যে যে মিথ্যা আর প্রবঞ্চনা আর ফন্দিবাজিকে সে প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছে, সে-সব একান্তভাবে তার নিজস্ব গোপন পরিকল্পনার অঙ্গ, আশ্রমের জীবনে কেন সে সমস্তের প্রতিক্রিয়া ফুটিয়া ওঠে? আর এদিকে মহেশ চৌধুরী, সরল নিরীহ বুদ্ধিহীন ভালমানুষ মহেশ চৌধুরী, না চাহিয়া সে সকলের হৃদয় জয় করিয়াছে, নিজের দুঃখময় ব্যর্থ জীবনকে পর্য্যন্ত সার্থকতায় ভরিয়া তুলিয়াছে। কি এমন মহাপুরুষ মহেশ চৌধুরী যে, তার পাগলামী পর্য্যন্ত মানুষকে মুগ্ধ করিয়া দেয়? আর কি এমন অপরাধ বিপিন করিয়াছে যে, সকলে তাকে কেবল ফাঁকিই দেয়, সদানন্দ হইতে মাধবীলতা পর্য্যন্ত? এইসব ভাবিতে ভাবিতে বিপিন মড়ার মত বিছানায় পড়িয়া থাকিয়াছে—অন্য মানুষ সে অবস্থায় ছটফট করে। সেই সময়েই বিপিন ভাবিয়া রাখিয়াছিল, মহেশ চৌধুরীর সঙ্গে ভাব করিয়া লোকটাকে একটু ভালভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিবে। তবে বিশেষ উৎসাহ তার ছিল না। তারপর ধীরে ধীরে মহেশ চৌধুরীকে কাজে লাগাইবার পরিকল্পনা মনের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে। এখন আর আশ্রমের পরিসর বাড়ান সম্ভব নয়, সম্প্রতি যে আম-বাগানটা পাওয়া গিয়াছে, তাই লইয়াই আপাততঃ সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। সুতরাং রাজাসায়েবের ভয়ে মহেশ চৌধুরীকে এড়াইয়া চলিবার আর তো কোন কারণ নাই। আশ্রমে অর্থ-সাহায্য করাও রাজাসায়েব বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, কিছুদিন আর পাওয়া যাইবে না। ভবিষ্যতে আবার যদি রাজাসায়েবের কাছে কিছু আদায় করা সম্ভব মনে হয়, তখন অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা যাইবে।

এদিকে, যাদের চাষাভুষো মানুষ বলে, জনসাধারণ নামে আশ্রমকে যারা ঘিরিয়া আছে গ্রাম আর পল্লীতে, তাদের সঙ্গে আশ্রমের একটু যোগাযোগ ঘটানো দরকার। ওদের বাদ দিয়া কোন প্রতিষ্ঠানই গড়িয়া তোলা সম্ভব নয়। ওদের সঙ্গে এখন যে সংযোগ আছে আশ্রমের, সে না থাকার মত। কাছাকাছি কয়েকটি গ্রামের নরনারী আশ্রমে সদানন্দের উপদেশ শুনিতে এবং সদানন্দকে প্রণাম করিতে আসে, প্রণামান্তে কিছু প্রণামীও দিয়া যায়—কিন্তু সে আর ক'জন মানুষ, সে প্রণামী আর কত। তিন দিনের পথ হাঁটাইয়া অনেক দূরের গ্রাম হইতে মানুষকে যদি আশ্রমে টানিয়া আনিতে হয়, আর এক একদিনের প্রণামীর পরিমাণ দেখিয়া নিশ্চিন্ত মনে দেশের সর্ব্বত্র আশ্রমের শাখা খুলিবার ব্যবস্থা আরম্ভ করিয়া দেওয়া সম্ভব করিতে হয়, তাহা হইলে অন্য কিছু করা চাই, কেবল সদানন্দকে দিয়া কাজ চলিবে না।

মহেশ চৌধুরীকে এরা পছন্দ করে—এইসব সাধারণ মানুষগুলি।

মানুষটাও ভাল মহেশ চৌধুরী।

শিশুর মত সরল।

কয়েকদিন আসা-যাওয়া মেলা-মেশা করিয়া বিপিন কিন্তু একটু ভড়কাইয়া গেল। মহেশ চৌধুরীর আসল রূপটা সে আর খুঁজিয়া পায় না। ভালমানুষ, শিশুর মত সরল, কিন্তু জোর কই? আশ্রমের কদমতলায় তার যে মনের জোরের পরিচয় বিপিনকে পর্য্যন্ত কাবু করিয়া কয়েক দিন আন্‌মনা করিয়া রাখিয়াছিল? ছেলের কথা বলে, ঘরের কথা বলে, নিজের কথা বলে, আর এই সব কথার মধ্যে ফোড়ন দেয় ভগবানের কথার—শান্তি চাই মহেশের, শান্তি। অনেক দুঃখ পাইয়াছে মহেশ, সে জন্য কোন দুঃখ নাই, এবার একটু শান্তি না পাইলে যে শেষ জীবনটাও মন দিয়া ভগবানকে ডাকা হয় না মহেশের।

'ভগবানকে ডাকবার জন্য আমরা আশ্রম করিনি।'

মহেশ চৌধুরী কৌতুকের হাসি হাসিয়া বলে, 'এখনও আমার সঙ্গে ছলনা করবেন বিপিনবাবু? ভগবানকে ডাকার জন্য ছাড়া আশ্রম হয়। তবে ভগবানকে ডাকার সুবিধের জন্যে অন্য কিছু

যদি করেন—সে সবও ভগবানকে ডাকারই জন্য।'

'আপনি তো প্রভুর বাণী শোনেন?'

'শুনি বৈকি।'

'উনি কি কোনদিন বলেছেন, আশ্রমে যারা আছেন, তাদের কাজ হল ভগবানকে ডাকা?'

'বলেন বৈকি—সব সময়েই বলেন। আমরা সবাই পাপী তো বিপিনবাবু?' প্রশ্ন শুনিয়া বিপিন গুম খাইয়া থাকে।

মহেশ চৌধুরী সায় না পাইয়াও বলে, 'মহাপাপী আমরা। আমাদের কি ক্ষমতা আছে নিজে থেকে ভগবানকে ডাকবার? তাই যদি পারতাম বিপিন-বাবু, মনে আমার এমন অশান্তি কেন—সকলের মনে অশান্তি কেন। প্রভু আমাদের শিখিয়ে দিচ্ছেন কি করলে ভগবানকে ডাকবার ক্ষমতা হয়, কি করলে আমরা ভগবানকে ডাকতে পারি। কাণ্ডারী একমাত্র ভগবান, কিন্তু গুরুদেবের চরণতরীই ভরসা—।' তর্কের কথা নয়, তর্ক বিপিন করে না, কথায় কথা তুলিয়া মানুষটাকে বুঝিবার চেষ্টা করে। অন্য সব দিক দিয়া সে হতাশ হইয়া যায়, একটিমাত্র ভরসা থাকে মহেশের নিজের বিশ্বাস আঁকড়াইয়া থাকিবার ক্ষমতা। নিজে যা জানিয়াছে তার বেশী কিছু জানিতে বা বুঝিতে চায় না, সদানন্দের কথা হোক, শাস্ত্রের বাক্য হোক, তার নিজের ব্যাখ্যাই ব্যাখ্যা। এদিক দিয়া মহেশ ভাঙ্গিবে কিন্তু মচকাইবে না।

এ রকম মানুষ দিয়া বিপিনের কাজ চলিবে কি?

'আচ্ছা, প্রভু যদি আপনাকে কোন অন্যায় আদেশ দেন, সে আদেশ আপনি পালন করবেন?'

'প্রভু অন্যায় আদেশ দিতে পারেন না।'

'মনে করুন দিলেন—'

'ওরকম ছেলেমানুষী অসম্ভব কথা মনে করে কি লাভ হবে বলুন?'

বিপিনের ধৈর্য্য অসীম।

'ওঁর আদেশ অন্যায়, আমি তা বলছি না। ধরুন, উনি ঠিক মত আদেশই দিয়েছেন, আপনার মনে হল আদেশটা সঙ্গত নয়; তখন আপনি কি করবেন?'

মহেশ নিশ্চিন্তভাবে বলে, 'আদেশ অন্যায় বলে ওঁর পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নেব।'

'আদেশটা পালন করবেন তো?'

'উনি যদি আমার মনের ধাঁধা মিটিয়ে দিয়ে আদেশ পালন করতে বলেন, তবে নিশ্চয় করব।'

'আর যদি মনের ধাঁধা না মিটিয়ে শুধু আদেশ পালন করতে বলেন?'

মহেশ হাসিয়া বলে, 'যান মশায়, আপনার আজ মাথার ঠিক নেই। ওরকম উনি কখনো বলতে পারেন?'

'যদি বলেন?'

'আপনি আবার সেই অসম্ভব কল্পনার মধ্যে যাচ্ছেন।'

বিপিনের ধৈর্য্য সত্যই অসীম।

'বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে যদি বলেন? এতদিন আপনাকে যেরকম পরীক্ষা করছিলেন না, এই রকম কোন পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য নিয়ে যদি আপনাকে অন্যায় আদেশ পালন করতে বলেন?'

'পরীক্ষার জন্য? আরও পরীক্ষা করবেন?' মহেশের মুখ চোখের পলকে শুকাইয়া যায়। ভীত সন্ত্রস্ত শিশুর মত অসহায় চোখ মেলিয়া সে বিপিনের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। সদানন্দের পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে কি ফেল করিয়াছে, আজও মহেশ চৌধুরী ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই, শুধু জানিয়াছে যে, সদানন্দ তাকে অনুগ্রহ করিয়াছে, জানিয়া এই সৌভাগ্যেই সর্ব্বদা ডগমগ হইয়া আছে। পরীক্ষার কথা মনে হইলেই তার মুখ শুকাইয়া যায়।

বিপিনের পিছনে বিভূতির মা অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিল। দুধের বাটি হাতে করিয়া আসিয়াছে। দুধটা বেশী গরম ছিল, এমনিভাবে ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকাতেও আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হইতে কোন বাধা হইতেছে না, তাই এতক্ষণ দু'জনের অপরূপ আলাপে বাধা দেয় নাই। এবার বলিল, 'বিপিনবাবু, ওঁর সঙ্গে আপনি কথায় পারবেন না। গুরুদেবের সমস্ত আদেশ উনি চোখ কান বুজে মেনে চলবেন—ভাববেন না।'

তবু বিপিনের ভাবনার শেষ হয় না। এমন সমস্যায় সে আর কখনও পড়ে নাই। একটা মানুষকে গ্রহণ বা বর্জ্জনের সিদ্ধান্ত ঠিক করিয়া ফেলিতে যে এত ভাবিতে হয়, বিপিনের সে ধারণা ছিল না। আশ্রমে যদি স্থান দেওয়া হয় মহেশকে, কাজে কি তার লাগিবে মহেশ?

মাধবীলতাকে পর্য্যন্ত অন্যমনে এক সময় সে জিজ্ঞাসা করিয়া বসে, 'মহেশবাবু লোক কেমন মাধু?'

মাধবীলতা সংক্ষেপে বলে, 'ভাল নয়।'

সদানন্দকে মাধবীলতা ভাল লোক বলিয়া প্রশংসা করিয়াছিল। মনে পড়াতেও বিপিনের হাসি আসিল না। মাধবীলতা অন্য মানদণ্ড দিয়া

বিচার করিতেছে—ভাল শব্দটায়ও অনেক রকম মানে আছে।

গম্ভীরমুখে সে জিজ্ঞাসা করে, 'আশ্রমে ফিরে যাবে মাধু?'

'যাব।'

'কি করবে আশ্রমে গিয়ে?'

এ প্রশ্নের জবাব মাধবীলতা দিতে পারিল না।

আট

বিপিন ভাবিতেছিল, মাধবীলতাকে প্রথমে আশ্রমে ফিরাইয়া আনিবে, তারপর ভাবিয়া চিন্তিয়া মহেশকেও আশ্রমে আসিয়া বাস করিতে বলিবে কিনা ঠিক করিবে। ভাবিতে ভাবিতে দিন কাটিতে লাগিল। সদানন্দের নাগালের মধ্যে আবার মাধবীলতাকে আনিয়া ফেলিতে বিপিন আর সময়ই পায় না। নিজেই সে বুঝিতে পারে না মাধবীলতাকে ফিরাইয়া আনিবে ঠিক করিয়াও মহেশের ওখানে মেয়েটাকে কেন ফেলিয়া রাখিয়াছে। এবার অবশ্য সে মাধবীলতার সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা করিবে, নিজেও সতর্ক থাকিবে, তবু যেন ভয় হয়।

সদানন্দ বড় ভয়ানক মানুষ। (বিপিনের মতে)

সদানন্দের মানুষ বশ করার যে ক্ষমতাকে অসামান্য গুণ মনে করিয়া বিপিন এতদিন আশ্রমের কাজে লাগাইয়াছে, আজ সেই ক্ষমতাকে অনিষ্টকর ভয়ানক কিছু বলিয়া গণ্য করিতে বিপিনের দ্বিধা হয় না। বিজ্ঞানের সুবিধাভোগীরা যে ভাবে বিজ্ঞানকে অভিশাপ দেয়, সদানন্দকেও বিপিন আজকাল তেমনি ভাবে কাজ ফুরানো পাজীর দলে ফেলিয়াছে। কেবল মাধবীলতার জন্য এ বিরাগ নয়, সদানন্দের কাজ প্রকৃতপক্ষে ফুরায় নাই, মনে হইয়াছিল সদানন্দকে বাদ দিয়াও আশ্রম চালানো যাইবে, কিন্তু কল্পনাটা কার্য্যে পরিণত করিবার নামেই নানারকম আশঙ্কা মনে জাগায় আপনা হইতেই বিপিন টের পাইয়াছে যে, সদানন্দকে সে বিদায় দিতে চায় বটে কিন্তু এখনও সেটা সম্ভব নয়।

যে কোন বুদ্ধিমান উৎসাহী লোক সদানন্দকে সামনে দাঁড় করাইয়া এরকম একটি আশ্রম গড়িয়া তুলিতে পারিবে—সদানন্দকে বিদায় করার পক্ষে এই এখন সব চেয়ে বড় বাধা। সদানন্দ শুধু চলিয়া গেলে আরও বেশী কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া আশ্রমকে সে চালাইয়া নিতে পারিবে, কিন্তু প্রতিহিংসার উদ্দেশ্যে সদানন্দ প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিলে পারিবে না। হয়তো পারিবে, কোন বিষয়েই নিজেকে বিপিন অক্ষম ভাবিতে পারিবে না, কিন্তু সাধ করিয়া সে হাঙ্গামা টানিয়া আনিবার সাহস বিপিনের নাই।

বিপিনের সাহস কি কম? বিপিন কি ভীরু?

মাধবীলতা তাই বলে। বলে, 'বিপিনবাবু? উনি অপদার্থ ভীরু কাপুরুষ—'

বলে মহেশকে। প্রাণ খুলিয়া বিপিনের নিন্দা করিতে পারে। মহেশ চৌধুরীর উপর বিরক্তিটা তার এত বেশী বাড়িয়া গিয়াছে, লোকটাকে দেখিলেই গায়ে যেন আজকাল তার জ্বর আসে। কিছুদিন আগে মাধবীলতা বিপিনকে বলিয়াছিল, মহেশ চৌধুরী লোক ভাল নয়। তখন বিপিনের সাহচর্য্য সে সহ্য করিতে পারিত না। আজকাল মহেশ চৌধুরীর একসুরে বাঁধা মনোবীণার একঘেয়ে ঝঙ্কারগুলি একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তোলায় বিপিনের মধ্যেও হঠাৎ সে কিছু কিছু বৈচিত্র্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। বিপিনের কাছে আর তাই মহেশ চৌধুরীর সম্বন্ধে কোনরকম মন্তব্য করে না, মহেশ চৌধুরীর কাছে বিপিনকে বিশেষণের পর বিশেষণে অভিনন্দিত করিয়া চলে—চালবাজ, মিথ্যুক, লোভী, অসংযত প্রভৃতি কত সংজ্ঞাই যে বিপিনকে সে দেয়।

বিপিনের প্রশংসায় মহেশ কিন্তু পঞ্চমুখ। কারও সম্বন্ধে মহেশ কখনও কোন কারণেই মত বদলায় না—অন্ততঃ স্বীকার করে না যে, নিন্দা প্রশংসায় কারও সম্বন্ধে তার ধারণার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হইয়াছে। নিন্দা সে জগতে কারও করে না, একবার যার যে গুণগান করিয়াছে, চিরকাল সমান উৎসাহের সঙ্গে তার সেই গুণকীর্ত্তনই করিয়া যায়।

মাধবীলতার মুখে বিপিনের বিশেষণগুলি শুনিয়া সে একে একে বিশ্লেষণ করিয়া প্রমাণ করিতে বসে যে, মাধবীলতা ভুল করিয়াছে, ওসব বিশেষণ বিপিনের প্রতি প্রয়োগ করা চলে না। বিপিন মহান্, উদার, আত্মত্যাগী মহাপুরুষ,—চাল বিপিনের নাই, মিথ্যা সে কখনও বলে না, লোভী সে নয়, সংযমের তার তুলনা নাই। বিপিনের ভীরুতার অপবাদটিরও মহেশ প্রতিবাদ করে।

মাথা নাড়িয়া হাসিয়া বলে, 'বিপিনবাবু ভীরু কাপুরুষ? কি যে তুমি বলো মা! ওঁর মত বুকের পাটা কটা মানুষের থাকে?'

মাধবীলতা রাগিয়া বলে, 'কি যে দেখেছেন আপনি বিপিনবাবুর মধ্যে। উনি যদি ভীরু কাপুরুষ নন, কে তবে ভীরু কাপুরুষ? শুনুন বলি তবে। আশ্রমের ক্ষতি করবেন ভয়ে আপনাকে উনি আশ্রমে নিতে ভরসা পাচ্ছেন না।'

রাগের মাথায় ভিতরের মস্ত বড় কথা যেন ফাঁস করিয়া দিয়াছে, এমনি গর্ব্বভরা অনুতাপের ভঙ্গিতে মাধবীলতা একদৃষ্টে মহেশ চৌধুরীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। মহেশ চৌধুরী হঠাৎ গম্ভীর হইয়া যায়। মনে হয়, ভিতরের আসল কথাটা জানিতে পারিয়া বুঝি চটিয়াই গিয়াছে! কিন্তু কথা শুনিয়া বুঝা যায়, এত সহজে খেইহারা হইবার মানুষ সে নয়।

'ভয় তো বিপিনবাবুর মিথ্যে নয় মা। আমাকে আশ্রমে ঠাঁই দিলে আশ্রমের ক্ষতির আশঙ্কা আছে বৈকি। আমি হলাম মহাপাপী, আমার সংস্পর্শে—'

বিপিনের ভীরুতার প্রমাণটি ফাঁসিয়া যায়। চালের উপরেই বিপিন চলে, এ ধারণা মনের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে কিন্তু উদাহরণ দাখিল করিতে গিয়া বিপিনের চালবাজির একটি দৃষ্টান্তের কথাও মাধবীলতা আগে এতদিন অনেক চেষ্টাতেও মনে করিতে পারে নাই। বিপিনের ভীরুতার কয়েকটি জোরালো দৃষ্টান্ত আজ সে কোনরকমেই স্মরণ করিতে পারে না। বিপিন ভীরু সন্দেহ নাই, কিন্তু কবে কোথায় সে ভীরুতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে?

ভাবিতে গেলে সত্যই বড় বিস্ময় বোধ হয়। বিপিনের কি তবে দোষ বলিয়া কিছুই নাই? অভাব কেবল তার গুণের? সদ্‌গুণ একেবারে নাই বলিয়াই লোকটার চালচলন এমন নিন্দনীয় মনে হয়? সংসারে মানুষ হয় ভালমন্দ মেশানো, কারো মধ্যে ভাল বেশী, কারও মধ্যে কম, কিন্তু বিপিনের মধ্যে ভালর নামগন্ধও নাই। তাই কি বিপিনকে মনে হয় খারাপ লোক, যদিও তার মধ্যে মন্দের ভাগটাও খুঁজিয়া মেলে না? কথাটা যেন দাঁড়াইয়া যায় ধাঁধায়—ভালও নাই মন্দও নাই, কি তবে আছে বিপিনের মধ্যে? কিসের মাপকাঠিতে মানুষ তাকে মানুষ হিসাবে বিচার করিবে? তাকে কি ধরিয়া নিতে হইবে নিন্দা প্রশংসার অতীত মহামানব বলিয়া?

বিপিন মহামানব! ভাবিলেও মাধবীলতার হাসি আসে। কিন্তু ধারণাগুলি দিয়া—আপনা হইতে মনের মধ্যে যে সব ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে, সেই ধারণাগুলি দিয়া—বিপিনের বিচার না করিলে, বিপিনের দোষগুণ নিরপেক্ষভাবে ওজন করিতে বলিলে, বিপিন সত্যই পরিণত হয় মহামানবে।

নিজের সমস্যাগুলি নিয়া অত্যন্ত বিব্রতভাবে বিপিনের দিন কাটিতেছে, মাধবীলতার খবর নেওয়ার সময়ও বিশেষ পাইতেছে না, এমন সময় বিভূতি একদিন বাড়ী ফিরিয়া আসিল। মহেশের অসুখ উপলক্ষে তাকে বাড়ী ফিরিতে দেওয়া হইয়াছে। না বলিয়া গ্রাম ত্যাগ করিতে পারিবে না, সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত বাড়ীতে থাকিবে।

ছেলের চেহারা দেখিয়া বিভূতির মা কাঁদিয়াই আকুল। মহেশ বলিল 'কাঁদছ কেন? পাপ করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না?'

বিভূতি বলিল, 'খিদে পেয়েছে মা, খেতে দাও। খালি খেতে দাও, দিনরাত শুধু খেতে দাও, আর কিছু নয়।'

পরদিন ভোরবেলা মহেশ ছেলেকে নিয়া সদানন্দের চরণ বন্দনা করিতে বাহির হইল। চরণ বন্দনার উদ্দেশ্যে আশ্রমে যাইতেছে, একথা অবশ্য বিভূতিকে জানাইল না, শুধু বলিল, 'আমাদের একবার আশ্রম থেকে ঘুরিয়ে আনবি, চল্‌তো।'

'কি হবে আশ্রমে গিয়ে? এ্যাদ্দিন পরে এলাম, গাঁয়ের সকলের সঙ্গে দেখা-টেকা করি?'

'পরে দেখা করিস। আগে আশ্রম থেকে ঘুরে আসবি চল।'

কিন্তু বিভূতির কাছে আশ্রমের কিছুমাত্র আকর্ষণ ছিল না! গ্রামের চেনা মানুষগুলির সঙ্গে দেখা করিবার জন্যই মনটা তার ছটফট করিতেছিল। তার আসিবার খবরটা সে আসিয়া পৌঁছিবার অনেক আগেই গ্রামে ছড়াইয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই, তবু কাল কেউ তাকে দেখিতে আসে নাই বলিয়া বিভূতি একটু আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছে। তার সংস্পর্শে আসিতে কয়েকজনের ভয় হওয়া সম্ভব, অন্ততঃ ভয় ভাঙ্গিতে কিছুদিন সময় লাগিবে, কিন্তু চোরা গাইয়ের সঙ্গে কপিলা গাইয়ের বাঁধা পড়িবার আতঙ্কটা কি সকলের মধ্যেই এত বেশী প্রচণ্ড যে, একজন তার খবর নিতেও আসিল না?

না আসুক, বিভূতি নিজেই সকলের সঙ্গে দেখা করিয়া ভয় ভাঙাইয়া দিয়া আসিবে। আশ্রমে যাওয়ার প্রস্তাবে সে তাই ইতস্ততঃ করিতে থাকে।

আশ্রমে যাওয়ার নামে মাধবীলতা আনন্দে ডগমগ হইয়া বলে, 'তাই চলুন, আশ্রম দেখে আসবেন।'

বিভূতি হাসিয়া বলে, 'আশ্রম দেখা কি আর আমার বাকী আছে, ঢের দেখেছি।'

'সে আশ্রম আর নেই, কত পরিবর্ত্তন হয়েছে দেখে অবাক হয়ে যাবেন।'

বিভূতির জেলে যাওয়ার আগে সদানন্দের আশ্রম কেমন ছিল এবং তারপর আশ্রমের কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে, মাধবীলতার জানিবার কথা নয়, এটা তার শোনা কথা। মাধবীলতার উৎসাহ দেখিয়া বিভূতি আর আপত্তি করিল না, তিনজনে আশ্রমের দিকে রওনা হইয়া গেল—মহেশ, মাধবীলতা আর বিভূতি। বিভূতির মা গেল না, বলিল, 'আশ্রম মাথায় থাক, তোমরা ঘুরে এসো।'

বাড়ীর সামনে কাঁচা পথ ধরিয়া তিনজনে হাঁটিতে আরম্ভ করিয়াছে, শশধর আসিয়া জুটিল। আশ্রমে যাওয়ার একটা সুযোগও শশধর ত্যাগ করে না।

মহেশ মাধবীলতাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'হাঁটতে পারবে তো মা?'

মাধবীলতা হাসিয়া বলিল, 'আমাকে জিজ্ঞেস না করে বরং আপনার ছেলেকে জিজ্ঞেস করুন।'

মহেশ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'দুর্গা, দুর্গা। সত্যি ওর চেহারাটা বড় খারাপ হয়ে গেছে।'

আশ্রমে পৌছিয়া প্রথমেই দেখা হইয়া গেল রত্নাবলীর সঙ্গে। মাধবীলতাকে দেখিয়া সে একগাল হাসিয়া বলিল, 'বেঁচে আছিস?'

মহেশ তাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কেমন আছ মা?'

কাছেই একটা মোটা গাছের গুঁড়ি পড়িয়াছিল, কদিন আগে গাছটা কাটা হইয়াছে। বিভূতি গুঁড়িতে পা ঝুলাইয়া বসিয়া পড়িল, কিছুক্ষণ বিশ্রাম না করিয়া সে আর নড়িবে না।

মাধবীলতা বলিল, 'কাঠপিঁপড়ে হুল ফুটিয়ে দেবে কিন্তু।'

বিভূতি বলিল, 'দিক, গোখরো সাপ কামড়ালেও এখন আমি নড়ছি না।'

তখন সেইখানে কাঠের গুঁড়িতে বসিয়া সকলে গল্প আরম্ভ করিয়া দিল। শীতের সকালের প্রথম মিষ্টি রোদ আসিয়া পড়িতে লাগিল সকলের গায়ে। আরামে এমন জমিয়া উঠিল আলাপ যে মনে হইতে লাগিল, সদানন্দের চরণ বন্দনার কথাটা মহেশও ভুলিয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে কুটীর হইতে বাহির হইয়া তাদের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবার সময় স্বয়ং সদানন্দকেও কেউ দেখিতে পাইল না। খেয়াল হইল সদানন্দ যখন সামনে আসিয়া রোদ আড়াল করিয়া দাঁড়াইল।

প্রথমে প্রণাম করিল মহেশ, তারপর মামার অনুকরণে শশধর। রত্নাবলী প্রণাম করায় মাধবীলতাও ঢিপ, করিয়া একটা প্রণাম ঠুকিয়া দিল।

সদানন্দ জিজ্ঞাসা করিল, 'কেমন আছ মাধু?'

মাধবী বলিল, 'ভালই আছি।'

মহেশ বিভূতিকে বলিল, 'এঁকে প্রণাম কর।'

আগের কথা সদানন্দের মনে ছিল, সে তাড়াতাড়ি বলিল, 'থাক্, থাক্।'

মহেশ জোর দিয়া আবার বলিল, 'প্রণাম কর বিভূতি, এঁর আশীর্ব্বাদে তুমি ছাড়া পেয়েছ।'

সকলে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বিভূতি উঠে নাই। বসিয়া থাকিয়াই সে দু'হাত একত্র করিয়া কপালে ঠেকাইয়া বলিল, 'নমস্কার, ভাল আছেন? অনেকদিন পরে দেখা হল। আপনার আশীর্ব্বাদ গবর্ণমেণ্টকেও টলিয়ে দিতে পারে, তা তো জানতাম না।'

সদানন্দ শান্তভাবে বলিল, 'আমার বলে নয়, আশীর্ব্বাদ আন্তরিক হলে ভগবানকে পর্য্যন্ত টলিয়ে দিতে পারে বাবা।'

বিভূতি আরও বেশী শান্তভাবে বলিল, 'ভগবানের কথা বাদ দিন, তিনি তো সব সময়েই টলছেন মাতালের মত। টাল সামলাতে প্রাণ বেরোচ্ছে আমাদের।'

মাধবীলতা চোখ বড় বড় করিয়া বিভূতির দিকে চাহিয়া থাকে। রত্নাবলীর সাদা দাঁতগুলি ঝক্ ঝক্ করে। অস্থির হইয়া ওঠে মহেশ। কি করিবে ভাবিয়া না পাইয়াই যেন প্রথম দিকে ব্যাকুলভাবে শুধু বলিয়া চলে, 'আহা', 'ওকি' আর 'ছি ছি'। তারপর হঠাৎ রাগ করিয়া, সোজা আর শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া, গম্ভীরকণ্ঠে ডাকে, 'বিভূতি!' বসা অবস্থাতেই বিভূতি বলে 'কেন'?

'পায়ে হাত দিয়ে এঁকে প্রণাম কর, নিজের ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চেয়ে নাও।'

'এঁকে আমার প্রণাম করতে ইচ্ছা হয় না বাবা। ক্ষমা চাওয়ার মত অন্যায় কথা কিছু বলি নি।'

'এঁকে আমি দেবতা মনে করে পূজা করি, আমার ছেলে তুই, এঁকে তোর প্রণাম করতে ইচ্ছা হয় না? যা মনে এল বলে বসলি মুখের ওপোর, তবু তোর অন্যায় কথা বলা হল না?'

বিভূতি নীরবে মাথা নাড়িল।

'করবি না প্রণাম ?'

'না।'

এবার প্রশান্তকণ্ঠে সদানন্দ বলিল, 'মহেশ, কি ছেলেমানুষী আরম্ভ করে দিলে তুমি ?'

'ছেলেমানুষী প্রভু ?'

'তুমি কি ভাব ওর প্রণাম পাওয়ার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে আছি ?'

'ত ভাবিনি প্রভু। ও প্রণাম করুক না করুক আপনার তাতে কি আসবে যাবে—সর্ব্বনাশ হবে ওর নিজের। ও যে আমার সন্তান প্রভু ?'

সদানন্দ অভয় দিয়া বলিল, 'ভয় নেই, ওর কিছু হবে না। প্রণাম নিয়ে আমি আশীর্ব্বাদ বিক্রী করি না মহেশ, আশীর্ব্বাদ করাটা আমার ব্যবসা নয়, ভুলে যাও কেন ? ছেলেমানুষের কথায় যদি আমি রাগ করি, আমি যে ওর চেয়েও ছেলেমানুষ হয়ে যাব।'

মহেশ ভক্তি-গদগদ কণ্ঠে বলিল, 'তা কি জানি না প্রভু ? আপনি দেবতা, আপনার কি রাগদ্বেষ আছে ? কিন্তু আপনাকে প্রণাম না করলে ওর অকল্যাণ হবে।'

'অনিচ্ছায় প্রণাম করার চেয়ে না করাই ভাল, মহেশ।'

'না প্রভু। প্রণম্যকে প্রণাম করতেই হয়। প্রণাম করতে করতে মনে ভক্তি আসে।—বিভূতি, প্রণাম কর এঁকে।'

বিভূতি নীরবে মাথা নাড়িল।

মহেশ আবার বলিল, 'বিভূতি, প্রণাম কর। এই দণ্ডে যদি প্রণাম না কর এঁকে, আমি যেমন আছি তেমনিভাবে যে দিকে দু' চোখ যায় চলে যাব, কোনদিন আর ফিরব না।'

বিভূতি শুকনো মুখে কোন রকমে বলিল, 'আমি পারব না বাবা।'

মাধবীলতার সব কথাতেই ফোড়ন দেওয়া চাই। পিতার আদেশ আর মিনতি যেখানে ব্যর্থ হইয়া গেল, যে দিকে দু' চোখ যায় চলিয়া যাওয়ার ভয় প্রদর্শন পর্য্যন্ত কাজে লাগিল না, সেখানে কাতরকণ্ঠে বিভূতিকে অনুরোধ না জানাইয়া সে পারিল না, 'আহা, এমন করে বলছেন সবাই, করুন না প্রণাম একবারটি ?'

এমন সময় আসিল বিপিন।

কারও দিকে বিপিন চাহিয়াও দেখিল না। সোজাসুজি মাধবীলতার কৈফিয়ৎ দাবী করিয়া বলিল, 'আমায় না জানিয়ে আশ্রমে এলে যে মাধু ?'

বিপিনের মুখ দেখিয়া আর গলার আওয়াজ শুনিয়া মাধবীলতার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। মহেশ বলিল, 'আমি ওকে এনেছি বিপিনবাবু।'

বিপিন তীব্রস্বরে ধমক দিয়া বলিল, 'চুপ করুন, আপনাকে আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিনি।'

প্রকাশ্যভাবে কেউ কোনদিন বিপিনকে উঁচু গলায় কথা বলিতে শোনে নাই—বিশেষতঃ সদানন্দের সামনে।

সকাল বেলাই এমন একটা জটিল অবস্থা সৃষ্টি হইবে কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই। মনে মনে সকলেই একটা শঙ্কা-জড়িত অস্বস্তি বোধ করিতে থাকে। বিভূতি সদানন্দকে প্রণাম করিতে অস্বীকার করায় যে খাপছাড়া কাণ্ড ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল, বিপিনের আবির্ভাবে এখনকার মত সেটা চাপা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু সে আর কতক্ষণের জন্য ? মহেশ চৌধুরী ছাড়িবার পাত্র নয়। সে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিয়া দিয়াছে, বিভূতি সদানন্দের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম না করিলে যেদিকে দু'চোখ যায় চলিয়া যাইবে। বিপিনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হইয়া গেলেই সে আবার ছেলেকে নিয়া পড়িবে।

কিন্তু কি বোঝাপড়া হইবে বিপিনের সঙ্গে ? মহেশ চৌধুরী কি চুপ করিয়া থাকিবে বিপিনের ধমক সহ্য করিয়া ? ধমকটা সদানন্দ দিলে সকলে অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করিত, সদানন্দ এমন প্রচণ্ড শব্দে ধমক দিলে এতটা খারাপ শোনাইত না। মহেশ চৌধুরীর মত ভক্তকে ধমক দিবার অধিকার সদানন্দের মত মহাপুরুষের থাকে এবং আগেও অনেকবার অনেক ছুতায় মহেশ চৌধুরীকে সে অপমান করিয়াছে। সদানন্দের অপমান অনেকটা গা-সহা হইয়া আসিয়াছে মহেশ চৌধুরীর। কিন্তু বিপিনের অপমান সে সহ্য করিবে কেন ? দুজনে যদি এখন কলহ বাধিয়া যায়।

মহেশ চৌধুরী কি বলে শুনিবার জন্য সকলে উৎকর্ণ হইয়া থাকে।

মহেশ চৌধুরীর মুখ দেখিয়া বিশেষ কিছু বুঝা যায় না। বিপিনের ধমকটা তার কানে গিয়াছে কি না, এ বিষয়েও যেন কেমন সন্দেহ জাগে। চাহিয়া সে থাকে মাধবীলতার মুখের দিকে। কিছুক্ষণের জন্য তার দৃষ্টি এমন তীক্ষ্ণ ও অস্বাভাবিক মনে হয় যে, এতদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পর তার একটা নূতন রূপ আবিষ্কারের সম্ভাবনায় শশধর ও সদানন্দের কেমন ধাঁধা লাগিয়া যায়।

মহেশ চৌধুরীর মুখ ধীরে ধীরে গম্ভীর হইয়া আসে। আকাশের দিকে একবার মুখ তুলিয়া উদাস কণ্ঠে সে বলে, 'মাধু আশ্রমে আসতে পাবে না, হুকুম দিয়েছিলেন, আমি জানতাম না বিপিনবাবু!'

মহেশ চৌধুরীর ভঙ্গিটাই মারাত্মক। তার উপর 'হুকুম' শব্দটা সকলের কানে যেন বিঁধিয়া যায়।

মাধবীলতার অপরাধ-ক্লিষ্ট মুখের গ্লানিমায় স্নায়বিক মূঢ়তার ভাবটাই এতক্ষণ স্পষ্ট হইয়াছিল, তবে মহেশ চৌধুরী ছাড়া সেটা কেউ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিয়াছিল কিনা সন্দেহ। নিজের প্রয়োজনে কে আর ওভাবে তরুণী মেয়ের মুখ দেখিতে শেখে? সোজাসুজি ভীরুতা আর কোমলতার অভিব্যক্তি বলিয়া ধরিয়া নেওয়ায় কত ভাল লাগিতেছিল সকলের, কেমন দরদ সকলে বোধ করিতেছিল মেয়েটার জন্য! কিন্তু ওরকম বর্ব্বরের মত মায়া করা মহেশ চৌধুরীর ধর্ম্ম নয়, ওরকম সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা তার নাই। মানুষের এই স্বগত রসানন্দরূপী পিপাসা-সৃষ্টির আগ্রহ ক্ষয় হইয়া যাওয়ায় অসংখ্য ছোট ছোট মুক্তির মধ্যে মহেশ শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে। মাধবীলতার ভীরু কোমল কাঁদ' কাঁদ' মুখখানা দেখিয়া মহেশ চৌধুরী ছাড়া আর কে বুঝিতে পারিত তার ভয় বা দুঃখ হয় নাই, আকস্মিক স্নায়বিক উত্তেজনায় সে একটু দিশেহারা হইয়া গিয়াছে? খোঁচা দিয়া তার আত্মমর্য্যাদার জ্ঞান জাগাইয়া তুলিবার এবং তার অবরুদ্ধ তেজকে মুক্তি দিবার বুদ্ধি বা সাহস আর কার হইত? সোণালী রোদের মতই মাধবীলতার মুখে লালিমার আবির্ভাব ঘটিতে দেখিয়া মহেশ আবার বলে, 'এবারকার মত ওকে মাপ করুন বিপিনবাবু। আপনি ওকে বারণ করেছেন জানলে—' বিপিনের আদেশ অমান্য করায় মাধবীলতার যে অকথ্য অপরাধ হইয়াছে তার বিরাটত্ব অনুভব করিয়া মহেশ চৌধুরী নিজেই যেন সঙ্কুচিত হইয়া যায়, কোন রকমে এবারকার মত মেয়েটাকে বিপিনের ক্ষমা পাওয়াইয়া দিবার ব্যাকুলতায় যেন দিশেহারা হইয়া যায়। মাধবীলতার হইয়া সে যেন বিপিনের পায়ে ধরিয়া বসিবে।

এবার মাধবীলতা ফোঁস করিয়া উঠে, 'বারণ করেছেন মানে? উনি বারণ করবার কে? বেশ করেছি আমি আশ্রমে এসেছি।'

বিপিন বলে, 'আশ্রমটা বেড়াবার যায়গা নয় মাধু।'

মাধবীলতা ব্যঙ্গ করিয়া বলে, 'কি করবেন, মারবেন?'

সদানন্দ বলে, 'আহা, কি আরম্ভ করে দিয়েছ তোমরা?'

সে কথা কানে না তুলিয়া বিপিন রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলে, 'ছেলেমানুষী কোরো না মাধু। আমার সঙ্গে এসো।'

মহেশ তাড়াতাড়ি সায় দিয়া বলে, 'যাও মা, যাও। বিপিন বাবুর সঙ্গে যাও।'

মহেশ চৌধুরী ফোড়ন না দিলে হয়তো মাধবীলতার উদ্ধত ভাবটা ধীরে ধীরে নরম হইয়া আসিত। বিপিনের সংযমহারা রাগ দেখিতে ভিতরে ভিতরে তার যেন কেমন ভাল লাগিতেছিল। সেদিন রাত্রের কথা মাধবীলতার মনে পড়িয়া গিয়াছে, বিপিন যখন তাকে মহেশ চৌধুরীর বাড়ী রাখিয়া আসিয়াছিল। সে রাত্রের স্মৃতি ভুলিবার নয়, মাধবীলতা ভুলিয়াও যায় নাই। হঠাৎ তার খেয়াল হইয়াছে, সে রাত্রে বিপিন তার সঙ্গে যে আশ্চর্য্য ব্যবহার করিয়াছিল, তার মাথাটা বুকে চাপিয়া ধরিয়া ব্যাকুল হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল সে যেখানে যাইতে চায় পাঠাইয়া দিবে, তাকে বাড়ী কিনিয়া দিবে, তার নামে ব্যাঙ্কে টাকা রাখিবে, মাঝখানে কয়েকদিনের ছেদ দিয়া আজ দিনের আলোয় বিপিন যেন সেই ব্যবহারেরই জের টানিয়া চলিয়াছে। তফাৎ কেবল এইটুকু যে, মাঝখানের সময়টাতে সে যেন সত্যসত্যই নিঃসন্দেহে বিপিনের হইয়া গিয়াছে। বিপিনের রাগ আর ধমক দিয়া জোর গলায় কথা বলার মধ্যে পর্য্যন্ত মাধবীলতা স্পষ্ট অনুভব করিতে পারে বিপিন জোর খাটাইতেছে আত্মীয়তার, অন্য কিছু নয়। সে যেন বিপিনের মেয়ে বা বৌ বা ওইরকম একটা কিছু।

কিন্তু মহেশ চৌধুরী ফোড়ন কাটায় এতগুলি মানুষের সামনে বিপিনের ব্যবহারে মেজাজটা তার চড়িয়াই যাইতে থাকে। সকলের সামনে এভাবে শাসন করিতে গেলে মেয়ে বা বৌও চটিয়া যায় বৈকি!

মাধবীলতা বিভূতির সামনে গিয়া দাঁড়াইল, বিপিনের দিকে পিছন ফিরিয়া।

'চলুন আমরা ফিরে যাই বিভূতিবাবু। যাবেন?'

'আমার ওখানে একবার আসবে না মাধু?'—সদানন্দ জিজ্ঞাসা করিল।

মহেশ সঙ্গে সঙ্গে বলিল, 'যাও মা যাও, প্রভুর মন্দিরে একবার যাও।'

মাধবীলতা জবাবও দিল না।

বিভূতি এতক্ষণে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। মাধবীলতাকে সঙ্গে করিয়া সে বাড়ীর দিকে রওনা হওয়ার উপক্রম করে, সকলে দাঁড়াইয়া থাকে কাঠের পুতুলের মত। বিভূতি অস্বীকার করিয়াছে প্রণাম করিতে, মাধবীলতা ফিরিয়া চলিল আদেশ অমান্য করিয়া। চারিদিকে বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে না কি সদানন্দের বিরুদ্ধে? আশ্রমে দাঁড়াইয়া সদানন্দকে এভাবে অপমান আর অমান্য করা! দাঁতের বদলে রত্নাবলীর চোখ দু'টি চকমক করে। শশধর বোকার মত হাঁ করিয়া থাকে। কি করিবে বুঝিতে না পারিয়া বিপিন অসহায় ক্রোধ দমন করার জন্য একটা বিড়ি ধরায়। সদানন্দের ভীতিকর গাম্ভীর্য্য ঘনীভূত হইয়া আসে। বিপিন আর সদানন্দ দুজনের মনেই প্রায় এক ধরণের অদম্য ইচ্ছা জাগে—ছুটিয়া গিয়া মাধবীলতাকে বগলদাবা করিয়া বিভূতিকে আথালি-পাথালি প্রহার করা।

মহেশ ডাকে, 'বিভূতি।'

বিভূতি দাঁড়ায় এবং মুখ ফিরাইয়া তাকায়। মাধবীলতা দাঁড়ায় কিন্তু মুখ ফিরায় না।

মহেশ বলে, 'এখানে এসো।'

বিভূতি কাছে আসে এবং হাই তোলে। মাধবীলতা সঙ্গে আসে কিন্তু মুখ নীচু করিয়া থাকে।

মহেশ বলে, 'প্রভুকে প্রণাম কর।'

সদানন্দ বলে, 'তুমি বড় বাড়াবাড়ি করছ মহেশ।'—সদানন্দের গলা কাঁপিয়া যায়।

মহেশ হাত জোড় করিয়া বলে, 'বাড়াবাড়ি প্রভু? ও যদি আপনাকে এখন প্রণাম না করে, আমার যে যেদিক দুচোখ যায় চলে যেতে হবে প্রভু।'

সদানন্দ বলে, 'তাই যাও তুমি, বজ্জাত কোথাকার।'

মহেশ তখনও হাত জোড় করিয়া বলে, 'ওকে প্রণাম না করিয়ে কেমন করে যাব প্রভু?'

সদানন্দ বাক্যহারা হইয়া থাকে। মহেশ বলে, 'বিভূতি, প্রণাম কর প্রভুকে।'

বিভূতি নড়ে না। সদানন্দ আগাইয়া গিয়া সশব্দে মহেশের গালে বসাইয়া দেয় এক চড়।

কিছুদূরে চালার নীচে আশ্রমের অধিকাংশ নরনারী জমা হইয়াছিল; দু'চারজন করিয়া তখনও আসিয়া জুটিতেছিল। সদানন্দ আজ আত্মজ্ঞান লাভের প্রক্রিয়ায় ব্রহ্মচর্য্যের স্থান সম্বন্ধে উপদেশ দিবে। সকলে নিঃশব্দে সদানন্দের প্রতীক্ষা করিতে করিতে কাঠের গুঁড়িটার কাছে এদের লক্ষ্য করিতেছিল। ততদূর হইতে কথা বুঝা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, কিন্তু সকলের চলাফেরা আর অঙ্গভঙ্গির নির্ব্বাক অভিনয় দেখিয়া বেশ অনুমান করিতে পারিতেছিল যে, রীতিমত একটি নাটকীয় ব্যাপারই ঘটিতেছে। সদানন্দ আগাইয়া গিয়া মহেশ চৌধুরীর গালে যে চড় বসাইয়া দিয়াছে, এটা তারা স্পষ্টই দেখিতে পাইল। হঠাৎ একটা জোরালো গুঞ্জনধ্বনি উঠিয়া আবার তৎক্ষণাৎ থামিয়া গেল।

সদানন্দ সকলের আগে একবার চাহিয়া দেখিল চালার দিকে। অনেক সাক্ষীর সামনেই মহাপুরুষ সদানন্দ সাধু মহেশ চৌধুরীকে মারিয়া বসিয়াছে বটে। এখন কেবল ঘটনাটা সকলের চোখে পড়িল, পরে বিস্তারিত বিবরণ শুনিবে।

রত্নাবলীর চোখ আর দাঁত দুই-ই তখন চকচক করিতেছে। মাধবীলতা অস্ফুট শব্দ করিয়া মুখের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়াছে ডান হাতের চারটি আঙুল—ছেলেবেলায় মাধবীর এই অভ্যাসটা ছিল, বড় হইয়া কোনদিন এভাবে সে মুখে আঙুল ঢুকাইয়া দেয় নাই।

থতমত খাইয়া গিয়াছিল সকলেই, কিন্তু দেখা গেল অবাধ্য বিভূতি বাপের অপমানের প্রতিকার করিতে বড়ই চটপটে। মহেশ চৌধুরীর মোটা বাঁশের ছড়িটি কাঠের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া রাখা ছিল। চোখের পলকে লাঠিটা তুলিয়া নিয়া সে সদানন্দের দিকে আগাইয়া আসিল। দেশের জন্য মানুষ খুন করার কেবল পরামর্শ করার জন্য এতগুলি বছর সে আটক থাকিয়া আসিয়াছে, আজ বাপের জন্য হয়তো সত্যসত্যই মানুষ খুন করিয়া বসিত। বাধা দিল মহেশ।

'ছি বিভূতি, ছি।'

বিভূতির হাতের লাঠি ছিনাইয়া নিয়া সদানন্দের পদতলে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া মহেশ চৌধুরী তার মাথা গুঁজিয়া দিল।

'আপনাকে রাগিয়েছি, আমায় মাপ করুন প্রভু। ছেলে আমার আপনাকে লাঠি নিয়ে মারতে উঠেছিল, আমায় মাপ করুন প্রভু।'

প্রায় আর্ত্তনাদ করার মত চীৎকার করিয়া বিভূতি বলিল, 'তোমার কি লজ্জাসরম নেই বাবা ?'

'কি বকছিস্ তুই পাগলের মত ? প্রণাম কর বিভূতি, প্রভুকে প্রণাম কর। ও বিভূতি, শীগগির প্রণাম কর প্রভুকে। আমি না তোর বাপ বিভূতি ? আমার দেবতাকে মারবার জন্ত তুই লাঠি তুলেছিস, হাত যে তোর খসে যাবে রে, কুষ্ঠ হবে যে তোর হাতে! শীগগির প্রণাম কর বিভূতি, প্রভুকে শীগগির প্রণাম কর।'

পাগল হইয়া গিয়াছে মহেশ চৌধুরী ? বিভূতি সভয় বিস্ময়ে সদানন্দের পদতলে বাপের সর্ব্বাঙ্গীণ আত্মোৎসর্গ চাহিয়া দেখে আর তার অভিনব মন্ত্রোচ্চারণ শুনিয়া যায়। মাধবীলতা কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলে, 'প্রণাম করে নিন্। তারপর ওঁকে নিয়ে বাড়ী যাই চলুন।'

বিভূতি একটু ইতস্ততঃ করিয়া সদানন্দকে প্রণাম করিবার জন্ত আগাইয়া যায়। মহেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সদানন্দের পা দুটিকে মুক্তি দেয়। হাত জোড় করিয়া নিবেদন জানায়, 'প্রভু, আশীর্ব্বাদ করুন, ছেলের যেন আমার সুমতি হয়।'

নয়

বিকালে মহেশ চৌধুরীর বাড়ীতে সকলে পিঠা খাইতে বসিয়াছে। খাওয়ার জন্ত বিভূতির লুব্ধ ব্যাকুলতা দেখিয়া তার মার চোখে জল আসিয়া পড়িতেছিল। ছেলে বাড়ী ফেরার পর বিভূতির মা আজকাল কেবল নানা রকম খাবারই তৈরী করে। বিভূতি খাইতে পারে না, সামান্ত কিছু খাইলেই তার পেট ভরিয়া যায়, দুর্ভিক্ষ পীড়িতের মত উগ্র খাওয়ার লোভের তার তৃপ্তি হয় না। তার চাহনি দেখিয়া কত কথাই যে মাধবীলতার মনে হয়। হঠাৎ শিহরিয়া উঠিয়া মাথায় সে একটা ঝাঁকুনি দেয়।

ভিতরের চওড়া বারান্দায় অর্দ্ধচন্দ্রাকারে সকলে বসিয়াছে, মুখোমুখি হওয়ার সুবিধার জন্ত। বৈকালিক জলখাবার শেষ হইতে কোন কোনদিন দু'ঘণ্টা সময়ও লাগিয়া যায়। রাজ্যের কথা আলোচনা হয় এই সময়। আজ কথাবার্ত্তা তেমন জমিতেছিল না। সকালের ঘটনায় একমাত্র মহেশ চৌধুরী ছাড়া সকলেই কমবেশী অস্বস্তি বোধ করিতেছে।

হঠাৎ বিভূতি বলিল, 'আচ্ছা বাবা, তুমি কি পাগল হয়ে গেছ ?'

মহেশ চৌধুরী হাসিয়া বলিল, 'কে আগে কথা তোলে দেখছিলাম। পাগলামী মনে হয়েছে তোদের, না ? কেন বল তো ? পাগলের কথা, কাজ, কোন কিছুর মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না, আমি তো খাপছাড়া কিছু বলিও নি, কিছু করিও নি।'

'বল নি ? কর নি ?'

'না। আমি আবোলতাবোল কথা কোনদিন বলি না, খাপ-ছাড়া কাজ করি না। মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যেতে পারে, তা সেটা সবারি হয়।'

'এরকম অহঙ্কার তো কখনও দেখিনি তোমার! নিজেকে প্রায় মহাপুরুষ দাঁড় করিয়ে দিচ্ছ।'

মহেশ চৌধুরী মাথা নাড়িল, 'তা করিনি, একটা সোজা সত্য কথা বলেছি। তোর অহঙ্কার মনে হল কেন জানিস্ ? তোর সঙ্গে কথা বলবার সময় আমার মনে আছে তুই আমার ছেলে, কিন্তু আমার বিচার করার সময় তুই ভুলে যাচ্ছিস যে আমি তোর বাপ। কথাটা প্রভুকে বললে অন্তভাবে বলতাম—শুনলে আমার বেশী বেশী বিনয় দেখে তুই চটে যেতিস, তখন তোর খেয়াল থাকত যে আমি তোর বাপ, আর নিজের বাপের আত্মমর্য্যাদা জ্ঞানের অভাব দেখে লজ্জায় দুঃখে অপমানে তোর মাথা হেঁট হয়ে যেত।'

এভাবে মহেশ চৌধুরীকে বলিতে মাধবীলতা কখনো শোনে নাই। সে একটু বিস্ময়ের সঙ্গে মহেশ চৌধুরীর কৌতুকোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মহেশ চৌধুরী আবার বলিল, 'আত্মমর্য্যাদা বলতে তোরা কি বুঝিস জানিস ? ফাঁকা গর্ব্ব, গোঁয়ার্ত্তুমি। মানুষের সঙ্গে সংঘর্ষ ছাড়া তোদের আত্মমর্য্যাদা টেঁকে না, ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের ঠোকাঠুকি লাগবে, দরকার হলে প্রকাশ্যেও হাতাহাতি হয়ে যাবে, লাঠি হাতে মারতে উঠবি, তবে তোদের আত্মমর্য্যাদা খাড়া থাকতে পারবে। কি বল মাধু, তাই নয় ?'

মাধবীলতার মুখ ভর্ত্তি ছিল, খাবারটা গিলিয়া কথা বলিতে হওয়ায় বড়ই সে লজ্জা পাইল।—'কি জানি, ওসব বড় বড় দার্শনিক কথা ভাল বুঝি না।'

মহেশ চৌধুরী হাসিয়া বলিল, 'বড় বড় দার্শনিক কথা আবার কখন বললাম ? জানলে তো বলব! আচ্ছা, কথাটা বুঝিয়ে বলছি তোমাকে।'

'থাক না, আমার না বুঝলেও চলবে।'

'উঁহু, তা চলবে না। কথাটা তোমায় না বুঝিয়ে ছাড়ব না।'

মহেশ চৌধুরীর একগুঁয়েমিতে মাধবীলতার হঠাৎ বড় হাসি পায়। মনে হয়, সে যদি কথাটা না বুঝে, সদানন্দের চরণ দর্শনের জন্য একদিন যেমন ধন্না দিয়াছিল, আজ সকালে যেভাবে বিভূতিকে সদানন্দের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করাইয়াছে, তেমনি একটা কিছু কাণ্ড মহেশ চৌধুরী আরম্ভ করিয়া দিবে।

'বুঝেও যদি না বুঝি ?'

মহেশ চৌধুরী শান্তভাবে বলিল, 'হেসো না, হাসতে নেই। বুঝবে বৈকি, বললেই বুঝবে। শোন বলি। সকালে বিপিনবাবুর সঙ্গে যে ঝগড়া করলে, মানুষটার মনে কষ্ট দিয়ে বাড়ীর দিকে চলতে আরম্ভ করলে, আত্মমর্য্যাদা বাঁচাবার জন্য তো ? তুমি ভাবলে, বিপিনবাবুর সঙ্গে ভাল-ভাবে কথা বললে সবাই তোমাকে ভীরু অপদার্থ মনে করবে, লোকের কাছে তোমার অপমান হবে। ব্যাপারটা কি বিশ্রী দাঁড়িয়ে গেল বল ত ? তুমিও উল্টেপাল্টে সারাদিন ওই কথাই ভাবছ, বিপিন-বাবুও ভাবছেন। তোমাদের দুজনের মনের শান্তি নষ্ট হয়ে গেছে। তুমি যদি হাসিমুখে দুটো মিষ্টি কথা বলতে, এক মুহূর্ত্তে বিপিনবাবুর রাগ জল হয়ে যেত। তুমিও চাইছিলে ঝগড়া না হয়ে বিপিন-বাবুর সঙ্গে ভাব হোক, বিপিনবাবুও তাই চাইছিলেন —আত্মমর্য্যাদা বাঁচাবার জন্য তোমাদের ঠোকাঠুকি হয়ে গেল। তোমরা সকলকে হিংসা কর কি না, তাই এমন হয়। নিজের যাতে কোন ক্ষতি নেই, পরের জন্য সেটুকু ত্যাগও করিতে পার না।'

মাধবীলতা কথা বলিল না।

বিভূতি বলিল, 'গালে যে চড় মারে, তার পায়ে লুটিয়ে পড়ার চেয়ে ওরকম ঝগড়া ঢের ভাল।'

মহেশ চৌধুরী বলিল, 'গালে চড় মেরেছেন, প্রভুর সঙ্গে আমার কি শুধু এইটুকু সম্পর্ক বিভূতি ? আমি তো চিরদিন প্রভুর পায়ে লুটিয়ে আসছি ? প্রভুকে যদি আগে থেকে দেবতার মত ভক্তি না করতাম, আজ গালে চড় মারার পর মানুষকে আমার ক্ষমা আর সহিষ্ণুতা দেখাবার জন্য প্রভুর পায়ে ধরতাম, তা হলে অন্যায় হত। তার মানে কি দাঁড়াত জানিস ? আমি যেন প্রভুর চেয়ে বড়। কিন্তু প্রভুর সম্বন্ধে আমার অহঙ্কার নেই, দীনতা নেই, উদারতা নেই—আমি সোজাসুজি তাঁকে দেবতার মত ভক্তি করি। গালে যখন উনি চড় মারলেন, আমি বুঝতে পারলাম উনি ভয়ানক রাগ করেছেন। আমার মনে বড় কষ্ট হল, তাই ওঁর পায়ে ধরলাম। উনি আমায় বড় ভালবাসেন বিভূতি—আমায় মারার জন্য না জানি মনে মনে কত কষ্ট পাচ্ছেন।'

বিভূতি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'মানুষের পক্ষে মানুষকে দেবতার মত ভক্তি করা—'

মহেশ চৌধুরী সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়া বলিল, 'উচিত নয়। মানুষ কখনও মানুষকে দেবতার মত ভক্তি করে না। কিন্তু সংসারে কটা মানুষ আছে বল তো ? যে মানুষ নয়, সে মানুষকে দেবতার মত ভক্তি করবে না কেন বল তো ? সবাই যদি মানুষ হত বিভূতি, পৃথিবীটা স্বর্গ হয়ে যেত।'

এবারও বিভূতি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'তোমার কথা ঠিক নয় বাবা। একজন মানুষ আরেকজনকে দেবতার মত ভয় ভক্তি করে বলেই সংসারে এত বেশী অমানুষ আছে—সবাই মানুষ হতে পারছে না। একজন মানুষের চাপে আরেকজন কুঁকড়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেকথা থাক— আমাকে কেন তুমি জোর করে ওঁকে প্রণাম করালে ? আমি তো ওঁকে দেবতার মত ভক্তি করি না। বরং—'

মহেশ চৌধুরী তাড়াতাড়ি বলিল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি। তুই আমার ছেলে বলে তোকে প্রণাম করিয়েছি। তুই ভক্তি করিস বা না করিস সে কথা ভিন্ন, তোকে দিয়ে ওঁকে প্রণাম করাবার ক্ষমতা থাকতেও যদি প্রণাম না করাতাম, আমার পক্ষে অন্যায় হত। অন্য কাউকে তো আমি জোর করে প্রণাম করাই না।'

বিভূতি মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিল।

সন্ধ্যার পর হঠাৎ স্বয়ং সদানন্দ মহেশ চৌধুরীর বাড়ী আসিল।

সকলে ভাবিল, বুঝি সকালবেলা মহেশ চৌধুরীর গালে চড় মারার প্রতিবিধান করিতে আসিয়াছে। ভক্তকে সদানন্দ আজ অনেক আদর করিবে।

মহেশ চৌধুরী তাড়াতাড়ি প্রণাম করিয়া বলিল, 'প্রভু ?'

সদানন্দ বলিল, 'মহেশ, বিপিন আমাকে আশ্রম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তাই তোমার কাছে এলাম। তোমার বাড়ীতে থাকব।'

দশ

একথা কে কল্পনা করিতে পারিয়াছিল যে, সদানন্দ সাধুর আশ্রম হইতে সদানন্দ সাধুকেই তাড়াইয়া দেওয়া হইবে। অন্য সকলের মুখের ভাব দেখিয়াই বুঝা গেল, কথাটা সত্যই কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই, কেবল মহেশের ভাব দেখিয়া মনে হইল না সে বিশেষ অবাক হইয়াছে। সে যেন এ রকম একটা কিছু প্রত্যাশাই করিতেছিল। বিস্ময় প্রকাশ করার বদলে সে দেখাইল রাগ।

'বটে। বিপিনবাবুর স্পর্দ্ধা তো কম নয়।

তারপর সদানন্দের সামনে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া হাত জোড় করিয়া উর্দ্ধমুখে সদানন্দের মুখের দিকে চাহিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিল, 'আপনি আমার এখানে থাকবেন প্রভু? আমার এত বড় সৌভাগ্য হবে, আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। আজ আমার জীবন সার্থক হল। এ বাড়ী আপনার, এ বাড়ীর মেয়ে-পুরুষ আপনার দাসদাসী।'

ব্যাপারটা কি হইয়াছে, কেন বিপিন হঠাৎ সদানন্দকে আশ্রম হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে, এ ক্ষমতা বিপিন কোথায় পাইল, সকলের মনে এ ধরণের কত যে প্রশ্ন জাগিতেছিল হিসাব হয় না। কিন্তু সদানন্দকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার সাহস কারও নাই। ভরসা না পাওয়ার জন্যই হোক অথবা অন্য যে কোন কারণেই হোক, মহেশ চৌধুরীও এ বিষয়ে একেবারে মুখ বুজিয়া ছিল।

অন্য কেউ কথা তুলিবে ভাবিয়া মাধবীলতা একটু অপেক্ষা করে, তারপর খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া বলিয়া বসে, 'আপনাকে তাড়িয়ে দিলেন কেন বিপিনবাবু?'

সদানন্দ কিছু বলিবার আগেই মহেশ চৌধুরী বলে 'কি যে তুমি বল মাধু? তাড়িয়ে আবার কে দেবে প্রভুকে? উনি রাগ করে চলে এসেছেন, তাও বুঝতে পার না?'

সদানন্দ বলে, 'না মহেশ, বিপিন আমায় তাড়িয়েই দিয়েছে।'

মহেশ বলে, 'তাই কি হয় প্রভু! আপনাকে তাড়াবার ক্ষমতা কারও নেই।'

সদানন্দ বলে, 'তা আছে বৈকি। আশ্রমটা বিপিনের সম্পত্তি। আমি আশ্রমের শিক্ষক হিসাবে ছিলাম, ক'বছরের মাইনে ছাড়া আর কিছু দাবী করতে পারব না। বিষয়বুদ্ধি তো নেই—'

'আপনার বুদ্ধির কাছে বিপিনবাবুর বিষয়বুদ্ধি!' মহেশ চৌধুরী একগাল হাসে, 'ক'বিঘা মেঠো জমি বিপিনবাবু নিজের নামে লিখে নিয়েছেন, আপনি জয় করেছেন মানুষগুলিকে। আশ্রম কখনো বিপিনবাবুর সম্পত্তি হতে পারে প্রভু? আপনাকে নিয়ে তবে তো আশ্রম। আপনি যেখানে থাকবেন সেখানটাই হবে আশ্রম। আপনি যখন চলে এসেছেন, আপনার সঙ্গে আশ্রমও চলে এসেছে।'

সজোরে নিশ্বাস ফেলিয়া গভীর আফশোষের সঙ্গে মহেশ আবার বলে, 'প্রথমটা রাগ হয়েছিল, এখন আবার বিপিনবাবুর জন্য মায়া হচ্ছে। বুদ্ধির দোষে মানুষ কি সর্ব্বনাশটাই নিজের করে।'

মহেশ চৌধুরী সদানন্দের বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া দিল। মহেশ চৌধুরীর ঘরবাড়ী সর্ব্বদাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, ঘষা-মাজা ধোয়া-মোছা নিয়া বিভূতির মা সব সময়েই ব্যস্ত হইয়া আছে। সবচেয়ে ভাল ঘরখানায় তাড়াতাড়ি সদানন্দের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল। পিতামহের আমলের প্রকাণ্ড খাটে আনকোরা নূতন তোষক পাতা হইল—একটু ছোট হইল তোষকটা। তা হোক, লোকের ব্যবহার করা তোষক তো আর সদানন্দকে দেওয়া যায় না। তোষক ঢাকা পড়িল গায়ে দেওয়ার মুগার চাদরে। বালিশের বদলে দেওয়া হইল ঝালর দেওয়া তাকিয়া, কেবল বিশেষ উপলক্ষে আসর পাতা হইলে যেগুলি কাজে লাগে। ঘরের এক কোণে পড়িল ঘরে বোনা কার্পেটের আসন, দুপাশে জ্বলিতে লাগিল ধূপধুনা আর কোণ ঘেঁষিয়া একটি মস্ত ঘিয়ের প্রদীপ। অভ্যর্থনার আরও কত ছোটবড় আয়োজনই যে মহেশ চৌধুরী করিল। কিছুকাল আগেও মহেশ চৌধুরীর বাড়ী ছিল নিস্তব্ধ, মহেশ আর তার ভাগ্নে শশধর এবং তাদের দুজনের দুটি স্ত্রী চুপচাপ এ বাড়ীতে দিনরাত্রি কাটাইয়া দিত, কারও মধ্যে যেন প্রাণ ছিল না। তারপর মাধবীলতা আসিয়াছে, বিভূতি আসিয়াছে, আজ আসিল সদানন্দ—মাধবীলতার পদার্পণের পর সেই যে একটু জীবনের সাড়া জাগিয়াছিল বাড়ীতে, আজ যেন তা চরমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে বিশেষ একটি উৎসবে।

সকলের মধ্যে চাঞ্চল্য আসিয়াছে, মুখে ফুটিয়াছে কথা। একজন কেবল আগেও যেমন চুপচাপ ছিল, এখনও তেমনি চুপচাপ থাকিয়া গিয়াছে। সে শশধরের ঘোমটা-টানা বৌ। কোন্ ফাঁকে কখন বাড়ীর কোন্ আড়াল হইতে আসিয়া সে

যে সদানন্দের সামনে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল এবং আবার নিজের অন্তরালে চলিয়া গেল, কেউ খেয়ালও করিল কিনা সন্দেহ। শশধরের বৌ যে বাড়ীতে থাকে, অধিকাংশ সময়ে তা টেরও পাওয়া যায় না।

মহেশ কেবল একবার একরাশি বাসন হাতে খিড়কি পুকুর যাওয়ার সময় উঠানের কোণে পিছন হইতে তাকে পাকড়াও করিয়া বলিল, বৌমা, তুমিই প্রভুর জন্য রান্না কোরো। চান করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যেমন করে ঠাকুরদেবতার ভোগ রান্না কর না, ঠিক তেমনি করে।'

শশধরের বৌ মামাশ্বশুরের সঙ্গে কথা বলে না। ডাক শুনিয়া মহেশ চৌধুরীর দিকে পিছন করিয়াই সে থমকাইয়া দাঁড়াইয়াছিল, ঠিক সেই অবস্থাতেই ঘোমটার মধ্যে মাথা নত করিয়া সে নীরবে সায় দিল। মহেশ চৌধুরী সরিয়া গেলে আর কিছু বলিবার নাই জানিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিল খিড়কির পুকুরের দিকে।

তারপর মহেশ জিজ্ঞাসা করিতে গেল, শশধরের বৌ স্নান করিয়া ভোগ রান্না করিয়া দিলে সদানন্দের আপত্তি নাই তো?

সদানন্দ বলিল, 'বাড়াবাড়ি কোরো না মহেশ, বাড়াবাড়ি কোরো না।'

মহেশ বলিল, 'না প্রভু।'

'সকলের জন্য যা রান্না হবে, আমিও তাই খাব। আমার ওসব নেই জান তো?'

'আপনি অনুমতি দিলে একটু বিশেষ ভাবেই রান্নাটা করাই প্রভু। আশ্রমের কথা আলাদা, এখানে—'

সদানন্দ হাসিয়া বলিল, 'তুমি আমায় টিকতে দেবে না মহেশ।'

মহেশও হাসিয়া বলিল, 'আপনাকে আমি আর ছাড়ব না প্রভু, আজ থেকে আপনি আমার হয়ে গেলেন।'

অন্য কেহ হইলে হয় তো একথার জবাবে তামাসা করিয়া বলিত, আজ তোমার সম্পত্তি হয়ে গেলাম মহেশ? কিন্তু ওসব রসিকতা সদানন্দের আসে না। মহেশ যে তাকে সত্যসত্যই স্থায়ীভাবে এখানে আটকাইয়া ফেলিবার বিরাট আয়োজন আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, সদানন্দের এটা যেন ভাল লাগিতেছিল না। বিপিন একবার রাগ করিয়া আশ্রম হইতে একদিনের জন্য কিছু না বলিয়া যখন চলিয়া গিয়াছিল, আশ্রমের পাশের আমবাগানটি যেবার সে বাগাইয়া আনে, তখন বিপিনের জন্য তার কি রকম মন কেমন করিয়াছিল, সদানন্দের মনে আছে। আজ নিজে রাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াও তার তেমনি মন কেমন করিতেছে। সেবার যেমন কেবলি মনে হইত বিপিন ফিরিয়া আসিবে, আজ তেমনি আশা হইতেছে বিপিন হয়তো ডাকিতে আসিবে, হাতে পায়ে ধরিয়া তাকে ফিরাইয়া নিয়া যাইবে।

মহেশ চৌধুরী বলে, 'আশ্রম থেকে আপনার জিনিষপত্র সব আনিয়ে নিই প্রভু?'

সদানন্দ বারণ করিয়া বলে, 'না, না, এখন থাক্। তাড়াতাড়ির কি আছে!'

জন্মের মত আশ্রম ত্যাগ করিয়া সদানন্দ চলিয়া আসিয়াছে, বলিয়া আসিয়াছে জীবনে আর কোনদিন বিপিনের ওই জমিদারীতে আর সে পা দিবে না। আশ্রমের সঙ্গে আর তার কিসের সম্পর্ক? শুধু তার নিজস্ব জিনিষপত্রগুলি যতক্ষণ আশ্রমে আছে, একটু যেন যোগাযোগ বজায় রহিয়াছে ততক্ষণ আশ্রমের সঙ্গে, ওই যোগাযোগটুকুও ঘুচাইয়া ফেলিতে সদানন্দের ইচ্ছা হয় না। তাছাড়া, সদানন্দের একটু ভয়ও হয়। জিনিষপত্রগুলি আনাইয়া নিলে বিপিন যদি আরও রাগিয়া যায়, তাকে ডাকিয়া ফিরাইয়া নিয়া যাওয়ার সাধ থাকিলেও যদি ওই কারণেই সে মতটা বদলাইয়া ফেলে!

মহেশ চৌধুরীও বোধ হয় এসব কথা অনুমান করিতে পারে। সদানন্দের আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে আরও একটু বাধা সৃষ্টি করিতে তার আগ্রহ দেখিয়া অন্ততঃ তাই মনে হয়। জিনিষগুলি আনাইবার অনুমতি পাওয়ার জন্য সে পীড়াপীড়ি করিতে থাকে। পরে আনাইলেও অবশ্য চলিবে, কিন্তু এখন আনাইলেই বা দোষ কি? এক মুহূর্ত্তের জন্যই বা সদানন্দ সামান্য একটু অসুবিধা ভোগ করিবে কেন? মহেশের তো তা সহ্য হইবে না।

কিন্তু সদানন্দ কিছুতেই অনুমতি দেয় না। বলে, 'আজ থাক মহেশ। কাল যা হয় করা যাবে।'

বিপিন তাকে হাতে পায়ে ধরিয়া ফিরাইয়া নিতে আসিবে, সদানন্দের এরকম আশা করার একটু কারণ ছিল। বিপিন সত্যই তাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। সহজ ভাষায় স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছে, আমার আশ্রম ছেড়ে চলে যাও। সদানন্দও রাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। তাকে এভাবে

তাড়াইয়া দেওয়ার জন্য বিপিনের মন খারাপ হওয়া আশ্চর্য্য নয়, তাকে ফিরাইয়া নিতে আসাও আশ্চর্য্য নয়।

সেদিন সকালে বিপিনের বিনা অনুমতিতে মাধবীলতার আশ্রমে আসা এবং সদানন্দের পায়ে বিভূতিকে প্রণাম করানো নিয়া যে কাণ্ডটা হইয়া গিয়াছিল, তারপর সারাদিন বিপিন আর সদানন্দের দেখা হয় নাই।

অনেক রাত্রে বিপিন সদানন্দের ঘরে আসিয়াই বলিয়াছিল, 'সদা, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এলাম তোকে। আগের মত আমার কথা শুনে চলবি কি চলবি না তুই ?'

'আমি কি তোর মাগনায় কেনা চাকর যে, তোর সব হুকুম মেনে চলব ?'

'ওসব বাজে কথা থাক। তোর সঙ্গে কোন দিন আমি ওরকম ব্যবহার করি নি, সে সম্পর্ক আমার নয় তোর সঙ্গে। আমার কথা শুনে চলা মানে আমার হুকুম মেনে চলা নয়। নিজেই ভেবে ত্থাখ, আমি বুদ্ধি খাটিয়ে আশ্রমের উন্নতির ব্যবস্থা করব, তুই আমার একটা কথা মানবি একটা কথা মানবি না, তা'হলে কি আশ্রম চলে ? আশ্রমের জন্য তোকে দরকার আছে, কিন্তু আশ্রম চালাবার ক্ষমতা তোর নেই, তুই যদি—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি। আসল কথাটা শুনি ?'

বিপিন একটু চুপ করিয়া থাকিয়াছিল। রাগ করিবে না এবং তর্ক করিবে না ঠিক করিয়াই সে এখন সদানন্দের কাছে আসিয়াছে, কিন্তু আজকাল কথায় কথায় সদানন্দের সঙ্গে তর্ক করিতে ইচ্ছা হয়, ঝগড়া করিবার সাধ জাগে।

'আসল কথাটা এই। আগে যেমন সব বিষয়ে আমার কথা শুনে চলতিস, তেমনিভাবে যদি না চলিস, তোকে দিয়ে আমার কাজ হবে না।'

'না হলে কি করবি ?'

'তোকে বিদেয় দেব।'

'বিদেয় দিবি! তোর তো স্পর্দ্ধা কম নয়। তোকে কে বিদেয় দেয় ঠিক নেই—'

'আমার আশ্রম থেকে আমাকে কে বিদেয় দেবে ?'—বিপিন হাসিয়াছিল।

সদানন্দ সগর্ব্বে বলিয়াছিল, 'আমি একটা মুখের কথা বললে সবাই তোকে কেটে মাটিতে পুঁতে ফেলবে, তা জানিস ?'

বিপিন নির্ব্বিকার ভাবেই বলিয়াছিল, 'বলেই ত্থাখ না মুখের কথাটা ?'

কথাটার ইঙ্গিত খুব স্পষ্ট। সদানন্দ হুকুম দিলেও আশ্রমের কেউ বিপিনের বিরুদ্ধে যাইবে না। এ বিষয়ে সদানন্দের মনেও বরাবর একটা খটকা আছে। সকলে তাকে ভক্তি করে বটে, কিন্তু সাধুতার মধ্যে যেমন ফাঁকি আছে, সকলের ভক্তির মধ্যেও তেমনি একটা ফাঁকি আছে বলিয়া সদানন্দের সন্দেহ হয়।

বিপিন একটা বিড়ি ধরাইয়া বলিয়াছিল, 'তুই বড় বোকা সদা। সবাই ঢিপ্ ঢিপ্ করে প্রণাম করে, আর তুই ভাবিস্ তোর জন্য প্রাণ দিতে সবাই ছটফট করছে। প্রাণ পাওয়া অত সহজ নয় রে! আমি তোকে ভড়ং শিখিয়েছি, সেই ভড়ং করে লোকের মনে তুই জন্মিয়েছিস একটা ভয়। তুই থাকিস একটা ধোঁয়ার আড়ালে, তোর সম্বন্ধে কেউ কিছু জানে না, সকলের সামনে মহাপুরুষের মত চলিস ফিরিস, সবাই তাই তোকে মহাপুরুষ ভেবে রেখেছে। কল্পনা-জগতের অবাস্তব প্রমাণ দেখিয়ে দেখিয়ে তোকে আমার মহাপুরুষ দাঁড় করাতে হয়েছে। তুই যে মহাপুরুষ নোস্, তার একটা বাস্তব প্রমাণও কেহ যাতে না পায়, সেইজন্যই তোকে আমার লুকিয়ে রাখতে হয়। সকলে তোকে কি রকমের ভয় ভক্তি করে জানিস ? কাল যদি আমি রটিয়ে দিই তোর অত্যাচারে মাধুকে আশ্রম ছাড়তে হয়েছে, সবাই তাই বিশ্বাস করে বসবে। মাধুকে নিয়ে কয়েকটা যে বোকামি করেছিস, সেগুলি হবে তার বাস্তব প্রমাণ। এত বড় সাধু তুই, কিন্তু তোর সাধুত্বের বাস্তব প্রমাণ নেই কিনা, তাই মাধুর সম্বন্ধে তোর বোকামির ওই কটা তুচ্ছ প্রমাণেই তোর সাধুত্ব ফেঁসে যাবে।'

'মাধুকে নিয়ে কি বোকামি করেছি ?'

'জানিস না ? তা, নাও জানতে পারিস। চোর কি করে জানিস, যখন দরকার নেই তখন বেশী বেশী সাধু ব'নে থাকে, আর চুরি করার সময় ভাবে কেউ জানতে পারছে না। তবু চোর ধরা পড়ে জেলে যায়। আজ সকালেই তো সকলের সামনে কেঁদে কেঁদে বললি, একবার আমার ঘরে আসবে না মাধু ? আহা, একটা মেয়ের কাছে কি করুণ মিনতি মহাপুরুষ সদানন্দের! মাধু মুখ ফিরিয়ে গটগট করে চলে গেল। কথাটা কেউ মনে আনছে না তাই, কিন্তু একবার যদি কেউ সুর তোলে, কারও দু'বার ভাবতে হবে না কিসের মানে কি।'

এবার সদানন্দ রাগ করিয়াছিল। বলিয়াছিল, বিপিনের মনটাই কদর্য্য। কতদূর কদর্য্য, লাগসই উপমা দিয়াও বুঝাইয়া দিয়াছিল। বিপিন যা ভাবে, কেউ তা ভাবিবে না। সকলে তো বিপিন নয়, বিপিনের মত কুৎসিত মন তো নয় সকলের, বিপিন যেমন বড়লোকের পা-চাটা, ফন্দিবাজ, হীন, বিশ্বাসঘাতক মানুষ—

'তিন দিনের মধ্যে তুই আমার আশ্রম ছেড়ে চলে যাবি। আমি যাই হই, আশ্রমের কুটোটি পর্য্যন্ত আমার, তা মনে রাখিস। তুই সত্যি আমার চাকর—তোকে থাকবার কোয়ার্টার দিয়েছি, খেতে পরতে দিয়েছি, চাইলে মাইনে বাবদ কিছু টাকা পাবি, বাস্। আর কোন কিছু অধিকার তোর নেই।'

'আচ্ছা, রাজাসায়েবের সঙ্গে সে বোঝাপড়া হবে।'

'রাজাসায়েব? রাজাসায়েব কি করবেন? দুদিন আগে রাজাসায়েবের যা খুসী করার ক্ষমতা ছিল, এখন আর নেই। এখন সমস্ত কিছুর মালিক আমি। তুই কি ভাবিস সেবার গিয়ে আমি শুধু আমবাগানটা বাগিয়ে এনেছি? সব নিজের দখলে এনেছি। টাকা পয়সার মালিক তো ছিলাম প্রথম থেকেই, এবার জমিজমারও মালিক হয়েছি। কি করবেন বল্ রাজাসায়েব, ক'বিঘা জমির জন্য ছেলেকে তো আর জেলে পাঠাতে পারেন না।'

'জেল!'

'আমি না বাঁচিয়ে দিলে, মাধুর জন্য নারাণবাবুর জেল হত বৈকি।'

'ও!'

সদানন্দ চুপ করিয়া ছিল অনেকক্ষণ।

'আশ্রমের আয়ে প্রথম থেকে তোর অধিকার ছিল?'

'ছিল বৈকি। আমার নামে আশ্রম হল, আশ্রমের আয় আমার হবে না? লোকসান হলেও অংশ আমার ঘাড়ে চাপত। প্রথমে ক'জনকে নিয়ে কতটুকু আশ্রম হয়েছিল মনে আছে সদা? তখন তোরা ভাবতেও পারিসনি একদিন আশ্রম এতবড় হবে—দিনরাত কেবল কানের কাছে ঘ্যান ঘ্যান করতিস, আশ্রম চলবে না, আশ্রম চলবে না। রাজাসায়েবও আশ্রমের এ রকম উন্নতির কথা ভাবতে পারেননি, তাই প্রথম দফায় অল্প জমি আমাকে একেবারে দান করে দিয়েছিলেন। পরের দফায় যখন জমি দিলেন, তখন করলেন কি জানিস, এত সব অধিকার চেয়ে বসলেন যে, আশ্রম নিয়ে যা খুসী করতে পারেন। আমি তাতেই রাজী হয়ে গেলাম। জানতাম, একদিন সমস্ত ক্ষমতা আবার আমার হাতেই ফিরে আসবে।'

এক মুহূর্ত্তের জন্য বিপিন থামিয়াছিল, তারপর আবার বলিয়াছিল, 'এসব কথা তোকে বলতাম না, তোকে আর রাখা চলবে না বলেই বললাম। আমার আশ্রম ছেড়ে তুই চলে যা ভাই, দোহাই তোর। গোলমাল তুই করতে পারিস, কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে না, যেতে তোকে হবেই। গোলমাল না করে যদি চলে যাস, আশ্রমের এতদিনের লাভের একটা ভাগ বরং তোকে দেব, যতই হোক, এতদিন তো তুই আশ্রমের উন্নতিতে সাহায্য করেছিস, কিছু দাবী তোর আছে। ওই টাকায় যেখানে খুসী নিজের একটা ছোটখাট আশ্রম তুই খুলতে পারবি।'

রাত্রি বাড়িবার জন্যই ঘরের আলোটার জ্যোতি যেন একটু ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে বলিয়া মনে হইয়াছিল। দুজনে চুপ করিয়া থাকিয়াছে। বিপিন একবার ভাল করিয়া মুখখানা দেখিয়াছে সদানন্দের, সদানন্দ একবার ভাল করিয়া মুখখানা দেখিয়াছে বিপিনের। ব্যাপারটা গুরুতর, তাই তারা ভিন্ন কে বুঝিবে কি গুরুত্ব সেই দেখার। দুজনে তারা বন্ধু, বন্ধুর মধ্যে ছাড়া এমন ব্যাপার ঘটে না, এ রকম বিচ্ছেদের ব্যবস্থা হয় না। সদানন্দ কি বলিত অনুমান করা কঠিন, বিপিন একটা খাপছাড়া কথা বলিয়া বসায় সে আর মুখ খোলে নাই।

'আরও একটা জিনিষ তোকে দিলাম সদা। মাধুকে তুই নিস্। ওকে দিয়ে আমার আর দরকার নেই।'

বিপিনের শেষ কথাটার কোন মানে হয়? মাধবীলতাকে সে দান করিয়া দিল, মাধবীলতা যেন তার সম্পত্তি! আশ্রমটা সম্পূর্ণরূপে নিজের দখলে আনার জন্য এতদিন মাধবীলতাকে তার দরকার ছিল, এখন আর দরকার নাই, তাই বন্ধুকে দিয়া দিয়াছে! কেমন লাগে কথাটা ভাবিতে? মনটা কি রকম জ্বালা করে? কে বলিয়াছে বিপিনকে, মাধবীলতাকে তার দরকার আছে?

তবু বিপিনের কথায় একটা ইঙ্গিত নিন্দনীয় অভিপ্রায়ের ধারাবাহিক অবাধ্যতার মত মনের মধ্যে পাক খাইয়া বেড়ায়। মাধবীলতাকে নিয়া সদানন্দ এবার যা খুসী করিতে পারে, বিপিনের দিক হইতে এতটুকু বাধার সৃষ্টি হইবে না।

মাধবীলতাকে বিপিন আশ্রয়ে আনিয়াছিল কিন্তু ওর সম্বন্ধে সমস্ত দায়িত্ব তার শেষ হইয়া গিয়াছে। হয়তো এতটুকুই ছিল বিপিনের আসল বক্তব্য। মাধবীলতার সম্বন্ধে বন্ধুকে অভয় দেওয়া।

মহেশ যখন সদানন্দকে তার ঘরে একা বিশ্রাম করিবার সুযোগ দিয়াছে, সকলকে বারণ করিয়া দিয়াছে ঘরে যাইতে, তখন মাধবীলতা আসিয়া হাজির হয়।

'ব্যাপার কি বলুন তো?'

'এসো মাধু। বোসো।'

'বসছি, কিন্তু ব্যাপারটা কি হ'ল?'

'ব্যাপার আর কি হবে, ঝগড়া করে চলে এলাম। ও রকম স্বার্থপর ছোটলোকের সঙ্গে মানুষের পোষায়? এতদিন সহ্য করেছিলাম, আর সহ্য হল না।

মাধবীলতা মুখ গম্ভীর করিয়া বলে, 'আপনাদের দিয়ে কোন ভাল কাজ হতে পারে না। খালি নিজেদের মধ্যেই মারামারি করবেন তো কাজ হবে কি। ছি ছি, নিজের নিজের স্বার্থচিন্তাই যদি করবেন দিনরাত, এসব কাজে কেন আসেন আপনারা?'

সদানন্দ গম্ভীরভাবে একটু হাসিয়া বলে, 'স্বার্থচিন্তাই যদি করতাম মাধু, আশ্রম ছেড়ে আজ চলে আসতে হত না। বিপিনের বদলে আশ্রমটা আমিই দখল করতাম।'

'পারলে তা করতেন।'

মাধবীর মন্তব্যে সদানন্দ রাগ করিয়া বলে, 'আমাকে কি তুমি বিপিনের মত অপদার্থ ভাব?'

'বিপিনবাবুকে আমি অপদার্থ ভাবি না।'

'মহাপুরুষ ভাব বুঝি?'

সদানন্দের ব্যঙ্গের জবাবে মাধবীলতাও ব্যঙ্গ করিয়া বলে, 'বিপিনবাবু কেন মহাপুরুষ হবেন, মহাপুরুষ তো আপনি।'

মাধবীলতা আর সে মাধবীলতা নাই। সদানন্দের কাছে সব রকম চাপল্য হারাইয়া আর সে জড়সড় হইয়া যায় না, ভয়ে ভয়ে হিসাব করিয়া কথা বলে না, অনায়াসে ব্যঙ্গ করে। মাধবীলতার সঙ্গে সদানন্দের ব্যবহারও অবশ্য বদলাইয়া গিয়াছে। বাহিরের সকল ভক্তের সঙ্গে আলাপ করার অভ্যস্ত ভঙ্গিতেই প্রথম প্রথম সে মাধবীলতার সঙ্গে আলাপ করিত, মাঝে মাঝে সব গোলমাল হইয়া যাইত বটে, কিন্তু তাও যেন ছিল ছেলেমানুষী ভাবপ্রবণতার আবরণে মানবীকে দেবতার প্রশ্রয় দেওয়া, দেবতার বাড়াবাড়ি অন্তরঙ্গতার জবাবেও যাতে মাথা তুলিবার সাহস মানবীর হয় না। কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে মাধবীলতার সঙ্গে আলাপ করাটা তার নামিয়া গিয়াছে বিপিনের সঙ্গে আলাপ করার স্তরে।

মাধবীর আগের মন্তব্যে সদানন্দ রাগ করিয়াছিল, এবারকার ব্যঙ্গে হাসিয়া বলে, 'তোমার কাছে তাই বটে। আমাকে মহাপুরুষ না ভেবে তো তোমার উপায় নেই।'

'কেন?'

'তোমাকে যে তাহলে ভ্রষ্টচারিণী হতে হবে।'

মুখ মাধবীর লাল হয় না, বিবর্ণ হইয়া যায়। ধীরে ধীরে উঠিয়া সে বাহিরে চলিয়া যায়।

সদানন্দ নীচু গলায় ব্যগ্রভাবে বলে, 'রাগ করলে মাধু? শোন, শুনে যাও—'

কিন্তু মাধবীলতা আজকাল বড়ই অবাধ্য হইয়াছে, কোন কথাই শুনিতে চায় না।

সদানন্দ যতই আশা করুক, বিপিন তো আসেই না, আশ্রম হইতে কোন শিষ্যও আসে না। সদানন্দ কারও কাছে কিছু বলিয়া আসে নাই, আশ্রমের শিষ্যদের কিছু জানাইবার কথা ভাবিতেও তার সঙ্কোচ হইতেছিল। বিপিন তাদের কি বুঝাইয়াছে, সেই জানে। হয়তো আশ্রমের কেউ এখনও জানিতেই পারে নাই, সদানন্দ চিরদিনের জন্য চলিয়া গিয়াছে অথবা সদানন্দ বাগবাদায় মহেশ চৌধুরীর বাড়ীতে গিয়া উঠিয়াছে। হয়তো বিপিন তাদের বুঝাইয়াছে, সদানন্দ বিশেষ কারণে কিছুদিন মহেশ চৌধুরীর বাড়ীতে বাস করিতে গিয়াছে, তাকে গিয়া কারও দর্শন করা বারণ। বিশেষ কারণটাও হয়তো বিপিন সকলকে ইঙ্গিতে জানাইয়া দিয়াছে। মাধবীলতার আকর্ষণ।

মহেশ চৌধুরীর বাড়ীতে আসিয়া উঠিলে বিপিন যে এমন একটা ইঙ্গিত করার সুযোগ পাইবে, এখানে আসিবার আগে সদানন্দের সেটা খেয়াল হয় নাই। যাই হোক, এখন নানাভাবে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কথাটা সে ভাবে। মাধবীলতা এখানে আসিবার কয়েকদিন পরে সেও আসিয়া হাজির হইয়াছে, মাধবীলতার সঙ্গে তার নাম জড়াইয়া কলঙ্ক রটানোর পক্ষে এ একটা জোরালো যুক্তিই বটে। ভাবিতে ভাবিতে মাথা গরম হইয়া উঠিলে এই বলিয়া সদানন্দ নিজেকে সান্ত্বনা দেয় যে, বিপিন কি বলিয়াছে কি বলে নাই না জানিয়া নিজের মনের অনুমান নিয়া বিচলিত হওয়ার কোন

কারণ হয় না। হয়তো ক্ষতিকর কিছুই বিপিন বলে নাই, সদানন্দের অন্তর্দ্ধানের একটা সাধারণ ও সঙ্গত কারণই সকলকে জানাইয়াছে। আর যদি সত্য সত্যই তাকে ফিরাইয়া নিয়া যাওয়ার ইচ্ছা বিপিনের জাগিয়া থাকে, তবে হয় তো সেই সঙ্গে একথাও সকলকে জানাইয়া দিয়াছে যে, কয়েকদিন পরেই সাধুজী আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

আশ্রমের কেউ না আসুক, আশে পাশের গ্রামের নরনারী দলে দলে সদানন্দকে দর্শন ও প্রণাম করিতে আসে। প্রথমে ঝোঁকের মাথায় সদানন্দ এখানে সকলের কাছে নিজের আশ্রমত্যাগের ভিতরের ব্যাপারটা ঘোষণা করিয়া ফেলিয়াছিল, তারপর ভাবিয়া চিন্তিয়া মহেশ চৌধুরীকে বলিয়া দিয়াছে, কথাটা কয়েকদিন যেন বাহিরে প্রকাশ না পায়।

'এখন সকলকে জানিও, আমি এমনি কয়েক-দিন তোমার এখানে থাকতে এসেছি।'

'প্রভু?'

সদানন্দ বুঝিতে পারিয়াছে।

'না, মিথ্যে কথা তোমায় বলতে বলিনি মহেশ। তোমরা যে জানো আমি কেন আশ্রম ছেড়ে এসেছি, একথা অস্বীকার করবে কেন? শুধু বলবে যে, কারণটা এখন প্রকাশ করা হবে না।'

পরদিন সকালেই দলে দলে দর্শনার্থীর সমাগম ঘটায় মহেশ বারণ না মানিয়া সব কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে ভাবিয়া সদানন্দ প্রথমটা বড়ই রাগিয়া যায়।

মহেশ চৌধুরী বলে, 'আজ্ঞে না, আমি কিছুই বলি নি। আপনি এখানে এসেছেন জেনে সকলে প্রণাম করতে আসছে।'

'আমি এখানে এসেছি, একথাটাও এত তাড়া-তাড়ি নাই বা ছড়িয়ে দিতে মহেশ? দু'দিন একটু শান্তিতে থাকতাম।'

'আপনি এসেছেন, একথা কি ছড়িয়ে দেবার দরকার হয় প্রভু? মুখে মুখে খবর ছড়িয়ে যায়। সূর্য্যকে কি লুকিয়ে রাখা চলে প্রভু। কাল সকালে যখন এলেন, তখনি গাঁয়ের অর্দ্ধেক লোক জেনে গেছে আপনি এসেছেন। কালও অনেকে এসেছিল, আমি আপনাকে বিরক্ত করতে দিই নি। আজ আসতে বলে দিয়েছিলাম।'

সকলে আসে, প্রণাম করিয়া যায় এবং অনেকে প্রণামীও দেয়। মাধবীলতা কাছে উপস্থিত থাকিলে কেউ কেউ কৌতূহলের দৃষ্টিতে তাকে ছাখে, কৌতূহলের সঙ্গে মেশানো থাকে ভয়। কে জানে, মাধবীলতার সম্বন্ধে তাদের মনে কি কল্পনার ছায়া ভাসিয়া আসিতে সুরু করিয়াছে। মেয়ে দরকার হয়, এমন সাধনাও তো সাধু-পুরুষেরা করে, শব-সাধনার মত যে সব সাধনার কাল্পনিক বিবরণ শুনিলেই সাধারণ মানুষের রোমাঞ্চ হয়।

প্রণামী নিয়া একটু বিপদ হয়। প্রণামী নেওয়া হইবে কিনা, সদানন্দও ঠিক করিতে পারে না, মহেশও ঠিক করিতে পারে না। প্রথমে মুখ খোলে মহেশ।

'কি করব প্রভু?'

'তুমি কি বল মহেশ?'

'আমার মনে হয়, প্রণামী এখন না নেওয়াই ভাল। এখন প্রণামী নিলে যেন নিজের জন্য নেওয়া হবে প্রভু। আশ্রম খোলা হলে তখন আশ্রমের জন্য প্রণামী নিলে দোষের হবে না।'

শুনিয়া সদানন্দ ভাবে, মহেশ তবে তাকে নিয়া নূতন একটি আশ্রম খুলিবার কল্পনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে? কে জানে, প্রথম হইতেই মনে মনে মহেশের এ মতলব ছিল কি না। হয়তো এ রকম একটা উদ্দেশ্য নিয়াই তাকে বাগানোর জন্য এতকাল মহেশ হাজার অপমান সহিয়াও আশ্রমে যাতায়াত করিয়াছে, অতিভক্তির বন্যায় তাকে ভাসাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছে। প্রথম প্রথম মহেশকে একটু বোকা মনে হইত, কিন্তু এখন সময় সময় তাকে সদানন্দের বিপিনের চেয়েও চালাক মনে হয়।

না, ঠিক বিপিনের চেয়ে চালাক নয়, বিপিনের চেয়ে বুদ্ধিমান মনে হয়। বিপিনের সঙ্গে মহেশের পার্থক্য এত বেশী প্রকট যে, দুজনের বুদ্ধিকে এক শ্রেণীতে ফেলিতে মনে খটকা লাগে। মহেশও হয় তো বিপিনের মতই ভাল উদ্দেশ্যে ভড়ং করে, মিথ্যার আশ্রয় নেয়, মনে মনে ধারণা পোষণ করে যে, রোগীকে আর শিশুকে ভুলানোর মত জগতের পীড়িত বয়স্ক শিশুগুলিকেও দরকার মত ভুলাইলে দোষ হয় না, তবু যেন বিপিনের বেলা এসব মনে হয় অন্যায় কিন্তু মহেশের বেলা অন্যায়ের প্রশ্ন মনেও আসে না।

তবে, একথাও সত্য যে, বিপিনের ঘোরপ্যাঁচ বুঝা যায়। উদ্দেশ্য তার অতি মহৎ, এটা বুঝা গেলেও, প্যাঁচ যে কষিতেছে সে অতি জটিল, তাতে আর সন্দেহ থাকে না। মহেশের উদ্দেশ্য না

বুঝিলেও, কখনও জোর করিয়া ভাবা চলে না তার মধ্যে ঘোরপ্যাঁচ আছে, মতলব হাসিল করিবার জন্য তলে তলে সে চালিতেছে চাল।

কেন এমন হয়? দশজনের ভালর জন্য এক-জনের সর্ব্বনাশ করাটা বিপিন অন্যায় মনে করে না, কিন্তু কারও সামান্য একটু ক্ষতি করার চিন্তা মহেশের পক্ষে মনে আনাও সম্ভব নয়, এইজন্য? সদানন্দের মনে হয়, আরও অনেক কারণ আছে। মহেশের মধ্যে এমন কতকগুলি গুণ আছে, বিপিনের যা নাই। বিপিনের মধ্যে এমন কতকগুলি দোষ আছে, মহেশের যা নাই। কিন্তু আসল গুণ বা দোষ, যার শাখা-প্রশাখাই মানুষের মধ্যে ছোট বড় নানা রকম দোষগুণের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে, মানুষের তো দশটা থাকে না? কি সেই গুণ মহেশের এবং কি সেই দোষ বিপিনের অথবা কি সেই দোষের অভাব মহেশের এবং কি সেই গুণের অভাব বিপিনের, যার জন্য দু'জনের মধ্যে এতখানি পার্থক্য সম্ভব হইয়াছে?

ভাবিতে ভাবিতে সদানন্দ আনমনে বলে, 'আচ্ছা, এখন তবে প্রণামী নিও না।'

মনে হয়, সাধু সদানন্দ যেন মহেশ চৌধুরীকে এই কয়েকটি কথার মধ্যে নূতন একটি আশ্রম খুলিবার অনুমতিই দিয়া ফেলিয়াছে, মহেশ চৌধুরীর মুখখানা আনন্দে এমনি উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

এগার

দিন কাটিয়া যায়, আশ্রম হইতে বিপিনও আসে না, কোন শিষ্যও আসে না। সদানন্দ আকাশ পাতাল ভাবে মন খারাপ করিয়া। শিষ্যদের না আসিবার কারণটা যে সদানন্দ মোটামুটি অনুমান করিতে পারে না, তা নয়। বিপিনের কোন কারসাজি আছে নিশ্চয়। কিন্তু আশ্রমে কি এমন ভক্ত তার একজনও নাই, বিপিনের কোন কথায় কান না দিয়া যে তার সঙ্গে দেখা করিতে আসাটা দরকার মনে করে? মুখখানা তার বড় বিমর্ষ দেখায়। কেউ সেটাকে ভাবে গাম্ভীর্য্য, কেউ মনে করে গভীর চিন্তার ছাপ। যে বুঝিতে পারে সাধু সদানন্দের মুখখানা বিষণ্ণ দেখাইতেছে, সে ভাবে, সাধু সন্ন্যাসী মানুষের আবার মন খারাপ হওয়া কেন? মাধবীলতা মনের দুঃখে মাথা নাড়িয়া ভাবে, নাঃ, লোকটার একটুও মনের জোর নেই।

একদিন রাত্রি প্রায় আটটার সময় বিনা খবরে রত্নাবলী আসিয়া হাজির হয়। সঙ্গে কেউ নাই। কার একটা মোটা বাঁশের লাঠি হাতে করিয়া একাই এতখানি রাস্তা হাঁটিয়া আসিয়াছে।

মাধবীলতা চোখ কপালে তুলিয়া বলে, 'কি করে এলি!'

রত্নাবলী হাসিয়া বলে, 'এলাম।'

মাধবীলতা খুঁত খুঁত করিয়া বলে, 'দিনের বেলা এলেই হত, নয়তো কাউকে সঙ্গে নিয়ে—'

'চুপি চুপি এলাম যে লুকিয়ে।'

'কেন, লুকিয়ে কেন?'

'বিপিনবাবু টের পেলে তাড়িয়ে দেবে না আশ্রম থেকে?'

'দেয় দেবে তাড়িয়ে, এখানে এসে থাকবি তুই।'

'আহা, সেটা জানতে হবে তো আগে? এখানে থাকতে পাব কিনা, না জেনে আগে থেকে ওখানকার আশ্রয়টা তো আর ঘুচিয়ে দিতে পারি না।'

রত্নাবলী গোড়া হইতে হাসিতেছিল, এবার হাসিল শশধরের দিকে তাকাইয়া।

ঘরে অনেক লোক, কিছুক্ষণ আগে মহেশ চৌধুরীর চেষ্টায় এ ঘরে বাড়ীর সকলের ঘরোয়া মজলিস বসিয়াছে। হাতে পায়ে ধরিয়া সদানন্দকেও মহেশ এ মজলিসে টানিয়া আনিয়াছে। সতরঞ্চি বিছান প্রকাণ্ড চৌকীতে অন্য সকলে বসিয়াছে, কিছু তফাতে অন্য একটি ছোট চৌকীতে ঘরে বোনা সুদৃশ্য আসনে সদানন্দের বসিবার ব্যবস্থা। আশ্রমে সদানন্দের কুটীরে মাঝে মাঝে শিষ্য ও ভক্তদের মজলিসে সদানন্দ উপস্থিত থাকিত, নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করা, সদানন্দকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা, এসব অধিকার ভক্তদের কিছু কিছু থাকিত, তবু সে মজলিসের সঙ্গে এ মজলিসের অনেক তফাৎ। যেটুকু স্বাভাবিক হওয়ার স্বাধীনতা সেখানে সকলকে দেওয়া হইত, সদানন্দের সামনে সেটুকু স্বাধীনতা কাজে লাগানর সাহস কারও হইত না, সকলে কথা বলিত ভয়ে ভয়ে। এখানে মহেশ নিজেই বাজে গল্প আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল, রত্নাবলী যখন ঘরে ঢোকে, বিভূতি রস দিয়া দেশের কাহিনী বলিতেছে, সকলে মন দিয়া শুনিতেছে তার কথা, সদানন্দের দিকে কারও নজর নাই। বিপিন সদানন্দকে আড়ালে রাখিত তার অসাধারণত্ব অটুট রাখিবার জন্য, মহেশের সব ব্যবস্থাই যেন উল্টা, সে যেন সকলের সামনে আনিয়া আনিয়া সদানন্দের কৃত্রিম অসাধারণত্বের আবরণটি ঘুচাইয়া দিতে চায়।

বিভূতির গল্প শুনিতে শুনিতে সদানন্দ এই কথাটাই ভাবিতেছিল। বিভূতির মাও ঘরে আসিয়াছে, ছেলের দুর্দ্দশার রসালো কাহিনী শুনিতে শুনিতে তার চোখ ছলছল করিতেছিল। ঘরে আসে নাই কেবল শশধরের ঘোমটা-টানা বৌ। তবে তার অনুপস্থিতিটা কেউ একবার খেয়াল করিয়াছে কিনা সন্দেহ। বাড়ীর কারও চেতনায় নিজের অস্তিত্বের সাড়া না তুলিয়া বাঁচিয়া থাকিবার কঠিন সাধনায় বৌটি প্রায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ফেলিয়াছে।

রত্নাবলীর কথার জবাবে মহেশ চৌধুরী বলিল, 'তুমি তো আমার মেয়ে, মা? এখানে থাকতে পাবে কিনা, তাতে তো তোমার সন্দেহ থাকা উচিত নয় মা।'

রত্নাবলী এবার হাসিল না।—'না না, এমনি কথাটা বলেছিলাম মাধুকে তামাসা করে। থাকতে পাব বৈকি এখানে।'

'তুমি এখানে এসে থাকলে আমরা বড় সুখী হব মা।'

'আমি তো যখন খুসী আসতে পারি, কেবল উমা মাসীর জন্যে—' রত্নাবলী একটু হাসিল।

মহেশ বলিল 'প্রভু যখন এখানে আছেন, ওঁকে বললে উনি এসে এখানে থাকতে রাজী হবেন না?'

'মনে তো হয় না। উনি বড় চটেছেন।'

রত্নাবলী আসিয়া সদানন্দকে প্রণাম করে নাই। সদানন্দ এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, এবার জিজ্ঞাসা করিল, 'উমা চটেছে কেন?'

'আজ্ঞে, আপনি সন্ন্যাস ছেড়ে দিলেন বলে।'

'সন্ন্যাস ছেড়ে দিলাম? সন্ন্যাস ছেড়ে দিলাম মানে?'

'সন্ন্যাস ছেড়ে দিয়ে চলে আসেন নি আপনি?'

'বিপিন বলেছে বুঝি?'

রত্নাবলী ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল, বলিল, 'তা ছাড়া, সন্ন্যাস না ছাড়লে গেরস্তের বাড়ী তিন রাত্রির বেশী বাস করছেন কি করে।'

সদানন্দের তীব্র দৃষ্টিপাতে রত্নাবলী মাথা হেঁট করে, সকলে স্তব্ধ হইয়া থাকে। মহেশ চোখ বুজিয়া হাঁটুতে হাত বুলায়। মাধবীলতা চাহিয়া দেখিতে থাকে সকলের মুখের দিকে।

হঠাৎ সদানন্দ বলিল, 'তাই বুঝি তুমি আজ আমায় প্রণাম করলে না?'

রত্নাবলী মাথা হেঁট করিয়া রাখিয়াই বলিল, 'আজ্ঞে না। আমার আজ কাউকে প্রণাম করতে নেই।'

'ওঃ!' বলিয়া সদানন্দ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।—'আর কি বলেছে বিপিন আমার নামে?

মহেশ চৌধুরী হাত জোড় করিয়া বলিল, 'প্রভু?'

সদানন্দ অধীর হইয়া বলিল, 'না মহেশ, আমায় শুনতে দাও। বলো রতন, বলো আর কি বলেছে বিপিন?

রত্নাবলী বলিল, 'আমি আর কি বলব, ওতো সবাই জানে।'

'তবু তুমিই বল না শুনি।'

রত্নাবলী মুখ তুলিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি জানেন না কিছু?'

সদানন্দ বলিল, 'না। কি জানি না?'

'তবে তো সত্যি নয়!'—খুব সম্ভব রত্নাবলীর বিস্ময় আরও বাড়িয়া যায়, কিন্তু সেটা মুখে ভাল করিয়া ধরা পড়ে না, হাসি ছাড়া আর কিছুই রত্নাবলীর মুখে ভাল করিয়া পরিস্ফুট হয় না।—'ওমা, আমি তো সত্যি কিনা জানতেই ছুটে এলাম! সত্যি নয় তবে! কি কাণ্ড মা, এঁ্যা! এমন করেও বলতে পারেন বিপিনবাবু!'

'কি ছ্যাবলামি করছ রতন? কি সত্যি নয়? কি বলেছে বিপিন?'

সদানন্দের ধমকে রত্নাবলী মুষড়াইয়া গেল, আমতা আমতা করিয়া বলিল, 'আর আমি তা উচ্চারণ করতে পারব না। সত্যি যখন নয়,—ছি ছি…'

কিন্তু আর কি এখন উচ্চারণ না করিলে চলে? কদিন ধরিয়া আশ্রম আর বিপিনের কথা ভাবিতে ভাবিতে সদানন্দের মাথা গরম হইয়া গিয়াছে, তার উপর রত্নাবলীর এতক্ষণের ভণিতা। সদানন্দ সিধা হইয়া বসিয়া ডাকে, 'রতন!'—আর সে ডাক শুনিয়া ঘরের সকলের বুক কাঁপিয়া ওঠে।

'আমার দিকে মুখ করে বোসো।'

রত্নাবলী সদানন্দের দিকে মুখ করিয়া বসে।

'চোখের দিকে তাকাও আমার।'

রত্নাবলী সদানন্দের চোখের দিকে তাকায়।

'এইবার বলো।'

রত্নাবলী বলে, তবে বলার আগে চোখ নামাইয়া নেয়। প্রথমে আশ্রমে রটিয়াছিল

সদানন্দ সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়াছে। তারপর কয়েকদিন আগে রটিয়াছে, সদানন্দ নাকি মাধবীলতাকে বিবাহ করিয়া সংসারী হইবে। সন্ন্যাস ত্যাগ করার উদ্দেশ্যও তাই। খবরগুলি অবশ্য রত্নাবলী সোজাসুজি বিপিনের কাছে শোনে নাই। তবে আশ্রমে বিপিন ছাড়া এসব খবর আর কে ছড়াইবে?

আশ্রমের কেউ আসে নাই কেন? বিপিন একদিন আশ্রমের সকলকে একত্র করিয়া বলিয়া দিয়াছে, যে কারণেই হোক, সদানন্দ যখন কারও কাছে বিদায় না নিয়া আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সঙ্গে দেখা করিতে যাওয়া উচিত হইবে না। যতই হোক, এতদিন তো সদানন্দ তাদের শ্রদ্ধেয় গুরুদেব ছিলেন। যুক্তিটার জন্য যত না হোক, বিপিনের হুকুমের বিরুদ্ধে কেউ আসিতে সাহস পায় নাই। বিপিন এইরকম ভাবেই হুকুম দেয়। তা ছাড়া, মনেও সকলের প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছে। কয়েকজন খুব কাঁদিয়াছে।

সদানন্দ সিধা হইয়াই বসিয়া থাকে কিন্তু নিজেকে তার বড়ই দুর্ব্বল অসহায় মনে হইতে থাকে। সে ছাড়া এ জগতে আর সকলেই কি অবস্থা বুঝিয়া হিসাব করিয়া নিজেকে বাঁচাইয়া নিজের কাজ হাঁসিল করিয়া চলিতে পারে, সেই কেবল সব সময় ঠকিয়া যায়, না পারে গুছাইয়া কোন একটা কাজ করিতে, না পারে নিজেকে বিপদের হাত হইতে বাঁচাইয়া চলিতে? বিপিন যখন ওদিকে তার নামে নানা কথা রটাইয়া আটঘাট বাঁধিয়া নিতেছে, সে তখন ভাবিতেছে কখন বিপিন আসিবে হাতে পায়ে ধরিয়া তাকে ফিরাইয়া নিতে —অনুতপ্ত লাঞ্ছিত বিপিন। বিপিন যে বলিয়াছিল বাস্তব জগতে তার কোন দাম নাই, কথাটা তো মিথ্যা নয়। কত হিসাব করিয়া বিপিন কাজ করে, প্রত্যেকটি সুযোগ সুবিধা কিভাবে কাজে লাগায়, সে শুধু বসিয়া বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবে। গৃহস্থের বাড়ী তিনরাত্রির বেশী বাস করা যে সন্ন্যাস ত্যাগের কত বড় একটা প্রমাণ সাধারণ মানুষের কাছে, আর এক্ষেত্রে সন্ন্যাস ত্যাগের কারণ হিসাবে মাধবীলতাকে বিবাহ করিয়া সংসারী হওয়ার উদ্দেশ্য যে কত জোরালো সমর্থক যুক্তি, কিছুই বিপিনের ভাবিতে বাকী থাকে নাই। আর এখানে আসিবার পরে তার শুধু একবার খেয়াল হইয়াছিল মাত্র যে, মাধবীলতার সঙ্গে তার নাম জড়াইয়া বিপিন কুৎসা রটনার সুযোগ পাইবে।

এখন সদানন্দ বুঝিতে পারে, এর চেয়ে কুৎসা রটানো ঢের ভাল ছিল। কারও কারও মনে একটু খটকা লাগিত মাত্র। মহেশ চৌধুরীর এ বাড়ীতে আজ কত যুগ ধরিয়া একটি পারিবারিক জীবনের ধারা বহিতেছে, বাড়ীতে গৃহিণী আছে, একটি বৌ আছে, মেয়েরা মাঝে মাঝে আসা যাওয়া করে, এখানে মাধবীলতা আর সাধু সদানন্দের বাস করাটাই তো নিন্দনীয় হইতে পারে না। মাধবীলতার পিছনে পিছনে সদানন্দও মহেশ চৌধুরীর বাড়ীতে আসিয়া হাজির হইয়াছে, কুৎসার স্বপক্ষে শুধু এই যুক্তি। কিন্তু ও যুক্তি বাতিল হইয়া যাইত দু'দিনে, সদানন্দ যখন ঘোষণা করিয়া দিত আশ্রম সে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে— অনাচার ও ব্যভিচারে ভরা বিপিনের টাকা রোজগারের উপায় যে আশ্রম! কিন্তু বিপিন তার নিন্দা করে নাই, তার বিরুদ্ধে কোন কথা বলে নাই, কেবল এত বড় সাধু যে সদানন্দ তার সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া সংসারী হওয়ার ইচ্ছার জন্য বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছে। এ গুজবও মিথ্যা প্রমাণিত হইয়া যাইবে, কিন্তু লোকের মনে একটা ছাপ থাকিয়াই যাইবে। কত কথাই মনে হইবে লোকের! কেউ ভাবিবে, কোন কারণে বিবাহ ভাঙিয়া গেল। কেউ ভাবিবে, বিবাহটা বোধ হয় দরকার হইল না, বিবাহ ছাড়াই—

মাধবীলতা সদানন্দের সম্পত্তি, সদানন্দের কোন রোমাঞ্চকর গোপন সাধনার জন্য মাধবীলতাকে প্রয়োজন হয়, এসব কল্পনাও যে ইতিমধ্যে অনেকের মনে দেখা দিয়াছে আশেপাশের গ্রামে, সে খবরটা সদানন্দ জানিত না। নিজে সাধু বনিয়া থাকিয়া, সাধু সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে সাধারণ লোকের ধারণা যে কি রকম, সে বিষয়ে সদানন্দের পরিষ্কার ধারণা নাই। স্ত্রী সঙ্গে থাকিলেও সাধু সন্ন্যাসীর কিছু আসিয়া যায় না, স্ত্রীও যদি সন্ন্যাসিনী সাজিয়া থাকে। তখন লোকে তাকে বলে 'মাতাজী' এবং টিপ্ টিপ্ করিয়া তার পায়েও প্রণাম করে। সাধু সন্ন্যাসীর নামে স্ত্রীলোক সংক্রান্ত কুৎসা বলিয়া কিছু হয় না। সাধু সন্ন্যাসী তো সামাজিক জীব নয়, সাধারণ মানুষ নয়। তাদের কথাই আলাদা। স্ত্রীলোক ছাড়াও তাদের সাধনা চলে, স্ত্রীলোক নিয়াও সাধনা চলে। যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে,

যে মুক্ত পুরুষ, তার আবার ব্যভিচার কিসের? কত বদমেজাজী সাধু থাকে, কথায় কথায় রাগে আগুন হইয়া অকথ্য ভাষায় গালাগালি দেয়, মারিতে ওঠে—কিন্তু সেজন্য কে মনে করে এই সাধুটি ক্রোধ রিপুর বশ, রিপুই যখন দমন করিতে পারে নাই, এ আবার সাধু কিসের? রাগারাগি গালা-গালির জন্যই বরং লোকের ভয়ভক্তি আরও বাড়িয়া যায়। কামও তো একটা তুচ্ছ রিপুমাত্র!

তবে জটা-ভস্ম-বিবর্জ্জিত, প্রচলিত কুসংস্কার ও রীতিনীতির বিরুদ্ধে প্রচারকারী আদর্শবাদী সাধু সম্বন্ধে লোকের মনে অনেক রকম খুঁতখুঁতানি থাকে। এসব সাধু চমকপ্রদ কিছু করে না কিনা, ওষুধ দেয় না, রোগ ভাল করে না, মরা মানুষকে বাঁচায় না, ভবিষ্যৎ গুণিয়া দেয় না, বৃষ্টি নামায় না, হিমালয়ের দুর্গম গুহায় দিন যাপনের কাহিনী শোনায় না, মাটির নীচে কিছুদিনের জীবন্ত সমাধির পর জ্যান্ত হইয়া উঠিয়া আসে না—এক রকম কিছুই করে না। শুধু বলে, এই কোরো না, ওই কোরো না।

তবে সদানন্দকে লোকে অবিকল এই ধরণের সাধুর পর্য্যায়ে ফেলে না। সদানন্দের কিছু কিছু অলৌকিক শক্তি আর কার্য্যকলাপের বিজ্ঞাপন বিপিন আগে প্রচার করিয়াছিল।

সকলের আগে কথা বলিল মহেশ চৌধুরী।

'বিয়ের কথাটা মিথ্যে নয় মা। তবে বিপিন-বাবু একটু ভুল শুনেছেন। মাধুর বিয়ে হবে আমাদের বিভূতির সঙ্গে।'

মাধবীলতার সঙ্গে সদানন্দের বিবাহের গুজব রটিয়াছে শুনিয়া সকলে হতবাক্ হইয়া গিয়াছিল, মহেশ চৌধুরীর কথা শুনিয়া চমকাইয়া গেল। সকলে এমনভাবে মুখ ফিরাইল মহেশ চৌধুরীর দিকে যে, ঘাড়ে একটু ঝাঁকুনি লাগিল সকলেরই, বিভূতির পাট করা চুলের কিছু অংশ সিঁথির লাইন ডিঙ্গাইয়া ও পাশে চলিয়া গেল, মাধবীলতার কাণে বিভূতির মার আদর করিয়া পরাইয়া দেওয়া দুল দুটি কাণের সামনে আর পিছনে জোরে জোরে আঘাত করিয়া দুলিতে লাগিল, রত্নাবলীর এলো খোঁপা খুলিয়া গেল।

তারপর খোঁপা ঠিক করিতে করিতে রত্নাবলী বলিল, 'সত্যি?'

মহেশ চৌধুরী হাসিয়া বলিল, 'সত্যি বৈ কি মা। এখন একটি শুভদিন দেখে—'

'দিন ঠিক হয় নি?'

'বিয়ে ঠিক হয়ে গেলে আর দিন ঠিক হতে কতক্ষণ লাগে মা?'

অন্য সকলে এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল। এবার সদানন্দ বলিল, 'মহেশ?'

'প্রভু?'

সদানন্দ কিছুই বলিল না।

রত্নাবলী বলিল, 'কিন্তু তুই কি মাধু? আমায় জানাস্ নি কিছু?'

মাধবীলতাও কিছু বলিল না।

রত্নাবলী একবার এদিক ওদিক চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, মাধবীলতার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া এক রকম টানিতে টানিতেই তাকে সঙ্গে নিয়ে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

তখন বিভূতি গম্ভীর মুখে ডাকিল, 'বাবা?'

মহেশ চৌধুরী বলিল, 'বুঝেছি, তুমি কি বলিতে চাও। কিন্তু এখন নাই বা বললি? ভেবে চিন্তে কথা বলতে কিছু দোষ আছে? যদি কিছু বলার থাকে, কাল না হয় পরশু বলিস, কেমন?'

বিভূতি খুব সম্ভব বলার কথাটা ভাবিয়া দেখার বদলে, কথাটা এখনই বলিয়া ফেলিবে না ভাবিয়া চিন্তিয়া কাল পরশু বলিবে, গম্ভীর মুখে প্রচণ্ডভাবে তাই ভাবিতে আরম্ভ করিয়া দিল। সদানন্দ বলিল, 'তোমার ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছি না মহেশ।'

'প্রভু?'

মুখখানা একবার একটু বিকৃত করিয়া সদানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইল, বাহিরের দিকে চলিতে আরম্ভ করিয়া বলিল, 'ঘরে গেলাম মহেশ। ঘণ্টাখানেক পরে একবার শুনে যেও।'

মিনিট দুই বসিয়া থাকিয়া বিভূতিও উঠিয়া গেল।

বিভূতির মা তখন বলিল, 'তুমি আর মেয়ে পেলে না?'

'কেন, মাধু তো বেশ মেয়ে।'

'আমার অমন ছেলে, তার জন্যে কুড়োনো মেয়ে!'

'অন্য মেয়েকে তোমার ছেলে বিয়ে করলে তো। ছাখো, হয়তো শেষ পর্য্যন্ত না বলে বসবে। কথাটা ভেবে দেখতে রাজী হয়েছে, এইটুকু যা ভরসা। আমি তো ভাবলাম, মুখের উপরেই বুঝি বলে বসে—' চোখ বুজিয়া মহেশ একটা নিশ্বাস ফেলিল। পরক্ষণে চোখ মেলিয়া বিভূতির মার ডান হাতটি বুকের উপর রাখিয়া বলিল, 'এখনো বুক কাঁপছে ছাখো।'

রত্নাবলীকে আশ্রমের সীমানা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দিয়া আসিতে গেল শশধর। এতক্ষণে মাধবীলতা যেন এতরাতে লুকাইয়া রত্নাবলীর একা এখানে আসার কারণটা বুঝিতে পারিল। একা আসিলেও তাকে যে কেউ পৌঁছিয়া দিয়া আসিতে যাইবে, তা কি আর রত্নাবলী জানিত না? এবং সঙ্গে যে যাইবে, তার শশধর হইতেই বা বাধা কি?

অন্য সময় মাধবীর মনে ব্যাপারটা পাক খাইয়া বেড়াইত, আজ তার এমন একটা বিষয়েও মাথা ঘামানোর ক্ষমতা ছিল না। কি উদ্ভট মানুষ মহেশ চৌধুরী! কেমন অনায়াসে বলিয়া বসিল বিভূতির সঙ্গে তার বিবাহ ঠিক হইয়া গিয়াছে! কাউকে একবার জিজ্ঞাসা করাও দরকার মনে করিল না। এক মুহূর্ত্ত আগে এ রকম একটা সম্ভাবনার কথা কি কারও কল্পনাতে ছিল?

অথবা আগেই কথাটা সকলে আলোচনা করিয়াছিল, সেই কিছু জানে না? তাকে না জানাইয়াই সকলে তলে তলে বিভূতির সঙ্গে তার বিবাহ ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে? কিন্তু, তাও কি সম্ভব!

কি হইবে এবার? মহেশ চৌধুরী তো যা মুখে আসিল বলিয়াই খালাস, ফলটা দাঁড়াইবে কি? সদানন্দ কি করিবে? কি করিবে সদানন্দ? সদানন্দের সেদিনকার সেই কথাটাই ঘুরিয়া ফিরিয়া মাধবীলতার মনে ভাসিয়া আসিতে থাকে; আমাকে মহাপুরুষ না ভেবে তো তোমার উপায় নাই, তোমাকে যে তা'হলে ছিচারিণী হতে হবে!

সদানন্দের ভয়টাই মাধবীলতার মনে সব চেয়ে বড় হইয়া দেখা দেয়। বিভূতিকে বিবাহ করার কথা সে কখনো ভাবে নাই, এ রকম একটা সম্ভাবনার কথা তার কল্পনাতেও আসে নাই। আজ এ বিষয়ে মাথা ঘামানোই তার পক্ষে উচিত ও স্বাভাবিক ছিল সব চেয়ে বেশী, কিন্তু কথাটা যে বিবেচনা করা দরকার, নিজের মনে তারও যে এ বিষয়ে একটা মীমাংসা করিয়া ফেলিতে হইবে আজকালের মধ্যে, এটা যেন তার খেয়ালও হইল না। বিভূতির জীবন-সঙ্গিনী হইতে সে রাজী আছে কি নাই, নিজেই সে তা এখানো জানে না। তবু সদানন্দ কি ভাবিবে, সদানন্দ কি বলিবে, সদানন্দ কি করিবে, কল্পনা করিয়া সর্ব্বাঙ্গে যেন রীতিমত অপরাধমূলক ভয়ের টিপ্‌টিপানি অনুভব করিতে থাকে।

নিজের ঘরে বিছানায় শুইয়া মাধবীলতা ভাবিতেছিল, কে যেন পাশে আসিয়া বসিল সন্তর্পণে, চোরের মত। মুখ ফিরাইয়া মাধবীলতা দেখিল শশধরের বৌ। ঘোমটা কমাইয়া দিয়াছে, তবু কপাল প্রায় সবখানিই ঢাকা।

'দিদি?'

আজ সে প্রথম ঘোমটা কমাইয়া মাধবীলতার সঙ্গে কথা কহিল, এতদিন কয়েকবার চেষ্টা করিয়াও মাধবীলতা তাকে কথা বলাইতে পারে নাই। হাত দেখিয়াই বোঝা যায় বৌটির রঙ খুব সুন্দর, মুখের রঙ আরও টুকটুকে।

'ঠাকুরপোর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে দিদি?'

এমন সুন্দর মুখের এত আনন্দের কথা কি যে বিশ্রী শুনাইল, বলিবার নয়। বৌটি ফোক্‌লা।

সদানন্দ বলে, 'তবে কি তুমি বলতে চাও, ওদের মধ্যে কোন কথাই হয় নি, বিভূতি আর মাধুর মধ্যে?'

মহেশ বলে, 'আজ্ঞে না। তবে দুজনে বেশ ভাব হয়েছে, সেটা তো বোঝাই যায়'।

সদানন্দ বলে, 'ভাব তো আর প্রণয় নয় মহেশ! দুজনে সর্ব্বদা মেলামেশা করছে, ওদের ভাব হওয়াটা আশ্চর্য্য কি। কিন্তু বিয়ে হল আলাদা ব্যাপার। সকলের সামনে কথাটা বলার আগে ওদের একবার জিজ্ঞাসা করা তো তোমার উচিত ছিল? আমার সঙ্গেও তো পরামর্শ করতে পারতে একবার?'

'সময় পেলাম না যে প্রভু? আপনার নামে অমন একটা কুৎসিৎ কথা রটেছে শুনে মনে হল, বিয়ে যখন এদের হবেই, আর দেরী না করে মেয়েটিকে কথাটা জানিয়ে দেওয়াই ভাল। মাধুর সম্পর্কে আপনার নামে আর কোন কথাই তা'হলে উঠতে পাবে না'।

'বিয়ে যখন ওদের হবেই মানে?'

'আজ্ঞে আপনার আশীর্ব্বাদে বিয়েটা ওদের নির্ব্বিঘ্নে হয়ে যাবে প্রভু। ছেলেটার মাথাও একটু ঠাণ্ডা হবে, মেয়েটাও সুখী হবে।'

শুনিলে মনে হয় না, বিভূতি আর মাধবীলতার বিবাহ যে হইবেই, সে বিষয়ে মহেশ চৌধুরীর কিছুমাত্র সন্দেহ আছে। কারও মত জিজ্ঞাসা করা হয় নাই, কারও সঙ্গে পরামর্শ করা হয় নাই, যাদের বিবাহ, দু'ঘণ্টা আগেও তাদের ইঙ্গিতেও ব্যাপারটা জানানো হয় নাই, তবু যেন মহেশ

চৌধুরী জানে, এ বিবাহ হইয়া যাইবে। রাগে সদানন্দের গা যেন জলিয়া যায়। একটু ভয়ও হয়। মহেশ চৌধুরীর একগুঁয়েমির কিছু কিছু পরিচয় সে পাইয়াছে।

'জানো মহেশ, তোমার ব্যাপার ভাল বুঝতে পারছি না। বিভূতির একটা বিয়ে দিতে চাও, ভাল কথা। কিন্তু মাধুর সঙ্গে বিয়ে হবে কি করে? মাধু আশ্রমে এসেছে, সংসার ওর ভাল লাগে নি বলে, সেবা আর আধ্যাত্মিক সাধনা নিয়ে ওর জীবনটা কাটিয়ে দেবার ইচ্ছে। আমি ওকে দীক্ষা দেব, নিজে ওকে সাধনপথে চালিয়ে নিয়ে যাব। ওর বিয়ের প্রশ্নই তো উঠতে পারে না'।

'প্রভু?'

'তুমি বুঝতে পার না মহেশ, ও মেয়েটির মধ্যে খাঁটি জিনিষ আছে? আমি কি সাধে ওকে বেছে নিয়েছি! একদিন ও অনেক উঁচুতে উঠে যাবে, হাজার হাজার মানুষের জীবনে একদিন ও সুখশান্তি এনে দেবে। এমন একটা খাঁটি জিনিষ নষ্ট হতে দেওয়া যায়!'

'প্রভু?'

'বল না, কি বলতে চাও? আলোচনা করবার জন্যই তো ডেকেছি তোমায়।'

'বিয়ে না হলে মেয়েটির মন শান্ত হবে না, প্রভু। বিয়ের জন্য মেয়েটি ছটফট করছে।'

সদানন্দ ব্যঙ্গ করিয়া বলে, 'তোমায় বলেছে নাকি, তাড়াতাড়ি আমার বিয়ে দিয়ে দিন, বিয়ের জন্য আমি ছটফট করছি মহেশবাবু?'

মহেশ হাত জোড় করিয়া বলে, 'আপনার তো অজানা কিছু নেই প্রভু! কেন মনে কষ্ট দিচ্ছেন আমায়? কোন মেয়েই অমন করে বলেও না, পারেও না। কিন্তু মেয়েমানুষের মন কি বোঝা যায় না? রাজাসায়েবের ছেলে তো ওকে বিয়ের লোভ দেখিয়ে বার করে এনেছিল।'

'ছেলেমানুষ হঠাৎ একদিন মনের ভুলে কি করেছিল—'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিও তো তাই বলি। নইলে নিজের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে চাইতাম? বিয়ে করে সংসারী হবার ইচ্ছা মেয়েটির মনে প্রবল।'

'কিন্তু মহেশ—'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ। বিয়েটা হয়ে যাক্, দুজনকেই আপনি দীক্ষা দিয়ে পায়ের তলে আশ্রয় দেবেন। যেমন চান তেমনি করে গড়ে তুলবেন দুজনকে। আপনার কাজে দুজনে জীবন উৎসর্গ করবে। ওরা তো আপনারই সন্তান প্রভু?'

সদানন্দের মনে হয়, মহেশ যেন তাকে ভক্তি-মাখা চাবুক মারিয়াছে।

বার

এ বিষয়ে বিভূতি সত্যই বড় ছেলেমানুষ—বিবাহ করার বিষয়ে। এতটুকু অভিজ্ঞতা নাই। মেয়েদের সম্বন্ধে কোনদিন সে যে মাথা ঘামায় নাই তা নয়, তবে সেটা খুবই কম। অস্পষ্ট একটা ধারণা তার মনে আছে যে, দেখিলেই ভাল লাগে এমন চেহারার আর মিশিলেই মিষ্টি লাগে এমন স্বভাবের একটি চালাকচতুর চটপটে মেয়ের সঙ্গে একদিন প্রেম তার হইবেই, বাস্, তারপরেই মালাবদল। কিন্তু মাধবীলতা কি তার কল্পনার সেই মেয়ে? দু'দিন ভাবিয়া বাপকে একটা জবাব দিবে বলিয়াছিল, সাতদিন ভাবিয়াও কিছু ঠিক করিতে পারিল না। তারপর মনে হইল, মাধবীলতার সঙ্গে পরামর্শ করিলে দোষ কি?

মাধবীলতা সোজাসুজি জবাব দিল, 'আমি কি জানি!'

অর্থাৎ মাধবীলতার আপত্তি নাই। মনে মনে বড় অভিমান হয় মাধবীলতার, তাকে জিজ্ঞাসা করা কেন, কি করা উচিত? ইচ্ছা না থাকে, বাতিল করিয়া দিলেই হয়! সে তো আর পায়ে ধরিয়া সাধে নাই!

সদানন্দ অনেকবার মাধবীলতাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে, সে যায় নাই। কি করিবে গিয়া? সদানন্দ কি বলিবে, সে ভাল করিয়াই জানে! আর ওসব কথা শুনিবার সাধ মাধবীলতার নাই। নিজে সে অনেক ভাবিয়াছে—এখনো ভাবিতেছে। ভাবিতে ভাবিতে মাথার মধ্যে যখন একটা যন্ত্রণা আরম্ভ হয়, মনে হয় মাথার ঘিলুগুলি গলিয়া গলিয়া তালুর কাছ হইতে টপ্ টপ্ করিয়া ফোঁটা ফোঁটা ঝরিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে (মোমের মত), তখন হঠাৎ একসময় দু'কাণে তার তালা লাগিয়া গিয়া সমস্ত জগৎ বদলাইয়া যায়। স্তব্ধ ও শান্ত চারিদিক। ভাবনার তো কিছু নাই? আত্মগ্লানির কোন কারণ তো খুঁজিয়া পাওয়া যায় না? সব ভাল, সব মিষ্টি, সব সুন্দর। জীবনে সুখী হওয়ার পথে একটা বাধাও আর নাই। কত আনন্দ জীবনে। আপশোষ শুধু

এই যে, সে জানে, আবার গোড়া হইতে সব সুরু হইবে, দুর্ভাবনা, অস্বস্তিবোধ, আত্মগ্লানি, আর মাথার অনির্দ্দিষ্ট দুর্ব্বোধ্য যাতনা। প্রথমে সামান্য-ভাবে আরম্ভ হইয়া বাড়িতে বাড়িতে কয়েকদিনে উঠিয়া যাইবে চরমে, তখন আবার দু'কাণে তালা লাগিয়া পাওয়া যাইবে শান্তি ও স্তব্ধতা। ব্যাপারটা মাধবীলতা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। এ কি কোন অসুখ? মাথার অসুখ? পাগল টাগল হইয়া যাইবে না তো?

সদানন্দ একদিন বিভূতিকে দিয়াই তাকে ডাকিয়া পাঠাইল। মাধবীলতা নীচু গলায় জিজ্ঞাসা করিল, 'যাব?'

'যাবে বৈকি, বাঃ রে!'

'একা একা যেতে আমার কেমন ভয় করে।'

'ভয় আবার কিসের?'

সদানন্দের সামনে নিজেকে মাধবীলতার সত্যই কেমন যেন পুতুলের মত অসহায় মনে হয়। তাকে নিয়া যা খুসী করার ক্ষমতা যেন এই লোকটির কেমন করিয়া জন্মিয়া গিয়াছে।

'আমাকে একেবারে ত্যাগ করে দিলে মাধু?'

মাধবীলতা পুতুলের মতই চাহিয়া থাকে। এই তো সবে আরম্ভ, আরও কত কথা সদানন্দ বলিবে! কিন্তু সদানন্দও কথা না বলিয়া চাহিয়া আছে দেখিয়া, খানিক পরে সে সত্যই আশ্চর্য্য হইয়া যায়। তখন মাধবীলতা মাথা নীচু করে, অনেক ভাবিয়া আস্তে আস্তে বলে, 'আপনি যদি বারণ করেন—'

সদানন্দ ভাবিতেছিল সেদিনকার কথা, আঙ্গুল-গুলিকে সেদিন পাখীর পালকের চেয়ে কোমল করিয়া মাধবীলতার গায়ে বুলাইতে ইচ্ছা হইয়াছিল। আজ মারিতে ইচ্ছা হইতেছে। এমন কোমল, এমন মোলায়েম গা মাধবীলতার, দেখিলেই মনে হয় চামড়ার উপর বুঝি আর একটা অপার্থিব আবরণ আছে (এটা সদানন্দ অনেকবার কল্পনা করিয়াছে), আগে স্পর্শ করিবার কল্পনাতেই রোমাঞ্চ হইত, আজ কাটিয়া ছিঁড়িয়া রক্তপাত করিয়া দিতে ইচ্ছা হইতেছে। ইচ্ছা হইতে হইতে হঠাৎ উঠিয়া গিয়া সদানন্দ দরজা জানালা সব বন্ধ করিয়া দেয়। সত্যই কি মাধবীলতার শরীরটা সে ছিঁড়িয়া ফেলিবে না কি? চোখ দেখিয়া মাধবী-লতার সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হইয়া আসে। পাগল না হইয়া গেলে কি মানুষের এমন চোখ হয়? কি করিবে সদানন্দ? খুন টুন করিয়া ফেলিবে না তো?

কাছেই বসে সদানন্দ, ডান হাত শক্ত করিয়া তার বাঁ হাতের কব্জির কাছে চাপিয়া ধরে। মায়া-মমতা যে আজ সদানন্দের মনে এক ফোঁটা নাই, রাগে দুঃখে অপমানে মানুষটা গরগর করিতেছে, মাধবীলতা অনেক আগেই সেটা টের পাইয়াছিল। এতক্ষণে সে বুঝিতে পারে, ভয়ঙ্কর একটা আঘাতে দেহে মনে তাকে চিরদিনের জন্য পঙ্গু করিয়া দিবার সাধটাই সদানন্দের মনে মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। এতদিন মনে মনে সদানন্দ কি ভাবিয়াছে কে জানে, হয়তো এই রকম একটা কল্পনাই মনে মনে নাড়াচাড়া করিয়াছে। আজ আর কোন রকমেই ঠেকানো যাইবে না। গলা টিপিয়া তাকে মারিয়া ফেলাও সদানন্দের পক্ষে আজ আশ্চর্য্য নয়। মাধবীলতা জানে বাঁ হাতের কব্জিটা তার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিন্তু মাথার মধ্যে এমন ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে যে, ব্যথাটা ভাল রকম অনুভব করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

বিস্ফারিত চোখ দুটি সদানন্দের চোখের সঙ্গে মিলাইবার চেষ্টা করিতে করিতে মাধবীলতা জ্ঞান হারাইয়া সদানন্দের গায়েই ঢলিয়া পড়িয়া গেল।

ঘরেই কুজায় জল ছিল, মাথায় খানিকটা জল চাপড়াইয়া দিয়া সদানন্দ দরজা জানালা খুলিয়া দিল। খানিক তফাতে হাত গুটাইয়া বসিয়া বিড়বিড় বকিতে লাগিল। বোধ হয়, আত্মরক্ষার এতবড় অস্ত্র আয়ত্ত করিয়া রাখার জন্য মাধবীলতাকে গালাগালি।

মাধবীলতার জ্ঞান হওয়ার পর সদানন্দ উদাস ভাবে বলিল, 'আচ্ছা তুমি যাও মাধু।'

'আপনি কি করলেন আমার?'

'কিছুই করিনি।'

মাধবীলতা সে কথা বিশ্বাস করিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল। গেল একেবারে বিভূতির কাছে। নালিশ যদি করিতে হয়, হবু স্বামীর কাছে করাই ভাল।

বিভূতি শুনিয়া অবাক। 'অপমান করেছেন? কি অপমান করেছেন স্বামীজি তোমাকে?'

মাথার মধ্যে কতকগুলো বড় অদ্ভুত প্রক্রিয়া চলিতেছিল মাধবীলতার, স্থান ও কালের কতক-গুলি নিয়ম যেন ঢিল হইয়া গিয়াছে। মাথার মধ্যে, অথচ ঠিক যেন মাথার মধ্যেও নয়, মাথার পিছন দিকে একটা বাড়তি অঙ্গ আছে, সেইখানে কত কি জিনিষ একসঙ্গে সরু আর মোটা হইয়া যাইতেছে, কয়েকদিন পরে পরে কাণে যে তার

ভালো লাগে, সেই বীভৎস স্তব্ধতা সর্ব্বব্যাপী আলোড়নের মধ্যে ঢেউ তুলিয়া এমন একটা এলোমেলো গতি লাভ করিয়াছে, যা চোখে দেখা যায়, আর এমন একটা অকথ্য ভয় (অনির্দ্দিষ্ট ভয়ের যে এমন একটা অবর্ণনীয় রূপ থাকে, মাধবীলতার জানা ছিল না)—ব্যাপারটা বুঝিবারও নয়, বুঝাই-বারও নয়। অথচ মস্তিষ্কের সাধারণ অংশটা এদিকে বেশ কাজ করিতেছে। সমস্ত ঘটনাটা অনায়াসে গড়গড় করিয়া সে বিভূতিকে বলিয়া গেল। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া হাত ধরিয়া টানিবার সময় ভয়ে অজ্ঞান হইয়া যাওয়ায় আজ কি ভাবে রাক্ষসটার হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে।

'তুমি যদি এর প্রতিকার না কর—'

বিভূতির বুকে মুখ গুঁজিয়া দিয়া মাধবীলতা ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। বিভূতি কথা বলে না দেখিয়া, খানিক পরে মুখ তুলিয়া চাহিয়াই সে চমকাইয়া গেল। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া আসিয়া হাত চাপিয়া ধরিবার সময় সদানন্দের মুখ যেমন হইয়াছিল, বিভূতির মুখও তেমনি দেখাইতেছে।

'একটু বোসো, আমি আসছি।'

মাধবীলতা সভয়ে তার হাত চাপিয়া ধরিল, 'কি করবে? থাকগে, কিছু করে কাজ নেই। যা হবার তাতো হলই—'

কিন্তু আর কি বিভূতিকে আটকানো যায়? হাত ছাড়াইয়া সে চলিয়া গেল। সদানন্দের ঘরে গিয়া সদানন্দের সামনে দাঁড়াইয়া বলিল, 'মাধুর সঙ্গে এরকম ব্যবহার করার মানে?'

'ছাখো বিভূতি, তুমি ছেলেমানুষ—'

বাকী কথাগুলি সে বলিয়া উঠিতে পারিল না, বিভূতির ঘুঁষিতে নাকটা ছেঁচিয়া গেল। বিভূতি আরও মারিত, কিন্তু পিছন হইতে মহেশ তাকে জড়াইয়া ধরায় আর কিছু করিতে পারিল না।

'ছেড়ে দাও বাবা, বজ্জাতটাকে আমি খুন করব।'

'ছি বিভূতি, ছি!'

'আমাকে ছি করছ? জানো ও কি করেছে?'

'জানি বৈকি।'

'জানো?'—বিভূতি এতক্ষণ ছাড়া পাওয়ার জন্য ধস্তাধস্তি করিতেছিল, এবার স্তব্ধ হইয়া গেল।

নাক দিয়া রক্ত পড়া বন্ধ হইল প্রায় আধঘণ্টা পরে, সেবা বেশীর ভাগ করিল শশধরের বৌ। কখন কোন্ ফাঁকে সে যে আসিয়া জুটিয়াছিল, কেউ টেরও পায় নাই। বিভূতি একদিকে ছোট একটা টুলে বসিয়া ব্যাপার দেখিতেছিল আর থাকিয়া থাকিয়া মুখ বাঁকাইতেছিল। এখনও তার রাগ কমে নাই, বেশ বুঝা যায় একটা হেস্তনেস্ত করিবার জন্যই সে বসিয়া আছে। মাঝখানে একবার সে একটা মন্তব্য করিতে গিয়াছিল, মহেশ হাত জোড় করিয়া বলিয়াছিল, 'দোহাই তোর, একটু থাম।' তারপর হইতে সে চুপ করিয়া আছে।

বুঝা যায়, মহেশ ভাবিতেছে।

ভাবিবার কি আছে বিভূতি বুঝিতে পারে না। তার বিরক্তির সীমা থাকে না। মহেশ যদি সব জানেই, তবে আর এই পাষণ্ড সম্বন্ধে কর্ত্তব্য স্থির করিতে তো একমুহূর্ত্ত দেরী হওয়া উচিত নয়। এত সেবা যত্নই বা কি জন্য? ঘাড় ধরিয়া রাস্তায় বাহির করিয়া দিলেই হয়।

সদানন্দ একটু সুস্থ হইলে মহেশ বলিল, 'বিভূতি, বড় ঘরের রোয়াকে ভাঙা কাঠের বাক্সটা আছে না, তার থেকে বড় হাতুড়িটা নিয়ে আসবে?'

'হাতুড়ি দিয়ে কি করবে?'

'একটু কাজ আছে।'

বিভূতি হাতুড়ি আনিয়া দিল। লোহায় মরিচা ধরিয়া গিয়াছে। হাতুড়ি হাতে করিয়া মহেশ চৌধুরী বলিল, 'প্রভু, আমার ছেলের হয়ে আমি আপনার কাছে মাপ চাইছি। ছেলে আমার প্রায়শ্চিত্ত করবে না, ওকে বলা বৃথা। ছেলের হয়ে আমি প্রায়শ্চিত্ত করছি, আপনি তাই মঞ্জুর করুন।'

বলিতে বলিতে মহেশ চৌধুরী করিল কি, হাতুড়িটা দিয়া নিজের নাকের উপর সজোরে মারিয়া বসিল। সকলে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল, কেবল শশধরের বৌ আবার সেবা আরম্ভ করিয়া দিল মহেশের। সে যেন এইরকম একটা কাণ্ড ঘটিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই প্রতীক্ষা করিতেছিল।

সদানন্দের চেয়ে মহেশের যে জোরে লাগিয়াছিল তাতে সন্দেহ নাই, রক্ত আর বন্ধ হইতে চায় না। মহেশের বারণ না মানিয়া বিভূতি পাড়ার সুবিমল ডাক্তারকে ডাকিতে পাঠাইয়া দিল। ডাক্তার আসিয়া কিন্তু করিতে পারিল না কিছুই, থেঁতলা নাকটা পরীক্ষা পর্য্যন্ত নয়। মহেশ তাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া অতিকষ্টে খোনাসুরে বলিল, 'না না, আমার কর্ম্মভোগ আমায় ভোগ করতে দিন।'

সুবিমল ডাক্তারের কাছে পাড়ার লোক জানিতে পারিল, সাধু সদানন্দ আর মহেশ চৌধুরীর

মধ্যে ভয়ানক রকমের একটা হাতাহাতি হইয়া গিয়াছে। দুজনেই দারুণ আহত। মহেশ চৌধুরীর এখন ভয়ানক অনুতাপ হইয়াছে, বিনা চিকিৎসায় মরিয়া যাইতে চায়।

হাতাহাতি হইল কেন? প্রথমে কথা কাটাকাটি, তারপর হাতাহাতি! ও রকম তো ওদের মধ্যে লাগিয়াই আছে। অন্যদিন কথা কাটাকাটির মধ্যেই সমাপ্তি হয়, আজ হাতাহাতি পর্য্যন্ত গড়াইয়াছে।

কথাটা কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রূপ নিল অন্যরকম। ঘটনাটা অপরাহ্নের, সন্ধ্যার পর অনেকে খবর জানিতে আসিল। সদানন্দ তখন নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া আছে, তার দেখা কেউ পাইল না। মহেশ চৌধুরীর সমস্ত মুখটাই ফুলিয়া গিয়াছে, কথা বলিতেও কষ্ট হয়। তবু সে-ই সংক্ষেপে ব্যাপারটা সকলকে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিল। গোঁয়ারগোবিন্দ একটা ছেলে আছে তার সকলে জানে তো? একটা ভুল বোঝার দরুণ হঠাৎ রাগের মাথায় সে সদানন্দকে অপমান করিয়া বসে। ছেলের হইয়া মহেশ চৌধুরী তাই শাস্তি গ্রহণ করিয়াছে।

রসিক ভট্‌চায মহেশ চৌধুরীর বন্ধু। সে বলিল, 'তুমি কি উন্মাদ মহেশ?'

'কাল পরশু তোমার সঙ্গে ও বিষয়ে তর্ক করা যাবে, কেমন?' বলিয়া মহেশ চৌধুরী শয়ন করিতে ভিতরে গেল।

যে দশ বারজন উৎসাহী ও কৌতূহলী পরিচিত লোকের কাছে মহেশ চৌধুরী কথাগুলি বলিল, তারা তখন ডাকাইয়া আনিল বিভূতিকে। কি হইয়াছিল? সদানন্দকে সে কি অপমান করিয়াছিল? কেন অপমান করিয়াছিল? কি দিয়া সদানন্দ মহেশ চৌধুরীকে আঘাত করিয়াছে?

কিন্তু বিভূতি তেমন ছেলেই নয়, সে সংক্ষেপে শুধু বলিল, 'আমি কিছু জানি না। আপনারা এবার যান তো।'

সকলে দয়া করিয়া তার বাড়ীতে পায়ের ধুলা দিয়াছে, সকলকে বসাইয়া রাখিয়া বাড়ীর ভিতরে যাইতে মহেশ চৌধুরীর কত সঙ্কোচ, কত আপশোষ! আর তার ছেলে কিনা সোজাসুজি সকলকে বিদায় করিয়া দিল! ছেলেটা সত্যই গোঁয়ার।

পরদিন অনেক দূরের গ্রামে পর্য্যন্ত রটিয়া গেল, ছেলেটাকে বাঁচাইতে গিয়া মহেশ চৌধুরী সদানন্দের হাতে ভয়ানক মার খাইয়াছে। একটি টুঁ শব্দও করে নাই মহেশ চৌধুরী, সদানন্দ মার বন্ধ করিলে রক্তাক্ত শরীরে সদানন্দের পায়ে মাথা ঠেকাইয়া ছেলের হাত ধরিয়া ঘরের বাহির হইয়া আসিয়াছে। ডাক্তার ডাকা হইয়াছিল, কিন্তু মহেশ চৌধুরী বলিয়াছে, 'প্রভুর প্রহারের চিকিৎসা? ছি!'

শেষ কথাটাতে সকলে যে কি মুগ্ধ হইয়া গেল বলিবার নয়। এমন ভক্তি মহেশ চৌধুরীর যে মার খাইয়া মরিতে বসিয়াছে তবু চিকিৎসা করিবে না—গুরু মারিয়াছে বলিয়া! সকলের কাণে যেন বাজিল 'মারলি মারলি কলসী-কাণা, তাই বলে কি প্রেম দিব না?'

না জানি কতবড় মহাপুরুষ সদানন্দ, যার জন্য মহেশ চৌধুরীর এমন অলৌকিক ভক্তিভাবের উদয় হইয়াছে, এমন মহৎ প্রেরণা আসিয়াছে। সদানন্দের উপর মানুষের ভক্তিশ্রদ্ধা যেন সভয় বিস্ময়ে হু হু করিয়া বাড়িয়া গেল। অনেকের মনে হইতে লাগিল, সদানন্দ হয় তো মানুষ নয়, মানুষের রূপধারী—

ফিস্ ফিস্ করিয়া অন্তরঙ্গ মানুষের কাণে কাণেই শুধু কথাটা বলা যায়। কয়েকটি ভাঙ্গা কুঁড়ের ভিতরে, গেঁয়ো পথের ধারে, কয়েকটি জমকাল গাছের ছায়ায় দেবতার আবির্ভাবের কথাটা কাণাকাণি হয়। অকাল-বার্দ্ধক্যের ছাপমারা কয়েকটি ক্লিষ্ট মুখে উত্তেজিত আনন্দের বিস্ময়কর আবির্ভাব ঘটে।

কয়েকটা দিন একরকম একা একা ঘরের কোণে কাটাইয়া দিবার পর সদানন্দই প্রথম কথাটা পাড়ে। বলে, 'আমি বরং কোথাও চলে যাই মহেশ।'

মহেশ চৌধুরী বলে, 'আর ও কথা কেন প্রভু? সেদিন তো ক্ষমা করেছেন, ও ব্যাপার তো চুকে গেছে?'

'চুকে গেছে বললেই কি সব ব্যাপার চুকে যায় মহেশ?'

'আজ্ঞে তা যায় বৈকি। আমরা এখন ভাবব ও ঘটনাটা যেন ঘটেই নি, মন থেকে একেবারে মুছে ফেলব। মনের বাইরে তো কোন কিছুর জের চলতে পারে না প্রভু।'

মাঝে মাঝে মহেশ চৌধুরী এমনভাবে কথা বলে, মনে হয় ঠিক যেন সদানন্দকে উপদেশ দিতেছে। প্রথম প্রথম সদানন্দ অতটা খেয়াল করিত না, আজকাল মন দিয়া শোনে। উপদেশের মতই কথাগুলি সে গ্রহণ করে এবং পালন করিবার

চেষ্টাও করে। মহেশ চৌধুরীর এখনকার উপদেশ, সেদিনকার ব্যাপারটা মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে হইবে। কথায়, ব্যবহারে, এমন ভাব দেখাইতে হইবে, যেন কিছুই ঘটে নাই। ভাবিয়া চিন্তিয়া সদানন্দ সেই চেষ্টাই করে। কয়েকদিন গম্ভীর ও বিষণ্ণভাবে ঘরের কোণায় কাটাইবার পর হঠাৎ সেদিন হাসিমুখে গিয়া হাজির হয় সান্ধ্য মজলিসে।

সকলেই উপস্থিত আছে। বিভূতি এবং মাধবীলতাও। প্রথমটা সদানন্দের ভয় হয়, বিভূতি হয়তো রাগ করিয়া উঠিয়া যাইবে, হয়তো একটা কেলেঙ্কারী করিয়া বসিবে। মাধবীলতা হয় তো তেমন কিছু করিবে না, সে সাহস তার নাই, কিন্তু কথায় ব্যবহারে সহজ ভাব কি ফুটাইয়া তুলিতে পারিবে মেয়েটা? মহেশ চৌধুরী তো বলিয়া খালাস সব চুকিয়া বুকিয়া গিয়াছে, কিন্তু ওদের দুজনের পক্ষে কি চুকিয়া বুকিয়া যাওয়া সম্ভব?

কিছুক্ষণ কাটিয়া যাওয়ার পর সদানন্দ বুঝিতে পারে, ব্যাপারটা সত্যসত্যই সকলে মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছে—যতটা মুছিয়া ফেলা সম্ভব। বিভূতি আর মাধবীলতা যে একটু সঙ্কোচ আর অস্বস্তি বোধ করিতেছে, প্রথমদিকে এটা পরিষ্কার বুঝা গিয়াছিল, কিছুক্ষণ পরে দুজনেই অন্যদিনের মত সহজভাবে সকলের হাসি গল্পে যোগ দিয়াছে।

সদানন্দের খুসী হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু মনটা তার হঠাৎ বড় খারাপ হইয়া গেল। আর একবার সে যেন মহেশ চৌধুরীর কাছে হারিয়া গিয়াছে। অতি শোচনীয় কুৎসিত পরাজয়। সেদিনকার ব্যাপারে মহেশ চৌধুরীর কাছে সে যে ছোট হইয়া গিয়াছে, আজ এই সান্ধ্য-মজলিসে আসিয়া প্রথম সেটা সদানন্দের খেয়াল হইল।

তার মনে হইতে লাগিল, এই উদ্দেশ্যই ছিল মহেশ চৌধুরীর, তাকে হীন করার জন্যই সে হাতুড়ি দিয়া সেদিন নিজের মুখে আঘাত করিয়াছিল। এখনো মহেশ চৌধুরীর মুখ অল্প অল্প ফুলিয়া আছে—কি সাংঘাতিক মানুষ মহেশ চৌধুরী।

তের

যাই হোক, একদিন যথারীতি বিভূতি আর মাধবীলতার বিবাহটা হইয়া গেল। প্রকাশ্য জীবনটা যেমন কাটিতেছিল, প্রায় সেই রকমই কাটিতে লাগিল দুজনের, বেশভূষার কিছু পরিবর্ত্তন দেখা গেল মাধবীলতার এবং চেহারাটাও যেন তার বদলাইয়া যাইতে লাগিল। এমন পরিবর্ত্তন যে দেখিলে মনে প্রশ্ন জাগে, এতদিন কি অসুখী ছিল মেয়েটা, এবার সুখী হইতে আরম্ভ করিয়াছে?

বিবাহে বিপিন আসিয়াছিল, পরে আরেক দিন আসিয়া সে অনেকক্ষণ সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়া গেল,—সদানন্দ ছাড়া। আমল দিলে সদানন্দের সঙ্গেও হয়তো সে ভাব জমাইয়া যাইত—শত্রুতা ভুলিয়া যাওয়ার প্রয়োজনে মানুষ মানুষের সঙ্গে যে রকম ভাব জমায়। মহেশ চৌধুরী সদানন্দকে কেন্দ্র করিয়া নতুন একটি আশ্রম খুলিতেছে, এ খবরটা বিপিন পাইয়াছিল, কিন্তু রাগ দুঃখ বা হিংসার বদলে তার উৎসাহই দেখা গেল বেশী। নিজেই কথা তুলিয়া সে মহেশ চৌধুরীকে বলিয়া গেল যে, রেশারেশি আশঙ্কা করিবার কোন কারণই অনুমান করা যায় না, বিপিন আর মহেশের আশ্রমের উদ্দেশ্য হইবে সম্পূর্ণ পৃথক।

'আপনার আশ্রমের উদ্দেশ্যটা কি বিপিনবাবু?'

প্রশ্নটা অসঙ্গত। এতকাল যে আশ্রম চলিতেছে, চারিদিকে যে আশ্রমের বেশ নামও একটু আছে, তার মালিককে বাড়ীতে পাইয়া একেবারে আশ্রমের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এ রকম একটা প্রশ্ন না করিলেই ভাল হইত। মহেশ চৌধুরীকে বিপিন কোনদিন পছন্দ করিত না, আশ্রমে লোকটাকে সে চিরদিন দমাইয়া রাখিবার চেষ্টাই করিয়াছে, এখন হঠাৎ অতীতের কথা ভুলিয়া বাড়ী বহিয়া আসিয়া এ রকম খাতির জমানোর চেষ্টাতেই মহেশের কৃতার্থ হইয়া যাওয়া উচিত ছিল। আশ্রমের উদ্দেশ্য? কে না জানে বিপিনের আশ্রমের উদ্দেশ্যের কথা। জিজ্ঞাসা করাটাই বাহুল্য।

বিপিনের কোন জবাব না পাইয়া মহেশ চৌধুরী আবার বলিয়াছিল, 'সত্যি কথাটা বলি, এতকাল আপনার আশ্রমে যাতায়াত করছি কিন্তু উদ্দেশ্যটা ঠিক বুঝতে পারি নি। প্রভু যতকাল ছিলেন, ততকাল তবু একটা কারণ ছিল, ওঁর জন্যে—'

বিপিন মৃদু হাসিয়া বলিয়াছিল, 'প্রভুই বটেন।'

মহেশ চৌধুরী দুই কাণে আঙুল দিয়া বলিয়াছিল, 'ছি বিপিনবাবু, ছি।'

তবু তো সর্ব্বজনবিদিত আশ্রমের উদ্দেশ্যটা বিপিন পর্য্যন্ত মহেশকে ঠিক ভাবে বুঝাইয়া দিতে পারিল না। নিজের মনেও তার ধারণা ছিল কথাটা অত্যন্ত সহজ ও সরল। বলার সময় দেশ,

সমাজ ও ধর্ম্মের মধ্যে বক্তব্যটা দিশেহারা হইয়া গেল। দেশ, সমাজ ও ধর্ম্মের কল্যাণ তো বটেই, কিন্তু কোন্ দিকে, কি ভাবে?

'আহা, আশ্রমে কি হয় না হয় সে তো আপনার জানাই আছে।'

মহেশ চৌধুরী সবিস্ময়ে বলিয়াছিল, 'কিন্তু আশ্রমে তো আপনার একরকম কিছুই হয় না। ভাল একটা যায়গা দেখে কয়েকজন লোককে শুধু থাকতে দিয়েছেন। প্রভু যখন ছিলেন, তখন তবু মাঝে মাঝে দশজন এসে সদুপদেশ শুনবার সুযোগ পেত, এখন—'

'এখনও পায়।'

'কে বলেন?'

'আমি বলি। আশ্রমে যাঁরা আছেন, তাঁরাও বলেন।'

'লোকজন আসে?' মহেশ চৌধুরী সন্দিগ্ধ ভাবে বলিয়াছিল, 'শুনলাম লোকজনের আসা অনেক কমে গেছে?'

মহেশ চৌধুরীর আশ্রম স্থাপিত হওয়ার পর বিপিনের আশ্রমে লোকজনের যাতায়াত আরও কমিয়া গেল,—একরকম বন্ধই হইয়া গেল বলা চলে। নূতন আশ্রমের উদ্বোধন-উৎসবটা হইল বেশ জমকাল। সহর হইতে দু'চারজন নামকরা লোক আসিল, খবরের কাগজে বিস্তারিত বিবরণও বাহির হইল। বিপিনের আশ্রমে যারা সদানন্দের উপদেশ শুনিতে যাইত, তারা সকলে তো আসিলই, কাছে ও দূরের আরও অনেক গ্রামের নারী পুরুষ ছেলেমেয়ের আবির্ভাবও ঘটিল। ভিড় হইল ছোটখাট একটি মেলার মত। তার উপর আবার ছিল কাঙালী ভোজনের ব্যবস্থা। কদিন ছোটখাট গ্রামটির উপর দিয়া যে চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার প্রবাহ বহিয়া গেল, তা সত্যই অভূতপূর্ব্ব। উৎসব শেষ হইয়া গেল, দূরের যারা আসিয়াছিল সকলেই প্রায় ফিরিয়া গেল, আশ্রমের চিহ্ন হিসাবে খাড়া রহিল কেবল মহেশ চৌধুরীর বাড়ীর পাশে বাগানের পিছনের মাঠে মস্ত একটা নতুন চালা আর বাগানের বাঁশের গেটের উপরে এক টুকরা আলকাতরা মাখানো চারকোণা কাঠে সাদা অক্ষরে লেখা 'শ্রী শ্রী সদানন্দ স্বামীর আশ্রম'। নতুন আশ্রমে মানুষের ভিড় কিন্তু কমিল না, মানুষের মুখে নতুন আশ্রমের আলোচনাও থামিল না। প্রত্যেক দিন দলে দলে লোক আসিয়া নতুন চালার নীচে বসে, মহেশ চৌধুরীর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা ও সদানন্দের বিস্তারিত উপদেশ শোনে, দলে দলে সদানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। সদানন্দ যতদিন বিপিনের কাছে ছিল, সাধারণ মানুষের পক্ষে তার শিষ্যত্ব লাভ করা প্রায় অসম্ভব ছিল, অনেক বাছাবাছির পর বিপিন কদাচিৎ যাকে উপযুক্ত মনে করিত তাকেই কেবল সদানন্দ শিষ্য করিত। এখানে সব বাছবিচার তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, যে আসে তাকেই সদানন্দ আলিঙ্গন দেয়।

আলিঙ্গনটাই শিষ্যের দীক্ষা। এখানে মহেশ চৌধুরীর পরামর্শে অথবা অনুরোধে এই নতুন প্রথায় দীক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। মেয়েদের জন্য ব্যবস্থাটা অবশ্য অন্য রকম, দু'পায়ের পাতার উপর মেয়েরা মাথা নামাইলে সদানন্দ মাথার উপর দুটি হাত রাখিয়া তাদের শিষ্যত্ব দান করে। বিভূতি আশ্রমের ম্যানেজার। প্রকাণ্ড একটা বাঁধানো খাতায় সে সকলের নাম, ঠিকানা এবং প্রণামীর পরিমাণটা লিখিয়া রাখে।

মন্ত্রশিষ্যও করা হয় কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব কম। মন্ত্রের জন্য বিশেষ ভাবে যারা আবেদন করে ও আগ্রহ জানায়, কেবল তাদেরই কাণে সদানন্দ মন্ত্রদান করে।

মহেশ চৌধুরীই একদিন সবিনয়ে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করিয়া সদানন্দকে বুঝাইয়া দিয়াছিল, হাত জোড় করিয়া বলিয়াছিল, 'প্রভু, গুরু অনেকের আছে, গুরু ত্যাগ করাটা ঠিক উচিত কাজ হয় না। মন্ত্র দেওয়া তো আমাদের উদ্দেশ্য নয়। শুধু মন্ত্র নিয়ে শিষ্য হবার নিয়ম করলে যারা আগেই মন্ত্র নিয়েছে তাদের বড় মুস্কিল হবে। এমনি শিষ্য হতে দোষ নেই, উপদেশ শুনবে, সাধন ভজন পূজা অর্চনার নিয়মকানুন জেনে যাবে, সৎকাজে যোগ দেবে, আশ্রমের নিজের লোক হয়ে থাকবে, তাই যথেষ্ট। এ ভাবে শিষ্য করলে কারও আশ্রমে যোগ দিতে কোন অসুবিধা থাকবে না।'

সদানন্দ একটু খুঁত খুঁত করিয়া বলিয়াছিল, 'কিন্তু নির্ব্বিচারে সকলকে—'

মহেশ চৌধুরী বলিয়াছিল, 'বেশী বাছাবাছি করে লাভ কি প্রভু? সবাইকে নিলে আমাদের ক্ষতিও কিছু নেই। ফাঁকিবাজ বাজে লোক হয়, খাতায় শুধু তার নামটা থাকবে। শিষ্য হলেও শিষ্য হয়েছে বলেই বিশেষ কোন অধিকারও দেওয়া হবে না যে ক্ষতি করবার সুবিধা পাবে।

ক্ষতি করার ইচ্ছা যদি কারও থাকে, শিষ্য হিসাবে খাতায় নাম উঠলেও যতটা সুযোগ পাবে, শিষ্য না হয়েও ততটা সুযোগ পাবে।'

শুনিতে শুনিতে সদানন্দের মনে হইয়াছিল, মহেশ চৌধুরী বুঝি তাকে আশ্রম পরিচালনার কায়দা কানুন শিখাইয়া দিতেছে—গুরু যেমন শিখায়। মহেশ চৌধুরীর মুখে বিনয় ও ভক্তির স্থায়ী ছাপ থাকে, জোড় হাতে দেবপূজার মন্ত্রোচ্চারণের মত করিয়া সে কথা বলে, তবু আজকাল প্রায়ই সদানন্দের এ রকম মনে হয়। মনে হয়, এর চেয়ে বিপিন যেন ভাল ছিল, অন্তরালে সে তর্ক করিত, উপদেশও দিত, হুকুমও দিত, কিন্তু সে সব ছিল বন্ধুর মত, তার কাছে নিজেকে এতটা অপদার্থ মনে হইত না।

আরও একটা ব্যাপার সদানন্দ লক্ষ্য করে। তার নামে আশ্রম করা হইয়াছে, সে-ই একরকম ভিত্তি এই আশ্রমের, অথচ খাতির যেন লোকে তার চেয়ে মহেশ চৌধুরীকেই করে বেশী। লোকের কাছে নিজের দামটা আগের চেয়ে যে কমিয়া গিয়াছে, এটা সদানন্দ স্পষ্টই অনুভব করিতে পারে। সকলের মুখে আর যেন আগের সেই সভয় ভক্তির ছাপটা খুঁজিয়া মেলে না, সকলের কথায় ও ব্যবহারে মানুষের বদলে নিজেকে আর দেবতা হিসাবে প্রতিফলিত হইতে দেখা যায় না। মহেশ চৌধুরীর উপরে লোকের ভক্তিশ্রদ্ধা যেন হুহু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে দিন দিন। এত যে ন্যাকামি মহেশ চৌধুরী করে, সকলের কাছে সব সময় মোসাহেবের মত নত হইয়া থাকে,—তবু।

মাঝে মাঝে সদানন্দ সন্দেহমূলক ক্ষীণ একটা অনুভূতির মধ্যে নিজের চালচলনের ভাঙ্গনধরা পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে। আগের মত তেজ কি আর তার নাই? আগের সেই সহজ আত্ম-বিশ্বাস? একটু একটু ভয় কি সে করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে সাধারণ তুচ্ছ মানুষগুলিকে? মানুষের সংস্পর্শে আসিলে মাঝে মাঝে হঠাৎ সদানন্দ নিজেকে যাচাই করিবার চেষ্টা করে, কোথায় কি ঢিল হইয়া গিয়াছে তার নিজের মধ্যে যা সকলে টের পাইয়া যাইতেছে? টেরও কি পাইয়া যাইতেছে সত্যসত্যই? আর কিছুই সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না, মৃদু একটা অস্বস্তিবোধের স্থায়ী অস্তিত্ব ছাড়া, আত্মবিশ্লেষণের অন্যমনস্কতা সম্বন্ধে হঠাৎ সচেতন হইবার পর যেটা আরও বেশী জোরালো হইয়া পড়ে। সদানন্দ জানে, খুব ভাল করিয়াই জানে, এমন কোন পরিবর্ত্তন তার বাহিরে প্রকাশ পায় না, কারও পক্ষে যেটা লক্ষ্য করা সম্ভব। তবু মনটা কেন যে খুঁত খুঁত করিতে থাকে। আগে কথা বলার মধ্যেও একটা বিস্ময়কর আনন্দ ছিল, নিজের কথা শুনিতে শুনিতে নিজেই সে মুগ্ধ হইয়া যাইত, সকলের অভিভূত ভাব দেখিয়া নিজের মধ্যে একটা অপার্থিব শক্তির সঞ্চার অনুভব করিত। এখন কথা হয় তো সে বলে আগের মতই, সামনের ভীরু, অসহায় আর অসুখী শিষ্যগুলিকে সুখ ও শান্তির সন্ধান দিবার অনন্যসাধারণ ক্ষমতা যে তার আছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই হয় তো বলার সময়টা তার থাকে না, কিন্তু তারপর একসময় তার মনে হইতে আরম্ভ হয়, সমস্ত জড়াইয়া ফলটা সুবিধাজনক হইল না। এই ভীরু অসহায় আর অসুখী শিশুগুলির মনে তার ব্যক্তিত্ব ও উপদেশের প্রভাব আগের মত কাজ করিতেছে না। করা সম্ভবও নয়, কারণ নিজেই কি সে বুঝিতে পারিতেছে না যে, আর সব ঠিক আগের মত থাকিলেও, সমগ্রভাবে ধরিলে তার ব্যক্তিত্ব ও উপদেশের প্রভাবটা আর আগের মত নাই?

ব্যাপারটা সদানন্দের বড়ই দুর্ব্বোধ্য মনে হয়। কোন কারণ খুঁজিয়া পায় না। কখনও সে ভাবে, সব কি তার নিজের কল্পনা, আজকাল একটু কল্পনাপ্রবণ হইয়া পড়িয়াছে? কখনও ভাবে, এখানকার প্রকাশ্য খোলাখুলি জীবন ভাল লাগিতেছে না বলিয়া, সব বিষয়ে বিরক্তি জাগিতেছে বলিয়া, এ রকম হইতেছে? বিপিনের মত একজন তাকে আড়াল করিয়া রাখে না, অধিকাংশ সময় নিজের একটি কুটীরের অন্তরালে নিজের মনে একা থাকার সুযোগ পায় না, সেইজন্য কি আনন্দ, উৎসাহ, শান্তি নষ্ট হইয়া যাইতেছে? অথবা মাধবীলতার জন্য মন কেমন করিতেছে, চিরদিনের জন্য মেয়েটা হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে বলিয়া?

কিন্তু মাধবীলতার জন্য বিশেষ কোন কষ্ট হইতেছে, তাও সদানন্দের মনে হয় না। প্রথমটা সত্যই বড় রাগ হইয়াছিল, পছন্দসই একটা খেলনা হাতের মুঠার মধ্যে আসিয়া ফসকাইয়া গেলে ছোট ছেলের যেমন অবুঝ রাগ হয়, খেলনাটা একেবারে ভাজিয়া চুরমার করিয়া ফেলিবার সাধ জাগে, কিন্তু সে সব সাময়িক প্রতিক্রিয়া কি মিটিয়া যায় নাই?

মাধবীলতাকে দেখিলে এখন কি একটা বিতৃষ্ণার ভাবই জাগে না তার?

অন্য একটা কারণেও মাধবীলতার উপর আজকাল মাঝে মাঝে সদানন্দের রাগ হয়। মাধবীলতা প্রাণপণে তাকে এড়াইয়া চলে। কথা তো বলেই না, সামনে পড়িলে তাড়াতাড়ি সরিয়া যায়। মাঝে মাঝে মহেশ চৌধুরীর পারিবারিক সান্ধ্য-মজলিসে বাধ্য হইয়া যদি বা হাজির থাকে, সদানন্দের যতটা তফাতে সম্ভব, পারিলে একেবারে পিছন দিকে, বসিবার চেষ্টা করে।

একদিন খুব ভোরে বারান্দায় মাধবীলতাকে একা দেখিয়া সদানন্দের একটু আলাপ করার সখ চাপিয়াছিল। নিছক আলাপ, আর কিছু নয়। হাসিমুখে সে বলিয়াছিল, 'এই যে মাধু! তোমার যে আজকাল দেখাই পাওয়া যায় না।'

'আমার বিয়ে হয়ে গেছে জানেন?' বলিয়া মাধবীলতা তৎক্ষণাৎ স্থান ত্যাগ করিয়াছিল। মাধবীলতার বাড়াবাড়িতে সদানন্দের বড় জ্বালা বোধ হয়, সেই সঙ্গে হাসিও পায়। এত অবিশ্বাস কেন তাকে? এ রকম হীন অমানুষ মনে করা? কি ছেলেমানুষ মাধবীলতা! তাই বটে, মেয়ে জাতটাই এরকম উদ্ভট হয় বটে!

এ সব ছাড়াও সদানন্দের মানসিক জগতে আরও একটা ব্যাপার ঘটে, যেটা আরও গুরুতর, আরও মারাত্মক, আরও বিস্ময়কর, আরও গভীর এবং আরও অনেক কিছু। অন্য কেউ নিজের মনের এরকম একটা অবস্থা বর্ণনা করিয়া তাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলে, সে সঙ্গে সঙ্গে ধরিয়া নিত লোকটার মাথা খারাপ হইয়াছে, কিন্তু নিজের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটায় সে বেশ বুঝিতে পারে মাথা খারাপ হওয়ার সঙ্গে এ ব্যাপারের কোন সম্পর্ক নাই, এটা মনোবিকার নয়, মনের মধ্যে তার এলোমেলো হইয়া যায় নাই কিছুই। যা কিছু অজানা ছিল, বুদ্ধির অগম্য ছিল, দুর্বোধ্য সঙ্কেতের মত সে সব অস্পষ্ট স্পষ্টতা লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এতকাল নিজের সমগ্র নিজস্বতা বলিয়া যা সে জানিত, পরিবর্ত্তনহীন বিচ্ছিন্নতা বজায় থাকিয়াও ওই অভিনব স্পষ্টতার সঙ্গে একটা আতঙ্কময় ফাঁপর-ফাঁপর ভাবের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। সদানন্দ জানে সব সে বুঝিতে পারিতেছে, তবু বার বার নিজেকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে গিয়া সে ব্যর্থ হইয়া যায়। বুঝাইবার চেষ্টাটা হয় নানা ভাবে। ধরা যাক, প্রকাণ্ড গভীর একটা বন, যার মধ্যে আনুমানিক আবছা অন্ধকার, বাঘ ভালুক সিংহ, চিরস্থায়ী ভয় ও বিষাদ—বনের ঠিক বাহিরে ঝলমলে সূর্য্যোলোকে দাঁড়াইয়া অজ্ঞাত কারণের অসহ্য শোকে শান্ত ও নির্ব্বিকার সদানন্দ চুপ চাপ গা এলাইয়া দিয়া মাটি হইতে কয়েক হাত উঁচুতে বাতাসে ভাসিতেছে। এরকম আরও কয়েকটা ইচ্ছাকৃত স্বপ্নের সাহায্যে সদানন্দ নিজের কাছে প্রমাণ করার চেষ্টা করে, নিজের মনের অপূর্ব্ব ব্যাপারটা বুঝিতে পারে বলিয়া তার যে ধারণা আছে, সেটা মিথ্যা নয়। কিন্তু স্বপ্ন দেখার সময় স্বপ্ন যা থাকে এবং জাগিয়া থাকার সময় স্বপ্ন যা হইয়া যায়, তার পার্থক্যটা ঘুচাইয়া দিবার মত ক্ষমতা তার হয় না, তাই ঘুমন্ত অবস্থার স্বাভাবিক স্বপ্নকে জাগ্রতাবস্থায় ব্যাখা হিসাবে সামনে খাড়া করিয়া জাগ্রত অবস্থার স্বাভাবিক স্বপ্নের সঙ্গে কোন মিল সে খুঁজিয়া পায় না। জাগ্রত অবস্থার কল্পনার স্বপ্ন হইলেও কথা ছিল, বিশেষ প্রশ্রয় না দিলেও বিচিত্র, উদ্ভট আর অসম্ভব অনেক কিছুকে সম্ভব ধরিয়া নিয়া খাপছাড়া আনন্দ উপভোগের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সদানন্দের পরিচয় আছে। কিন্তু সে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ।

একবার কেবল সদানন্দের মনে হইয়াছিল, এই কি প্রেম, প্রিয়কে হারানোর পর প্রেম যা হয়, আসল খাঁটি প্রেম? মাধবীলতাকে হারানোর পর হইতেই তো তার মধ্যে এরকম হইতেছে? কিন্তু নিজের কাছে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করিয়া ব্যাকুলতা এত সহজে মিটাইয়া দেওয়া সম্ভব হয় নাই। অজানা ও দুর্ব্বোধ্য স্মৃতি হোক, উপলব্ধি হোক, ক্ষয়িতমূল আত্ম-বিকাশের বিচ্ছিন্ন অংশ হোক, অথবা আর যাই হোক, স্পষ্টতর হওয়ার যে প্রক্রিয়া চলিতে থাকে, তার সঙ্গে মাধবীলতার কোন সম্পর্ক নাই। মাধবীলতা সম্বন্ধে মানসিক দুর্ব্বলতা ঘটবার একটা আশঙ্কা মনে আসিয়াছিল, সেই আশঙ্কাটার জন্যই এ ধরণের কথা সদানন্দের মনে আছে।

এক সময় হঠাৎ দরজা বন্ধ করিয়া সদানন্দ ঘরের কোণে মাটিতে বসিয়া পড়ে, আসন থাকিলেও মনে থাকে না। মেরুদণ্ড সিধা করিয়া বসে, চোখ বন্ধ করে, হাত জোড় করে—ইচ্ছাও নয়, অনিচ্ছায়ও নয়। বিড় বিড় করিয়া বলিতে থাকে—হে ঈশ্বর দয়া কর। ঈশ্বর বলে যদি কেউ থাকো, এ সময় আমায় দয়া কর। তুমি তো জানো আমি স্বীকার করি না তুমি আছ, তবু যদি থাকো, দয়া কর।

তুমি তো সব জানো—তুমি তো জানো কি উদ্দেশ্যে আমি এখন মেনে নিচ্ছি যে তোমায় আমি স্বীকার করি না—তোমায় স্বীকার করি না মেনে নেওয়ার উদ্দেশ্যটা কেন মেনে নিচ্ছি তাও তো তুমি জানো —কথা জড়াইয়া সদানন্দের কথা বন্ধ হইয়া যায়। মাথাটা প্রণাম করার ভঙ্গিতে মাটিতে ঠেকাইয়া সে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে।

এমনিভাবে ভাবোচ্ছ্বাসের নেশায় সদানন্দ অন্যমনস্কও হয়, নিজেকে শ্রান্ত ও শান্ত করিয়া ঘুমও পাড়ায়।

আশ্রমের বড় চালাটার পাশে সদানন্দের জন্য একখানা নতুন ঘর তোলা হয়। সদানন্দ হাসিয়া বলে, 'বাড়ীতে রাখতে ভরসা হচ্ছে না মহেশ?'

মহেশ আহত হইয়া বলে, 'প্রভু?'

'আহা, এত সহজে ঘা খাও কেন বলত মহেশ? তামাসা বোঝ না?'

স্তব্ধ হইয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া মহেশ হঠাৎ বলে, 'না প্রভু, আমি সত্যই বড় অপদার্থ। আপনি যা বললেন, ওই জন্যই আপনাকে সরিয়ে

মহেশ চৌধুরীর মুখে কথাটা এমন খাপছাড়া শোনায়, বলিবার নয়। অন্তঃপুরে তাকে স্থান দিতে সাহস না হওয়াও মহেশের পক্ষে যেমন আশ্চর্য্য, তার সামনে এ ভাবে স্বীকার করার সাহস হওয়াও তার চেয়ে কম আশ্চর্য্য নয়। এই মহেশ চৌধুরীই না হাতুড়ী দিয়া নিজের মুখে আঘাত করিয়াছিল, মাধবীলতাকে অপমান করার জন্য সদানন্দের উপর ছেলের রাগ হওয়ার প্রায়শ্চিত্ত বাবদে?

'আমায় তুমি আর বিশ্বাস কর না, না মহেশ?'

'বিশ্বাস করি বৈকি প্রভু, আপনি তো দেবতা। তবে সাধনার যে স্তরে আপনি পৌচেছেন, এখন আর আপনাকে ঘরগেরস্থালির মধ্যে রাখতে ভরসা হয় না। আপনার জন্যে সারাদিন আমার বুকের মধ্যে কাঁপে প্রভু। আমি এ অবস্থাটা পার হতে পারি নি প্রভু, তবে আমি তো অপদার্থ বাজে লোক, আমার সঙ্গে আপনার তুলনাই হয় না,—আপনি পারবেন। আপনি নিশ্চয় পার হয়ে যাবেন।'

সদানন্দ ভ্রু কুঁচকাইয়া মহেশ চৌধুরীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, বুঝিয়াও যেন বুঝিয়া উঠিতে পারে না মানুষটাকে, দ্বিধা সন্দেহ ভয় শ্রদ্ধা মমতা প্রভৃতি কত বিভিন্ন মনোভাব যে পলকে উদয় হয়, তার হিসাব থাকে না। যা বলিল মহেশ চৌধুরী তাই কি তবে ঠিক? মিথ্যা কথা তো মহেশ বলে না। কেমন করিয়া লোকটির সম্বন্ধে এই ধারণাটা তার নিজের মনেই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল, নিজেই সদানন্দ তা জানিতে পারে নাই, কিন্তু ক্ষণিকের মধ্যে এই ধারণাটি আর সব মনোভাবকে যখন চাপা দিয়া মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, তখন সদানন্দ এক অদ্ভুত কাজ করিয়া বসে। হঠাৎ মহেশের পায়ের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া প্রায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলে, 'মহেশ, আমায় তুমি রক্ষা কর—বাঁচাও আমায়।'

তিন সন্ধ্যা পরম ভক্তিভরে যার পায়ের ধূলা মাথায় ঠেকায়, তাকে এ ভাবে পায়ে পড়িতে দেখিয়া মহেশ চৌধুরীর মূর্চ্ছা যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু মানুষটা সে সত্যই খাপছাড়া। আরও কত তুচ্ছ কারণে কতবার যে ব্যাকুল হইয়াছে, কিন্তু এখন ব্যাকুলতার বদলে আত্মপ্রতিষ্ঠাই যেন তার বাড়িয়া যায়। সহজ ভাবেই সে বলে, 'প্রভু, এ রকম করবেন না। এই জন্যই তো গেরস্থালির ভেতর থেকে আপনাকে সরিয়ে দিচ্ছি। আপনাকে রক্ষা করার ক্ষমতা কি আমার আছে প্রভু? নিজেকে আপনার নিজেরি রক্ষা করতে হবে—ভেবে দেখুন, নিজেকে আপনার নিজেরি রক্ষা করতে হবে।'

তারপর সদানন্দ উঠিয়া বাগানে চলিয়া যায়, লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ সদানন্দ! 'গেরস্থালি!' কতবার মহেশ কথাটা উচ্চারণ করিয়াছে। মানুষটা কি কম চালাক মহেশ, কম ফন্দিবাজ! মেয়েমানুষ নয়, গেরস্থালি! গেরস্থালির মধ্যে সদানন্দকে আর রাখিতে ভরসা হইতেছে না, তাই মহেশ তাকে সরাইয়া দিতেছে! বাগান হইতে সদানন্দ মাঠে যায়, সেখানে নেংটি পরা কে যেন একটা মানুষ একটা বাঁধা গরুকে প্রাণপণে মারিতেছিল। দেখিয়াই প্রাণপণে ছুটিতে ছুটিতে কাছে গিয়া সদানন্দ লাঠিটা ছিনাইয়া নিয়া লোকটাকে এক ঘা বসাইয়া দেয়। 'এমন করে মারছিস্, লাগে না গরুটার?' তারপর লাঠিটা ফেলিয়া দিয়া লোকটার যেখানে মারিয়াছিল সেখানে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলে, 'আহা, তোমার লেগেছে বাবা?' তারও পরে লোকটিকে সঙ্গে করিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া মহেশকে বলে, 'একে একটা টাকা দিয়ে দাও তো মহেশ।'

গরীব চাষাভূষা মানুষ সাধু-সন্ন্যাসী দেখিয়াই ভড়কাইয়া যায়। তার উপর, সাধুটি কে, তাও তার অজানা ছিল না। থতমত খাইয়াই ছিল, এতক্ষণে বলিল, 'মোটে একটা, আজ্ঞে?'

শুনিয়াই তো সদানন্দ চটিয়া গেল। 'ওরে হারামজাদা, যা করে মারছিলি গরুটাকে, তোকে খুন করে ফেলা উচিত ছিল। তার বদলে একটা টাকা দিচ্ছি, তাতে তোমার পোষাল না? যা এখান থেকে, ভাগ, কিছু পাবি না তুই।'

'আজ্ঞে না কর্তা, যা দিবেন মাথা পেতে লিব।'

'কিছু দেবে না তোকে—একটি পয়সাও নয়। যা এখান থেকে—গেলি? দিও না মহেশ, খপর্দ্দার দিও না।'

রাগের মাথায় সদানন্দকে উঠিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া টাকার আশা ছাড়িয়া লোকটি তখনকার মত পালাইয়া যায়। টাকাটা কোমরে গুঁজিয়া সদানন্দ দাঁড়াইয়া থাকে। ঘণ্টাখানেক পরে আশ্রমের চালার নীচে মস্ত আসর বসিলে সকলের সামনেই জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সদানন্দ বলে, 'আমার মনটা বড় দুর্ব্বল হয়ে গেছে, মহেশ।'

মহেশ চৌধুরী ভরসা দিয়া বলে, 'তাতো যাবেই প্রভু?'

ভরসা পাওয়ার বদলে সদানন্দ কিন্তু আবার ভয়ানক চটিয়া ধমক দিয়া বলে, 'যাবেই মানে? কি যে তুমি পাগলের মত বল, তার ঠিক নেই।'

চৌদ্দ

সদানন্দ ভাবে: আমি নিজে যে কি সাধনা করছি, আমি নিজে তা জানি না কেন? সাধনার কোন্ স্তরে আমি পৌঁছেছি, আমার চেয়ে মহেশ চৌধুরী তা বেশী জানে কেন? ব্যাপারখানা কি?

নিজের কাছে ফাঁকি খুব ভালরকমেই চলে কি না, সদানন্দ তাই ভাবিয়া পায় না ঠিক কোন্ প্রক্রিয়ায় কি ভাবে কোন্ সাধনাটা সে কবে করিয়াছে। আসন করিয়া অনেক সময় বসিয়া থাকিয়াছে বটে, আবার অনেক সময় বসিয়া থাকেও নাই। কিন্তু আসন করিয়া বসিয়া থাকিলেই কি সাধনা হয়, আর কোন রীতিনীতি নিয়ম কানুন সাধনের নাই? আসন করিয়া বসিয়াই থাক আর বিছানায় চিৎ হইয়া পড়িয়াই থাক, চিন্তা সে যে একরকম সব সময়েই করে, জীবনের তুচ্ছতম বিষয়টির মধ্যে রহস্যময় দুর্ব্বোধ্যতা আবিষ্কার করা হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিরাট রহস্যগুলির ফাঁকি ধরিয়া ফেলা পর্য্যন্ত নানা ধরণের বিচিত্র চিন্তায় মসগুল হইয়া সে যে দিন কাটাইয়া আসিতেছে, এটা তার খেয়ালও হয় না। দিনের পর দিন নিজেকে নতুন চেনায় চিনিয়াছে, আবার নতুন অচেনায় আত্মহারা হইয়া গিয়াছে। এ ব্যাপারটাকে সদানন্দ সাধারণ বাঁচিয়া থাকার পর্য্যায়েই ফেলে। এক একজন মানুষ থাকে যারা ঘরে বসিয়া এলোমেলো লেখাপড়া করে, আগে শেষ করে দ্বিতীয়ভাগ, তারপর ধরে প্রথমভাগ, জ্ঞান হয়তো তাদের জমা হয় অনেক ডিক্রীধারী নামকরা জ্ঞানীর চেয়ে বেশী, কিন্তু জ্ঞান বলিয়া কিছু যে তারা সংগ্রহ করিয়াছে, এ ধারণাটাই তাদের মনে আসে না। ধাপে ধাপে সিঁড়ি ভাঙিয়া যেখানে উঠিতে হয়, বাঁশের খুঁটি বাহিয়াও যে সেইখানেই উঠিয়া পড়িয়াছে, উঠিবার পরেও অনেকে তা বিশ্বাস করিতে চায় না। সাধুসন্ন্যাসীর যোগ সাধনার বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ হইলেও বরং কথা ছিল, এসব যে ছেলেখেলা নয়, সদানন্দ তা ভাল করিয়াই জানে। নিজের অজ্ঞাতসারে সাধনার পথে অগ্রসর হইয়া চলা এবং কঠিন ও বিপজ্জনক অবস্থায় আসিয়া পৌছানো যে কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে, কোনমতেই তার মাথায় ঢুকিতে চায় না।

রাত দুপুরে ঘুম আসে না। অনেকক্ষণ ছটফট করিয়া মহেশ চৌধুরীকে ডাকিয়া পাঠায়।

'ভয় করছে প্রভু?'

প্রশ্ন শুনিবামাত্র সদানন্দ টের পায়। এতক্ষণ ভয়ই করিতেছিল বটে। একটা দুর্ব্বোধ্য বীভৎস আতঙ্ক মনের মধ্যে চাপিয়া বসিয়াছে।

তবু সাহস করিয়া সদানন্দ বলে, 'তুমি ভুল করছ মহেশ। আমি তো কোনদিন সাধন ভজন কিছু করিনি।'

'রাত দুপুরে জেগে বসে এই যে হিসাব করছেন সাধনভজন কিছু করেছেন না কি, এটা কি প্রভু?'

সদানন্দ অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে।

জোড়হাতে সবিনয়ে মহেশ চৌধুরী সদানন্দকে নানারকম উপদেশ দেয়! সদানন্দ নিজে কেন জানে না সে সাধক? কেন জানিবে! সাধক যে নিজেকে সাধক বলিয়া জানে, সেই জানাটা কি, সদানন্দ কি কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছে? অনন্যসাধারণ প্রক্রিয়াগুলি ওই জ্ঞানের জন্ম দেয় আর যতদিন সাধক ওই জ্ঞানকে একেবারে ভুলিয়া যাইতে না পারে, ততদিন সিদ্ধিলাভের কোন ভরসাই থাকে

না। সদানন্দের জানিবার তো কোন কারণ ঘটে নাই যে সে সাধনা করিতেছে, প্রক্রিয়া সে ঠিক করিয়া গিয়াছে নিজে, ও সব তার কাছে বাঁচিয়া থাকারই অঙ্গস্বরূপ। তা ছাড়া, যে রকম সাধনা সে কোনদিন করে নাই, লোকের কাছে নিজেকে সেইরকম সাধক বলিয়া পরিচিত করার ফলে মনে মনে একটা তার ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে যে, সাধনার ব্যাপারে সে ফাঁকিবাজ। আসলে কিন্তু—

'আমি যে ফাঁকিবাজ তাও দেখছি তুমি জানো মহেশ ?'

ফাঁকিবাজ তো আপনি নন প্রভু।'

সদানন্দ চটিয়া বলে, 'এই বলছ লোককে ফাঁকি দিই, সঙ্গে সঙ্গে আবার বলছ ফাঁকিবাজ নই, তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারি না মহেশ।'

'আজ্ঞে, দশজনকে জানিয়াছেন, আপনি সাধু —তাতে তো ফাঁকিবাজি কিছু নেই। দশজনের ভালোর জন্য নিজেকে সাধু ঘোষণা করাও সাধু ছাড়া অন্যের দ্বারা হয় না প্রভু। নিজের জন্য তো চান নি, লোকে সাধু ভাবুক, অসাধু ভাবুক, আপনার বয়ে গেল!'

সদানন্দ সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়িয়া বলে, 'নিজের জন্য চেয়েছিলাম কিনা কে জানে!'

'না, প্রভু, না। তাই কি আপনি পারেন ?'

খানিক পরে প্রকারান্তরে সদানন্দ মহেশ চৌধুরীকে এখানে শুইয়া থাকার অনুরোধ জানায়, কিন্তু মহেশ রাজী হয় না। বলে যে, ভয়কে এড়াইবার চেষ্টা করিলে তো চলিবে না, ভয়কে জয় করিতে হইবে।

মহেশ চৌধুরীর তুলনায় নিজেকে সদানন্দের অপদার্থ মনে হয়।

গভীর হতাশায় মন ভরিয়া যায়, রাগের জ্বালায় দেহের মধ্যে কি যেন সব পুড়িয়া যাইতে থাকে। মহেশ চৌধুরীর বাঁচিয়া থাকার কোন মানে হয় না, এই ধরণের উদ্ভট চিন্তা অসংখ্য খাপছাড়া কল্পনার আবরণে আসিয়া ভিড় করে। ক্রমে ক্রমে একটা বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার সে লক্ষ্য করে। মহেশ চৌধুরীর একটা বড় রকম ক্ষতি করার চিন্তাকে প্রশ্রয় দিলেই হঠাৎ নিজেকে যেন তার সুস্থ মনে হইতে থাকে, দেহ মনের একটা যন্ত্রণাদায়ক অসুস্থ অবস্থা যেন চোখের পলকে জুড়াইয়া যায়। যে আতঙ্কময় ফাঁপর ফাঁপর ভাবটা আজকাল তাকে থাকিয়া থাকিয়া আক্রমণ করে, আর যেন তার পাত্তাই পাওয়া যায় না। মহেশ চৌধুরীকে মনে মনে হিংসা করিবার সময়টা জাগ্রত স্বপ্নের প্রভাব হইতে সে মুক্তি পায়, মাথার ঝিমঝিমানি একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। বাতাসে ভাসিয়া বেড়ানোর বদলে হঠাৎ যেন শক্ত মাটিতে দাঁড়াইয়া আছে বলিয়া টের পায়।

মহেশ চৌধুরীকে তীব্রভাবে ঘৃণা করিয়া, দশজনের কাছে তাকে হীন প্রতিপন্ন করার সম্ভব অসম্ভব মতলব আঁটিয়া, আর নিজেকে তার চেয়ে ছোট মনে করার প্রতিক্রিয়ায় জর্জ্জরিত হইয়া গিয়া, সদানন্দ আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। অন্ততঃ তার তাই মনে হয়। ভয়টা যে এড়ানো যায়, রক্ত চলাচল শ্লথ করিয়া দেওয়ার মত উত্তেজনাবিহীন সর্ব্বগ্রাসী ভয়, তাও কি কম ? মহেশ চৌধুরী অবশ্য ভয় এড়ানোর চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু এসব ব্যাপারের সে কি বোঝে, কি দাম আছে তার উপদেশের ? সদানন্দকে উপদেশ দিতে আসে, স্পর্দ্ধাও কম নয় লোকটার!

দিন কাটিয়া যায়। মহেশ চৌধুরী শান্ত চোখে সদানন্দের চালচলন আর ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করে। মুখখানা যেন তার দিন দিন অল্পে অল্পে বিষণ্ণ ও গম্ভীর হইয়া উঠিতে থাকে।

একদিন মহেশ চৌধুরী বলে, 'প্রভু ?'

সদানন্দ একটা শব্দ করে, যেটা জবাব হিসাবেও ধরা যায়, আবার অবজ্ঞা হিসাবেও ধরা যায়।

'আর এগোতে পারছেন না প্রভু, না ?'

'কিসের এগোতে পারছি না ? কে বললে তোমাকে এগোতে পারছি না ?'

মহেশ চৌধুরীর চোখ ছল ছল করিতে থাকে, 'এগোতে না পারলে ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করুন, পিছিয়ে আসছেন কেন প্রভু ? এখন পিছু হটতে সুরু করলে কি আর উপায় আছে! প্রথমটা একটু ভাল লাগে, কিন্তু দুদিন পরে নিজের হাত পা কামড়াতে ইচ্ছা হবে। এমন যন্ত্রণা পাবেন, এখন তা ভাবতেও পারবেন না।'

'তোমার উপদেশ বন্ধ কর তো মহেশ।'

'উপদেশ নয়, কথাটা মনে পড়িয়ে দিচ্ছি। নিজেই বুঝে দেখুন, কি বিপদ ঘটাচ্ছেন নিজের।'

সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিলেও সদানন্দ কিছু কিছু বুঝিতে পারে। মহেশ চৌধুরীর সম্মুখ হইতে ছুটিয়া পালানোর এরকম জোরালো ইচ্ছা আগে তার

হইত না এবং মহেশ চৌধুরীর দিকে চোখ তুলিয়া চাহিবার কাজে এতটা শক্তিক্ষয়ও করিতে হইত না। নূতন একটা অনুভূতি আজকাল তার কাছে ধরা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, মানুষের জীবনের ব্যর্থতার অনুভূতি। অনুভূতিটা একেবারে নূতন, এ পর্য্যন্ত চাপা পড়া সঙ্কেতের মতও কোনদিন অনুভব করে নাই। মানুষের জীবনের ব্যর্থতার কথা অবশ্য সে অনেক ভাবিয়াছে, মাঝে মাঝে গভীর বিষাদে হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সে যেন ছিল অন্য জিনিষ। রোগে শোকে একজন মানুষকে কষ্ট পাইতে দেখিলে সহানুভূতির মধ্যে যে বিষাদ জাগিত, সমস্ত মানুষের জীবনের মূল্যহীনতা জাগাইয়া তুলিত সেই বিষাদ। কিন্তু এখন সে যা অনুভব করে, সেটা যেন ঠিক বিষাদ নয়। মানুষের বাঁচিয়া থাকার কোন অর্থ নাই, তার নিজের জীবনটা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত লোক বাঁচিয়া ছিল, তাহাদের জীবনও ব্যর্থ এবং ভবিষ্যতে যত লোক পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবে, তাদের জীবনও ব্যর্থ—কিন্তু তাতে যেন কিছু আসিয়া যায় না। ব্যর্থতার চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর নাই, জীবনের প্রতিকারহীন জীবনব্যাপী ব্যর্থতা—। অথচ তাও যেন সদানন্দের কাছে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। নির্ব্বিকার ভোঁতা একটা ক্ষোভ শুধু সে অনুভব করে। জ্বর আসিবার আগে শরীর ম্যাজ ম্যাজ করার মত এটা কি ভয়ানক কিছুর সূচনা?—মহেশ চৌধুরীর আলোচনা এই প্রশ্ন আর ভয় তার মধ্যে জাগাইয়া দেয়।

মহেশ চৌধুরীর ভক্তিশ্রদ্ধা ক্রমে ক্রমে যেন কমিয়া আসিতে থাকে। জোড়হাতে ছাড়া সদানন্দের সঙ্গে সে একরকম কথাই বলিত না, আজকাল হাত জোড় করিতে ভুলিয়া যায়। প্রভু শব্দটাও তার মুখে শোনা যায় কদাচিৎ। মহেশ চৌধুরীর ভক্তি শেষের দিকে সদানন্দকে বিশেষ কিছু তৃপ্তি দিত না, কিন্তু ভক্তির অভাব ঘটায় আজকাল তার ভয়ানক রাগ হয়।

সভায় কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ থামিয়া গিয়া সে সকলের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া ছাখে। মহেশ চৌধুরীর মত অন্য সকলের ভক্তি শ্রদ্ধাও কি কমিয়া গিয়াছে? এতকাল যাদের সে শিশু মনে করিয়া আসিয়াছে, মতামত নিয়া কোনদিন মাথা ঘামায় নাই, আজকাল তাদের তাকানোর ভঙ্গিতে অনুকম্পা আর অবজ্ঞা আবিষ্কার করিয়া বুকের মধ্যে হঠাৎ তার ধড়াস্ করিয়া ওঠে। কি করিয়াছে সে? কার কাছে কি অপরাধ করিয়াছে? কার সঙ্গে কিসের বাধ্যবাধকতায় সে আটক পড়িয়া গিয়াছে? দেহবাদী এইসব অপদার্থ মানুষ কেন তাকে সর্ব্বদা ইঙ্গিত করিতেছে; আমরা কাপুরুষ, কিন্তু হে মহাপুরুষ, তোমার চেয়ে কত সুখেই আমরা বাঁচিয়া আছি!

নিছক ভাবপ্রবণতা? যে জিনিষটা চিরদিন সে এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছে? বুঝিয়াও সদানন্দ যেন বুঝিতে পারে না। কোন্‌টা মনের দুর্ব্বলতা জানিবার পরেও সেটাকে দমন করা যে এমন কঠিন ব্যাপার, এতকাল তার জানা ছিল না। আগে ঘরের কোণে নিজের ছেলেমানুষীর কথা ভাবিয়া তার হাসি পাইত, এমন তুচ্ছ একটা বিষয়কে এত বড় করিয়া তুলিয়াছে কেন ভাবিয়া অবাক হইয়া যাইত—আজকাল ছেলেমানুষীকে প্রশ্রয় দেওয়ার দুর্ভাবনায় মাথা যেন তার ফাটিয়া যাওয়ার উপক্রম করে। হাত পা নাড়ায় বাধা দিলে শিশু যেমন ক্ষেপিয়া যায়, ছেলেমানুষীকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া সদানন্দের সেই রকম উন্মাদের মত আর্ত্তনাদ করিতে ইচ্ছা যায়।

একবার বিপিন আসিয়া বলে, 'তোর চেহারাটা বড় খারাপ হয়ে গেছে সদা।'

সদানন্দ রাগিয়া বলে, 'গেছে তো গেছে, তোর কি?

বিপিন উদাস ভাবে বলে, 'আমার আবার কি! তুই মরলেই বা আমার কি।'

ফিরিয়া যাওয়ার সময় মহেশ চৌধুরীর সঙ্গে বিপিনের দেখা হয়। বিপিন হাসিয়া বলে, 'সাধুজীকে খেতে দেন না নাকি? মুখের চামড়া যে কুঁচকে যেতে আরম্ভ করেছে মশায়?'

মহেশ চৌধুরী বলে, 'না খেলে কি মুখের চামড়া কুঁচকে যায় ভাই? নিজের মনকে কুঁচকে দিচ্ছেন, মুখের চামড়ার কি দোষ!' বিষণ্ণভাবে মহেশ চৌধুরী মাথা নাড়ে, 'অনেক আশা করেছিলাম, সব নষ্ট হয়ে গেল। কি খেলাই যে ভগবান খেলেন! এমন একটা মানুষ আমি আর দেখিনি বিপিন বাবু, অবতার বলা চলত। কি যে হল, নিজেকে একেবারে ধ্বংস করে ফেলেছেন।'

বিপিন অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে।

মহেশ চৌধুরী আবার বলে, 'গুরুর নির্দ্দেশ মেনে সারা জীবন প্রাণপাত করে বড় বড় যোগী ঋষি যে স্তরে উঠতে পারেন না, উনি নিজের স্বাভাবিক প্রেরণায় বিনা চেষ্টায় সেই স্তরে

পৌঁছেছিলেন। এক একবার আমি ভাবি কি জানেন, আমিই ভুল করলাম নাকি? আমি সচেতন করিয়ে দিয়েছি বলে কি বিগড়ে গেলেন? যেমন অবস্থায় ছিলেন, তেমনি অবস্থায় থাকলে হয় তো নিজের চেষ্টায় আপনা থেকে সামলে এগিয়ে চলতেন।'

মহেশ চৌধুরীর আপশোষ দেখিয়া বিপিন আরও অবাক হইয়া যায়। এতকাল লোকটাকে একটু পাগলাটে বলিয়া তার ধারণা ছিল, আজ হঠাৎ যেন ধারণাটা নাড়া খায়। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মহেশ চৌধুরী আবার বলে, 'এসব লোকের মধ্যে প্রচণ্ড তেজ আর শক্তি থাকে। যেই জেনেছেন সাধনার পথে এগোতে হবে, অমনি বিদ্রোহ করে বসেছেন। সামনে এগিয়ে দেবার জন্য আমি একটু আধটু ঠেলা দিয়েছি বলেই বোধ হয় রাগ করে পিছু হটতে আরম্ভ করেছেন। কি সর্ব্বনাশটাই আমি করেছি বিপিনবাবু?'

'যা করেছেন, ভাল উদ্দেশ্যেই তো করেছেন।'

'তবু আমার ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করাই হয় তো উচিত ছিল।'

দিন দশেক পরে মহেশ চৌধুরী একদিন সকালে বিপিনের আশ্রমে গেল। বিপিন আশ্রমে ছিল না, উমা আর রত্নাবলী মহেশকে আদর করিয়া বসাইল। আজকাল মহেশ চৌধুরীর সম্মান বাড়িয়াছে—মাধবীলতা তার ছেলের বৌ!

রত্নাবলী বলিল, 'আপনার ওখানে এবার আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করে দিন?'

মহেশ হাসিয়া বলিল, 'আমাদের ওখানে কি কারও থাকবার ব্যবস্থা আছে?—গিয়ে থাকতে হয়।'

উমা বলিল, 'আমাদের যেতে দিতে আপনি আপত্তি করছেন কেন বুঝতে পারি না।'

'আপত্তি? আপত্তি কিসের! তবে জানেন, আপনারা গেলে বিপিনবাবু রাগ করবেন কিনা, তাই আপনাদের নিয়ে যাইনি।'

'বিপিনবাবু রাগ করবেন বলে ইচ্ছে হলেও আমরা কোথাও যেতে পারব না! আমরা কি বিপিনবাবুর কয়েদী নাকি?'

'উঁহুঁ, তা কেন হবেন। আপনাদের ইচ্ছে হলে আপনারা যেখানে খুসী যাবেন, কিন্তু আমার কি নিয়ে যাওয়া উচিত? সেরকম ইচ্ছেও আপনাদের হয়নি যাওয়ার, হলে আপনারা নিজেরাই যেতেন, জোর করে যেতেন।'

'থাকতে দিতেন গেলে?'

'থাকতে দিতাম বৈকি।'

রত্নাবলী একটু খোঁচা দিয়া বলিল, 'কিন্তু বিপিনবাবু যে রাগ করতেন?'

মহেশ সহজভাবেই বলিল, 'রাগ করলে কি আর করতাম বলুন। আমি আপনাদের নিয়ে যাইনি, আপনারা নিজের ইচ্ছায় গিয়েছেন তাতেও যদি বিপিনবাবু রাগ করতেন—করতেন!'

'আপনি আশ্চর্য্য মানুষ!' উমা বলিল।

'উচিত অনুচিত জ্ঞানটা আপনার যেন একটু বেশী রকম সূক্ষ্ম। সব ব্যাপারেই কি এমনি করে বিচার করেন?' রত্নাবলী জিজ্ঞাসা করিল।

'বিবেক বড় কামড়ায় কিনা, বিচার না করে উপায় কি? বিবেকের কামড় এড়াবার সহজ উপায় থাকতে জেনে শুনে সাধ করে কামড় খাওয়া কি বোকামি নয়?'

'জীবনটা একঘেয়ে লাগে না আপনার?' রত্নাবলী জিজ্ঞাসা করিল।

'কেন, একঘেয়ে লাগবে কেন? সবাই বিচার করে কাজ করে, আমিও করি। অন্য দশজনে নিজের নিজের বুদ্ধি বিবেচনা মত কর্ত্তব্য ঠিক করে, আমিও তাই করি। কেউ জেনে শুনে ভুল করে, কেউ বুদ্ধির দোষে ভুল করে, কেউ কেউ আবার করছে কি না করছে গ্রাহ্যও করে না। আমি একটু চালাক মানুষ কিনা, তাই সব সময় চেষ্টা করি যাতে ভুল না হয়। তবু আমিও অনেক ভুল করে বসি। আমার যদি একঘেয়ে লাগে, তবে পৃথিবীর সকলেরি একঘেয়ে লাগবে।'

'আপনিও তবে ভুল করেন?'

'করি না? মারাত্মক ভুল করে বসি। সাধুজীকে নিয়ে গিয়ে একটা ভুল করেছি।'

উমা ও রত্নাবলী দুজনেই একসঙ্গে বলে, 'বলেন কি!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। জীবনে এমন ভুল আর করিনি।'

উমা আর রত্নাবলী মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।— 'কিন্তু বিপিনবাবু ওঁকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন বলেই তো আপনি—'

মহেশ চৌধুরী মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না না, তাড়াবেন কেন? দুজনে একটু মনোমালিন্য হয়েছিল, বন্ধু কিনা দুজনে। বিপিনবাবু তাই রাগ করে—যাকগে, কি আর হবে ওসব কথা আলোচনা করে?'

ঘণ্টাখানেক পরে বিপিন ফিরিয়া আসিলে মহেশ চৌধুরী তাকে আড়ালে ডাকিয়া নিয়া গেল। তাকে আশ্রমে দেখিয়াই বিপিন অবাক হইয়া গিয়াছিল, প্রস্তাব শুনিয়া তার বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

'ওকে ফিরিয়ে আনতে বলছেন?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ। আগের অবস্থায় ফিরে এলে হয়তো আত্মসম্বরণ করতে পারবেন।'

'ও কি ফিরে আসবে?'

'আসবেন বৈকি।'

বিপিন চুপ করিয়া থাকে। মাঝে মাঝে চোখ তুলিয়া তাকায় আর চোখ নামাইয়া নেয়। তারপর হঠাৎ বলে, 'দেখুন, আপনাকে সত্যি কথা বলি। মাঝে মাঝে আমি যে আপনার ওখানে যেতাম, আমার একটা উদ্দেশ্য ছিল। সদা চলে যাওয়ার পর আমার কতগুলি ভারি মুস্কিল হয়েছে, তাছাড়া ছেলেবেলা থেকে আমরা বন্ধু, ওকে ছেড়ে থাকতেও কেমন কেমন লাগছে। তাই ভেবেছিলাম, বলে কয়ে আবার ফিরিয়ে আনব। আমি অনেক বলেছি, ও কিন্তু রাজী হয়নি।'

মহেশ চৌধুরী বলিল, 'তা জানি। আমিও ওই রকম অনুমান করছিলাম।'

বিপিন চোখ বড় বড় করিয়া চাহিয়া থাকে।

মহেশ চৌধুরী আবার বলিল, 'এতকাল রাজী হন নি, এবার বললেই রাজী হবেন। এখানে উনি ভয়ানক যন্ত্রণা পাচ্ছেন।'

পনর

বলা মাত্র সদানন্দ রাজী হইল না, তবে শেষ পর্য্যন্ত রাজী সে হইয়া গেল। তবে একটা চুক্তি সে করিল বড় খাপছাড়া। প্রথমটা আরম্ভ করিল যেন একটু সলজ্জ ভাবে, সঙ্কোচের সঙ্গে, বিপিনের হাঁটুর দিকে তাকাইয়া; 'আমার সব কথা শুনে চলবি?'

'না।'

আর খানিকটা চোখ তুলিয়া সদানন্দ বলিল, 'কোন বিষয়ে আমায় জ্বালাতন করবি না?'

'করব।'

আরও খানিকটা তুলিয়া; 'আমার কাছে কিছু গোপন করবি না?'

'করব।'

তখন সোজাসুজি চোখের দিকে চাহিয়া সদানন্দ বলিল, 'আরেকটা কাজ করতে হবে আমার জন্যে। মাধুকে আমার চাই।'

'মাধুকে তোর চাই? কি করবি মাধুকে দিয়ে—ও!'

বিপিন হাঁ করিয়া সদানন্দের দিকে চাহিয়া রহিল। এরকম সদানন্দের সঙ্গে তার কোনদিন পরিচয় ছিল না। মাধবীলতার জন্য আকর্ষণ অনুভব করা অবস্থা বিশেষে সদানন্দের পক্ষে সম্ভব, অবস্থা বিশেষে হঠাৎ মাথাটা তার মাধবীলতার জন্য খারাপ হইয়া যাওয়াও অসম্ভব নয়, কিন্তু এভাবে কোন মেয়েমানুষকে চাওয়ার মানুষ সে নয়। যদি বা মনে মনে চায়, লজ্জায় দুঃখে ঘৃণায় লোকের কাছে মুখ দেখাইতে তার অস্বস্তি বোধ হওয়া উচিত। বিপিন নিজেই দারুণ অস্বস্তি বোধ করিতে থাকে, সে স্পষ্টই বুঝিতে পারে, মাধুকে পাওয়া সম্বন্ধে চেষ্টা করিবার কথা না দিলে সদানন্দ ফিরিয়া যাইবে না।

'কিন্তু মাধুর যে বিয়ে হয়ে গেছে?'

'তাতে কি?'

'তাতে কি? তাতে কি? তুই একটা পাঁঠা সদা, আস্ত পাঁঠা। আগে বলিস্‌নি কেন, বিয়ের আগে? তোর কথায় যখন উঠত বসত?'

সদানন্দের চোখ জ্বলিয়া উঠিল—এ জ্যোতি বিপিন চেনে! মানুষকে খুন করবার আগে মানুষের চোখে এ জ্যোতি দেখা দেয়।—'কি জানিস বিপিন, আগে মেয়েটাকে বড় মায়া করতাম, তখন কি জানি এমন পাজী সয়তান মেয়ে, তলে তলে এমন বজ্জাত! একটা রাত্রির জন্য ওকে শুধু আমি চাই, বাস, তারপর চুলোয় যাক, যা খুসী করুক, আমার বয়ে গেল। ওর অহঙ্কারটা ভাঙ্গতে হবে।'

এবার বিপিন যেন ব্যাপারটা খানিক খানিক বুঝতে পারে। মাধবীলতা হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে, জীবনের সীমানার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, তাই সদানন্দের এত জ্বালা। নিজে সে যাচিয়া মাধবীলতাকে প্রত্যাখ্যানের অধিকার দিয়াছে, তাই আজ প্রত্যাখানের জ্বালা সহ্য হইতেছে না, নয়তো তাকে অবহেলা করার অধিকার কোন মেয়ের আছে, এ ধারণাই সদানন্দের মনে আসিত কিনা সন্দেহ। নিজে সে মাধবীলতাকে বড় করিয়াছে, মাধবীলতাকে অধিকার দিয়াছে অনেক, নিজের উপভোগের স্বাদ বাড়ানোর জন্য নিজের কামনাকে জোরালো করিয়াছে, ব্যাপক করিয়াছে।

নয়তো কে ভাবিত মাধবীলতার কথা—কেবল মাধবীলতার কথা নয়, সে কি করে না করে আর ভাবে না ভাবে তা পর্য্যন্ত! বড় জোর একদিন তার কাছে মুচকি হাসির সঙ্গে আপশোষ করিয়া বলিত, 'ছুঁড়িটা বড় ফসকে গেল রে বিপিন!'

নতুন করিয়া সদানন্দকে আশ্রমে প্রতিষ্ঠা করিয়া এই ব্যাপারটা নিয়াই বিপিন মাথা ঘামায়। সদানন্দের সম্বন্ধে মহেশ চৌধুরীর কয়েকটা মন্তব্যও সে যেন কম বেশী বুঝিতে পারে। সদানন্দের সংযম সত্যই অসাধারণ ছিল, কারণ তার মধ্যে সমস্তই প্রচণ্ড শক্তিশালী, অসংযম পর্য্যন্ত। কেবল তাই নয়, সংযমও তার মাঝে মাঝে ভাঙ্গিয়া পড়ে। কামনার যার এমনিই জোর নাই, ভিতর হইতে যার মধ্যে বোমা ফাটিবার মত উপভোগের সাধ কোন দিন ঠেলা দেয় নাই, আত্মজয়ের তো তার প্রয়োজনও হয় না। কিন্তু সদানন্দের মত মানুষ, অতি অল্প বয়সেই যারা নিজের উপর অধিকার হারাইয়া বিগড়াইয়া যাইতে আরম্ভ করে, তার পক্ষে তো হঠাৎ কদাচিৎ অন্যায় করিয়া ফেলিয়াও অন্যায় না করিয়া বাঁচিয়া থাকা, অন্যায় করার অসংখ্য সুযোগের মধ্যে অন্যায় করার সাধ দমন করিয়া চলা, আত্মোপলব্ধির সাংঘাতিক সাধনায় ব্যাপৃত থাকার মত মনের জোর বজায় রাখা তো সহজ ব্যাপার নয়। সদানন্দের অনেক দুর্ব্বলতা, অনেক পাগলামীর একটা নূতন অর্থ বিপিনের কাছে পরিষ্কার হইয়া যায়। সে বুঝিতে পারে মহেশ চৌধুরীর কথাই ঠিক, ওসব দুর্ব্বলতা শক্তির প্রতিক্রিয়া, ওসব পাগলামি অতিরিক্ত জ্ঞানের অভিব্যক্তি। নিজে সদানন্দ জানিত না সে সত্য সত্যই মহাপুরুষ, তাই ভাবিত লোকের কাছে মহাপুরুষ সাজিয়া লোককে ঠকাইতেছে। শত শত মানুষ যে তার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অভিভূত হইয়া যায়, সামনে দাঁড়াইয়া চোখ তুলিয়া মুখের দিকে চাহিতে পারে না, তাও সে ধরিয়া নিয়াছিল শুধু তার নানারকম ছল আর মিথ্যা প্রচারের ফল। এত বড় বড় আদর্শ সে পোষণ করিত (হয়তো এখনো করে) যে, নিজের অসাধারণত্বকে পর্য্যন্ত তার মনে হইত (হয় তো এখনো হয়) সাধারণ লোকের তুচ্ছতার চেয়েও নীচু স্তরের কিছু।

বন্ধুর জন্য বিপিন একটা শ্রদ্ধার ভাব অনুভব করে, বন্ধুর আধুনিকতম এবং বীভৎস ও বিপর্জ্জনক প্রস্তাবটাও যার তলে চাপা পড়িয়া যায়। যোগাযোগটা তার বড় মজার মনে হয়। মহেশ চৌধুরী যখন সদানন্দকে মনে করিত দেবতা, তখন তার জন্য বিপিনের মনে ছিল প্রায় অবজ্ঞারই ভাব, তারপর সদানন্দের অধঃপতনের জন্য মহেশ চৌধুরীর ভক্তি যখন উবিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন বিপিনের মধ্যে জাগিয়াছে শ্রদ্ধা! মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগের নিয়মকানুনগুলি খাপছাড়া নয়?

বিপিনের আশ্রম ত্যাগ করা, মহেশ চৌধুরীর বাড়ীতে বাস করা, নূতন আশ্রম খুলিয়া নূতনভাবে জীবনযাপন করা এবং তারপর আবার নিজের পুরাতন আশ্রমে ফিরিয়া আসা, নাম ছড়ানোর দিক দিয়া এ সমস্ত খুবই কাজে আসিল সদানন্দের। মহেশ চৌধুরীর আশ্রমে সমবেত নারী পুরুষের ভক্তিশ্রদ্ধা হারানোর যে ভয়টা সদানন্দের মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা দিতেছিল সেটা অবশ্য নিছক ভয়, সকলেই শিষ্যত্ব অর্জ্জনের এবং তার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিবার অধিকার আর সুযোগ পাওয়ায় তার সম্বন্ধেই লোকের অস্বাভাবিক ভয়টা কমিয়া আসিতেছিল। বিপিনের সাহায্যে নিজের চারিদিকে সে যে কৃত্রিম ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছিল, মহেশের চেষ্টা ছিল সেটা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সকলের সঙ্গে তার সম্পর্কটা সহজ করিয়া তোলা। সম্পর্কটা সত্যসত্যই সহজ হইয়া আসিতে থাকায় সদানন্দের মনে হইয়াছিল, লোকের কাছে সে বুঝি নীচে নামিয়া যাইতেছে।

হয়তো নামিয়া যাওয়াই। সংস্কার-নাড়া-দেওয়া ভয়ের ভিত্তিতেই হয়তো দেবতার সর্ব্বোচ্চ আসন পাতা সম্ভব।

সদানন্দের সঙ্গে মহেশ চৌধুরীর আশ্রমের জনপ্রিয়তা যেন শেষ হইয়া গেল, যেদিন পুরাতন আশ্রমে সদানন্দ নূতন পর্য্যায়ে আসর বসাইল প্রথমবার, সেদিন মহেশ চৌধুরীর আশ্রমে লোক আসিল মোটে দশ-বার জন। সকলে সদানন্দের উপদেশ শুনিতে গিয়াছে—আগে যত লোক আসিত তার প্রায় তিনগুণ। সদানন্দ ভাবিয়াছিল এবার হইতে যতটা সম্ভব মহেশ চৌধুরীর নিয়মেই আশ্রম পরিচালনা করিবে, শিষ্য করিবে সকলকেই, নাগালের মধ্যে আসিতে দিবে সকলকেই, কথা বলিবে সহজভাবে। এক নজর তাকাইয়াই আর নারী বা পুরুষকে অপদার্থ করিয়া দিবে না। কিন্তু ভিড় দেখিয়া হঠাৎ তার কি যে জাগিল উল্লাস আর গর্ব্ব মেশানো একটা নেশা, মুখের গাম্ভীর্য্যের আর তুলনা রহিল না, যেন গোপন পাপ সব

আবিষ্কার করিয়া ফেলিতেছে দৃষ্টির তীব্রতায়, এমনি অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল অনেকের, আর কথা শুনিতে শুনিতে অনেকের মনে হইতে লাগিল তার পায়ে মাথা খুঁড়িতে খুঁড়িতে মরিয়া যায়।

প্রণামী দিতে গিয়া দু'একজন পায়ে আছড়াইয়া পড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সুবিধা হইল না।

প্রথম জনকে সদানন্দ বলিল; 'উঠে বোসো। তিনমাস মাছ মাংস মেয়েমানুষ ছুঁয়ো না। এবার যাও—যাও।'

দ্বিতীয় জনকে সংক্ষেপে বলিল; 'পাঁচ বছরের মধ্যে তুমি আমার কাছে এসো না।'

আগে কেউ বাড়িবাড়ি করার সাহস পাইত না, ভাবপ্রবণতার নাটকীয় অভিব্যক্তি সদানন্দ পছন্দ করে না। মাঝখানে অনেকগুলি ব্যাপার ঘটায় আর সদানন্দ নিজের নূতন পরিচয় দেওয়ায় কয়েকজনের সাহস হইয়াছিল, নূতন লোকও আজ আসিয়াছিল অনেক। কিন্তু পায়ে আছড়াইয়া পড়ার (তিন টাকা প্রণামী দেওয়ার পরেও) আর হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করার (প্রণামী—আড়াই টাকা) ফল দেখিয়া সকলের সাহস গেল। সকলের বসিবার ভঙ্গি দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, সদানন্দ যেন কোথাও কোনদিন যায় নাই, মাঝখানে প্রায় বছরখানেকের ফাঁক পড়ে নাই, এইখানে আগে যেমন সভা বসিত, আজ একটু বড় ধরণে সেই রকম সভাই বসিয়াছে।

কিন্তু দোকানে ফিরিয়া গিয়া শ্রীধর সেদিন সন্ধ্যার পর মুখখানা যেন কেমন একটু ম্লান করিয়া বলিল 'ঠাকুরমশায় কেমন যেন বদলে গেছেন। ঠাকুরমশায়ের রাগ তো দেখিনি কখনো, সত্যিকারের রাগ?'

ঠিক সেই সময় আশ্রমে নিজের গোপন অন্তঃপুরে সদানন্দ বিপিনকে বলিতেছিল 'উমা আর রতনকে দিয়ে মাধুকে আনাতে হবে। এই ঘরে মাধুকে বসিয়ে রেখে ওরা চলে যাবে, তারপর আমি না ডাকলে কেউ আমার মহলে আসবে না।'

'উমা আর রতন? ওরা কেন রাজী হবে?'

'হবে। আমি বললেই হবে।'

'তা হবে না। এরকম মতলবের কথা শুনলেই ওদের মন বিগড়ে যাবে, আশ্রম ছেড়েই হয় তো চলে যাবে।'

'সে আমি বুঝব।'

কিন্তু বুঝা বিপিনের পক্ষেও প্রয়োজন, সে তাই সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়ে। তারপর অন্য কথা বলে, 'কিন্তু মহেশ বা বিভূতি যদি পুলিশ ডেকে আনে?"

'আনে তো আনবে।'

'আনে তো আনবে? তোর খারাপ মাথাটা আরও খারাপ হয়ে গেছে সদা।'

'তুই বড় বোকা বিপিন। পুলিশ আশ্রমের ধারে আসামাত্র উমা, রতন আর আশ্রমের আরও পাঁচ সাতটি মেয়ে মাধুকে ঘিরে বসবে। পুলিশ এসে দেখবে মাধুকে কেউ আটকে রাখেনি, মেয়েদের সঙ্গে ফাঁকা যায়গায় বসে গল্প করছে। তবু যদি জেলে যেতে হয়, আমি যাব, সব দোষ আমি নিজে মেনে নেব'খন।'

'কিন্তু দরকার কি শুনি এত হাঙ্গামায়?'

'সে তুই বুঝবি না।'

বুঝুক না বুঝুক, বিপিন ভয় পাইয়া গেল। একদিন চুপি চুপি গিয়া মাধবীলতাকে সাবধান করিয়া দিয়া আসিল। সব কথা সে ফাঁস করিয়া দিল তা নয়, আভাসে ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিল যে সদানন্দ বড় চটিয়াছে, সে যেন কখনো কোন অবস্থায় আশ্রমে না যায়।

'যেই নিতে আসুক, যে উপলক্ষেই নিতে আসুক, যেওনা। উমা বা রতন এলেও নয়। বুঝেছ?'

মাধবীলতা সায় দিয়া বলিল, 'বুঝেছি। আপনি না বললেও আমি যেতাম না।'

কয়েকদিন পরে উমা আর রত্নাবলী মাধবীলতাকে আনিতে গেল। সদানন্দ যেন কোথায় গিয়াছে, আশ্রমে মেয়েদের কি যেন একটা ব্রত আছে, কি যেন একটা বিশেষ কারণে বিপিন তাকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছে। মহেশ চৌধুরী আর বিভূতির অবশ্য নিমন্ত্রণ আছে।

মাধবীলতা আসিল না, বিভূতিও নয়। মহেশ চৌধুরী শুধু নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিল। ব্রতের কোন আয়োজন নাই দেখিয়া সে আশ্চর্য্যও হইয়া গেল না, কিছু জিজ্ঞাসাও করিল না। মেয়েদের ব্রত কোন ঘরের কোণে, গাছের নীচে বা পুকুর ঘাটে কি ভাবে হয়, মেয়েরাই তা ভাল করিয়া জানে। নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়া কেউ কিছু খাইতে দিল না দেখিয়াই সে একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কে জানে, হয়তো ব্রত শেষ না হইলে খাইতে দিতে নাই। কিন্তু বেলা তিনটার সময়ও

যদি ব্রত শেষ না হয়, না খাওয়াইয়া বসাইয়া রাখিবার জন্য কেবল তার বাড়ীর তিন জনকে নিমন্ত্রণ করিবার কি দরকার ছিল?

সদানন্দ যেখানেই গিয়া থাক, ফিরিয়া আসিয়াছে। মহেশ চৌধুরী তার কাছে গিয়া বসে। এদিকে বিপিন ভাবে, উমা আর রত্নাবলী যখন সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, তারাই মহেশের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করিবে। উমা আর রত্নাবলী ভাবে, বিপিন যখন নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে বলিয়াছে, সেই জানে অতিথিকে কি খাইতে দেওয়া হইবে। বিপিন নিশ্চিন্তমনে কাজে বাহির হইয়া যায়। সদানন্দের কুটীরে মহেশকে খাইতে দেওয়া হইয়াছে ভাবিয়া উমা আর রত্নাবলী নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করে।

সদানন্দ বলে, 'কি খবর মহেশ?'

মহেশ বলে, 'আজ্ঞে, খবর আর কি!'

মহেশ যেন 'প্রভু' শব্দটা উচ্চারণ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে।

'কিছু উপদেশ দেবে না কি?'

'কি আর উপদেশ দেব বলুন?'

'এই আমার কি করা উচিত, কি করা উচিত নয়—'

মহেশ একটু ভাবিয়া বলে, 'উপদেশ তো নয়, পরামর্শ দিতে পারি। কথাটা মনে রাখলে কাজ দেবে। মানুষ যখন উঁচু পাহাড় পর্ব্বতে ওঠে, কত যত্নে কত সাবধানে প্রাণপণ চেষ্টায় তিল তিল করে ওঠে, সময়ও লাগে অনেক। কিন্তু মানুষ যখন উঁচু থেকে হাত-পা এলিয়ে নীচে পড়ে, পড়বার সময় কোন কষ্টই হয় না, সময়টা কেবল চোখের পলকে ফুরিয়ে যায়।'

সদানন্দ গম্ভীর হইয়া বলে, 'পড়বার সময়টা ফুরিয়ে গেলেও অনেক সময় কষ্ট হয় না মহেশ। বরং উঁচু থেকে পড়লে চিরকালের জন্য কষ্ট ফুরিয়ে যায়।'

'ফুরিয়ে যায়, না সুরু হয়, কে তা জানে বলুন?'

'আমি জানি। যে সীমার মধ্যে কষ্ট, সে সীমাই যদি পার হয়ে গেলাম, তবে আর কষ্ট কিসের? যারা বোকা তারাই বেঁচে থেকে রোগের জ্বালা শোকের জ্বালা সহ্য করে। অথচ আত্মহত্যা করা এত সহজ!'

'আত্মহত্যা করা সহজ? আত্মরক্ষা করা সহজ বলুন। আত্মহত্যা করা সহজ হলে মানুষের জীবনটাই আগাগোড়া বদলে যেত, সমাজ ধর্ম্ম রীতিনীতি সুখ দুঃখ ভাবনা চিন্তা অনুভূতি সব অন্যরকম হত। ব্রহ্মচারী দু'চারজন আছে, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য কি সহজ, না মানুষের পক্ষে সম্ভব? আত্ম-হত্যা দু'চারজন করে, কিন্তু সেটাও সহজ নয়, মানুষের পক্ষে সম্ভবও নয়। আপনি তো যন্ত্রণায় ক্ষেপে যাবার উপক্রম করেছেন, একবার দেখুন তো আত্মহত্যা করতে গিয়ে পারেন কি না? কষ্ট পাবেন, বেঁচে থাকার সাধ থাকবে না, তবু বেঁচে থেকে কষ্ট ভোগ করবেন। এই সমস্যা আছে বলেই তো বেঁচে থাকার এত নিয়মকানুনের আবিষ্কার। আসল সাধু কি ঈশ্বরকে চায়, স্বর্গ চায়, পরকালের কথা ভাবে? সাধু চায়, বিশেষ কতকগুলি অবস্থায় বাঁচতে যখন হবেই, বাঁচার সব চেয়ে ভাল উপায় কি, তাই আবিষ্কার করতে। অনেক যুক্তিই লাগসই মনে হয়, কিন্তু সব যুক্তি কি খাটে? অতি তুচ্ছ বিষয়ে যুক্তি খাড়া করবার সময় বিচার করে দেখবেন, কত অসংখ্য বিষয়ের সঙ্গে যুক্তিটার যোগ আছে। কোন্ যুক্তিটা সবচেয়ে বেশী খাটবে, কোন্‌টা সবচেয়ে কম খাটবে, ঠিক করতে নিরপেক্ষ মন নিয়ে জগতের সমস্ত যোগাযোগ বিচার করতে হয়। ওটা হল মহাপুরুষের কাজ। মূল্য যাচাই করার ক্ষমতা অর্জ্জন করবার নাম সাধনা। এই জন্য সাধনা এত কঠিন। মানুষকে জানেন তো, মরুভূমিতে তৃষ্ণায় মরবার সময় পর্য্যন্ত একগ্লাস জল আর একদলা সোনার মধ্যে বেছে নিতে বললে—'

'আমি তাই করেছি, না?' সদানন্দ ব্যঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করে।

'হ্যাঁ, একেই পাপ বলে।'

'পাপ? অনুতাপ না হলে আবার পাপ কিসের?'

'অনুতাপ যদি না হয়, তবে আর পাপ কিসের? হজম করতে পারলে আর শরীরের পুষ্টি হয়ে স্বাস্থ্য বজায় থাকলে, রাশি রাশি অখাদ্য কুখাদ্য খাওয়া আর দোষ কি! কিন্তু মুসকিল কি জানেন, অনুতাপ হয়। ভগবান দেন বলে নয়, লোকে বলে ব'লে নয়, অনুতাপ হওয়ার কথা বলেই অনুতাপ হয়। একটা কাজ করলে যদি আনন্দ হয়, আরেকটা কাজ করলে নিরানন্দ হতে পারে না?'

'সাধারণ লোকের হতে পারে, সকলের হয় না। মনকে যদি বশ করা যায়, আপশোষ হ'তে না দিলে কেন হবে?'

'সে তো বটেই, কিন্তু মনকে বশ করা হয় না। অনুতাপ বড় ভীষণ জিনিষ, মনকে একেবারে ক্ষয়

করে দেয়। অনুতাপ এড়িয়ে চলাও বড় শক্ত, একটা নখ কাটার জন্য পর্য্যন্ত অনুতাপ হতে পারে কি না। যাই করুক মানুষ, হয় সুখ পাবে নয় কষ্ট পাবে, উঠতে বসতে চলতে ফিরতে এর দুটোর একটা ঘটবেই ঘটবে। মহাপুরুষেরা এর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য ঘটাবার উপায় দেখিয়ে দেন। অনুতাপ হবেই, তবে মারাত্মক রকমের না হয়। মারাত্মক অনুতাপ যাতে হয়, তাকেই লোকে পাপ বলে। যেমন ধরুন, আপনি যদি গায়ের জোরে মাধুর ওপোর অত্যাচার করেন—'

সদানন্দ চমকাইয়া বলে, 'তার মানে?'

মহেশ শান্ত ভাবেই বলে, 'কথার কথা বলছি, একবার মাধুকে ধরে টানাটানি করেছিলেন কিনা, তাই কথাটা বলছি। ওরকম কিছু করলে আপনার অনুতাপ হবেই। হিসাব করে হয়তো দেখলেন ওজন্য অনুতাপ করা মনের দুর্ব্বলতা, প্রকৃতির নিয়ম ধরে বিচার করলে ও কাজটা আপনার পক্ষে কিছুমাত্র অন্যায় হয় নি, তবু অনুতাপে আপনি ক্ষয় হয়ে যাবেন। উচিত হোক আর অনুচিত হোক, এ প্রতিক্রিয়াটা ঘটবেই। মনকে যদি এমন ভাবে বদলে দিতে চান, যাতে ওরকম পাপ করেও অনুতাপ হবে না, তখন বিপদ হবে কি জানেন, যত দিন পাপ করার ইচ্ছা না লোপ পাবে, মনটা বদলাবে না। যোগসাধনার মূল নীতি এই। সাধারণ জীবনে উঠতে বসতে আমরা অসংখ্য ছোট বড় পাপ করি আর অনুতাপ ভোগ করি, সব সময় টেরও পাই না। সেই জন্য যোগসাধনার নিয়ম এত কড়া—কবার নিশ্বাস নিতে হবে তা পর্য্যন্ত ঠিক করে দেওয়া আছে। কামের চুলকানি জয় করলেই লোকে যোগী ঋষি হয় না, পিঠের চুলকানি পর্য্যন্ত জয় করতে হয়—নইলে মন বশে আসে না। তেইশ ঘণ্টা উনষাট মিনিট তপস্যা করেও হয় তো এক মিনিট শিষ্যকে দিয়ে ঘামাছি মারানোর জন্য তপস্যা বিফল হয়ে যায়।'

'গায়ে ছাই মেখে যে তপস্যা—'

মহেশ মৃদু হাসে, আপশোষের ভঙ্গিতে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলে, 'আপনাকে বলা বৃথা, আপনি আমার কথা বুঝবেন না। গায়ে ছাই মেখে হাত উঁচু করে বসে থাকা কি তপস্যা? না আমি সে তপস্যার কথা বলছি? আমি বলছিলাম আপনার তপস্যার কথা, আপনি যে তপস্যায় দিন দিন সফল হচ্ছিলেন।'

এবার সদানন্দ অনেকক্ষণ নীরব হইয়া থাকে, তারপর ধীরে ধীরে প্রশ্ন করে 'আমার আর কোন উপায় নেই?'

'মনে তো হয় না। তবে তেমন গুরু যদি খুঁজে বার করতে পারেন—'

শেষ বেলায় উপবাসী মহেশ বাড়ী ফিরিয়া গেল। খাইতে চাহিল মাধবীলতার কাছে।

মাধবীলতা অবাক হইয়া বলিল, এ আবার কোন দেশী ব্যাপার, নেমন্তন্ন করে নিয়ে গিয়ে খেতে না দেওয়া!'

যে ব্যাপার সে জানিত, তার চেয়ে এ ব্যাপারটা তার খাপছাড়া মনে হয়। তার সম্বন্ধে সদানন্দের খারাপ মতলব আঁটা আশ্চর্য্যের কিছু নয়, কিন্তু ডাকিয়া নিয়া গিয়া মহেশ চৌধুরীকে খাইতে না দেওয়ার কোন মানে হয়?

'বড় পাজী লোক ওরা।'

'ছি মা, রাগ করতে নেই। কোন একটা কারণ নিশ্চয় ছিল, বিব্রত করার ভয়েই তো আমি বললাম না, নইলে চেয়ে খেয়ে আসতাম।'

দুজনে এসব কথা বলাবলি করিতেছে, শশধরের বৌ খাবার আনিয়া হাজির। কোথায় সে থাকে টের পাওয়া যায় না, কিন্তু সব সময়েই বোধ হয় আশে পাশে আড়ালে লুকাইয়া থাকিয়া সকলের কথা শোনে।

মাধবীলতা কিন্তু হঠাৎ বড় চটিয়া গেল।

'সব ব্যাপারে তোমার বড় বাড়াবাড়ি। আমিই তো দিচ্ছিলাম?'

আড়ালে গিয়া শশধরের বৌ ঘোমটা ফাঁক করিয়া তাকে দেখাইয়া একটু হাসিল, হাতছানি দিয়া তাকে কাছে ডাকিল।

মাধবীলতা কাছে গেলে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, 'তোমার না আজ কিছু ছুঁতে নেই?'

মাধবীলতা চুপ করিয়া রহিল। সদানন্দের আশ্রমে নিমন্ত্রণ রাখিতে না যাওয়ার মিথ্যা অজুহাতের কথাটা তার মনে ছিল না।

এদিকে আশ্রমে তখন সদানন্দ বিপিনকে ডাকিয়া আনিয়াছে।

'মাধু এল না কেন?'

উমা আর রত্নাবলীর কাছে বিপিন যা শুনিয়াছিল জানাইয়া দিল। সদানন্দ বিশ্বাস করিল না। দাঁতে দাঁতে ঘসিয়া বলিল, 'ওসব বাজে কথা, আসল কথা আসবে না। না আসুক, আমিও

দেখে নেব কেমন না এসে পারে। তোকে বলে রাখছি বিপিন, ওর সর্ব্বনাশ করব, মহেশকে পথে বসাব, তবে আমার নাম সদানন্দ।'

কয়েকদিন পরে মহেশের বাড়ীঘর বাগান আর আশ্রম পুলিশ তন্ন তন্ন করিয়া খানাতল্লাস করিয়া গেল। বিভূতির সঙ্গে যখন সংস্রব আছে মাঝে মাঝে হঠাৎ এরকম পুলিশের হানা দেওয়া আশ্চর্য্য নয়। তবু, বাহির হইতে তাগিদ না পাইলে এ সময়টা পুলিশ হয় দে। বিভূতির নূতন আশ্রম নিয়া মাথা ঘামাইত না। বিভূতিকে যে কতগুলি কথা জিজ্ঞাসাবাদ করিল, খবরটা সেই ফাঁস করিয়া দিয়া গেল। পুলিশের লোকটি একদিন সদানন্দকে প্রণাম করিতে গিয়াছিল, কথায় কথায় সদানন্দ নাকি এমন কতকগুলি কথা বলিয়া ফেলিয়াছিল যে তাড়াতাড়ি অনুসন্ধান না করিয়া উপায় থাকে নাই।

'সত্যি, সত্যি কিছু আরম্ভ করেছেন না কি আবার? উনি তো মিথ্যে বলবার লোক নন।'

'উনিই মিথ্যে বলবার লোক।'

পুলিশের লোকটি সন্দিগ্ধ ভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, 'বিয়ে থা' করেছেন একটু সাবধানে থাকবেন। আর কি ওসব ছেলেমানুষী পোষায়?'

পুলিশের খানাতল্লাসের পর মহেশের আশ্রমে লোকের যাতায়াত আরও কমিয়া গেল। এতদিন পরে লোকের মুখে মুখে কি করিয়া যে একটা গুজব রটিয়া গেল, মহেশ চৌধুরী লোক ভাল নয় বলিয়া সদানন্দ তাকে ত্যাগ করিয়াছে, সাধু সদানন্দ।

ষোল

রাগে পৃথিবী অন্ধকার দেখিতে দেখিতে বিভূতি বলিল, 'দেখলে বাবা তোমার দেবতার কীর্ত্তি?'

মহেশ বলিল, 'ওর অধঃপতন হয়েছে।'

বিভূতি নাক সিঁটকাইয়া বলিল, 'ও আবার ওপরে উঠল কবে যে পতন হবে? ও লোকটা চিরকাল ভেতরে ভেতরে এমনি বজ্জাত। সাধে কি ওকে ঘুঁসি মেরেছিলাম।'

ছেলের সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে মহেশকে হাতুড়ি দিয়া নিজেকে আঘাত করিতে হইয়াছিল, ব্যাপারটা সহজে ভুলিবার নয়। মহেশ জিজ্ঞাসা করিল,—

'ঘুঁসি মেরে লাভ কি হয়েছিল?'

'তোমার জন্যে—'

'আমার কথা বাদ দিয়ে বল। আমি কিছু না করলেও তোর লাভটা কি হত? চারিদিকে বিচ্ছিরি একটা কেলেঙ্কারী বেধে যেত, গাঁয়ের লোক আমাদের মারতে আসত, নিজে রাগের যন্ত্রণায় ছটফট করতিস্—'

মহেশের যুক্তিতর্ক কোন দিনই ভাল করিয়া বিভূতির মাথায় ঢোকে না, তার মনে হয় ছেলেবেলা হইতেই সে যা বলে আর ভাবে, মহেশ ঠিক তার উল্টা কথাটা বলিয়া আসিতেছে। রক্তটা বিভূতির একটু গরম, ন্যায় অন্যায়ের বিচারবোধ আর কর্ত্তব্যপ্রবণতা বাপের জীবন্ত দেবতার নাকে ঘুঁসি মারানোর মত উদ্ধত, মানুষের চাপে পৃথিবীতে মানুষ কষ্ট পায় বলিয়া তার আপশোষের সীমা নাই। আর আদর্শগুলি এমন যে, কাজে কিছু করার সুযোগ না পাইলেও, কেবল একটা দলে কয়েক মাস মেলামেশা করার জন্যই পুলিশ তাকে কয়েকটা বছর আটকাইয়া রাখিয়াছিল। মনটা যে বিভূতির একটু নরম হইয়াছে, সংসারের অন্যায়-গুলির সঙ্গে রফা করিয়াই বাঁচিয়া থাকিতে সে যে প্রস্তুত হইয়াছে, মাধবীলতাকে বিবাহ করিয়া সংসারী হওয়াটাই তার প্রমাণ। তবু, মানুষের মন মানে না, কাজে না পারিলে তর্কে নিজেকে জাহির করে।

'তুমি বুঝি ভাব, তোমার জন্যে চুপ করে গিয়েছিলাম বলেই আমার রাগ কমে গিয়েছিল?'

'ক্ষমা চাওয়ায় জন্যে তো কমেছিল।'

'তুমি আমাকে দিয়ে জোর করে ক্ষমা চাওয়ালে, তাতে কখনো রাগ কমে?'

'কমে বৈকি, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, ক্ষমা চাইলেই মানুষের রাগ কমে যায়। তখন কি মনে হয় জানিস, মনে হয় এবারকার মত চুলোয় যাক, আবার যদি লোকটা কিছু করে তো দফা নিকেশ করে দেব। আমি জোর করে ক্ষমা চাওয়ালে কি হবে, নিজের দোষ স্বীকার করে ক্ষমা তো তোকে সত্যি সত্যি চাইতে হয়েছিল। ক্ষমা চাওয়ার পর আগের মত জোরালো রাগ পুষে রাখতে মানুষের বড় বিরক্তি বোধ হয়।'

বিভূতি বিশ্বাস করিল না। আগের বারের চেয়েও এবার তার বেশী রাগ হইয়াছিল। তার চলাফেরার দিকে পুলিশ একটু নজর রাখিবে, মাঝে মাঝে বাড়ী ঘর খানাতল্লাস করিবে, এ সব বিভূতির কাছে খাপছাড়া ব্যাপার নয়। এতকাল আটক রাখার পর তাকে পুলিশ একেবারে জন্মের মত

ত্যাগ করিবে, বিভূতি নিজেও তা বিশ্বাস করে না। ছাড়া পাওয়ার পর সব সময়েই তার মনে একটা আশঙ্কা জাগিয়া আছে, কখন আবার ডাক আসে। এমনিই পুলিশ যাকে বাগে পাওয়ার জন্য ওৎ পাতিয়া আছে, তার নামে মিথ্যা করিয়া পুলিশের কাছে লাগানো! বিভূতির মনে ভয় ছিল, সকলের মনেই এ অবস্থায় থাকে, রাগের জ্বালায় তাই তার মনে হইতে লাগিল, ভোঁতা একটা দা দিয়া সদানন্দের গায়ের মাংস কাটিয়া নেয়।

এই অসম্ভব কাজটার বদলে একবার আশ্রমে সদানন্দকে একটু ধমক দিয়া আসিবে কি না ভাবিতে ভাবিতে বিভূতি অন্যমনস্ক হইয়া থাকে।

রাত্রে মাধবীলতা জিজ্ঞাসা করে, 'কি ভাবছ?'

বিভূতি বলে, 'না। কিছু ভাবছি না।'

মাধবীলতা গভীর আদরের সঙ্গে তাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিয়া বলে, 'বল না', কি ভাবছ?'

দিনের বেলা মেলামেশা চলে, কিন্তু দিনের বেলা ভালবাসার খেলা মাধবীলতার পছন্দ হয় না। মাঝে মাঝে স্বামীর পাওনাগণ্ডার বিষয়টা খেয়াল না থাকিলে এমনও হয় যে, ফাঁকতালে একটু সোহাগ করিতে আসিয়া দু'হাতের জোরালো ঠেলায় বিভূতি চমকিয়া যায়। তখন অবশ্য মাধবীলতার খেয়াল হয়, মৃদু তিরস্কারের সুরে সে বলে, কি যে কর তুমি, চাদ্দিকে লোক রয়েছে না? ওমা দরজা বন্ধ করে দিয়েছ! বেশ লোক তো তুমি?' তবু, দিনে রাত্রে সব সময় মাধবীলতাকে নিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিবার অধিকার জন্মানোর অল্পদিনের মধ্যেই বিভূতি টের পাইয়া গিয়াছে, দিনের বেলা মিলনের আনন্দ ভোগ করার ক্ষমতাটা মাধবীর যেন ভোঁতা হইয়া যায়। ব্যাপারটা তার বড়ই দুর্বোধ্য মনে হয়, কারণ, রাত্রে মাধবীর তীক্ষ্ণতায় তাকেও মাঝে মাঝে বিব্রত হইতে হয়, ঘুম পর্য্যন্ত যেন মাধবীর চলিয়া যায়, বিভূতির ঘুম আসিলেও তাকে সে ঘুমাইতে দেয় না, প্রাণের চেয়ে যে প্রিয়তর, তাকে পর্য্যন্ত ভালবাসিতে ভালবাসিতে শ্রান্ত হইয়া বিভূতি ঝিমাইয়া পড়িলে, মাধবীলতা অক্লান্ত চেষ্টায় যেভাবে আবার তাকে বাঁচাইয়া তোলে, মানুষের বাস্তব জীবনে যে সে ধরণের অনুরূপ কাব্যের স্থান আছে, বিভূতি কোনদিন কল্পনাও করিতে পারে নাই।

বিভূতি বলে, 'পুলিশের কথা ভাবছিলাম। আবার যদি আমায় ধরে নিয়ে যায়?'

এক নিমেষে মাধবীলতা বদলাইয়া যায়, রুদ্ধ-শ্বাসে বলে, 'মাগো, পুলিশ দেখে আমার যা হচ্ছিল!'

পুলিশ চলিয়া যাওয়ার পর আরও তিনচার বার এমনি ভাবে সে প্রায় এই কথাগুলিই বলিয়াছে। হঠাৎ একবার বিভূতির মনে হয়, সব কি মাধবী-লতার ন্যাকামি, বাড়াবাড়ি, হিষ্টিরিয়া? কিন্তু এই টাইপের খাঁটি ন্যাকামি আর বাড়াবাড়ি আর হিষ্টিরিয়া ঠিক কি রকম, সে বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতা না থাকায় সন্দেহের চোখে মাধবীলতার ভীত চোখ দুটি দেখিতে গিয়া সে মুগ্ধ হইয়া যায়। কত জন্ম তপস্যা করিয়া সে এমন বৌ পাইয়াছে, কত ভাগ্য তার!

তখন মাধবীলতার ভয় দূর করার জন্য তাকে ভিতরের সব কথা খুলিয়া জানাইয়া দেয়, আশ্বাস দিয়া বলে যে, সমস্তটাই সাধু সদানন্দের কারসাজি, সদানন্দ পিছনে না লাগিলে পুলিশ আর তাকে জ্বালাতন করিতে আসিত না। ভয় নাই, মাধবী-লতার কোন ভয় নাই, পুলিশ আর বিভূতিকে ধরিবে না, বৌকে এমনিভাবে বুকে করিয়া, বিভূতি জীবন কাটাইয়া দিবে।

শুনিয়া, ভয়ে না যত হইয়াছিল মাধবীলতার চোখ তার চেয়ে বেশী রকম বিস্ফারিত হইয়া গেল।

'উনি! উনি এমন কাজ করলেন!'

'কেন, ও কি এমন কাজ করতে পারে না?'

মাধবীলতা সায় দিয়া বলিল, 'পারে, ও লোকটা সব পারে। ওর অসাধ্য কাজ নেই। ওর মত ভয়ানক মানুষ—'

মাধবীলতার ক্ষোভ-দুঃখের বাড়াবাড়ি দেখিয়া আবার বিভূতির মনে হইল সে যেন বাড়াবাড়ি করিতেছে। ভালবাসিতে আজ যেন মাধবীলতার ভাল লাগিল না, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বার বার সে ওই কথাই আলোচনা করিতে লাগিল। প্রথমটা কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য বাড়াবাড়ি মনে হইলেও তার বিচলিত ভাব দেখিয়া বিভূতি আবার মুগ্ধ হইয়া গেল। কি ভালই মাধবীলতা তাকে বাসে!

বিভূতির এই কৃতজ্ঞতাই মাধবীলতাকে সব চেয়ে বেশী মুগ্ধ করিয়াছিল। বড় সহজে বিভূতির মন ভুলানো যায়! একটু আদর যত্ন করা, রূপের সামান্য একটু বিশেষ ভঙ্গি দেখানো, বিভূতির কাছে এ সমস্ত যে কত দামী বুঝিতে পারিয়া মাধবীলতা নিজেই অবাক হইয়া যায়! কত সহজে কত গভীর আনন্দ সৃষ্টি ও উপভোগ করা যায়, মাঝে মাঝে খেয়াল করিয়া নিজের অফুরন্ত মন-কেমন-করার অভিশাপ তার যেন অসহ্য ঠেকে। ভয়ানক কিছু,

বীভৎস কিছু, প্রচণ্ড কিছুর জন্য কামনা যে স্বপ্নানুভূতির মত মৃদু অথচ মানসিক রোগের মত একটানা হইতে পারে, মাধবীলতার তা জানিবার বা বুঝিবার কথা নয়, ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার তরঙ্গে উঠিতে নামিতে তার প্রাণান্ত হইতে থাকে বলিয়া, জীবনের প্রত্যেকটি সহজ সুখ ও আনন্দের জন্য বিভূতিকে মনে মনে সে প্রায় পূজা করে। বিচলিত ভাবটা যতক্ষণ না কমে ততক্ষণ অবশ্য বিভূতিকে বড় করার কথাটা তার খেয়ালও হয় না এবং বিচলিত ভাবটা কমিতে কমিতে মাঝরাত্রি প্রায় কাবার হইয়া যায়। তখন হঠাৎ মনে পড়িয়া যাওয়ায় আপশোষের তার সীমা থাকে না। বিভূতির কপালে হাতের তালু ঘষিয়া দিতে দিতে সে ব্যগ্র কণ্ঠে বলে, 'না না, তুমি ভেবো না, ও তোমার কিচ্ছু করতে পারবে না।'

এতক্ষণ পরে নিজের দেওয়া আশ্বাস ফিরাইয়া পাইয়া গভীর ঘুমের আক্রমণ আর বিভূতিকে কাবু করিতে পারে না, মাধবীলতার গোলামী করার একটা রোমাঞ্চকর সাধ বরং তাকে ছোট ছেলের মত লজ্জার হাসি হাসাইয়া দেয়।

তার মাথাটা সজোরে বুকে চাপিয়া ধরিয়া মাধবীলতা বলে,'তোমার কিছু হলে আমি মরে যাব।'

বিভূতি চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে।

লণ্ঠনের বাদামী আলোয় মশারির ভিতরে ও বাহিরে গভীর রাত্রি রূপ নিয়াছে, লণ্ঠনের কাছের কয়েকটা জিনিষ ছাড়া মশারির জন্য বাহিরের আর কিছু ভাল দেখা যায় না, রঙিন কুয়াশায় যেন একটু ঝাপসা হইয়া গিয়াছে। ষ্টোভের পাশেই স্পিরিটের বোতলটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে আবেগের ভাজনপ্রবণতার জন্য মাধবীলতার চোখে যেন জল আসিয়া পড়ে। এমন কোমল কেন বিভূতি, এত বেশী ভাবপ্রবণ আর মমতাময়? এত অল্পে সে সন্তুষ্ট কেন, এত কম সে চায় কেন, এত কম সে নেয় কেন, কেন সে এত ব্যগ্র শুধু দেওয়ার জন্য? জেল আর ফাঁসীর ভয় তুচ্ছ করিয়া সে বুক-কাঁপানো কাজে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল, অনায়াসে সে সদানন্দের নাকে ঘুঁসি মারিতে পারে, সে যেন মাটির পুতুল, মায়ের কোলের শিশু।

তা হোক। তাই ভাল।

আরও জোরে বিভূতির মাথাটা বুকে চাপিয়া ধরিয়া গায়ের জোরেই যেন মাধবীলতা স্পিরিটের বোতলটার দিক হইতে দৃষ্টি সরাইয়া আনে।

'ঘুমোবে না?'

'তোমার ঘুম পেয়েছে?'

হাতের চাপ একটু আলগা করিয়া মাধবীলতা মৃদু হাসে; 'আমার ঘুম দিয়ে কি করবে, আমি তো দিনে ঘুমোই। তোমার ঘুম পেয়েছে কি না তাই বল।'

পরদিন দুপুরে ঘুমানোর বদলে মাধবীলতা শশধরের বৌকে সঙ্গে করিয়া সদানন্দের আশ্রমের উদ্দেশে বাহির হইয়া গেল। গেল প্রতিবেশী মনোহর দত্তের গরুর গাড়ীতে। আশ্রমে যাইবে শুনিয়া মনোহর দত্তের বুড়ো মা, বয়স তার প্রায় সত্তরের কাছে গিয়াছে, তাড়াতাড়ি নামাবলী গায়ে জড়াইয়া তাদের সঙ্গ নিল।

মনোহর দত্তের বৌ দেড়মাসের ছেলে কোলে করিয়া আপশোষ করিয়া বলিল, 'আমিও যেতাম বাছা তোমাদের সঙ্গে, কিন্তু আমার কপালে কি আর ধম্মো কম্মো আছে!'

আগে মাধবীলতা শশধরের বৌকে কিছু বলে নাই, বাহির হওয়ার একটু আগে কেবল খবরটা দিয়াছিল। শশধরের বৌ তো শুনিয়া অবাক।

'আশ্রমে যাবে? সাধুবাবাকে তুমি এত ভক্তি কর তা তো জানতাম না ভাই!'

'ভক্তি না তোমার মাথা। যাচ্ছি তার মুণ্ডুপাত করতে। আমাদের বাড়ীতে পুলিশ লেলিয়ে দেয়, এমন আস্পদ্ধা!'

শশধরের বৌ থতমত খাইয়া গিয়াছিল, একটু ভয়ও পাইয়াছিল। বলিয়াছিল, 'বাড়ীতে ওঁরা জানতে পারলে কিন্তু বড্ড রাগ করবেন।'

'বাবাকে বলে এসেছি।'

চুপি চুপি কারো কাছে কিছু না বলিয়া যাইবে অথবা মহেশ চৌধুরীর অনুমতি নিয়া যাইবে, সমস্ত সকালটা মাধবীলতা আজ এই সমস্যার মীমাংসা করিয়াছে। মহেশ চৌধুরী তাকে সদানন্দের আশ্রমে যাইতে দিতে রাজী হইবে কি না এ বিষয়ে মাধবীলতার মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু বলিয়া যাওয়াই ভাল মনে করিয়া অনুমতি চাহিতে গিয়া তার বিস্ময়ের সীমা থাকে নাই।

মহেশ চৌধুরী সঙ্গে সঙ্গে রাজী হইয়া বলিয়াছিল, 'আশ্রমে ওদের সঙ্গে দেখা করতে যাবে মা? বেশ তো।' তারপর হাসিয়া বলিয়াছিল, 'পুরোনো সাথীদের দেখতে সাধ হচ্ছে?'

মহেশ চৌধুরীই যে সদানন্দকে তাড়াইয়া দিয়াছে, সদানন্দকে ভক্তি করার বদলে সে যে এখন তার অধঃপতনের জন্য আপশোষ করে, এসব মাধবীলতার অজানা নয়। একটা প্রশ্ন পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা না করিয়া হাসিমুখে তাকে সদানন্দের আশ্রমে যাইতে অনুমতি দেওয়া মহেশ চৌধুরীর মত মানুষের পক্ষেও মাধবীলতা সম্ভব ভাবিতে পারে নাই। সদানন্দের অধঃপতনে বিশ্বাস হইয়াছে, কিন্তু তাকে যে সদানন্দ সত্যই অপমান করিয়াছিল, মহেশের মনে কি এ বিষয়ে একটু খুঁতখুঁতানিও জাগে নাই? যে কাণ্ডের ফলে নিজেকে তার হাতুড়ি দিয়া আঘাত করিতে হইয়াছিল?

দুপুর বেলা আশ্রমে যে যার ঘরে বিশ্রাম করিতেছিল, উমা ছিল রত্নাবলীর ঘরে। শশধরের বৌ আর মনোহর দত্তের মাকে সঙ্গে করিয়া মাধবীলতা প্রথমে সে ঘরে গেল তারপর সঙ্গী দুজনকে সেখানে বসাইয়া রাখিয়া একা দেখা করিতে গেল সদানন্দের সঙ্গে।

রত্নাবলী বলিল, 'একটু বোস্ না ভাই, দুদণ্ড গল্প করি। সেদিন তো কথা বলারই সময় পেলাম না।'

সদানন্দের নির্দ্দেশে উমার সঙ্গে মাধবীলতাকে নিমন্ত্রণ করিতে গিয়া রত্নাবলী একাই প্রায় তিনঘণ্টা মাধবীলতার সঙ্গে গল্প করিয়াছিল। কিন্তু যে রকম রোমাঞ্চকর ভাবে মাধবীলতার বিবাহ হইয়াছে, তাতে দু'চার ঘণ্টার গল্পে কি মনের কথা সব বলা হয়?

মাধবীলতা বলিল, 'না ভাই, চট্ করে আগে দেখাটা করে আসি। সেদিন আসিনি বলে বড্ড চটে আছেন।'

'তুই কি করে জানলি চটে আছেন?'

'ওকে চিনি না আমি?'

সদানন্দের মহলে ঢুকিতে গিয়া আগে দেখা হইল বিপিনের সঙ্গে। বিপিন তাকে দেখিয়াই, বলিল, 'কি সর্ব্বনাশ, তুমি এখানে!'

'ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'কেন?'

'আমার দরকার আছে।'

'কি দরকার?'

'আছে।'

বিপিন খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর বলিল, 'সেদিন তোমাকে অত করে বুঝিয়ে বলে এলাম—'

মাধবীলতার নিজেরও বুকের মধ্যে অকথ্য রকমের ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছিল, তবু সে মুখে সাহস দেখাইয়া বলিল, 'আপনার ভয় নেই, উনি আমার কিছু করতে পারবেন না। আপনার যত সব উদ্ভট ধারণা—উনি সে রকম মানুষ নন্।'

ইতিমধ্যে বিপিন একটু আত্মসম্বরণ করিয়াছিল, সে গম্ভীর মুখে বলিল, 'আমার যেমন ধারণাই থাক, ওঁর সঙ্গে তোমার দেখা হবে না। চল, তোমাকে বাইরে রেখে আসি।'

'কেন?'

'কেন আবার কি? আমার আশ্রমে যদি তোমায় ঢুকতে না দিই, তুমি কি গায়ের জোরে ঢুকবে?'

কথা হইতেছিল সদানন্দের ঘরের সামনে বারান্দায় দাঁড়াইয়া। মাধবীলতার গলা শুনিয়া সদানন্দ আগেই দরজার কাছে উঠিয়া আসিয়া দুজনের কথা শুনিতেছিল, এবার ডাকিয়া বলিল, 'এসো মাধু, ভেতরে এসো। বিপিন তুমি একটু বাইরের দরজার কাছে বসবে যাও তো, কেউ এসে আমাদের বিরক্ত না করে।'

আগাইয়া আসিয়া বিপিনের চোখের সামনে মাধবীলতার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে সদানন্দ তাকে ঘরের মধ্যে নিয়া গেল, বিপিনের মুখের উপর বন্ধ করিয়া দিল দরজা।

মাধবীলতার অর্দ্ধকণ্ঠের চীৎকার শোনা গেল, 'বিপিন বাবু! ও বিপিনবাবু!' তারপর স্পষ্টই বুঝা গেল সদানন্দ তার মুখে হাত চাপা দিয়াছে।

দরজার কাছে সরিয়া গিয়া বিপিন চাপা গলায় বলিল, 'সদা, তুই কি আমাদের সকলকে না ডুবিয়ে ছাড়বি না? দরজা খুলে দে—ওকে ছেড়ে দে।'

সদানন্দ ভিতর হইতে বলিল, 'কেন ভাবছিস্ তুই? কিচ্ছু হবে না, তোর কোন ভাবনা নেই। যদি হয়, তোর বোকামির জন্যে হবে।'

'তোর পায়ে পড়ি সদা—'

'পায়ে পড়িস্ আর যাই করিস্ কিছু লাভ হবে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাধার মত কেন সময় নষ্ট করছিস্, একজন কেউ এসে পড়লে ভাল হবে? এই সোজা কথাটা তুই বুঝতে পারছিস্ না নচ্ছার, মাধু একা ফিরে গেলে ও কারো কাছে কিছু বলবে না। কিন্তু অন্য কেউ জানতে পারলে, না বলে মাধুর উপায় থাকবে না?'

বিপিন জানিত মানুষটা সদানন্দ ভয়ানক, কিন্তু এতটা সেও ভাবিতে পারে নাই। এর চেয়ে ঢের বেশী অমানুষিক কাণ্ড সর্ব্বদাই সংসারে ঘটে,

কিন্তু নিজের সামনে না ঘটা পর্য্যন্ত নিজের জানাশোনা মানুষের সম্বন্ধে কে তা সম্ভব ভাবিতে পারে! বিপিন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল। সদানন্দ যা বলিতেছে তাই করাই হয় তো ভাল, তা ছাড়া আর কি উপায় আছে!

ভিতর হইতে সদানন্দ বলিল, 'বিপিন, গেলি?'

বিপিন বলিল, 'যাচ্ছি।'

ধীরে ধীরে বিপিন সদরের দরজার দিকে আগাইয়া যায়, মাথার মধ্যে তার যেন সব গোলমাল হইয়া যাইতে থাকে। দরজা বন্ধ না করিয়া খোলা দরজার সামনেই সে বসিয়া থাকে। মাথার মধ্যে তার যত গোলই পাকাইয়া যাক, এ বুদ্ধিটা তার থাকে যে, দরজা বন্ধ করার চেয়ে দরজা খুলিয়া রাখিয়া নিজে বসিয়া সকলের পথ আটকানো ভাল।

আশ্রমের একজন সামনে দিয়া যাওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করে 'এখানে বসে আছেন?'

'এমনি। উনি একজনকে বিশেষ উপদেশ দিচ্ছেন—আমারও একটু দরকার আছে ওনার সঙ্গে।'

বেলা পড়িয়া আসে, সামনে দিয়া আশ্রমের শিষ্য-শিষ্যার যাতায়াত বাড়িয়া যায়। কেউ কেউ বিপিনকে এখানে এভাবে বসিয়া থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করে, কেউ দু'দণ্ড দাঁড়াইয়া বাজে কথা বলিয়া যায়। চালার নীচে নিত্যকার সভার জন্য গ্রামবাসী নরনারী একে একে আসিয়া জমা হইতে থাকে। তৃষ্ণায় বিপিনের বুক ফাটিয়া যাওয়ার উপক্রম হয় কিন্তু উঠিয়া গিয়া এক গ্লাস জল যে খাইয়া আসিবে, সে সাহসও হয় না, কাউকে এক গ্লাস জল আনিয়া দিতে বলিতেও ভরসা পায় না।

শেষ বেলায় চালার নীচে সকলে সমবেত হইয়া অধীর আগ্রহে যখন সদানন্দের প্রতীক্ষা করিতেছে, উমা আর রত্নাবলী শশধরের বৌকে সঙ্গে করিয়া মাধবীলতার খবর নিতে আসিল।

বিপিন পাংশু মুখে বলিল, 'উনি মাধুর সঙ্গে কথা বলছেন।'

'এখনো কথা বলছেন!' রত্নাবলী বলিল।

বিপিন হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, 'মাধুকে উনি একটু বেশী পছন্দ করেন। তা ছাড়া, অনেকবার আমায় বলেছিলেন, বিবাহিত জীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মাধুকে কিছু বলবেন। সে সব কথা বলছেন বোধ হয়।'

রত্নাবলী বলিল, 'এতদিন এক বাড়ীতে থেকে বললেন না, এখন—'

বিপিন বলিল, 'বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে উপদেশ দিলে কি হবে? উনি অ্যাদ্দিন ইচ্ছে করেই কিছু বলেন নি। আজ মাধু নিজে শুনতে চাইল—'

'আমরাও একটু শুনে আসি' বলিয়া রত্নাবলী ভিতরে ঢুকিতে যায়, বিপিন ব্যস্ত হইয়া বাধা দিয়া বলিল, 'না না, যেও না। উনি কাউকে যেতে নিষেধ করেছেন।'

কিন্তু রত্নাবলীকে আটকাইবার মত গায়ের জোর বিপিনের ছিল না, তাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া রত্নাবলী ভিতরে চলিয়া গেল।

রত্নাবলীর মনটা একটু সন্দিগ্ধ।

সদানন্দের ঘরের সামনে রত্নাবলী একটু দাঁড়াইল। সন্দিগ্ধ মনে সাহস থাকে না, থাকে কৌতূহল। দরজা বন্ধ না খোলা? ঠেলা দিলেই যদি খুলিয়া যায়? সদানন্দ দরজা খুলিয়া যদি জিজ্ঞাসা করে, কি চাই? বিপদ হিসাবে কোনটাই কম নয়।

সাহস যে মনে নাই, কৌতূহল দমন করার মত মনের জোর সে মনে কোথায় পাইবে? দরজাটা ভেজানই ছিল।

সদানন্দ খাটে বসিয়া আছে, পা ঝুলাইয়া। দু'পাশে হাতের তালু দিয়া খাটে চাপ দিবার ভঙ্গি দেখিয়া মনে হয় হাতের উপরেই শরীরের ভর দিয়া যেন সদানন্দ বসিয়াছে। মাধবীলতা বসিয়াছে মেঝেতে তার ঝুলান পায়ের কাছে,—ঊর্দ্ধমুখী, উত্তেজিতা, শব্দময়ী মাধবীলতা। উপদেশ দেওয়ার কথা সদানন্দের, কিন্তু সে রীতিমত অস্বস্তির সঙ্গে মাধবীলতার বক্তৃতা শুনিতেছে।

সদানন্দের চোখে না পড়িলে রত্নাবলী হয়তো চোরের মত পালাইয়া যাইত, সদানন্দ তাকে দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ সাগ্রহে আহ্বান করিয়া বসায় সে সুযোগটা আর পাওয়া গেল না।

'এসো রতন।'

মাধবীলতা মুখ নামাইয়া ভাল করিয়া গা ঢাকিয়া কুঁজো হইয়া বসিল। পায়ে পায়ে আগাইয়া আসিয়া রত্নাবলী তার কাছে বসিল, সন্তর্পণে। মনের মধ্যে তার ওলট-পালট চলিতেছিল। অবস্থা বিশেষে কত রকম সন্দেহই মনে জাগে।

'তুমি একা এসেছ রতন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ভাবলাম যে একবার—'

'দেখে আসি ওরা কি করছে?' সদানন্দ হাসিল। রত্নাবলীর বিব্রত ভাব দেখিয়া আবার বলিল, 'বন্ধুর জন্য ভাবনা হচ্ছিল, চাবুক মারছি না গায়ে ছ্যাঁকা দিচ্ছি, ভেবে পাচ্ছিলে না, কেমন? আশ্রম ত্যাগ করার জন্য আমি কাউকে শাস্তি দিই না রতন। যার গলায় খুসী মালা দিয়ে তুমিও যেদিন ইচ্ছা আশ্রম ছেড়ে চলে যেও, আমি কিছু বলব না।'

সত্যমিথ্যায় জড়ানো কথা, না-চাওয়া কৈফিয়তের মত। সদানন্দের ভাবটা যেন নতুন জামাই-এর মত, শালীর সঙ্গে ফাজলামি করিতেছে। রত্নাবলী কিছুই বুঝিতে পারে না, কারণ, বুঝিবার মত কি যেন একটা জ্ঞান মনের অন্ধকার তলা হইতে উপরে উঠিতে উঠিতে চাকায় লাগা নোংরা কিছুর মত পাক খাইয়া নীচে তলাইয়া যায়। সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।

সকলে চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে কেন? মাধবীলতা তাই বলে, 'এবার থেকে মাঝে মাঝে আশ্রমে আসব ভাই। ওঁকে প্রণাম করে যাব।'

তারপর আবার তিন জনেই চুপ করিয়া থাকে, তবে বেশীক্ষণের জন্য নয়। একটু পরেই বিপিন আসিয়া গম্ভীর মুখে খবর দেয় যে, চালার নীচে বসিয়া বসিয়া অনেকে চলিয়া যাইতেছে, অনেকে অপেক্ষা করিতেছে। সদানন্দ যদি না যায়, বিপিন তাদের খবরটা দিতে পারে।

'চল, যাচ্ছি।' সদানন্দ যেন একটু ব্যস্ত হইয়াই চলিয়া গেল।

তারপর দু'জনে চুপচাপ বসিয়া থাকে। অনেকক্ষণ। শেষে মাধবীলতাই বলে, 'এখানে বসে থেকে কি হবে, চলো আমরাও যাই।'

'আশ্রমে থাকবে নাকি আজ?

'থাকবার কি উপায় আছে ভাই? তোমার ঘরে বসে নিরিবিলি দু'দণ্ড কথা বলিগে' চল।'

রত্নাবলীর মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন পাক খাইয়া বেড়াইতেছিল, সে খানিক খানিক জানে কিন্তু সব জানে না। সব তাকে জানানো হয় নাই বলিয়া অভিমানে প্রশ্নগুলি গলার কাছে আসিয়া আটকাইয়া যাইতেছিল। তবে জানার সাধটা যোরালো হইলে প্রায় সব মেয়েরাই খুক্ খুক্ করিয়া একটু কাসির ধাক্কাতেই দারুণ অভিমানের বাধা ঠেলিয়া সরাইয়া দিতে পারে। জিজ্ঞাসা তাই হয় আকস্মিক।

'হঠাৎ এলে যে?'

'হঠাৎ এলাম? ও, হঠাৎ কেন এলাম? এমনি এলাম আর কি।'

'এমনি এলে না তোমার মাথা এলে। ছি, ধিক্ তোকে। ঘরে যদি মন না বসে, ঘরের বৌ সাজতে গেলি কেন? কে তোর পায়ে ধরে সেধেছিল?'

'একজন সেধেছিল ভাই।'

ফাঁকি দেওয়া হাসি' হাসি' ভঙ্গির সঙ্গে হাল্কা কথা রতনকে রাগে যেন অন্ধকার দেখাইয়া দেয়। আশ্রমের মানুষ-দেবতার পূজার জন্য কোন গ্রামের কে যেন কি উপলক্ষে এক বোঝা নৈবিদ্য পাঠাইয়াছিল, আশ্রমের সকলেই ভাগ পাইয়াছে। ক্রুদ্ধ চোখে চাহিতে চাহিতে রত্নাবলী বন্ধুর জন্য একটা পাথরের থালায় ফলমূল আর মিষ্টান্ন সাজাইতে থাকে। সন্দেহটা মনের মধ্যে ধীরে ধীরে বিশ্বাসে দাঁড়াইয়া যাইতেছে। মনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ না জানিলেও মানুষের বড় বড় ভাবপরিবর্ত্তনের মধ্যে মনের পরিবর্ত্তন আবিষ্কার করা যায়। ভদ্রগৃহস্থের ছেলের সঙ্গে সামাজিক বিবাহের ফলে জীবনের সমস্ত তুচ্ছ খুঁটিনাটি যার কাছে এমন গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল যে, প্রায় মুচকি একটু হাসি পর্য্যন্ত অন্যায় মনে হইত, বন্ধুর এরকম সাংঘাতিক জেরার সময় সে যদি এমন সয়তানি ভরা ফাজলামি করিতে পারে, কিছু একটা ঘটিয়াছে বৈকি। হায়, মাঝখানে কিছুদিনের ছেদ পড়িয়া সদানন্দের সঙ্গে আবার কি মাধবীলতার আগের সম্পর্ক পাতানো হইয়া গেল?

'খা।'

'তুইও বোস ভাই, দু'জনে একসঙ্গে খাই?'

এতক্ষণে, মাধবীলতা যখন এক টুকরা ফল মুখে তুলিতেছে, রত্নাবলীর নজর পড়িল, মাধবীলতার ডান হাতের কব্জির কাছটা লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে।

'হাতটা প্রায় ভেঙ্গে গেছে ভাই, গায়ে কি জোর মানুষটার।'

চিবানো ফলের সঙ্গে ঢোক গিলিয়া রত্নাবলী ভাল মানুষের মত জিজ্ঞাসা করে 'কেন, এত জোরে হাত ধরল কেন?'

মাধবীলতা হাসিয়া বলে, 'রাগের চোটে' আবার কেন।'

'তারপর?'

'তারপর আবার কি? আমি কটমট করে তাকাতে হাত ছেড়ে দিয়ে বকবকানি আরম্ভ করে দিল।'

মাধবীলতা তৃপ্তির হাসি হাসে।

সতের

সত্য কথা বলিতে কি, মাধবীলতা কটমট করিয়া তাকানোর অবসর বেশীক্ষণ পায় নাই। অবসর পাইলেও সে তাকানিতে বিশেষ কোন কাজ হইত কি না সন্দেহ। মূর্চ্ছার উপক্রম হইলে যেমন হয়, মাথাটা সেই রকম বোঁ বোঁ করিয়া পাক খাইতে আরম্ভ করায় সে চোখ বুজিয়া মূর্চ্ছা গিয়াছিল। সদানন্দের চোখ মুখ দেখিয়া সে যেমন ভয় পাইয়াছিল, অন্ধকার রাত্রে হঠাৎ ভূত দেখিলেও সে রকম ভয় পাইত কি না সন্দেহ। তার মুখের সেই বীভৎস ভঙ্গি আর চোখের মারাত্মক দৃষ্টির মধ্যে পাশবিক কামনার একটু চিহ্ন খুঁজিয়া পাইলে মাধবীলতা হয়তো মূর্চ্ছার চরম শিথিলতা আনিয়া সদানন্দের আলিঙ্গনে গা এলাইয়া দিত না, আলিঙ্গন আরেকটু জোরালো হইলেই সে দেহের কয়েকটা পাঁজর নির্ঘাৎ মড়মড় করিয়া ভাঙ্গিয়া যাইত। মাধবীলতা নিঃসন্দেহে টের পাইয়াছিল, সদানন্দ তাকে খুন করিবে—সঙ্গে সঙ্গেই হোক অথবা অকথ্য যন্ত্রণা দিবার পরেই হোক। খবরের কাগজে যে সব খুনের খবর বাহির হয়, সোজাসুজি সেই রকম অভদ্র অমার্জ্জিত হত্যা, উপন্যাসের পাষণ্ডেরা যে রকম রসালো খুন করে, সেরকম নয়।

মাধবীলতার ভয় পাওয়ার আরেকটা কারণ ছিল।

সদানন্দ তখন মহেশ চৌধুরীর বাড়ীতে, তাকে নূতন আশ্রমে সরানোর আয়োজন চলিতেছে। একদিন হঠাৎ নির্জ্জন বারান্দায় সদানন্দের সামনে পড়িয়া সে পাশ কাটাইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতেছে, সদানন্দ ডাকিয়া বলিয়াছিল, 'একটা কথা শোন মাধু।'

মাধবীলতা কথা শুনিতে দাঁড়ায় নাই। তখন তীব্র চাপা গলায় সদানন্দ বলিয়াছিল, 'একদিন তোমায় হাতে পেলে গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নেব।'

তখন কথাটার দাম ছিল না।

যাওয়ার আগে মনে হইয়াছিল, সদানন্দের পক্ষে ও কাজটা অসম্ভব কি?

বিভূতি জিজ্ঞাসা করে, 'কেন গিয়েছিলে?'

মাধবীলতা জবাব দেয়, 'তোমার পেছনে কেন পুলিশ লেলিয়ে দিল।'

মাধবীলতার সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল, জাগিয়া আছে তবু ঘুমেই দু'চোখ বুজিয়া গিয়াছে। মনের মধ্যে একটা ধিক্কার ভরা আর্ত্তনাদ গুন্‌গুনানো গানের মত মৃদু চাপা সুরে গুমরাইতেছে। কি হইয়াছে? কেন হইয়াছে? কোথায় হইয়াছে? কবে হইয়াছে? কিছুই যেন মনে নাই। অবসাদের যন্ত্রণা যে এমন বৈচিত্র্যময়, সকলেই তা জানে, তবু সকলের পক্ষেই এটা 'কে তা জানিত'র পর্য্যায়ের।

[লেখকের মন্তব্য: অনেকে বিশ্বাস করে না, তবু জীবনের একটা চরম সত্য এই যে, সমস্ত অন্যায় আর দুর্নীতির মূল ভিত্তি জীবনীশক্তির দ্রুত অপচয়—ব্যক্তিগত অথবা সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের। যতই বিচিত্র আর জটিল যুক্তি ও কারণ মানুষ খাড়া করুক, ভাল-মন্দ উচিত-অনুচিত মানুষ ঠিক করিয়াছে এই একটিমাত্র নিয়মে। অবশ্য, মানুষের ভুল করা স্বভাব কিনা, তাই এমন একটা সোজা নিয়ম মানিয়া জীবনের রীতিনীতি স্থির করিতে গিয়াও কত যে ভুল করিয়াছে, তার সংখ্যা নাই।

মাধবীলতার তৃপ্তি উবিয়া যায় নাই, অবসাদের যন্ত্রণার নীচে চাপা পড়িয়া গিয়াছে মাত্র। এটা অনুতাপ নয়।]

সে রাত্রে আর বেশী জেরা করা গেল না। কারণ, বিড় বিড় করিয়া কয়েকটা ভাঙ্গা ভাঙ্গা দুর্ব্বোধ্য কথা বলিতে বলিতে মাধবীলতা ঘুমাইয়া পড়িল। পরদিন সে অনেক কথাই বলিল বটে কিন্তু বিভূতি ভাল করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না। মাধবীলতার অনেক কথার মানেটা দাঁড়াইল সেই একই কথায়, সে গিয়া হাতে পায়ে ধরিয়া বলিয়া আসিয়াছে বিভূতির পিছনে আর যেন সদানন্দ পুলিশ না লাগায়। কথাটা জটিলও নয়, দুর্ব্বোধ্যও নয়, তবু বিভূতির মনে হইতে লাগিল, মাধবীলতা যেন একটা খাপছাড়া কাজ করিয়া ব্যাখ্যা আর কৈফিয়তের বদলে একটা হেঁয়ালি রচনা করিতেছে। কাঁদিতে কাঁদিতে মাধবীলতা একদিন যার বিরুদ্ধে তার কাছে নালিশ করিয়াছিল আর সে যাকে গিয়া মারিয়াছিল ঘুঁষি, এতকাল এক বাড়ীতে আর বাড়ীর কাছে আশ্রমে থাকার সময় যে মাধবীলতা তার ধারে কাছে ঘেঁষে নাই। এখন বলা নাই কওয়া নাই এত দূর আশ্রমে গিয়া তার হাতে পায়ে ধরিয়া সাধিয়া আসিল সে যেন বিভূতির পিছনে আর পুলিশ না লেলাইয়া দেন। কচি খুঁকী তো সে নয় যে এটুকু জ্ঞান তার

নাই, এভাবে তার সদানন্দের হাতে পায়ে ধরিয়া সাধিতে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না? তার ভালর জন্য গিয়াছিল? তার বিপদের ভয়ে দিশেহারা হইয়া? কথাটা ভাবিতে ভাল লাগে কিন্তু বিশ্বাস যে করা যায় না! দিশেহারা আতঙ্ক ছাড়া আর কিছুতেই প্রকাশ পায় না সে আবার কোন্ দেশী সৃষ্টিছাড়া প্রেম, সে প্রেম মাধবীলতা পাইলই বা কোথায়? তা ছাড়া দিশেহারা আতঙ্কের আর কোন লক্ষণ তো তার মধ্যে দেখা যায় নাই?

মনটা এমন খারাপ হইয়া গেল বিভূতির বলিবার নয়। আটক থাকার সময় প্রায়ই যেমন মনে হইত সব ফাঁকি আর সব ফাঁকা, কাঁটা বিছানো বিছানায় এপাশ ওপাশ করাটাই জীবন আর মেশানো আলো অন্ধকারের আবছা অর্থহীন উপমার মত স্মৃতি-কল্পনা আশা-নিরাশা সুখ-দুঃখের খিচুড়ি পাকানো ভোঁতা অনুভূতিগুলির মাথার মধ্যে মাথাধরার মত টিপ্ টিপ্ করাটাই বাঁচিয়া থাকার একমাত্র অভিব্যক্তি, আজ তেমনি মনে হইতে লাগিল, মাধবীলতাও যে তার আপন নয়, এই সত্যটা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হওয়াটাই তাকে আপন করিতে চাওয়ার একমাত্র সম্ভবপর পরিণতি। আটক থাকার সঙ্গে মাধবীলতা আপন নয় ভাবার পার্থক্য অনেক, কিন্তু মন খারাপ হওয়াটা একরকম কেন, এই দার্শনিক সমস্যাটা মনে উদয় হওয়ায় বিভূতি একটু অন্যমনস্ক হইয়া গেল এবং সকল অবস্থার সুখদুঃখ একই রকম কিনা এই কথাটা ভাবিতে আরম্ভ করায় আধ ঘণ্টার মধ্যে ঘটিয়া গেল স্নায়বিক বিপর্য্যয়। তখন, মৃদু-স্বরে সে ডাকিল, 'মাধু?'

আজ অবসাদ কমিয়াছে, কারণ বিভূতির রকম সকম দেখিয়া অল্প অল্প ভয়ের উত্তেজনা আসিয়াছিল। ঘুম তাই একেবারেই আসে নাই। ঘুমের ভাণে মাধবীলতা এমন ভাবেই সাড়া দিল যে, পরমুহূর্তে আকস্মিক আবেগে বিভূতি তাকে জড়াইয়া ধরিল। কিন্তু কি মৃদু আর সশঙ্ক সে আলিঙ্গন, পাঁজর যদি মাধবীলতার পাটখড়ির হইত তবু ভাঙিবার কোন ভয় ছিল না।

অনেকগুলি দিন কাটিয়া গেলে হয়তো আবার একদিন আশ্রমে যাওয়ার সাধটা মাধবীলতার অদম্য হইয়া উঠিত কিন্তু কয়েকটা দিন কাটিবার আগেই একদিন মহেশ চৌধুরী বলিল, 'চল মা, একবার আশ্রম থেকে ঘুরে আসি।'

না গেলেও চলিত, খুব বেশী ইচ্ছাও ছিল না যাওয়ার, তবু মাধবীলতা শ্বশুরের সঙ্গে আশ্রমে বেড়াইতে গেল। তখন সকাল বেলার মাঝামাঝি, আবহাওয়া অতি উত্তম। এক বছর সদানন্দের উপদেশ শোনার চেয়ে এক বছর আশ্রমে পায়চারি করিলে প্রকৃতির প্রভাবেই মনের বেশী উন্নতি হয়। মহেশ চৌধুরীকে একটু চিন্তিত দেখাইতেছিল। চিন্তা মহেশ চৌধুরী চিরকালই করিয়া থাকে কিন্তু বেশ বুঝা যায় যে এখন তার মুখের ছাপটা দুর্ভাবনার। কি হইয়াছে কে জানে!

গাছতলায় আশ্রমের সকলে সদানন্দকে ঘিরিয়া বসিয়াছে। প্রাচীন ভারতের তপোবনে শিষ্যবেষ্টিত ঋষির ছবি যার কল্পনায় আছে, দেখিলেই তার মনটা ব্যাকুল হইয়া উঠিবে। মহেশ চৌধুরী ভুরু কুঁচকাইয়া বিস্ময়ের সঙ্গে চাহিয়া থাকে আর মৃত্যুর মধ্যে জীবনের কতখানি শেষ হইয়া যায় সকলকে তার হিসাব বুঝাইতে বুঝাইতে হাসিমুখে সদানন্দ মাথাটা হেলাইয়া তাকে অভ্যর্থনা জানায়। মাধবীলতা রত্নাবলীর কাছে গিয়া বসে আর সদানন্দের ইঙ্গিত উপেক্ষা করিয়া মহেশ চৌধুরী বসে সকলের পিছনে। কয়েক মিনিটের মধ্যে বেশ বুঝিতে পারা যায় একমনে সে সদানন্দের কথা শুনিতেছে, অসম্ভব কিছু সম্ভব হইতে দেখিবার বিস্ময়ের সঙ্গে।

অন্য সকলের, পুরুষ ও নারীদের, বিস্ময় নাই। সকলে মুগ্ধ, উত্তেজিত। কথা শেষ করিয়া সদানন্দ হাসিমুখে উঠিয়া দাঁড়ায়, ধীরে ধীরে একা নদীর দিকে আগাইয়া যায়। যে মৃদু গুঞ্জনধ্বনি ক্ষণ-কালের স্তব্ধতার শেষে সুরু হয়, তার মধ্যে অনেক-গুলি আত্মসমর্পিত মনের সার্থকতার আনন্দ যেন রবীন্দ্রনাথের গানের সুরের মত প্রাঞ্জল মনে হয়। অন্ততঃ মহেশের যে মনে হয় তাতে সন্দেহ নাই, কারণ সে আরও বেশী থতমত খাইয়া সদানন্দের গতিশীল মূর্ত্তির দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকে।

রত্নাবলীর সঙ্গে তার কুটীরে যাওয়ার আগে মাধবীলতা তাকে খবরটা দিতে আসিল, ফিরিবার সময় যাতে তাকে খোঁজ করার হাঙ্গামা না বাধে।

মহেশ চৌধুরী বলিল, 'আমরা আজ এখানে থাকব মাধু।'

'সারা দিন?'

'সারা দিন তো বটেই, সারা রাতও থাকতে পারি।'

মাধবীলতা এই উদ্ভট সিদ্ধান্তের কারণটা জানিবার চেষ্টা আরম্ভ করার আগেই মহেশ চৌধুরী উঠিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। সদানন্দ তখন চোখের আড়ালে চলিয়া গিয়াছে। নদীর ধারে

অনেক খোঁজাখুজি করিয়াও তার দেখা না পাইয়া মহেশ চৌধুরী অবশ্য বুঝিতে পারিল যে, নদীর দিকের খিড়কি দরজা দিয়া সদানন্দ কুটীরে ফিরিয়া গিয়াছে, কিন্তু নিজে সে কুটীরে ঢুকিল না। রত্নাবলীর কুটীরে ফিরিয়া গিয়া মাধবীলতাকে বলিল, 'ওঁকে একবার ডেকে আন তো মাধু।'

মাধবীলতা অবাক ;—'ডেকে আনব ? এখানে ?'

'হ্যাঁ। বলগে, আমি একবার দেখা করতে চাই।'

মহেশ চৌধুরী হুকুম দিয়া ডাকিয়া আনিয়া দেখা করিবে সদানন্দের সঙ্গে! প্রতিবাদ করিতে গিয়া কিছু না বলিয়াই মাধবীলতা চলিয়া গেল। হঠাৎ তার মনে পড়িয়া গিয়াছিল মহেশ চৌধুরীর পাগলামীর মানে বুঝিবার ক্ষমতা এতদিন এক বাড়ীতে থাকিয়াও তার জন্মে নাই।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে, রত্নাবলী যখন ব্যস্ত আর বিব্রত হইয়া বার বার বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, তার একবার গিয়া খোঁজ করিয়া আসা উচিত, মাধবীলতা ফিরিয়া আসিল। সদানন্দ বলিয়া পাঠাইয়াছে, দেখা করিবার দরকার থাকিলে মহেশ চৌধুরী যেন সন্ধ্যার পর তার সঙ্গে গিয়া দেখা করিয়া আসে। শুনিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া মহেশ চৌধুরী বলিল, 'চল আমরা ফিরে যাই মাধু।'

'সারা দিন এখানে থাকবেন বলেছিলেন যে ?'

'আর থেকে কি হবে ? ভেবেছিলাম মানুষটা বুঝি হঠাৎ বদলে গেছে, কিন্তু মানুষ কি কখনো বদলায় ?'

মানুষ যে বদলায় না, তার আরেকটা মস্ত বড় প্রমাণ পাওয়া গেল ফিরিবার পথে। চরডাঙ্গা গ্রামের কাছাকাছি মস্ত একটা মাঠে পঁচিশ ত্রিশ জন অর্দ্ধ-উলঙ্গ নোংরা মানুষকে আত্মহত্যা করিতে বিভূতি নিষেধ করিতেছে। মুখে ফেণা তুলিয়া এমনভাবে নিষেধ করিতেছে যেন কোন রকমে এই লক্ষ্মীছাড়া বোকা মানুষগুলোকে কথাটা একবার বুঝাইয়া দিতে পারিলেই তারা হত্যা করিবে তবু আর এভাবে আত্মহত্যা করিবে না।

একসঙ্গে খাইতে বসিয়া মহেশ চৌধুরী সোজা-সুজি জিজ্ঞাসা করিল, 'আবার কি তুমি জেলে যেতে চাও ?'

'সাধ করে কেউ জেলে যায় ?'

বিভূতির মেজাজটা ভাল ছিল না।

'অমন করে ওদের ক্ষেপিয়ে তুললে জেলেই তো যেতে হয় বাবা ? একটু কিছু ঘটলেই তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে।'

'নেয় নেবে।'

মহেশ চৌধুরী ডালমাখা ভাত খায় আর ভাবে। বুঝাইয়া কোন লাভ হইবে না। এই কথাটাই অনেকবার অনেক ভাবে ছেলেকে সে বুঝাইয়াছে যে, অকারণে জেলে গিয়া কোন লাভ হয় না, সেটা নিছক বোকামি—কাজের মত কোন কাজ করিয়া ছেলে তার হাজার বার জেলে যাক, হাজার বছরের জন্য জেলে যাক, মহেশ চৌধুরীর তাতে তো কোন আপত্তি নাই! কিন্তু পাহাড়ে উঠিবার উদ্দেশ্যে সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ার মত দেশ আর দেশের মানুষের মঙ্গলের জন্য চোখ কাণ বুজিয়া জেলে যাওয়ার তো কোন অর্থ হয় না। মনে হইয়াছিল, বিভূতি বুঝি কথাটা বুঝিতে পারিয়াছে—বিভূতি চুপচাপ শুনিয়া গিয়াছে, তর্কও করে নাই, নিজের মতামত জাহির করিবার চেষ্টাও করে নাই। আজ আবার মহেশ চৌধুরীর মনে হইতে লাগিল, অনেক দিন পরে বাড়ী ফিরিয়া সে শুধু বাপের সঙ্গে কথা কাটাকাটি এড়াইয়া চলিয়াছিল, কথাগুলি তার মাথায় ঢোকে নাই।

একবার ঢোঁক গিলিয়া মহেশ চৌধুরী এক চুমুকে জলের গ্লাসটা প্রায় অর্দ্ধেক খালি করিয়া ফেলিল। ছেলেও যদি তার সহজ সরল কথা না বুঝিয়া থাকে—

অথবা এসব কথা বুঝিবার নয় ? মানুষ যা করিতে চায় তাই করে ?

অল্প দূরে মহেশের পোষমানা বিড়ালটি ঘপটি মারিয়া বসিয়াছিল। মাছের ঝোল পরিবেশন করিতে আসিবার সময় বেচারীর লেজে কি করিয়া মাধবীলতার পা পড়িয়া গেল কে জানে, চমক দেওয়া আওয়াজের সঙ্গে লাফাইয়া উঠিয়া মাধবীলতার নতুন সাড়ীখানা আঁচড়াইয়া ছিঁড়িয়া দিল। মাছের ঝোলের থালাটি মাটিতে পড়িয়া গেল, বিড়ালটির মতই বিদ্যুৎগতিতে লাফ দিয়া পিছু হটিতে গিয়া মাধবীলতা ধপাস করিয়া মেঝেতে পড়িয়া গেল—পা ছড়াইয়া বসিবার ভঙ্গিতে। গায়ে তার আঁচড় লাগে নাই, পড়িয়া গিয়াও বিশেষ ব্যথা লাগে নাই, কিন্তু চীৎকার শুনিয়া মনে হইল তাকে বুঝি বাঘে ধরিয়াছে।

কাঠের মোটা একটা পিঁড়ি কাছেই পড়িয়াছিল, দু'হাতে পিঁড়িটা তুলিয়া নিয়া এমন জোরেই বিভূতি বিড়ালটিকে মারিয়া বসিল যে, মরিবার আগে একটা আওয়াজ করার সময়ও বেচারীর জুটিল না।

সকলের আগে মহেশ চৌধুরীর মনে হইল তার পোষমানা জীবটি আর কোনদিন লেজ উঁচু করিয়া তার পায়ে গা ঘষিতে ঘষিতে ঘড়্ ঘড়্ আওয়াজ করিবে না। তারপর অনেক কথাই তার মনে হইতে লাগিল।

জটিল, খাপছাড়া, সব রাশি রাশি কথা—চিন্তাগুলি যেন ছেঁড়া কাগজের মত মনের ঘরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ দমকা হাওয়ায় এলোমেলো উড়িতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। এরকম অবস্থায় মহেশ চৌধুরী কথা বলে না। তা ছাড়া আর উপায় কি আছে? এমন অভ্যাস জন্মিয়া গিয়াছে যে, বিচার বিবেচনার পর একটা কিছু সিদ্ধান্ত দিয়া না বুঝিলে মনের ভাব আর প্রকাশ করা যায় না। আত্ম-বিরোধী মত যদি কিছু প্রকাশ করিয়া বসে? সেটা প্রায় সর্ব্বনাশের সামিল। কেন সর্ব্বনাশের সামিল, তা অবশ্য মহেশ চৌধুরী কখনও ভাবিয়া দেখে নাই, তবে ক্ষতির সম্ভাবনাকে আত্মরক্ষী জীব মাত্রেই ভয় করে। নিজের সুখ-দুঃখকে পরের সুখদুঃখের মুখাপেক্ষী করার নীতি যাকে মানিয়া নিতে হয়, অস্বাভাবিক সংযম তার একমাত্র বর্ম্ম। রাগে দুঃখে অভিমানে বিচলিত হওয়া মহেশ চৌধুরীর পক্ষে সম্ভব, কিন্তু উচিত কি অনুচিত না জানিয়া পোষা একটা বিড়ালকে মারার জন্য বিভূতিকে চড় চাপড়টা মারিয়া বসাও সম্ভব নয়, গালাগালি দেওয়াও সম্ভব নয়।

কয়েকবার ঢোঁক গিলিয়া মহেশ চৌধুরী একেবারে চুপ করিয়া যায়। অন্য বিষয়েও একটি শব্দ আর তার মুখ দিয়া বাহির হয় না। খাওয়াও তখনকার মত শেষ হয় সেইখানে।

বিস্ফারিত চোখে খানিকক্ষণ মরা বিড়ালটার দিকে চাহিয়া থাকিয়া মাধবীলতা প্রথম ভয়ে ভয়ে কথা বলে, 'কেন মারলে? কি নিষ্ঠুর তুমি!'

'যেখানে যেখানে আঁচড় দিয়েছে, আইডিন লাগিয়ে দাও গিয়ে।'

'আঁচড় লাগেনি'

কথাটা বিভূতি সহজে বিশ্বাস করিতে চায় না। একটুও আঁচড় দেয় নাই? একেবারে না? কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! তবে তো বিড়ালটাকে না মরিলেও চলিত। বোকার মত একটু হাসে বিভূতি, মড়া বিড়ালটার দিকে চাহিয়াই মুখ ফিরাইয়া দেয়। বেশ বুঝিতে পারা যায় সে যেন একটু স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে,—বিস্ময়ে নয়, ব্যথা লাগে না এমন কোন আকস্মিক ও প্রচণ্ড আঘাতে। মহেশ চৌধুরীর নির্ব্বাক থাকার চেয়ে বড় সংযম যেন বিভূতির দরকার হইতেছে শুধু সহজ নির্ব্বিকার ভাবটা বজায় রাখিতে। বিচলিত হওয়ার উপায় তো বেচারীর নাই। মনের কোমল দুর্ব্বলতা যদি প্রকাশ পাইয়া যায়? সেটা প্রায় সর্ব্বনাশের সামিল। কেন সর্ব্বনাশের সামিল, তা অবশ্য বিভূতি কখনও ভাবিয়া ভাখে নাই, তবে অন্যায়-বিরোধী মানুষ মাত্রেই নিজের দুর্ব্বলতাকে চাপা দিতে চায়। পরের দুঃখ কমানোর জন্য নিজের দুঃখকে তুচ্ছ করার নীতি যাকে মানিয়া নিতে হয়, অস্বাভাবিক সংযম তারও বর্ম্ম। অনুতাপে থতমত খাইয়া যাওয়া বিভূতির পক্ষে সম্ভব, কিন্তু স্ত্রীকে আক্রমণ করার জন্য তুচ্ছ একটা বিড়ালকে শাস্তি দিয়া ব্যাকুলতা প্রকাশ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

চাকর বিড়ালের দেহটা তুলিয়া নিয়া যায়, বিভূতি আবার খাইতে আরম্ভ করে। খাইতে খাইতে ধীরে ধীরে সে আত্মসম্বরণ করিতে থাকে। আত্মসম্বরণ করিতে সময় তার বেশীক্ষণ লাগে না, খাওয়া দাওয়ার পর মাধবীলতা যখন আজ শশধরের বৌ-এর সঙ্গে গল্প করার বদলে পান হাতে স্বামীর ঘরে ঢুকিয়া ভিতর হইতে দরজাটা বন্ধ করিয়া দেয়, বিভূতির মন তখন কঠিন কর্ত্তব্য সম্পন্ন করার গাঢ় আর আটার মত চটচটে তৃপ্তিতে ভরিয়া গিয়াছে। দুপুরটা সেদিন দুজনের গভীর আনন্দে কাটিয়া গেল। পুরুষ আর নারীর প্রথম যৌবনের সব দুপুর ওরকম আনন্দে কাটে না।

বিভূতির মা ঘরে যায় দুধের বাটি হাতে। মহেশ এক রকম কিছুই খায় নাই।

'খাও।'

মহেশ কথা বলে না, শুধু মাথা নাড়ে। কিন্তু শুধু মাথা নাড়িয়া পতিব্রতা স্ত্রীকে কে কবে ঠেকাইতে পারিয়াছে? শেষ পর্য্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিতে হয়, 'কেন জ্বালাতন করছ? এখন কিছু খাব না।'

'কেন খাবে না?'

বিভূতির মার নিজেরও খাওয়া হয় নাই, ক্রমে ক্রমে মেজাজ চড়িতেছিল, আবার খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া মহেশ যখন সংক্ষেপে কৈফিয়ৎ দেয় যে, মনের উত্তেজনার সময় খাইলে শরীর খারাপ হয়—বিভূতির মার মেজাজ রীতিমত গরম হইয়া উঠিয়াছে।

'কচি খোকার মত কি যে কর তুমি।'

ভাল করিয়া কথা বলিলে, এমন কি রীতিমত ঝগড়া করিলেও, হয়তো বিভূতির মা তখনকার মত শুধু রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে চলিয়া যাইত, এক ঘণ্টা পরে আবার ফিরিয়া আসিত দুধের বাটি হাতে। কিন্তু এভাবে কথা পর্য্যন্ত বলিতে না চাহিলে কি মানুষের সহ্য হয়? বিভূতির মা তো আর জানিত না, নিজের মনে সঙ্গে মহেশ বুঝাপড়া করিতেছে, কত যে বিচার বিশ্লেষণ চলিতেছে, তার সীমা নাই। খোলা দরজা দিয়া দুধের বাটিটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বিভূতির মা আগাগোড়া একটা বিছানার চাদর মুড়ি দিয়া দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া শুইয়া রহিল।

তখন মনটা মহেশ চৌধুরীর বড় খারাপ হইয়া গেল। কি দোষ করিয়াছে বিভূতির মা? অন্যের পাপে সে কেন কষ্ট পায়? সেদিনের কথা মহেশের মনে পড়িতে থাকে, সদানন্দের কুটীরের সামনে তার সঙ্গে বিভূতির মা যখন গাছতলায় বৃষ্টিতে ভিজিতেছিল। বিছানার একপ্রান্তে পা গুটাইয়া বসিয়া মহেশ ভাবিতে থাকে। বিভূতির মাকে তুলিয়া খাওয়ানো যায়, সেটা তেমন কঠিন কাজ নয়। কিন্তু কি লাভ হইবে? বিভূতির সম্বন্ধে যা সে ভাবিতেছে, তাই যদি স্থির করিয়া ফেলে, তখন বিভূতির মাকে যে কষ্টটা ভোগ করিতে হইবে, তার তুলনায় এখনকার এ কষ্ট কিছুই নয়।

বিভূতিকে বাড়ী হইতে চলিয়া যাইতে বলিবে কি না, এই কথাটাই মহেশ ভাবিতেছিল। বিড়াল মারার জন্য নয়, বিভূতির প্রকৃতি যে কখনও বদলাইবে না, এটা সে ভাল করিয়া টের পাইয়া গিয়াছে বলিয়া। এখন বিভূতিকে বাড়ীতে থাকিতে দেওয়ার অর্থ-ই কি তাকে সমর্থন করা নয়? শুধু ছেলে বলিয়া তাকে আর কি ক্ষমা করা চলে, চোখ কাণ বুজিয়া আর কি আশা করা চলে এখনও তার সংশোধন সম্ভব? বিনা প্রতিবাদে এখন চুপ করিয়া থাকা আর বিভূতিকে স্পষ্ট বলিয়া দেওয়া যে, সে যা খুসী করিতে পারে, এর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। তার ছেলে বলিয়া বিভূতির অন্যায় করার যে বিশেষ সুযোগ সুবিধা আছে, মানুষের উপর যে প্রভাব প্রতিপত্তি আছে, বিভূতিকে জানিয়া শুনিয়া সে সমস্ত ব্যবহার করিতে দেওয়া আর তার নিজের অন্যায় করার মধ্যেই বা পার্থক্য কি? মনে মনে মহেশ চৌধুরী স্পষ্টই বুঝিতে পারে, এ বিষয়ে আর ভাবিবার কিছু নাই, বিভূতিকে বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বলা উচিত কি অনুচিত, এটা আর প্রশ্নই নয়, এখন আসল সমস্যা দাঁড়াইয়াছে এই যে, বিভূতি তার ছেলে। বিভূতি তার ছেলে। বিভূতি যে তার স্ত্রীরও ছেলে, এটা এতক্ষণ মহেশের যেন খেয়াল ছিল না। বিভূতির মা'র চাদর মুড়ি দেওয়া মূর্ত্তি এই আসল সমস্যাটাকে তাই একটু বেশী রকম জটিল করিয়া দিয়াছে।

বিভূতির মা'র ছেলেকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেওয়ার অধিকার কি তার আছে?

ভাল ছেলে, সৎ ছেলে, আদর্শবাদী ছেলে—গ্রামে আর এমন ছেলে নাই! কেবল বুদ্ধিটা একটু বিকৃত—ভাল মন্দের ধারণাটা ভুল। অনেকগুলি মানুষকে ক্ষেপাইয়া তুলিবার আনন্দ, দু'দিন পরে যখন প্রচণ্ড একটা সংঘর্ষ ঘটিয়া যাইবে, কতকগুলি মানুষ যাইবে জেলে আর কতকগুলি যাইবে হাসপাতালে আর কতকগুলির দেহ উঠিবে চিতায়, আনন্দের তখন আর তার সীমা থাকিবে না। জেল, হাসপাতাল বা চিতা, এর কোনটার জন্য নিজেরও অবশ্য তার ভয় নাই। ছেলের এই নির্ভীকতাও মহেশের আরেকটা বিপদ। নিজের কথা যে ভাবে না, স্বাধীনভাবে চলা-ফেরার বয়স যার হইয়াছে, ছেলে বলিয়া আর মতের সঙ্গে মত মেলে না বলিয়া তার উপর বাপের অধিকার খাটানোর কথা ভাবিতে মনটা মহেশের খুঁতখুঁত করে।

মহেশ চৌধুরী নির্ব্বাক হইয়া থাকে প্রায় তিন দিন। গম্ভীর নয়, বিষণ্ন নয় উদাস নয়, শুধু নির্ব্বাক। বিভূতির মাও নির্ব্বাক হইয়া থাকে, কিন্তু তাকে বড় বেশী গম্ভীর, বিষণ্ন আর উদাস মনে হয়।

বিভূতি বলে, 'কি হয়েছে মা?'

বিভূতির মা বলে, 'কিছু হয় নি।'

বিভূতি পিছন হইতে মাকে জড়াইয়া ধরিয়া কানের কাছে মুখ নিয়া চুপি চুপি বলে, 'শোন, আমার জন্যে ভেবো না। ভয় নেই, আমি আর জেলে যাব না। সে সব ছেলেমানুষী বোকামীর দিন কেটে গেছে।'

তবু বিভূতির মার প্রথমটা মন-মরা ভাব কাটিতে চায় না! বরং বাড়িবার উপক্রম হয়! কারণ, একদিন মহেশ চৌধুরী সোজাসুজি বিভূতির সম্বন্ধে তার সিদ্ধান্তের কথাটা তাকে শুনাইয়া দেয়।

বিভূতির মা প্রথমটা শোনে হাঁ করিয়া, তারপর দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলে, 'বেশতো, তাড়িয়ে দাও।'

'তুমি কি করবে?'

'আমি? গলায় কলসী বেঁধে পুকুরে গিয়ে ডুব দেব।'

'সত্যি? না, তামাসা করছ?'

ছোট ছেলেকে প্রথমভাগ পড়ানোর মত ধৈর্য্যের সঙ্গে বিভূতির মা বলে, 'ছাখো, পষ্ট কথা বলি তোমাকে, শোনো। তুমি না থাকলেও আমার একরকম করে দিন কেটে যাবে, কিন্তু ছেলে ছাড়া আমি বাঁচব না বলে রাখছি।'

মহেশ তা জানিত, এতদিন খেয়াল করে নাই।

'এই কথা ভাবছ বুঝি ক'দিন?' বিভূতির মা জিজ্ঞাসা করে।

মহেশ চৌধুরী নীরবে মাথা হেলাইয়া সায় দেয়।

বিভূতির মা তার মুখের সামনে হাত নাড়িয়া বলে, 'কেন শুনি? কি জন্যে শুনি? ওর কথা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার কি শুনি? ছেলে বড় হয়েছে, বিয়ে-থা' দিয়েছ, তার যা খুসী সে করুক। তোমার তাতে কি? তোমার কাজ তুমি ক'রে যাও, তার কাজ সে করুক—তুমি কেন ওর পেছনে লাগাতে যাবে?'

মহেশ ভাবিতে ভাবিতে বলে, 'নিজের কাজ করার জন্যেই তো ওর পেছনে লাগতে হচ্ছে গো'।

ভাবিতে ভাবিতে মহেশ চৌধুরীর দিন কাটে। মানুষটার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে—সদানন্দের অধঃপতনের আঘাতে অথবা সদানন্দের সম্বন্ধে ভুল করার ধাক্কায়। আর যেন নিজের উপর সে সহজ বিশ্বাস নাই। সমস্ত প্রশ্নই আজকাল ধাঁধাঁর মত মনে হয়। কত সন্দেহই যে মনে জাগে। জীবনের পথে চলিবার জন্য আত্মবিশ্বাসের একটিমাত্র রাজপথ ধরিয়া এতকাল চলিবার পর বুদ্ধিবিবেচনা যেন ক্রমাগত ভিন্ন ভিন্ন পথের অস্তিত্ব দেখাইয়া তার সঙ্গে খেলা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। বিভূতির মার সঙ্গে আলোচনা করার পর একটা যে প্রচণ্ড সংশয় মহেশের মনে জাগে, তার তুলনা নাই। বিভূতির সম্বন্ধে কি করা উচিত স্থির করিয়া ফেলার পর সেটা করা সত্যই উচিত কিনা সে বিষয়ে আরও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি তার মনে আসিয়াছে, প্রথমে যা খেয়ালও হয় নাই। বিভূতির সম্বন্ধে কি করা উচিত জানিয়াও তা না করা এক কথা—নিজের অনেক দুর্ব্বলতার মধ্যে একটির সম্বন্ধে সুনিশ্চিত প্রমাণ হিসাবে গণ্য করা যায় আর দুঃখিত হওয়া চলে। কিন্তু এ তো তা নয়। অনেক বিষয় বিবেচনা না করিয়াই সে যে কি করা উচিত স্থির করিয়া ফেলিয়াছে। তার সমস্ত বিচার বিবেচনাই কি অসম্পূর্ণ, একপেশে? কেবল উপস্থিত প্রমাণ প্রয়োগের উপর নির্ভর করিয়া আদালতের চোখ কাণ বুজিয়া বিচার করার মত নিজের জ্ঞান আর বুদ্ধির উপর নির্ভর করাই কি তার নিরপেক্ষতা? একটা প্রশ্নের সম্বন্ধে কত কথা ভাবিবার থাকে, নিজের ভাবিবার ক্ষমতা দিয়া কি সে প্রশ্নের মীমাংসা করা উচিত, যদি মীমাংসা করার আগেই সমস্ত কথাগুলি ভাবিবার ক্ষমতা না থাকে? চিরজীবন সে কি এমনি ভুল করিয়া আসিয়াছে? মানুষ কি এমনি ভুল করে, পৃথিবীর সব মানুষ?

মিথ্যাকে সত্য বলিয়া জানে আর নূতন জ্ঞানের আলোকে এই ভুলকে আবিষ্কার করে?

এবং হয় তো আবার নূতন জ্ঞানের আলোকে আবিষ্কার করে যে, এই আবিষ্কারটাও মিথ্যা?

সুতরাং বিষম এক জটিল সমস্যা নিয়া মহেশ চৌধুরী বড়ই বিব্রত হইয়া পড়ে। ব্যাপারটা কিন্তু হাস্যকর মোটেই নয়। জগতে এমন কে চিন্তাশীল আছে, এ সমস্যা যাকে পীড়ন না করে? এ সংশয়ের হিমালয় না ডিঙ্গাইলে তো চরম সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না।

[লেখকের মন্তব্য: মহেশ চৌধুরীর আসল সমস্যার কথাটা আমি একটু সহজভাবে পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দিই। বলার প্রয়োজনও আছে। মহেশ চৌধুরীর মনের মধ্যে পাক খাইয়া বেড়াইলে তার মনের অবস্থাটা বুঝা সম্ভব, ধাঁধাঁটা পরিষ্কার হওয়া সম্ভব নয়।

কোন প্রশ্নের বিচারের সময় সেই প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত যুক্তিতর্ক বিবেচনা করা উচিত, এই কথাটা মহেশ চৌধুরীর মনে হইয়াছে। কথাটা গুরুতরও বটে, যুক্তিসঙ্গতও বটে। কিন্তু মুস্কিল এই, কেবল প্রশ্ন নয়, জগতে এমন কি আছে, যার সঙ্গে জগতের অন্য সমস্ত কিছু সংশ্লিষ্ট নয়? অস্তিত্বের অর্থই তাই—সমগ্রতা। বিচ্ছিন্ন কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই। এদিকে মানুষের মস্তিষ্ক এমন যে, সেখানে এক সময় একটির বেশী সমগ্রতার স্থান হয় না—অংশও মস্তিষ্কের পক্ষে সমগ্র। জগতের অসংখ্য আংশিক সমগ্রতাকে ধারাবাহিক ভাবে বিচার করিয়া কোন প্রশ্নের জবাব পাওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। পৃথিবীর সমস্ত দর্শন তাই একটি-মাত্র উপায় অবলম্বন করিয়াছে—আংশিক সমগ্রতার

পরিধি বাড়াইয়া চলা। দু'টি অংশের একত্ব আবিষ্কার করিয়া, দুটি আংশিক সমগ্রতাকে এক করিতে পারিলে জ্ঞানের পথে, চরম বা পরম সত্য আবিষ্কারের পথে, এক পা অগ্রসর হওয়া গেল। আজ পর্য্যন্ত কেউ বিশ্বের সমগ্রতাকে নিজের ব্যক্তিগত একটিমাত্র সমগ্রতায় পরিণত করিতে পারিয়াছে কি না, ভবিষ্যতে কোনদিন পারিবে কি না, জানি না।

তবে, সীমাবদ্ধ জ্ঞান মানুষকে এমনি ভাবে সংগ্রহ করিতে হয়, সঙ্কীর্ণ জীবনের তুচ্ছ সমস্যার বিচারও করিতে হয় এমনি ভাবে। তাছাড়া আর উপায় নাই। জন্ম হইতে সকলে আমরা করিয়াও আসিতেছি তাই। শৈশবেও সমস্যার মীমাংসা করিয়াছি, আজও করিতেছি। তখন যেটুকু জ্ঞান আয়ত্তে ছিল কাজে লাগাইতাম, আজ যেটুকু জ্ঞান আয়ত্তে আছে কাজে লাগাই। তখনকার জ্ঞান হয় তো ছিল মোটে কয়েকটি টুকরা জ্ঞানের যোগফল, আজকের জ্ঞান হয় তো অনেক বেশী টুকরার মিলিত পরিণাম, কিন্তু তখনও যেমন আর টুকরাগুলির জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মাথা ঘামাইতাম না, আজও ঘামাই না। জলের সঙ্গে জল মেশার মত, আলোর সঙ্গে আলো মেশার মত, মিলিত আংশিক জ্ঞানের পার্থক্য ঘুচিয়া গিয়াছে।

সমস্ত মানুষ, মনের মধ্যে কোন প্রশ্ন জাগিলে, সাময়িক যুক্তি বা সত্যোপলব্ধির সম্পত্তি দিয়া তার বিচার করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার জবাবও পায়। জবাব না মানা আর নিজের মনের সঙ্গে লড়াই করা আজ নিজের ভবিষ্যৎ পরিবর্ত্তিত যুক্তি বা সত্যোপলব্ধির কাছে আপীলের ভরসা করা অবশ্য ভিন্ন কথা। তবে সাধারণ আপীলের ফলটাও হয় তো মন মানিতে চায় না—শেষ যুক্তি বা শেষ সত্যের আদালত খুঁজিয়া মরিতে হয়।

সীমাবদ্ধ সংক্ষিপ্ত জ্ঞানের জগতের সমগ্রতার আশীর্ব্বাদ মানুষ ক্রমে ভুলিয়া যাইতেছে। সংশয়-বাদের রোগ ধরিয়াছে মানুষকে। প্রত্যেক প্রশ্নের বিচার করিতে আজ তাকে সেই প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের খোঁজ করিতে হয়। কে জানে এমন একদিন আসিবে কি না, যে দিন কেহ আমার এই উপন্যাসটি পড়িতে বসিয়া প্রথম লাইনটি পড়িয়া ভাবিতে আরম্ভ করিবে, লাইনটির যে অর্থ মনে আসিয়াছে তাই কি ঠিক, অথবা প্রত্যেকটি শব্দের আর প্রত্যেকটি অক্ষরের অর্থ বিশ্লেষণ করিয়া, ব্যাকরণের নিয়মকানুনগুলি ভাল করিয়া ঘাঁটিয়া, শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে আর ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া লাইনটির মানে যাচাই করা উচিত?]

একটি দুপুর তো বিভূতির মাধবীলতার সঙ্গে অপরিসীম আনন্দে কাটিয়া গেল, কিন্তু রাত্রি? পরের দিনের দুপুরটা? তার পরের দিনরাত্রিগুলি? দুপুরটা যেন ছিল মাতালের মাঝরাত্রির মত, শেষ হওয়ার সঙ্গে জীবনের আর কিছুই যেন রহিল না। তারপর কয়েকদিন ধরিয়া মাতলামির ক্ষুধায় ভিতরটা যেন জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু স্নায়বিক বিকারের ভাটিখানায় বড় বেশী খামখেয়ালী চলে।

তাই আর কোন কারণ, কোন তুচ্ছতম নূতন ঘটনা, না ঘটিলেও মাধবীলতার উপর অবিশ্বাসে বিভূতির যেন প্রায় বিশ্বাস জন্মিয়া গেল। অনেক যুক্তিই মনে আসিতে লাগিল, তার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান, সে নিজে অতি অপদার্থ, আকর্ষণহীন, কুৎসিত পুরুষ। কেবল তাকে নিয়া খুসী থাকা মাধবীলতার পক্ষে কি সম্ভব?

হঠাৎ আবার একদিন বিভূতি জেরা আরম্ভ করে, 'কই, সেদিন আশ্রমে গিয়েছিলে কেন, তাতো বললে না?'

মাধবীলতা ভয় পাইয়া বলে, 'বললাম যে?'

'কই বললে?'

'ওই যে সেদিন বললাম।'

'হুঁ' বলিয়া বিভূতি চুপ করিয়া যায়।

গভীর বিতৃষ্ণায় পিছন ফিরিয়া সে শুইয়া থাকে, মাধবীলতা মৃদুস্বরে ডাকিলে বলে বড় ঘুম পাইয়াছে। ঘুম কিন্তু আসে না, মনের অস্বস্তি দেহের একটা অপরিচিত যন্ত্রণার মত তাকে জাগাইয়া রাখে। মনে হয়, ঠিক চামড়ার নীচে সর্ব্বাঙ্গে পেটের অম্বলের জ্বালা যেন ছড়াইয়া গিয়াছে আর বাহিরের গুমোটে তাতিয়া উঠিয়াছে মাথাটা। অথচ এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার, শেষ রাত্রে ঘুমাইয়া পরদিন যখন অনেক বেলায় ঘুম ভাঙ্গে, মনের অবস্থাটা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। পাশে যে অসতী স্ত্রী ছিল গতরাত্রে, অবিশ্বাসের সব কিছু ঝাড়িয়া ফেলিয়া আজ সকালে সে যেন চোখের আড়ালে সংসারের কায করিতে গিয়াছে। আগের রাত্রের ধারণা আজ বিভূতির নিছক ছেলেমানুষী মনে হয়। এমনি তুচ্ছ মনে হয় কথাটা যে, ও বিষয়ে একটু চিন্তা করাটাও তার কাছে পরিশ্রমের অপচয়ের সামিল হইয়া দাঁড়ায়। দুঃস্বপ্ন দেখিয়া যেন বিচলিত

হইয়াছিল, দুঃস্বপ্ন কাটিয়া গিয়াছে। অনুভূতির জগতে যদিবা একটা দুর্বোধ্য আতঙ্কের জের এখনও আছে, পেটে অম্বলের শক্রতা নাই, দেহে টনটনানি নাই, মাথায় গ্রীষ্মবোধও নাই। একটু শুধু ভারি মনে হইতেছে দেহটা। বোধ হয় হৃদয়ের ঈষৎ চাপা-পড়া বেদনাবোধের ভারে।

চা আর খাবার খাইয়া বিভূতি গ্রামের দিকে যায়। শেষ রাত্রে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, আকাশে অল্প অল্প মেঘের জন্য রোদেরও তেমন তেজ নাই। ঘুরিতে ঘুরিতে বিভূতি গিয়া হাজির হয় শ্রীধরের দোকানে। দোকানের সামনে কাঠের বেঞ্চে বসিয়া কয়েকজন ফিস্‌ফাস্ করিতেছিল, বিভূতিকে দেখিয়া তারা অপরাধীর মত চুপ করিয়া যায়।

শ্রীধর অভ্যর্থনা জানাইয়া বলে, 'আসেন। বসেন। বিড়ি খান?' বিভূতি বসে কতকটা উদাসভাবেই, মাথা নাড়িয়া বলে, 'বিড়িতো আমি খাই না।'

শ্রীধর সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়া বলে, 'ঠিক বটে, সহরে ছিলেন এতকাল, আপনারা খান সিগারেট। তাতো নেই দাদাবাবু!' তারপর কোথা হইতে কি করিয়া শ্রীধর যে মারাত্মক গাম্ভীর্য্য মুখে টানিয়া আনে, সেই জানে, একটা অদ্ভুত আপশোষের শব্দ করিয়া বলে, 'সহর ভাল। জানেন দাদাবাবু, মোদের এসব লক্ষ্মীছাড়া গাঁয়ের চেয়ে সহর ঢের ঢের ভাল। বৌঝি নিয়ে নিভ্‌ভাবনায় ঘর তো করা চলে—ঘরের বৌঝিকে তো কেউ জোর করে ধ'রে নিয়ে যায় না।'

যারা ফিস্‌ফাস্ করিতেছিল, তারা সকলে একবাক্যে সায় দেয়। একজন, রামলোচন দে, কাঁচাপাকা চুলের বাবরিতে ঝাঁকি দিয়া বলে, 'আপনি তো ব'লে খালাস দাদাবাবু, মরি যে আমরা। হুঁ, নিজের দোষে মরি তো বটে, উপায় কি বলেন?'

ক্রমে ক্রমে নানারকম আপশোষমূলক মন্তব্য ও প্রশ্নের বাধা ডিঙ্গাইয়া আসল ব্যাপারটা বিভূতির বোধগম্য হয়। কারও বৌঝি কেউ সম্প্রতি হরণ করে নাই, যদিও কিছুকাল আগে এরকম একটা ব্যাপার এই গ্রামেই ঘটিয়া গিয়াছে। সকলের বর্ত্তমান রাগ দুঃখ আর আপশোষের কারণটা এই। নন্দনপুরের ভদ্রলোকেরা গ্রামে গ্রামে চাঁদা তুলিয়া পাকা নাট-মন্দিরের অভাব মিটানর জন্য খড়ের একটা চালা তুলিয়াছে। তার নীচে নানা উপলক্ষে, মাঝে মাঝে বিনা উপলক্ষেও, যাত্রাগান, কীর্ত্তনগান প্রভৃতি হয়। খড়ের নাটমন্দিরটিতে স্থান একটু কম, তবে সাধারণ অনুষ্ঠানের সময় সেই স্থানও সবটা ভরে না। মুস্কিল হয় ভাল দলের যাত্রা বা নাম-করা কীর্ত্তনীয়ার কীর্ত্তন বা ঐরকম কোন প্রোগ্রাম থাকিলে, যার আকর্ষণ আছে! তখন চালার নীচে অর্দ্ধেক লোকের বসিবার স্থান হয় না, ভিড়ের বাহিরে দাঁড়াইয়া শুনিতে হয়। তাতেও কোন আপত্তি ছিল না, যদি ওগ্রামের ভদ্রলোকেরা এগ্রামের ভদ্রলোকদের মাঝে মাঝে সামনে গিয়া বসিতে দিত।

'যায়গা থাকলেও বসতে দেয় না দাদাবাবু। এগিয়ে গিয়ে বসতে গেলে ঠেলে পিছনে হটিয়ে দেয়। কেন আমরা সতরঞ্চিতে বসতে পারি না সামনের দিকে? চাঁদা দিই না আমরা? ওকি তোদের বাপের সম্পত্তি যে, শুধু গাঁয়ের বাবুদের জন্যে বেদখল করে রাখিস?'

আগের দিন শ্রীধর, রামলোচন এবং আরও অনেকে যাত্রা শুনিতে গিয়াছিল। সামনের দিকে অনেকটা যায়গা খালি পড়িয়া আছে দেখিয়া যেই বসিতে গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে গলাধাক্কা। কে একজন শ্রীধরের পিঠে সত্যই একটা ধাক্কা দিয়াছিল এবং আরেকজন রামলোচনের বাবরি ধরিয়া দিয়াছিল টান।

'শেষে ভিড়ের পিছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাত্রা শুনি।'

বিভূতি আশ্চর্য্য হইয়া বলে, 'তারপরেও যাত্রা শুনলে?'

'শুনব না? চাঁদা দিই নি আমরা?'

বিভূতি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া সকলের মন্তব্য শুনিয়া যায়, তারপর জিজ্ঞাসা করে, 'ওরা কি বলল, যারা তোমাদের ঠেলে সরিয়ে দিলে?'

জবাব দিল শ্রীধর। 'কি আর বলবে দাদাবাবু, বলল, পিছন দিকে তোমাদের জন্যে বসবার যায়গা থাকে, আগে এসে বসতে পার না?'

'একটা দিন হয়তো বিশেষ কারণে—'

'একটা দিন? প্রত্যেক বার এমনি হচ্ছে, একটা দিন কি দাদাবাবু! মোদের গাঁয়ের কেউ সামনে গিয়ে বসতে চায় না।'

এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে বিভূতির সাধ যায় না। মনে হয়, প্রতিবাদ করার মত ব্যাপারও এটা নয়। যাত্রা শুনিতে গিয়া গ্রামের কয়েকজন

বসিবার স্থান পায় নাই বলিয়া কি বিচলিত হওয়া চলে? তবু বসিবার স্থানের উপর এ গ্রামের লোকেরও অধিকার আছে, স্থান থাকিলেও যদি তাদের বসিতে দেওয়া না হয়, সেটা অন্যায়। অন্যায়ের প্রতিকার করা কর্তব্য। নিজের চোখে দেখিয়া ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিবার উদ্দেশ্যে বিভূতি বলে, 'সামনের জন্মাষ্টমীতে যাত্রাটাত্রা হবে না?'

শ্রীধর বলে, 'তিন রাত্তির হবে, অনেক মজা আছে দাদাবাবু।'

বিভূতি বলে, 'তোমরা সবাই আমার সঙ্গে যেও, দেখি কেমন বসতে না দেয়।'

একজন একটু সংশয় ভরে জিজ্ঞাসা করে, 'কি করবেন?'

বিভূতি হঠাৎ রাগিয়া উঠিয়া বলে, 'আমি একা কি করব? তোমরা সবাই করবে—যায়গা থাকলে সেখানে বসে পড়বে। আবার কি?'

আঠারো

নেতা হওয়া যে এত সহজ আর নেতৃত্ব করা এমন কঠিন, বিভূতি তা জানিত না। এবার সে ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে। শ্রীধরের দোকানে বসিয়া মাত্র কয়েকজনের কাছে সে আবেগের সঙ্গে ঘোষণা করিয়াছিল যে, নন্দনপুরের যাত্রার আসরে সামনে বসিবার অধিকার সে তাদের আদায় করিয়া দিবে। জন্মাষ্টমীর দিন দেখা গেল নানা বয়সের প্রায় দেড়শ' মানুষ তার এই অধিকার আদায়ের অভিযানে যোগ দিয়াছে। শ্রীধর বা রামলোচনের মত যারা অন্তত ফতুয়া গায়ে দিয়া যাত্রা শুনিতে যায়, এদের অধিকাংশই সমাজের সে স্তরের মানুষও নয়। এরা যাত্রা শুনিতে যায় গামছা কাঁধে, আসরে সামনের দিকে ভদ্রলোকদের মাঝে বসিতে পাইলে বোধ হয় রীতিমত অস্বস্তিই বোধ করে। শ্রীধর, রামলোচন প্রভৃতির মত চাঁদা দিয়াও সামনে বসিতে না পাওয়ার অপমানে এরা ক্ষুব্ধ হয় নাই। চাঁদাই বা এদের মধ্যে ক'জন দিয়াছে কে জানে! কোথা হইতে দিবে? খাজনা দিতে যাদের অনেকের ঘটিবাটি বাঁধা দিতে হয়, চাঁদা দেওয়ার বিলাসিতা তাদের কাছে প্রশ্রয় পায় না।

তবু তার নেতৃত্বে যাত্রার আসর আক্রমণের জন্য সকলে যেন উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। নন্দনপুরের স্থায়ী আটচালার নীচে সর্ব্বসাধারণের যাত্রার আসর। চাঁদা দিক বা না দিক, গায়ে ফতুয়া থাক বা না থাক, এদের সকলেরই অবশ্য সে আসরে সামনে বসিবার অধিকার আছে। কিন্তু এরা কি তাই চায়? সেইজন্যই কি এরা সকলে জড়ো হইয়াছে? বাঁচিবার অধিকার সম্বন্ধে মাঝে-মাঝে এদের সে যেসব কথা বলিয়াছে, এ কি তারই প্রতিক্রিয়া?

এই প্রশ্ন বিভূতিকে পীড়ন করিতে থাকে। তার বক্তৃতা আর উপদেশ এতগুলি মানুষের মধ্যে সাড়া জাগাইয়াছে, একথা বিশ্বাস করিতে ভাল লাগে কিন্তু নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। গ্রামের সঙ্গে গ্রামের প্রতিযোগিতা থাকে, মনোমালিন্য থাকে—এক গ্রাম অন্য গ্রামকে অনায়াসে হিংসা করে। কে জানে এরা নন্দনপুরের অধিবাসীদের একটু জব্দ করিতে চলিয়াছে কি না? শ্রীধর, রামলোচন আর অন্যান্য কয়েকজন ফতুয়াধারী হয়তো নিজেদের কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এই সব অশিক্ষিত সরল মানুষগুলিকে ক্ষেপাইয়া দিয়াছে। যাত্রার আসরে হয়তো আজ একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটিয়া যাইবে।

কিন্তু এখন আর পিছাইবার উপায় নাই, মরিয়া গেলেও না। বিভূতি বার বার সকলকে আসল কথাটা বুঝাইয়া দেয়। গালাগালি হাতাহাতি চলিবে না। ধীর স্থির শান্তভাবে সকলে সামনের দিকে গিয়া জাঁকিয়া বসিয়া পড়িবে, কিছুতেই আর সেখান হইতে উঠিবে না।

একজন প্রশ্ন করে, 'ওরা যদি গাল দেয়, অপমান করে? যদি মারে?' বিভূতি জবাব দেয়, 'তবু চুপ করে বসে থাকবে, কথাটি কইবে না। আমাদের ভদ্র ব্যবহারে ওরাই লজ্জা পাবে। ওরা যদি ছোটলোকমি করে, আমরা কেন ছোটলোক হতে যাব?'

বিভূতি ইচ্ছা করিয়াই সকলকে সঙ্গে নিয়া যাত্রা আরম্ভ হওয়ার অনেক আগে আসরে গিয়া হাজির হইল। মানুষ তখন জমা হইয়াছে অনেক তবে বসিবার স্থানও যথেষ্ট ছিল। সামনের বিশেষ স্থানগুলি রাখা হইয়াছিল বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের জন্য। সকলে দল বাঁধিয়া সেই স্থানগুলি দখল করিয়া বসিবার উপক্রম করিবামাত্র কয়েকজন ভলান্টিয়ার আসিয়া প্রতিবাদ করিল। বিভূতি

যেখানে খুসী বসুক, বিভূতির দু'একজন বন্ধু-বান্ধবও বসুক, কিন্তু সকলে বসিলে চলিবে কেন।

বিভূতি খুব অহিংসভাবেই জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন চলবে না? এরা সকলেই আমার বন্ধু।'

একজন ভলান্টিয়ার, বয়স তার আঠার উনিশের বেশী হইবে না, একগাল হাসিয়া বলিল, 'আর আমরা বুঝি আপনার শত্রু?'

'না, তা বলছি না—'

একজন তিন চার হাত তফাৎ হইতে বিভূতির মুখগহ্বরটিকে পিকদানি হিসাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করিয়াছে। মুখ ভাসাইয়া পানের পিক বুকে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল, বিভূতি মুছিবার চেষ্টাও করিল না। এক লাফে সামনে আগাইয়া গিয়া এক হাতে অপরাধীর গলাটা টিপিয়া ধরিয়া অন্যহাতে তাকে মারিতে লাগিল কিল চড় ঘুষি। আরেকজন চট করিয়া বসিয়া পড়িয়া পিছন হইতে বিভূতির পা ধরিয়া মারিল এক হ্যাঁচকা টান, বিভূতি মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল।

একজন চীৎকার করিয়া উঠিল 'মার শালাদের।'

অনেকের মুখে প্রতিধ্বনি শোনা গেল: 'মার! মার! মার!'

অধিকাংশ লোক যেন দাঙ্গার জন্যই প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল, দেখিতে দেখিতে এমন দাঙ্গা বাধিয়া গেল বলিবার নয়। কোথা হইতে যে এত লাঠি ইঁট পাটকেল আসিয়া জুটিল! কয়েকটা মাথা ফাটিয়া গেল, অন্যভাবে আহত হইল অনেকে। হৈ হৈ রৈ রৈ হল্লা, ছুটাছুটি, মারামারি—এক গ্রামের লোক যে ভাবে পারিতেছে অন্য গ্রামের লোককে আঘাত করিতেছে। নিয়ম নাই, শৃঙ্খলা নাই, ভাল করিয়া দল বাঁধিয়া দাঙ্গা করিবার মত কাণ্ডজ্ঞান পর্য্যন্ত কারও নাই। একজন হয়তো পেছন হইতে অন্য একজনের মাথায় লাঠি মারিবার আয়োজন করিয়াছে, এমন সময় তৃতীয় একব্যক্তি লোহার একটা মুখ-সরু শিক তার পিঠের মধ্যে ঢুকাইয়া দিল। এ ধরণের অস্ত্রও কেউ কেউ দু'একটা সঙ্গে আনিয়াছিল। কেবল আজ নয়, আগের দু'দিনও আনিয়াছিল। মারামারিটা যে আজ হঠাৎ লাগে নাই, এ তার একটা মস্ত বড় প্রমাণ।

শেষ পর্য্যন্ত বিভূতির স্থাপিত ব্যায়াম-সমিতি-গুলির সদস্যেরা আসিয়া সেদিনকার মত সেখানকার হাঙ্গামাটা থামাইয়া দিল। মারামারিটা হইতেছিল এক গ্রামের লোকের সঙ্গে আরেক গ্রামের লোকের এবং বিভূতি ব্যায়াম-সমিতি স্থাপন করিয়াছিল এক এক গ্রামে একটা করিয়া। কিন্তু এমনই আশ্চর্য্য ব্যাপার, মারামারিটা বন্ধ করিল ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের ব্যায়াম-সমিতিগুলির সদস্যেরা একসঙ্গে মিলিয়া। অধিকাংশই মাথা-গরম যুবক, কিন্তু তাদের মধ্যে এমন ঘোরতর মিল দেখা গেল, ঠাণ্ডামাথা বুড়োদের মধ্যে যা সম্ভব হয় না।

আহত বিভূতিকে তারা গরুর গাড়ীতে বাড়ী পাঠাইয়া দিল। বিভূতির আঘাত বিশেষ গুরুতর নয়, অন্ততঃ দেহের আঘাত নয়। অন্যান্য যারা আহত হইয়াছিল, তাদের কয়েকজনকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হইল, কিন্তু অধিকাংশ আহত মানুষ যে কোথায় উধাও হইয়া গেল, তার আর কোন পাত্তাই মিলিল না।

মারামারি কিন্তু সেইখানে শেষ হইল না।

এক গ্রামের কয়েকজন অন্য গ্রামের একজনকে একা পাইলে ধরিয়া পিটাইয়া দিতে লাগিল। মারামারির পরদিন সকালে নন্দনপুরে গিয়া মহেশ চৌধুরী মার খাইয়া অজ্ঞান হইয়া গেল। মাথাটা তার ফাটিয়া গেল এবং দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল কয়েকটা।

বিভূতি আহত অবস্থায় বাড়ী ফিরিলে মহেশ চৌধুরী জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'তুমি গিয়ে দাঙ্গা করে এসেছ?'

বিভূতি বলিয়াছিল, 'না। যাতে দাঙ্গা না বাধে তার চেষ্টা করেছিলাম।' কথাটা মহেশ বিশ্বাস করে নাই, কিন্তু তখনকার মত কিছু আর বলেও নাই। পরদিন সকাল হইতে আসল ব্যাপারটা জানিবার জন্য নিজে ছুটিয়া গিয়াছিল। কিন্তু খোঁজখবর নেওয়ার সুযোগটাও সে পায় নাই। তাকে দেখিয়াই নন্দনপুরের জনপাঁচেক বদমেজাজী মানুষ বলিয়াছিল 'বিভূতির বাপ ব্যাটা এসেছে রে!'

বলিয়াই তাকে পিটাইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

অনেক বেলায় খবর পাইয়া বিভূতি তাকে আনিতে গেল। বাপের অবস্থা দেখিয়া মুখ তার অন্ধকার হইয়া গেল। যাদের সে যাচিয়া আগের দিন যাত্রার আসরে সঙ্গে নিয়া গিয়াছিল, মারা-মারির জন্য তাদের উপরেও তার বিরক্তির এতক্ষণ সীমা ছিল না। এরকম একটা কুৎসিত কাণ্ড ঘটার জন্য মনে মনে তার বড়ই খারাপ লাগিতে-ছিল। সে ভাবিতেছিল, এই রকম বর্ব্বর যদি

তার দেশের মানুষ হয়, আর এই রকম কারণে অকারণে পরস্পরকে হিংসা করে আর পরস্পরের সঙ্গে কলহ বাধায়, দেশের তবে হইবে কি? আজ আহত বাপকে দেখিয়া সর্ব্বাগ্রে তার মনে হইল, যারা তার বাপকে এভাবে মারিয়াছে, তাদের কিছু উত্তম মধ্যম না দিলে জীবন ধারণ করাই বৃথা।

কিন্তু কে যে মহেশ চৌধুরীকে মারিয়াছে, কেউ তা জানে না। অত সকাল আটচালার দিকে বড় কেউ যায় নাই। একটু বেলায় মহেশকে রাস্তায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া গ্রামে একটা গোলমাল বাধিয়া যায়। তখন নন্দনপুর ব্যায়াম-সমিতির সদস্যেরা তাকে সযত্নে তুলিয়া আনিয়া সেবাযত্নের ব্যবস্থা করিয়াছে।

ডাক্তার দেখাইয়া পাল্কিতে করিয়া মহেশকে বাড়ী নিয়ে যাওয়া হইল। সারাদিন সারারাত বিভূতি মহেশের শিয়রে বসিয়া রহিল, বিভূতি মহেশের শিয়রে বসিয়া রহিল, বিভূতির মা বসিয়া রহিল পায়ের কাছে। মাধবীলতাও ওই রকম ভাবেই রাতটা কাটাইবার আয়োজন করিয়াছিল, বিভূতির জন্য পারিয়া উঠিল না। মাঝরাত্রে বিভূতি তাকে এমন একটা অপমানজনক ধমক দিয়া ন্যাকামি করিতে বারণ করিয়া দিল যে, কাঁদিয়া ফেলিয়া মাধবীলতা উঠিয়া গেল।

মহেশ চৌধুরীর জ্ঞান ফিরিল পরদিন সকালে।

উদ্‌ভ্রান্ত ভাবটা একটু কটিয়া আসিলে বিভূতি মৃদুস্বরে তাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমায় কে মেরেছে বাবা?'

মহেশ চৌধুরী বলিল, 'একজনে কি মেরেছে—চার পাঁচজনে।'

'কেন মারল?'

'তোমার জন্যে। পাপ করলে তুমি, তোমার বাপ বলে আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করলাম।'

উত্তেজিত হওয়ার ফলে হঠাৎ ব্যথায় মহেশ একটু কাতর হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ সকলে চুপচাপ।

'তুমি আমার বাবা ব'লে তোমায় মারল? কে কে মারল?'

মহেশ চৌধুরী চোখ বুজিয়া বলিতে লাগিল, 'ওরা সবাই ভাল লোক, অকারণে কখনো মারতো না। যোগেন, দীনু, কালীপদ, রমানাথ আর নগেনের সেজমামা ছিল,—কি যেন নাম লোকটার? আমি তো ওদের কোন দিন ক্ষতি করিনি, মিছিমিছি কেন ওরা আমায় দেখামাত্র পিটতে আরম্ভ করবে?'

নড়িতে গিয়া মৃদু একটা আর্ত্তনাদ করিয়া মহেশ চৌধুরী চুপ করিয়া গেল।

বিভূতি দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া বলিল, 'আমি যদি ওদের তোমার মত অবস্থা না করি, তোমার ব্যাটা নই আমি।'

কাতরাইতে কাতরাইতে চোখ মেলিয়া মহেশ চৌধুরী বলিল, 'তুমি যদি আবার ওদের পিছনে লাগতে যাও, তোমায় আমি জন্মের মত ত্যাগ করবো বলে রাখছি।'

'তা তুমি ত্যাগ করো। তাই বলে ঘাড় গুঁজে এ অন্যায় সহ্য করা—'

'কিসের অন্যায়? যদি করেই থাকে অন্যায়, তোর কি? মেরেছে আমাকে, তোমাকে তো মারেনি, তোমার মাথা ঘামাবার দরকার?'

'বাঃ, বেশ!' বলিয়া বিভূতি খানিকটা হতভম্বের মতই বসিয়া রহিল। মহেশ চৌধুরী বলিতে লাগিল, 'তুমি ওদের পেছনে লাগবে, বদনাম রটবে আমার। সবাই বলবে আমি তোমায় দিয়ে ওদের মারিয়েছি।'

বিভূতি বলিল, 'তুমি এমন কাপুরুষ!'

'কাপুরুষ?'

'নয় তো কি? লোকে নিন্দে করবে ভয়ে মুখ বুজে এতবড় অন্যায় সহ্য করে যাবে? লোকের নিন্দা প্রশংসা দিয়ে তোমার নীতি ঠিক হয় আর কিছু নেই তার পেছনে?'

বিভূতির মা ব্যাকুলভাবে বলিল, 'চুপ কর না বিভূতি? কি যে তোরা আরম্ভ করেছিস?'

বিভূতি কথাটা গ্রাহ্য করিল না, চুপচাপ একটু ভাবিয়া বলিল, 'নিন্দা প্রশংসা তো আমারও আছে। আমার বাপকে ধরে পিটিয়ে দিল, আমি যদি চুপ করে থাকি, লোক আমায় অপদার্থ বলবে। ভীরু কাপুরুষ বলবে।'

মহেশ সভয়ে বলিল, 'কি করবি তুই?'

বিভূতি বলিল, 'ওদের বুঝিয়ে দেব, মারতে কেবল ওরা একাই জানে না।'

'তাতে লাভ কি হবে?'

'ভবিষ্যতে আর এরকম করবে না।'

'আরও বেশী ক'রে করবে। তার চেয়ে সেরে উঠে আমি যদি গিয়ে হাসিমুখে এদের সঙ্গে কথা বলি, ভাই বলে জড়িয়ে ধরি, ওরা কিরকম লজ্জা পাবে বল তো?'

'ছাই পাবে। ভাববে, আবার মার খাবার ভয়ে খাতির করছ।'

মহেশ শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, আর তার তর্ক করার ক্ষমতা ছিল না। তখনকার মত সে চুপ করিয়া গেল। কিন্তু বিভূতি উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই আবার তাকে ডাকিয়া বসাইয়া বুঝাইবার চেষ্টা আরম্ভ করিয়া দিল। রাগ করিয়া, মিষ্টি কথা বলিয়া, মিনতি করিয়া, কতভাবেই যে সে বিভূতিকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করিল। যতই সে কথা বলিতে লাগিল, বিভূতির কাছে ততই স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল তার ভয়ের পরিচয়—মার খাইয়া মহেশ চৌধুরী মার ফিরাইয়া দিয়াছে, মানুষের কাছে এই রকম অসভ্য বর্ব্বররূপে পরিগণিত হওয়ার ভয়। মহেশ চৌধুরীকে এমন দুর্ব্বল বিভূতি আর কখনো দেখে নাই। শেষে বিরক্ত হইয়া সে বলিল, 'আচ্ছা সে দেখা যাবে।' বলিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

নিজের ঘরে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িয়া সে ভাবিতে লাগিল। হাতাহাতি মারামারি সে নিজেও কোন দিন পছন্দ করে না, ও সমস্ত সত্যই নীচতা। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই কি তাই? মহেশ চৌধুরী কোন অপরাধ করে নাই, কেবল তার বাবা বলিয়া তাকে যারা মারিয়াছে, উদারভাবে তাদের ক্ষমা করাটা কি উচিত? তাকে কি উদারতা বলে? তার চেয়ে ছোটলোকের মত ওদের ধরিয়া কিছু উত্তম মধ্যম লাগাইয়া দেওয়াই কি মহত্ত্বের পরিচয় নয়, মনুষ্যত্বের প্রমাণ নয়? ভাবিতে ভাবিতে বিভূতি বুঝিতে পারিল, মাধবীলতা ঘরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গত রাত্রে মাধবীলতাকে বিশ্রী ধমক দিয়া কাঁদানোর কথাটা মনে পড়ায়, ভাব করার উদ্দেশ্যে হঠাৎ সে মাধবীলতার কাছে পরামর্শ চাহিয়া বসিল।

মাধবীলতা চোখ বড় বড় করিয়া বলিল, 'ওদের মেরে ফেলা উচিত, খুন করে ফেলা উচিত।'

বিভূতি হাসিয়া বলিল, 'সত্যি? কিন্তু ওরা যদি আমায় মেরে ফেলে?'

বিভূতি হাত বাড়াইয়া দিতে মাধবীলতা তার বুকের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল। এতক্ষণ যেন অধীর আগ্রহে সে এই জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল। বিকারের সঙ্গে ভালবাসার তীব্রতা বাড়িয়া গিয়াছে। বিকার ছাড়া স্বাভাবিক মায়ামমতা জোরালো হয় না। এক রাত্রির অভিমান-সংক্ষুব্ধ বিরহ মাধবীলতাকে অধীর করিয়া দিয়াছে।

হাঙ্গামার ফলে নন্দনপুরে যাত্রা আর কীর্ত্তন বন্ধ হইয়া গেল, সেই যাত্রা আর কীর্ত্তন প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইল আশ্রমে। বুদ্ধিটা মাথায় আসিল কয়েকটি গ্রামের মাতব্বরদের। তারা ভাবিয়া দেখিল, আশ্রমে সব গ্রামের লোকের সমান অধিকার, সেখানে বিশেষ সুবিধাও কেউ দাবী করিতে পারিবে না, বদমাইসী করিয়া গোলমাল সৃষ্টি করার সাহসও কারও হইবে না। যেদিন সকালে মহেশ চৌধুরীর জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, সেই-দিন দুপুরে আরম্ভ হইল শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা কীর্ত্তন। রাত্রি আটটা ন'টার সময় যাত্রাভিনয় আরম্ভ হইবে এবং সমস্ত রাত চলিবে।

বিভূতি যখন দল বাঁধিয়া বাপের প্রহারকারীদের খোঁজে বাহির হইল, তখন পুরা দমে কীর্ত্তন চলিতেছে। বাছা বাছা কয়েকজন ভক্তকে সঙ্গে করিয়া পাঁচটি অপরাধীর খোঁজ করিতে গিয়া বিভূতি শুনিল, তারা সকলে কীর্ত্তন শুনিতে গিয়াছে। বিভূতি তখন সোজা আশ্রমে চলিয়া গেল।

আসর লোকে ভরিয়া গিয়াছে। কীর্ত্তনের দলটি নামকরা, প্রধান কীর্ত্তনীয়ার গলাটি মধুর আর আবেগ রোমাঞ্চকর—শ্রীকৃষ্ণ কেন জন্মিবেন, যুগে যুগে তপস্যা করিয়া যোগী-ঋষিরা যার হদিশ পায় না, তিনি কেন নিজে মানুষের মধ্যে মানুষের রূপ ধরিয়া আসিবেন, এই কথাটা সুর করিয়া বুঝাইয়া বলিতে বলিতেই সে সকলকে একেবারে মাতাইয়া দিয়াছে, গদগদ করিয়া তুলিয়াছে। কয়েকজনের চোখে জলও দেখা দিয়াছে।

সদানন্দের কিছু তফাতে অপরাধী পাঁচজন বসিয়া ছিল। মনে তাদের একটু ভয় ঢুকিয়াছে, মহেশ চৌধুরী যদি মরিয়া যায়! কাছাকাছিই বসিয়া চুপি চুপি ইঙ্গিতে তারা এ বিষয়ে প্রথমে একটু আলাপ করিয়াছিল, তারপর চুপ করিয়া কীর্ত্তন শুনিতেছে। দলবল সহ আসিয়া বিভূতি যখন আসরের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া তাদের খোঁজেই চারিদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছে, তার উপর পাঁচজনেরই নজর পড়িল।

পাঁচজনকে দেখিয়া বিভূতি সঙ্গীদের বলিল, 'ওই যে ওরা।'

সঙ্গীদের একজন একটু দ্বিধাভরে বলিল, 'এত লোকের মাঝখান থেকে টেনে আনা কি উচিত হবে?'

বিভূতি বলিল, 'প্রথমে ডাকব, যদি আসে ভালই। না এলে ঘাড় ধরে টেনে আনতেই হবে। শাস্তিটা সকলের সামনেই দিতে হবে।'

ইতিমধ্যে সদানন্দ বিভূতিকে ডাকিতে লোক পাঠাইয়া দিয়াছে—মহেশের খবর জানিবে। বিভূতিকে আশ্রমে দেখিয়া সদানন্দ সত্যই খুসী হইয়াছিল। বিভূতি মুখ তুলিয়া তার দিকে চাইতে সে একটু হাসিল। বিভূতি হাসিল না, হাসিবার মত মনের অবস্থা তার তখন নয়, শুধু মাথা একটু কাত করিয়া হাসির জবাব দিল।

লোকটিকে বলিল, 'বলগে, াকটু কাজ সেরে আসছি।'

পূর্ণেন্দু নামে একটি যুবককে বিভূতি অপরাধী পাঁচজনের কাছে পাঠাইয়া দিল। পূর্ণেন্দু গিয়া বলিল, 'মহেশবাবুর ছেলে বিভূতিবাবু আপনাদের একটু বাইরে ডাকছেন—বিশেষ দরকার।'

যোগেন ভড়কাইয়া গিয়া বলিল, 'আমাদের ডাকছে? কেন ডাকছে।'

'দরকার আছে. আসুন।'

'আমাদের ডাকছে? আমাদের কাদের?'

পূর্ণেন্দু একে একে আঙুল দিয়া পাঁচজনকে দেখাইয়া দিল, 'আপনাকে—আপনাকে—আপনাকে—আপনাকে—আপনাকে।'

পাঁচজনেই ভড়কাইয়া গেল। আসর ছাড়িয়া কি যাওয়া যায়? দরকার থাকিলে বিভূতি আসুক না?

'চৌধুরী মশায় কেমন আছেন জানো?'

পূর্ণেন্দু বলিল, 'ভাল নয়।'

শুনিয়া পাঁচজনে আরও ভড়কাইয়া গেল। এবং আরও স্পষ্টভাবেই জানাইয়া দিল যে, কীর্ত্তন যখন চলিতেছে, আসর ছাড়িয়া যাওয়া কোনমতেই সঙ্গত হইবে না। আশে পাশের দু'একজন এতক্ষণে গোলমালের জন্য অসহিষ্ণু হইয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। পূর্ণেন্দু উঠিয়া গেল।

তারপর ঘটিল অতি খাপছাড়া নাটকীয় ব্যাপার। লোকজনকে ঠেলিয়া সরাইয়া বিভূতি আর তার সঙ্গীরা অপরাধী পাঁচজনের কাছে আগাইয়া গেল। চার পাঁচজনে মিলিয়া এক একজনকে ধরিয়া হ্যাঁচকা টান মারিয়া দাঁড় করাইয়া দিল। পাঁচজনের মুখ তখন পাংশু হইয়া গিয়াছে। কীর্ত্তন বন্ধ হইয়া গেল, সকলে অবাক হইয়া ব্যাপার দেখিতে লাগিল।

বিভূতি সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'এই পাঁচটি গুণ্ডা মিলে কাল সকালে আমার বাপকে বিনা দোষে মেরে প্রায় খুন করে ফেলেছে। আজ সকাল পর্য্যন্ত বাবা অজ্ঞান হয়ে ছিলেন। আপনাদের সকলের সামনে আমি এদের শাস্তির বিধান করছি, চেয়ে দেখুন।' বলিয়া একদিন সদানন্দের মুখে যেরকম ঘুষি লাগাইয়াছিল, কালীপদর মুখে সেইরকম একটা ঘুষি বসাইয়া দিল। তারপর সকলে মিলিয়া পাঁচজনকে মারিতে আরম্ভ করিল। আরম্ভ করিল বটে, কিন্তু মারটা তেমন জমিল না। ভয়ে যারা আধমরা হইয়া গিয়াছে, চোখ বুজিয়া গোঙাইতে আরম্ভ করিয়াছে, হাত তুলিয়া একটা আঘাত ফিরাইয়া দিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত যাদের নাই, একতরফা তাদের কাঁহাতক পিটানো যায়? এমনি মারিতে হাত উঠিতেছে না দেখিয়া, বিভূতি একজনের একটা ছড়ি কুড়াইয়া নিল, তারপর সেই ছড়ি দিয়া পাঁচজনকে মারিতে আরম্ভ করিল।

এতক্ষণে চারিদিকে হৈ চৈ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। মারের ভয়ে আশেপাশের সকলে তফাতে সরিয়া গিয়াছে এবং সেখানে নিরাপদে দাঁড়াইয়া চিল্লাইতেছে। সদানন্দই বোধ হয় সকলের আগে তাদের কাছে আগাইয়া আসিল। সদানন্দকে আগাইতে দেখিয়া তখন অগ্রসর হইল আশ্রমের অধিবাসীরা।

সদানন্দ বিভূতিকে ধরায় বিভূতি তাকে ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া সরাইয়া দিল। তখন সকলের দিকে চাহিয়া বজ্রকণ্ঠে সদানন্দ বলিতে লাগিল, 'আমার আশ্রমে এসে একজন গুণ্ডা গুণ্ডামি করছে, আমায় অপমান করছে, তোমরা চুপ করে দাঁড়িয়ে তাই দেখছ? আমাকে মারল, এ অপমান তোমাদের সহ্য হচ্ছে? আমার যদি একজন ভক্ত এখানে থাকে—'

উত্তেজনা অনেকের মধ্যেই সঞ্চারিত হইয়াছিল, তার উপর সদানন্দের অনুপ্রেরণা। একটা গর্জ্জনের মত আওয়াজ উঠিয়া এলোমেলো গোলমালটা একেবারে ঢাকিয়া দিল। শ'চারেক লোক আগাইয়া গেল বিভূতি আর তার সঙ্গীদের দিকে। বিভূতিরা দলে যে বিশেষ ভারি নয়, সেটা টের পাইয়া সকলের মধ্যেই অনেকটা সাহসের সঞ্চার হইয়াছিল। বাকী পাঁচ শ' ছ'শ লোকের মধ্যে তিন চার শ' স্ত্রীলোক আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, বাকী সকলে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল মজা।

মাঝে মাঝে শোনা যাইতে লাগিল: 'মার শালাদের।' এই মহামন্ত্র উচ্চারণ না করিয়া

বাঙ্গালী দাঙ্গাহাঙ্গামা মারামারি আরম্ভ করিতে পারে না।

জনতা যখন আক্রমণ করে, তখন দেরী হয় শুধু আরম্ভ করিতে, একজন যতক্ষণ আসল ব্যাপারটা হাতেনাতে সুরু করিয়া না দেয়, ততক্ষণ চলিতে থাকে শুধু হৈ চৈ আস্ফালন। তবে এরকম অবস্থায় আরম্ভ হইতেও যে খুব বেশী দেরী হয় তা নয়,—দু'এক মিনিটের মধ্যেই কারোর না কারোর উত্তেজনা চরমে উঠিয়া যায়। ব্যাপার যে কি রকম গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, বিভূতি আর তার সঙ্গীরা ভাল করিয়াই টের পাইয়াছিল। সকলে মিলিয়া আরম্ভ করিলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাদের ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিবে। কিন্তু এখন আর উপায় কি? পালানোর চেষ্টা করিলে কয়েকজন বাঁচিয়া যাইতে পারে, কিন্তু পালানোর চেষ্টা তো আর করা চলে না। তার চেয়ে উন্মত্ত জনতার হাতে মরাই ভাল।

পালানোর চেষ্টা করা চলে না কেন? বিভূতির ভক্তেরা সকলে কি মনে করিবে! মানুষের নিন্দা প্রশংসা সম্বন্ধে মহেশ চৌধুরীর দুর্ব্বলতা দেখিয়া সেদিন সকালে বিভূতির লজ্জা আর দুঃখ হইয়াছিল, এখন সে চোখের পলকে বুঝিতে পারে, অনুগত যুবক-সমাজের নিন্দা-প্রশংসার ভাবনাই তাকে নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে আড়ষ্ট করিয়া দিয়াছে। যাদের এত বড় বড় কথা শুনাইয়াছে, অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য বুক ফুলাইয়া যাদের সঙ্গে করিয়া এখানে নিয়া আসিয়াছে, এখন বিপদ দেখিয়া তাদের ফেলিয়া পালানোর কথা ভাবিতেই হাত পা অবশ হইয়া আসিতেছে। অথচ এ ভাবে মরণকে বরণ করা নিছক বোকামি। রেল লাইনে ট্রেণের সামনে দাঁড়াইয়া সাহস দেখানোর মত।

সদানন্দও নিমেষের মধ্যে ব্যাপারটা অনুমান করিতে পারিয়াছিল। দু' হাত মেলিয়া বিভূতিকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া সকলকে ঠেকানোর কল্পনাটা মনের মধ্যে আসিয়াই অন্য একটা কল্পনার তলে মিলাইয়া গেল। চোখের সামনে এমন একটা ভীষণ কাণ্ড ঘটিতে যাইতেছে, অথচ এই অবস্থাতেও সদানন্দের মনে পড়িয়া গেল যে, এ জগতে মাধবীলতার একজন মাত্র মালিক আছে, তার নাম বিভূতি। বিভূতির যদি কিছু হয়, মাধবীলতার তবে কেউ আর কর্ত্তা থাকিবে না। চিন্তাটা মনে আসিতে সদানন্দ একটু সরিয়া দাঁড়াইল।

এমন সময় ঘটিল আরেকটা কাণ্ড। হাতে আর মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মহেশ চৌধুরী খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে পাগলের মত আসিয়া হাজির হইল। খানিকটা তফাৎ হইতেই সে প্রাণপণে চেঁচাইতে লাগিল, 'ওরে, রাখ্, রাখ্। ওরে বিভূতি, রাখ্।'

সকলে স্তব্ধ হইয়া গেল। কতকটা বিস্ময়ে, কতকটা কৌতূহলে, কতকটা সহানুভূতিতে। বিভূতি প্রথমে সকলকে শুনাইয়া যা বলিয়াছিল, মহেশ চৌধুরীকে দেখিয়া সেই কথাগুলি সকলের মনে পড়িয়া গিয়াছে।

উনিশ

কয়েক মুহূর্ত্তের স্তব্ধতা। তারপর আবার মারামারি আরম্ভ হইয়া গেল। এবার আরও জোরে। আসরে মহেশ চৌধুরীরও অনেক ভক্ত উপস্থিত ছিল, তাদের রক্ত গরম হইয়া উঠিয়াছে। ব্যাপার দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, মহেশ চৌধুরী আর্ত্তনাদের সুরে বিভূতিকে হাঙ্গামা থামাইতে অনুরোধ করে নাই, বিভূতিকে রক্ষা করার জন্য তার অনুগতদের কাছে আবেদন জানাইয়াছে। বাপের আর্ত্তনাদ বিভূতির কাণে পৌঁছায় নাই। গোলমালের জন্য নয়, সে তখন প্রায় সদানন্দের পায়ের কাছেই উদ্ভট ভঙ্গীতে পড়িয়া আছে, বাঁ হাতটা কব্জি ছাড়াও আরেক যায়গায় ভাঁজ হইয়া শরীরের নীচে চাপা পড়িয়া গিয়াছে আর ডান হাতটা টান হইয়া নিবেদনের ভঙ্গীতে আগাইয়া গিয়াছে সদানন্দের পায়ের দিকে। শরীরটা রক্তমাখা, তবে কোন কোন অঙ্গের নড়নচড়ন দেখিয়া বুঝা যায় তখনও মরে নাই। আরও অনেকে জখম হইয়াছে, সকলে তারা বিভূতির সঙ্গীও নয়, সদানন্দের মান রক্ষার জন্য তার যে সব উৎসাহী ভক্তেরা আগাইয়া আসিয়াছিল, তাদের মধ্যেও কয়েকজন অন্য উৎসাহী ভক্তের হাতে মার খাইয়াছে। মারামারির সময় হাতের কাছে যাকে পাওয়া যায় তাকেই দু'ঘা দিতে এমন হাত নিস্‌পিস্ করে!

শুধু হাতের মার নয়, গ্রামের লোকের পথ চলিতে লাঠির বড় দরকার হয়।

মারামারির দ্বিতীয় খণ্ডটা পরিণত হইয়া গেল রীতিমত দাঙ্গায়, কেউ ঠেকাইতে পারিল না। অনেকে আগেই পালাইতে আরম্ভ করিয়াছিল,

ব্যাপার এতদূর গড়াইবে না আশায় বুক বাঁধিয়া যারা অপেক্ষা করিতেছিল, এবার তারাও ছিটকাইয়া সরিয়া গেল। কেউ সটান পা বাড়াইয়া দিল বাড়ীর দিকে, কেউ দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল মজা। কেউ মাটির ঢেলা ইঁট পাটকেল, হাতের কাছে যা পাইল, দূর হইতে তাই ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল যুদ্ধক্ষেত্রে—একটু আগেও যেটা ছিল শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা-কীর্ত্তনের আসর. খানিক তফাতে একটা চ্যালা কাঠের স্তূপ ছিল, আট দশজন লোক হঠাৎ কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া দু'হাতে চ্যালা কাঠ ছুঁড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল—ঠিক যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে নয়, একপাশে, সেখানে তখনও সমবেত স্ত্রীলোকদের অর্দ্ধেকের বেশী নিরুপায় আতঙ্কে কিচির মিচির সুরে আর্ত্তনাদ করিতেছে। কোন অল্পবয়সী স্ত্রীলোক পুরুষ সঙ্গীর খোঁজে বিফল দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে প্রাণপণে চীৎকার করিতেছে বাবাগো মাগো বলিয়া, আর কোন বয়স্কা স্ত্রীলোক বসিয়া বসিয়াই মধুসূদনকে ডাকিতেছে। মেয়েদের অবস্থাই সবচেয়ে সঙ্গীন। আসরের চারিদিকে রাত্রি আর নির্জ্জনতা, পালানোর উপায় নাই। কয়েকজন অবশ্য দাঙ্গার সূচনাতেই উন্মাদিনীর মত যেদিকে পারে ছুটিয়া পালাইয়াছে, সকলে সেরকম উদ্‌ভ্রান্ত সাহস কোথায় পাইবে? পুরুষ অভিভাবকরা আসিয়া অনেককে উদ্ধার করিয়া নিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখন উদ্ধারের কাজটাও হইয়া দাঁড়াইয়াছে আরও কঠিন। নিজেদের সঙ্কীর্ণ সীমানাটুকুর মধ্যে অনেকে ভয়ের তাড়নায় কয়েকটি পলাতকা উন্মাদিনীর মতই দিশেহারা হইয়া এদিক ওদিক আরম্ভ করায় নিজেদের মধ্যে নিজেরাই হারাইয়া গিয়াছে। তারপর আছে ছোট ছেলেমেয়ে। তারপর আছে ধাক্কা দেওয়ার, গা মাড়াইয়া দেওয়ার বচসা আর গালাগালি। যে দু' একজন অভিভাবক লজ্জা ভয় ভদ্রতা ছাড়িয়া একেবারে মেয়েদের মধ্যে আসিয়া খোঁজ করিতেছে, খোঁজ পাইয়া, দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া, কাছে আনাইয়া সঙ্গে করিয়া পালাইতে তারও সময় লাগিতেছে অনেকটা।

এই অবস্থায় চ্যালা কাঠগুলি আসিয়া পড়িতে লাগিল তাদের গায়ে মাথায়।

কেউ থামানোর চেষ্টা না করিলেও দাঙ্গা আপনা হইতেই থামিয়া যায়। কোনটা তাড়াতাড়ি থামে, কোনটার জের চলে এখানে সেখানে ছাড়া ছাড়া হাতাহাতিতে, পিছন হইতে মাথা ফাটানোয়। এ দাঙ্গাটা থামাইয়া দিল বিপিন। আশ্রমে একটা লুকানো বন্দুক ছিল। বন্দুকের লাইসেন্স ছিল, তবু বন্দুকটা লুকানোই থাকিত। ছুটিয়া গিয়া বন্দুকটা আনিতে বিপিনের সময় লাগিল মিনিট পাঁচেক আর খানিকটা তফাতে দাঁড়াইয়া কয়েকবার আওয়াজ করিতে সময় লাগিল দু'মিনিট। শেষ মিনিটের আওয়াজ দরকার ছিল না, এ ধরণের সখের দাঙ্গা থামাইতে একটা বন্দুকে এক মিনিটে যে কটা আওয়াজ করা যায় তাই যথেষ্ট।

দাঙ্গা থামার পরে হাঙ্গামার প্রথম বীভৎস আর বিশৃঙ্খল অবস্থাটাও শেষ হইয়া গেল অল্প সময়ের মধ্যেই। এরকম হাঙ্গামার ডালপালা ছাঁটিয়া ফেলিতে সদানন্দের আশ্রমবাসী শিষ্য-শিষ্যাদের পটুতা দেখা গেল অসাধারণ। পরিচালনার ভারটা নিতে হইল বিপিনকে, সদানন্দের কিছু করার ক্ষমতা ছিল না, সেও মার খাইয়াছে। মেয়েদের শান্ত করিয়া অভিভাবকদের সঙ্গে মিলন ঘটাইয়া দেওয়া হইতে লাগিল এবং আহতদের প্রাথমিক শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা হইল।

আধঘণ্টা পরে দেখা গেল আসরে আছে শুধু আশ্রমের লোক, আহত আর নিহতদের আত্মীয়স্বজন, আর আছে গহনার শোকে কাতর কয়েকজন নরনারী। মধ্যে যারা চ্যালা কাঠ ছুঁড়িয়া মারিতেছিল, দাঙ্গার শেষের দিকে হঠাৎ সে কাজটা বন্ধ করিয়া মেয়েদের ভিড়ে ঢুকিয়া কয়েকজনের গলার হার, কাণের মাকড়ি, হাতের চুড়ি ছিনাইয়া নিয়া তারা সরিয়া পড়িয়াছিল। সকলে পলাইতে পারে নাই, একটা চ্যালা কাঠ কুড়াইয়া নিয়া রত্নাবলী দু'জনের মাথা ফাটাইয়া দেওয়ায় তারা এখনও আহতদের সারির একপ্রান্তে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে।

আনকোরা নূতন আঘাতের রক্তমাখা চিহ্ন গায়ে নিয়া সদানন্দ, আর পুরাণো আঘাতের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা চিহ্ন গায়ে নিয়া মহেশ চৌধুরী, জড় ভরতের মত একরকম কাছাকাছিই বসিয়া আছে—বিভূতির গা ঘেঁষিয়া। দাঙ্গা শেষ হওয়ার একটু আগে অথবা সঙ্গে সঙ্গে অথবা একটু পরে বিভূতি মরিয়া গিয়াছে। এক মিনিট স্তব্ধতার আগের তিন মিনিট আর পরের সাত মিনিট, মোট দশ মিনিটের দাঙ্গায় মারা গিয়াছে চার জন। গুরুতর আঘাত পাইয়াছে সাত জন আর

সাধারণভাবে আহত হইয়াছে সতর জন। আরও কয়েকজন আহত হইয়াছে সন্দেহ নাই, তবে তারা এখানে নাই, আগেই সরিয়া পড়িয়াছে। সদানন্দ আর মহেশ আহতদের প্রাথমিক সেবা শুশ্রূষার পর প্রাথমিক চিকিৎসার আয়োজন চাহিয়া দেখিতে থাকে, আর শুনিতে থাকে মরা ও আধমরা মানুষগুলিকে ঘিরিয়া বসিয়া মেয়েদের ডুকরানো কান্না আর পুরুষদের হায় হায় আফশোষ। সদানন্দের মাথার মৃদু ঝিমঝিমানির মধ্যেও মনে হয়, এতগুলি গলার কান্না আর আফশোষের শব্দ থামা সত্ত্বেও আসরটা যেন বড় বেশী নিঃশব্দ হইয়া গিয়াছে—মানুষের ভিড়ে যখন গমগম করিতেছিল আর খোল করতালের সঙ্গে কীর্ত্তন চলিতেছিল, তখনও আসরে যেন ঠিক এইরকম স্তব্ধতা নামিয়া আসিয়াছিল। মেয়েদের কান্না শুনিতে শুনিতে মহেশ চৌধুরীর মনে হয় অন্য কথা—এই শোকের ছড়াছড়ির মধ্যে বিভূতি যেন অন্যায় রকম ফাঁকিতে পড়িয়া গিয়াছে, তার জন্য শোক করিবার কেউ নাই!

অন্যায়টা শেষ পর্য্যন্ত তার বোধ হয় সহ্য হইল না, তাই মাঝরাত্রি পার হইয়া যাওয়ার অনেক পরে বিপিনকে ডাকিয়া বলিল, 'বাড়ীতে একটা খবর পাঠাতে পার বিপিন?'

'পাঠাচ্ছি—সকালে পাঠালে ভাল হত না? এত রাত্রে মেয়েদের—'

'না, এখুনি খবরটা পাঠিয়ে দাও। মেয়েরা এসে একটু কাঁদুক।'

সদানন্দ এতক্ষণ বার বার শুশ্রূষা আর চিকিৎসা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, এবার বিপিন অনুরোধ করিতেই রাজী হইয়া গেল এবং একজন শিষ্যের গায়ে ভর দিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে নিজের তিন মহল আশ্রমের দিকে চলিয়া গেল। সঙ্গে গেল একজন শিষ্যা। মনে হইল, এতক্ষণ অন্য সব আহতদের মত কেবল সাধারণ শুশ্রূষা আর চিকিৎসা পাওয়া যাইত বলিয়া, সে গ্রহণ করে নাই, এবার বিশেষ ব্যবস্থা করা সম্ভব হওয়ায় সকলের চোখের আড়ালে সেটা উপভোগ করিতে যাইতেছে।

এদিকে কয়েক মিনিট কাটিতে না কাটিতে মহেশের মনে হইতে লাগিল, বাড়ীর মেয়েদের আসিতে বড় দেরী হইতেছে। তাই, আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া নিজেই সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল। মনে হইল, সদানন্দের সামনে ছেলের জন্য কাঁদিতে এতক্ষণ তার যেন লজ্জা করিতেছিল, এবার সুযোগ পাওয়ায় প্রাণ খুলিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বিভূতির মা, মাধবীলতা আর বাড়ীর সকলে আসিল প্রায় শেষ রাত্রে। কিন্তু তেমনভাবে কেউ কাঁদিল না। মাধবীলতা একরকম হাঁ করিয়া বিভূতির দিকে চাহিয়া নিঃশব্দেই বাকী রাতটুকু কাবার করিয়া দিল। বিভূতির মা এত আস্তে কাঁদিতে লাগিল যে, একটা কাণ ব্যাণ্ডেজে ঢাকা না থাকিলেও পাশে বসিয়া মহেশ চৌধুরী সব সময় তার কান্নার শব্দ শুনিতে পাইল না।

পুলিশ আসিল সকালে।

পুলিশের লোকের কাছে একটা খবর পাওয়া গেল, ইতিমধ্যেই তারা তিনজনকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিয়াছে। তবে দাঙ্গার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল না। আশ্রমের পশ্চিম সীমানায় আশ্রমের যে ছোট ফুলের বাগানটি আছে, সেখানে পাঁচজন লোক কাল রাত্রে একটি এগার বছরের মেয়েকে নিয়া একটু আমোদ করিয়াছিল। তিনজন ধরা পড়িয়াছে, দু'জন পলাতক।

'না, মরেনি, বেঁচে উঠবে বলেই তো মনে হয় মেয়েটা। তবে কি জানেন বিপিন বাবু—'

মহেশ চৌধুরী শুনিতেছিল, হঠাৎ তার মনে হইল দাঙ্গার চেয়ে এই মেয়েটির আলোচনাই সকলে যেন বেশী উপভোগ করিতেছে। দাঙ্গাহাঙ্গামা সামান্য ব্যাপার, জগতের কোথাও না কোথাও সর্ব্বদাই যে কুরুক্ষেত্রীয় কাণ্ড চলিতেছে, তার তুলনায় দাঙ্গাহাঙ্গামার ক্ষুদ্রতা আর তুচ্ছতা শোচনীয়ভাবে লজ্জাকর। কিন্তু এগার বছরের একটি রক্তমাংসের বিন্দুতে তীব্র আর বীভৎস অস্বাভাবিকতার সিন্ধু খুঁজিয়া মেলে, রোমাঞ্চকর লজ্জা ভয় রাগ দ্বেষ ঘৃণা আর অবাধ্য আবেগে স্নায়ুগুলি টান হইয়া যায়, কাণে ভাসিয়া আসে লক্ষ কোটি পশুর গর্জ্জন।

মহেশ চৌধুরী একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া এক চোখে চারিদিক চাহিতে থাকে। আহতদের অনেক আগেই ভাল আশ্রয়ে সরানো হইয়াছে, পড়িয়া আছে কেবল তিনটি সাদা চাদর ঢাকা দেহ। এত বয়সে এত কাণ্ডের পর এরকম আবেষ্টনীতে এমন অসময়ে একটা জানা কথা নূতন করিয়া জানিয়া নিজেকে তার বড় অসহায় মনে হইতে থাকে। চাপা দিলে সত্যই রোগ সারে না, হিমালয় পাহাড়ের মত বিরাট এক স্তূপ সুগন্ধি ফুলের নীচে চাপা দিলেও নয়।

[লেখকের মন্তব্য : মহেশ চৌধুরীর এই অস্পষ্ট আর অসমাপ্ত চিন্তাকে মহেশ চৌধুরীর চিন্তার শক্তি ও ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া স্পষ্টতর করিয়া তুলিতে গেলে অনেক বাজে বকিতে হইবে, সময়ও নষ্ট হইবে অনেক। আলপিন ফুটাইয়া খাঁড়ার পরিচয় দেওয়ার চেয়ে মন্তব্যের এই ভোঁতা ছুরি বেশী কাজে লাগিবে মনে হয়।

মোট কথা, মহেশ চৌধুরীর মনে হইয়াছে, পৃথিবীর সমস্ত মানুষ অনেকদিন হইতে রোগে ভুগিতেছে। মাঝে মাঝে দু'একজন মহাপুরুষ এবং সব সময় অনেক ছোটখাট মহাপুরুষ এই রোগ সারানোর চেষ্টা করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন, কিন্তু সে চেষ্টায় বিশেষ কোন ফল হয় নাই, এখনও হইতেছে না। কারণ, তাদের চেষ্টা শুধু ভালর আড়ালে মন্দকে চাপা দেওয়ার, কেবল দুধ ঘি খাওয়াইয়া রুগীকে স্বাস্থ্যবান করার।

মানুষের রোগের কারণ তারা জানে না, অর্থ বোঝে না, চিকিৎসার পথও খুঁজিয়া পায় না। তারা নিজেরাও রুগী। না হইয়া উপায় কী? মানুষ হইতে যে মানুষের জন্ম, মানুষের কাছ হইতে খুঁটিয়া খুটিয়া যার আত্মসংগ্রহ, মানুষের যা আছে তা ছাড়া মানুষের যা নাই তা সে কোথায় পাইবে? উপাদানগুলি সেই এক, ভিন্ন ভিন্ন মানুষ শুধু নিজের মধ্যে ভিন্নভাবে আত্মচিন্তার খিচুড়ি রাঁধে।

তাই মানুষের রোগের চিকিৎসার উপায় কেউ খুঁজিয়া পায় না, পাওয়া সম্ভবও নয়। তাই মানুষকে সুস্থ করার সমস্ত চেষ্টা গরীবকে স্বপ্নে বড়লোক করার চেষ্টার মত দাঁড়াইয়া যাইতেছে ব্যর্থ পরিহাসে।

জগতের কোটি কোটি অন্ধকে অন্ধের পথ দেখানোর চেষ্টার করুণ দিকটা মহেশ চৌধুরীকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলে। হতাশায়, অবসাদে সমস্ত ভবিষ্যৎ তার অন্ধকার মনে হয়। কেউ খুঁজিয়া পাইবে না, মানুষের মুক্তির পথ কেউ খুঁজিয়া পাইবে না।

মনুষ্যত্বকে অতিক্রম করিয়া মানুষের নিজেকে জানিবার, নিজের আর বিশ্বের সমস্ত মানুষের মুক্তির পথ খুঁজিয়া পাওয়ার, একটা উপায়ের কথা যে শাস্ত্রে লেখা আছে, মহেশ চৌধুরীও তা জানে, আমিও জানি। তবে, শুধু লেখা আছে, এইটুকুই আমরা দুজনে জানি।]

দাঙ্গাহাঙ্গামার জের চলিতে লাগিল, মহেশ চৌধুরীও বিষাদ ও অবসাদের ভারে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। মানুষের মুক্তি নাই, মানুষের ভাল নাই, একথা ভাবিলেই তার মনে হয় পৃথিবীশুদ্ধ আত্মভোলা লোক ভাল মন্দে জড়ানো জীবন নিয়া মনের আনন্দে বাঁচিয়া আছে, সেই কেবল পশুর খাঁচায় আটক পড়িয়াছে। সকলে ভাবে পুত্রশোকে মহেশ কাতর, মহেশ ভাবে, পুত্রশোকে সে যদি সকলের মত রীতিমত কাতর হইতে পারিত! একটি মাত্র ছেলে, তার শোকেও আত্মহারা হইতে পারিতেছে না, একি ভয়ানক অবস্থা তার? শোক বাড়ানোর জন্যই মহেশ সর্ব্বদা বিভূতির কথা ভাবিতে চেষ্টা করে, গৃহ কেমন শূন্য হইয়া গিয়াছে অনুভব করার চেষ্টা করে, বিভূতির স্মৃতিচিহ্নগুলি ঘাঁটাঘাঁটি করে, বারবার মাধবীলতার নূতন বেশের দিকে তাকায়।

কেবল শোক বাড়ানোর জন্য। অন্য কোন কারণে নয়।

মহেশ চৌধুরীর শোক দেখিয়া বাড়ীর লোকের বুক ফাটিয়া যায়। বিভূতির মা মাথা নাড়িয়া বলে, 'ও আর বাঁচবে না। না বাঁচুক, আর বেঁচে কি হবে? ওর আগেই যেন আমি যেতে পারি, হে মা কালী, ওর আগেই যেন—তোর মত বেশ যেন আমায় ধরতে না হয় রাক্ষসী।'

মাধবীলতার শোকটা তেমন জোরালো মনে হয় না। তাকে কেবল একটু বেশী করম রুক্ষ দেখায়,—তেল মাখিয়া স্নান না করার রুক্ষতা নয়, ভিতর হইতে রস শুকাইয়া যাইতে থাকিলে যেমন হয়।

অনেক ভাবিয়া একদিন সে মহেশ চৌধুরীর সামনে জোড়াসন করিয়া বসে, আগে মাথার ঘোমটা ফেলিয়া দিয়া বলে, 'ওই লোকটাই খুন করেছে বাবা।'

'স্বামীজী?'

'ওই লোকটা' বলিতে মাধবীলতা যে কাকে বুঝাইতেছে, অনুমান করিতে মহেশের দ্বিধা পর্য্যন্ত করিতে হয় না।

'হ্যাঁ।'

'তুমি জানলে কি করে, তুমি যাও নি।'

'লোকের কাছে শুনেছি। আপনিও তো জানেন। ওই তো সকলকে ক্ষেপিয়ে দিল, সকলকে ডেকে খুন করতে বলল—'

'খুন করতে বলেননি, বলেছিলেন—'

মাধবীলতা অসহিষ্ণু হইয়া বলে, 'তার মানেই তো তাই। এ লোকটা আমায় অপমান করেছে, তোমরা চুপ করে সহ্য করবে—ও কথা ব'লে সকলকে ক্ষেপিয়ে দেওয়ার আর কি মানে হয়? কি অপমান করেছে সবাই তো দেখতে পাচ্ছিল, শুনতে পাচ্ছিল? কেউ তখন আর মারতে উঠেনি কেন? যেই সকলকে ডাকল তখনি সবাই এসে একজনকে মারতে আরম্ভ করল কেন?'

মহেশ চৌধুরী ধীরভাবে বলে, 'উনি হয়ত ওকে শুধু আসর থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্য সবাইকে ডেকেছিলেন।'

মাধবীলতা আরও ব্যাকুল হইয়া বলে, 'না না, আপনি বুঝতে পারছেন না। আশ্রমের লোকেরা তাড়াতে পারত না?'

'দল নিয়ে গিয়েছিল যে?'

অগত্যা মাধবীলতাকে ধৈর্য্য ধরিতে হয়, শান্ত হইতে হয়। সব কথা বুঝাইয়া না বলিলে মহেশ চৌধুরী বুঝিতে পারিবে না, এমন ভাল মানুষ কেন যে সংসারে জন্মায়।

'তা নয়, দলে আর ক'জন ছিল? ওকে খুন করাই ওই লোকটার উদ্দেশ্য ছিল। জেলে দেবার জন্যে পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছিল মনে নেই? ওঁকে জেলে পাঠালে আমার পেছনে লাগার সুবিধে হত। জেলে পাঠাতে পারল না, তাই একেবারে মেরে ফেলল।'

এবার মহেশ চুপ করিয়া চাহিয়া থাকে। একজন স্ত্রীলোককে পাওয়ার লোভে তার স্বামীকে হত্যা করা দুর্বোধ্য ব্যাপার নয়, তবু যেন মহেশ কিছুই বুঝিতে পারিল না। ওরকম হত্যাকাণ্ডগুলি অন্যভাবে হয়। বিভূতিকে সদানন্দ ডাকিয়া পাঠায় নাই, বিভূতি যে আসরে যাইবে, তাও সদানন্দ জানিত না। বিভূতি নিজে হইতে গিয়া হাঙ্গামা আরম্ভ করিয়াছিল। এরকম অবস্থায় সদানন্দের সম্বন্ধে এমন একটা ভয়ানক কথা অনুমান করা চলে কেমন করিয়া?

মহেশের মুখ দেখিয়া মাধবীলতার শরীর রাগে রি রি করিতে থাকে। এমন অপদার্থ হাবাগোবা ভাল মানুষও পৃথিবীতে জন্মায়!

'বুঝতে পারছেন না? আমার বিয়ে হবার পর থেকে দিনরাত ভাবত ওঁকে কি করে সরানো যায়, সেদিন সুযোগ পাওয়া মাত্র—যেই বুঝতে পারল যে সবাইকে ক্ষেপিয়ে দিলেই সকলে মিলে ওঁকে মেরে ফেলবে, অমনি সকলকে ক্ষেপিয়ে দিল।"

'তা বটে, সুযোগ পাওয়া মাত্র সুযোগের সদ্ব্যবহার করা সদানন্দের পক্ষে অসম্ভব নয়।' মাথা হেঁট করিয়া মহেশ চুপ করিয়া বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবে আর মাধবীলতা ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া থাকে। এই সহজ কথাটা কেন যে মানুষ বুঝিতে পারে না। বিভূতিকে বাঁচাইতে দু'হাত বাড়াইয়া আগাইবার উপক্রম করিতে গিয়া হঠাৎ যে চিন্তা মনে আসায় সদানন্দ পিছাইয়া গিয়াছিল, মাধবীলতা সেই চিন্তাকে কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া সদানন্দের জীবনের দিনে, মাসে, বৎসরে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছে। সদানন্দ এই কথাই সর্ব্বদা চিন্তা করিত, কি করিয়া বিভূতিকে মারিয়া মাধবীলতাকে লাভ করা যায়। মাধবীলতাকে পাওয়ার চিন্তা ছাড়া সদানন্দের কি অন্য চিন্তা থাকিতে পারে?

কুড়ি

প্রথমটা একটু উত্তেজিত হইয়াছিল, তারপর কিন্তু মহেশ চৌধুরী অস্বাভাবিক রকম শান্ত হইয়া পড়িল। একেবারে শান্তির প্রতিমূর্ত্তি। মুহূর্ত্তের জন্যও তার মুখের চামড়া কুঁচকায় না, দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত হয় না, কথায় আলো প্রকাশ পায় না। আরও বেশী আস্তে চলাফিরা করে, আরও বেশী ধীরতার সঙ্গে বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজনগুলি নিখুঁতভাবে পালন করিয়া যায়।

মাধবীলতা দাঁতে দাঁত কামড়ায়।—'আপনি কিছুই করবেন না?'

'করব।'

'কি করবেন?'

'কি করব তাই ভাবছি মা।'

মাধবীলতা রাগে পৃথিবী অন্ধকার দেখিতে থাকে।—'আপনার কিছু করা উচিত কিনা, তাও ভাবছেন বোধ হয়?'

মহেশ চৌধুরীর স্পষ্ট, মৃদু ও একটানা আলাপ করার সুর বদলায় না। 'ভাবছি বৈকি। সব কথা না ভেবে কিছু করতে আছে? সব কথা ভাবছ না বলেই সদানন্দের দোষের কথা ভেবে তুমি অস্থির হয়ে পড়েছ।'

আগে কোনদিন মহেশ চৌধুরী সদানন্দকে সদানন্দ বলে নাই। সে অনায়াসে নামটা উচ্চারণ করিয়া গেল, খাপছাড়া শোনাইল মাধবীলতার কাণে—সে নিজেই মহেশ চৌধুরীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে যে, ও নামটা খুনীর।

'স্বামীজির দোষ আছে বলেই—'

'দোষ তো তোমারও থাকতে পারে মা ?'

মাধবীলতা বড় দমিয়া গেল, মুখখানা হইয়া গেল ফ্যাকাসে। মহেশ চৌধুরী কেন তাকেও দোষী করিতেছে, অনুমান করা কঠিন নয়। এদিকটা আগে সে ভাবিয়া ছাখে নাই।

'তুমি আগেও ভাবতে সদানন্দ তোমার জন্য এমন পাগল যে, বিভূতিকে খু- পর্য্যন্ত করতে পারে। তাই এত সহজে সদানন্দকে দোষী ভেবে নিয়ে অস্থির হয়ে পড়েছ যে—একবার একটু সন্দেহও জাগে নি। তোমার কোন দোষ না থাকলে এসব কথা ভাবতে কেন ?'

'আমি—'

'তোমার কি দোষ তুমি জান না ?' অতি ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া মহেশ চৌধুরী যেন তার সেই অক্ষমতাকে সমর্থনই করে, 'সেইখানে তো মুস্কিল বাছা। নিজের দোষ যদি আমরা জানতে পারতাম, তবে আর ভাবনা ছিল কি। আমি কি আমার দোষ জানি ?'

মাধবীলতা বড় দমিয়া যায়। কি ভাবিতেছে মহেশ চৌধুরী ? কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। কি ধারণা জাগিয়াছে তার সম্বন্ধে তার মৃত স্বামীর পিতার মনে ? কি সন্দেহ করিয়াছে এই হাবা-গোবা ভালমানুষটি,—মাঝে মাঝে যাকে মারাত্মক রকমের চালাক মনে হয় ? তার ছেলের বৌকে পাওয়ার লোভে সদানন্দ ইচ্ছা করিয়া তার ছেলেকে হত্যা করিয়াছে শুনিয়াও মহেশ চৌধুরীর অবিচলিত ভাব দেখিয়া মাধবীলতার আর রাগ করিবার সাহস হয়না। তাছাড়া, এতক্ষণে তার মনে হইতে থাকে যে, মহেশ চৌধুরীর করিবারই বা কি আছে, সে কি করিতে পারে ? প্রথমে মনে হইয়াছিল, মহেশ চৌধুরী আসল ব্যাপারটা অনুমান করিতে পারিলেই বুঝি সদানন্দের শাস্তির আর সীমা থাকিবে না। এখন মাধবীলতা ভাবিয়া পায় না, এমন একটা বিশ্বাস তার কেন জাগিয়াছিল। প্রতিহিংসা নেওয়ার মানুষ মহেশ চৌধুরী নয়, সে ক্ষমতাও তার নাই।

দাঙ্গার ফলে আর কিছু না হোক আশ্রমের নাম আরও বেশী ছড়াইয়া গিয়াছে। কেবল কাছাকাছি গ্রাম আর সহরের মানুষের মধ্যেই ব্যাপারটা নিয়া হৈ হৈ হয় নাই, খবরের কাগজেও বিস্তারিত বিবরণ বাহির হইয়াছে। দাঙ্গার বিবরণ শুধু নয়, আশ্রম সম্পর্কেও অনেক কথা প্রকাশিত হইয়াছে। একটি কাগজে লেখা হইয়াছে : এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক শ্রীশ্রীসদানন্দ স্বামী দীর্ঘকাল তপস্যার পর জনসেবাই সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া জানিয়া রোগশোকদারিদ্র্যনিপীড়িত নরনারীর কল্যাণের জন্য ইত্যাদি। সকল মহৎ কর্ম্মের বিরোধিতা করাই এক শ্রেণীর লোকের প্রকৃতি, এইরূপ একদল লোক অন্যভাবে আশ্রমের ক্ষতি করিতে অসমর্থ হইয়া আক্রোশের বশে আশ্রমের বাৎসরিক প্রতিষ্ঠা উৎসবের দিন গুণ্ডা ভাড়া করা ইত্যাদি। এই বিবরণটি যে কাগজে বাহির হইয়াছিল, মহেশ চৌধুরীর বাড়ীতে সেই কাগজটিই রাখা হয়। বাড়ীতে খবরের কাগজটি আসামাত্র সকলের আগে মাধবীলতা সেটিকে দখল করে। দাঙ্গাহাঙ্গামার কোন বিবরণ তার অজানা নয়, ব্যাপারটার জের কি দাঁড়াইতেছে, তাও খবরের কাগজে বাহির হওয়ার কয়েকদিন আগেই তার কাণে আসে, তবু খবরের কাগজে সংক্ষিপ্ত আর ভুল বিবরণ পড়িবার জন্য সে ছটফট করিতে থাকে। সদানন্দ, তার আশ্রম ও দাঙ্গাহাঙ্গামা সম্বন্ধে অভিনব টীকা পড়িয়াই কাগজটি হাতে করিয়া সে মহেশ চৌধুরীর কাছে ছুটিয়া যায়।

'দেখেছেন কি আরম্ভ করেছে ওরা ? পড়ে দেখুন।'

মহেশ ধীরে ধীরে আগাগোড়া পড়িয়া বলে, 'সদানন্দের তপস্যা আর আশ্রমের উদ্দেশ্যের কথা সত্য, গুণ্ডা ভাড়া করার কথাটা সত্য নয়।'

মাধবীলতা বোমার মত ফাটিয়া যায়, 'একটা কথাও সত্যি নয়। ও লোকটা কত খারাপ আপনি জানেন না, যে সব কাণ্ড চলে—'

মহেশ বলে, 'জানি মা, সব জানি। সদানন্দ অনেক সাধনা করেছে, তবে কি জান মা, সাধকেরও পতন হয়। সদানন্দ লোক ভাল। আশ্রমটাও বড় উদ্দেশ্য নিয়েই স্থাপন করা হয়েছিল, তবে ঠিক সেভাবে কাজ হয় নি। মানুষের ভুল ত্রুটি হয় কিনা, বুঝবার দোষ হয় কিনা নানারকম—'

মাধবীলতা অবাক হইয়া শুনিয়া যায়। সদানন্দ লোক ভাল ? আশ্রমের উদ্দেশ্য মহৎ ? এত কাণ্ডের পর মহেশ চৌধুরীও যে এমন কথা বলিতে পারে, কাণে শুনিয়াও মাধবীলতার যেন বিশ্বাস হইতে চায় না। হঠাৎ তার মনে হয়, লোকটি বোধ হয় পাগল। প্রত্যেক উন্মাদের মত নিজের একটা জগৎ সৃষ্টি করিয়া সেখানে সে বাস করিতেছে

আর বাস্তব জগতের অর্থ স্থির করিতেছে তার নিজের খাপছাড়া জগতের নিয়মে।

'কিছু ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

মাধবীলতা অভিভূতের মত বলে, 'সব ঠিক হয়ে যাবে?'

মহেশ চৌধুরী একদিন আশ্রমে গেল। বিপিনের সঙ্গে দেখা করিয়া বলিল, 'বিভূতির দোষে এতগুলি লোক জেলে যাবে বিপিনবাবু?'

'ওরাও তো মারামারি করেছিল।'

'তা করেছিল, কিন্তু দোষ তো ওদের নয়। বিভূতি হাঙ্গামা না বাধালে কিছুই হ'ত না।'

বিপিন চুপ করিয়া মহেশের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। কয়েক মুহূর্তের জন্য তারও মনে হয়, লোকটা কি পাগল? দাঙ্গা করার জন্য পুলিশ যাদের ধরিয়াছে, বিভূতিকে নিজের হাতে মারিয়াছিল এমন লোকও যাদের মধ্যে আছে, তারা শাস্তি পাইবে বলিয়া এই মানুষটার দুর্ভাবনা!

সেদিন সকালেই বিপিন আর সদানন্দের মধ্যে পরামর্শ হইয়াছিল, আদালতে প্রমাণ করিতে হইবে দাঙ্গাহাঙ্গার দায়িত্বটা ছিল বিভূতির। কিছুদিন আগে একটি আশ্রম স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে মহেশ চৌধুরী সদানন্দকে নিমন্ত্রণ করিয়া তার বাড়ীতে নিয়া গিয়াছিল। কিন্তু কোন ভাল উদ্দেশ্যের পরিবর্তে বড় আশ্রমটির ক্ষতি করিবার জন্য একটি বিরোধী আশ্রম স্থাপন করাই মহেশ চৌধুরীর আসল উদ্দেশ্য, ইহা টের পাইয়া সদানন্দ চলিয়া আসিয়াছিল। বাপের অপমানে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বিভূতি এই হাঙ্গামা বাধায়। মহেশ চৌধুরীকেও দাঙ্গাহাঙ্গামার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে জড়াইয়া কিছুদিনের জন্য জেলে পাঠানোর চেষ্টা করার ইচ্ছা সদানন্দের ছিল, বিপিন কোনমতেই রাজী হয় নাই। মহেশ চৌধুরীর সম্বন্ধে বিপিনের মনের ভাব ক্রমে ক্রমে বদলাইয়া যাইতেছিল।

বিকৃত সত্য বলিয়া জানিয়া যে আদালতে প্রমাণ করার জন্য সদানন্দের সঙ্গে গোপনে চক্রান্ত করিতেছিল, মহেশ চৌধুরী নিজে আসিয়া তাই সত্য বলিয়া ঘোষণা করিতেছে, সব দোষ ছিল তার ছেলের! বিভূতি দোষী প্রমাণ করার উদ্দেশ্য তাদের ছিল স্বার্থরক্ষা, বিভূতির দোষে কতকগুলি লোক জেলে যাইবে বলিয়া মহেশ চৌধুরীর হইতেছে আপশোষ!

'কিছু করা যায় না?'

'কি করা যাবে বলুন?'

'বিভূতির দোষটা আদালতে প্রমাণ করলে—?'

বিপিন ভাবিয়া বলিল, 'তাতে অন্য সবাই ছাড়া পাবে না, তবে শাস্তিটা কম হতে পারে।'

মহেশ বলিল, 'তাই হোক। তাছাড়া যখন উপায় নেই, কি আর করা যাবে।'

সদানন্দের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যা ঠিক হইয়াছিল, সেটা মনে মনে বাতিল করিয়া দিয়া বিপিন বলিল, 'আদালতে কি বলবেন?'

'যা সত্য তাই বলব, আর কি বলব?'

যা সত্য আদালতে তাই বলা হইবে স্থির হইলেও, কি বলা হইবে, সে বিষয়ে পরামর্শ করার প্রয়োজন দেখা গেল। সকলে সত্য কথা বলিলেও সত্যের খুঁটিনাটিগুলি ভিন্ন ভিন্ন লোকের মুখে এমন পরস্পরবিরোধী হইয়া দাঁড়ায়। আদালতে দাঁড়াইয়া মহেশ চৌধুরী ধীর স্থির শান্তভাবে বলিয়া গেল, বিভূতি কেমন একগুঁয়ে ছিল, মেজাজটা তার কি রকম গরম ছিল, আগে একবার সে একটা ছোটখাট হাঙ্গামা সৃষ্টি করিবার ফলে মহেশ কি ভাবে কয়েকজনের হাতে মার খাইয়াছিল এবং বাপকে যারা মারিয়াছিল তাদের শাস্তি দিবার জন্য কীর্তনের আসরে গিয়া সে কি ভাবে হাঙ্গামার সৃষ্টি করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ছেলের চরিত্রের কয়েকটা বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টাও করিল যে, কর্তব্যজ্ঞান, নিষ্ঠা, তেজ, সাহস, এ সব মানুষের যতই থাক, ভাল মন্দ উচিত অনুচিত ন্যায় অন্যায় বিচার করিবার ক্ষমতা না থাকিলে ওসব কোন কাজেই লাগে না।

অনেকে হতভম্বের মত শুনিয়া গেল, কেউ ভাবিল মহেশ চৌধুরীর মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে, কয়েকজন সকৌতুকে হাসিতেও লাগিল।

বিভূতির মা বলিল, 'আদালতে দশ জনের কাছে তুমি আমার ছেলের নিন্দে করে এলে! এবার আমি গলায় দড়ি দেব। আমি অনেক সয়েছি, আর সইব না।' বলিয়া মাথা কুটিতে লাগিল।

মাধবীলতা বলিল, 'আপনার মনে এই ছিল! আমিও গলায় দড়ি দেব।' বলিয়া হুহু করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

মহেশ চৌধুরী তাদের বুঝাইয়া শান্ত করিবার কোন চেষ্টা করিল না, এতটুকু বিব্রত হইয়াছে বলিয়াও মনে হইল না।

অপরাহ্নে বিপিন আসিল। মহেশ বলিল, 'এসো বিপিন।'

বিপিন যেন হঠাৎ তার স্নেহের পাত্রে পরিণত হইয়া গিয়াছে। সম্বোধনের তারতম্যটা বিপিনও খেয়াল করিল কিনা সন্দেহ, শ্রান্ত ক্লান্ত মানুষের মত সামনে বসিয়া পড়িয়া পরমাত্মীয়ের মতই বিনা ভূমিকায় বলিল, 'কিছু ভাল লাগছে না।'

মহেশ সায় দিয়া বলিল, 'অনেক দিন থেকেই তো তোমার মন খারাপ।'

ছোট ছেলে যেমন সহানুভূতির প্রত্যাশায় গুরুজনকে দুঃখ জানায়, তেমনি ভাবে বিপিন বলিল, 'আশ্রম নিয়ে আমি পাগল হয়ে গেলাম চৌধুরী মশায়। যা ভেবেছিলাম তা তো কিছু হলই না, একটার পর একটা হাঙ্গামাই বাধছে। কত বড় উদ্দেশ্য নিয়ে কি রকম আশ্রমের গোড়াপত্তন করেছিলাম, দিন দিন কি দাঁড়াচ্ছে আশ্রমটা! এত চেষ্টা করছি, কিছুতেই গোল্লায় যাওয়া ঠেকাতে পারছি না।'

মহেশ বলিল, 'কেন, তুমি তো আশ্রমের টাকা আর সম্পত্তি বাড়াবার চেষ্টা করেছিলে, তাতো বেড়েছে? নাম ছড়াবার চেষ্টা করেছিলে, তাও তো ছড়িয়েছে?'

বিপিন বলিল, 'কিন্তু যে উদ্দেশ্যে আশ্রম করেছিলাম, তার যে কিছুই হচ্ছে না, বরং উল্টো ফল হচ্ছে।'

মহেশ বলিল, 'সে দোষটা তোমার।'

বিপিন আহত হইয়া বলিল, 'আমার দোষ? আমার কি দোষ?'

মহেশ বিপিনকে তার দোষগুলি বুঝাইয়া দিতে আরম্ভ করে। আগে বিপিন রাগ করিত, আজ নিঃশব্দে শুনিয়া যায়। মহেশের কথা শেষ হওয়ার আগেই তার মুখ দিয়া হঠাৎ বাহির হইয়া যায়, 'আপনাকে যদি আশ্রমে পেতাম।'

'পাবে।'

'আপনি আশ্রমে যোগ দেবেন?'

'দেব। ক'দিন আগেই ঠিক করেছি, আশ্রমের ভারটা এবার আমিই নেব। মন দুর্ব্বল কিনা, তাই ভাবছিলাম, ধীরে সুস্থে ক'দিন পরে আশ্রমে যাব। কিন্তু ঠিক যখন করে ফেলেছি, অনর্থক দেরী করে লাভ কি, কি বল?'

বিপিন অভিভূতের মত বলিল, 'নিশ্চয়।'

মহেশ বলিল, 'চলো তবে আজকেই যাই।'

বিপিন ভয়ে ভয়ে বলিল, 'কিন্তু সদানন্দের বিষয়ে কি করা যাবে?'

মহেশ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'সদানন্দ আর মাধবীলতাকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিলেই চলবে।'

সদানন্দ আর মাধবীলতাকে অন্যত্র পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থার অর্থ বিপিন এক রকম বুঝিয়াছিল সদানন্দকে আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বলা হইবে এবং মাধবীলতাকে মহেশের কোন আত্মীয়ের কাছে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। মাধবীলতাকে অন্য কোথাও পাঠাইয়া দিবার অর্থটা সে ঠিক বুঝিতে পারে নাই। মহেশের আশ্রমে যোগদানের সঙ্গে সদানন্দকে সরাইয়া দেওয়ার প্রশ্ন জাগিতে পারে, মাধবীলতাকে সরাইয়া দিবার প্রয়োজন কি, কারণ কি? মহেশ যে দুজনকে একসঙ্গে সরাইয়া দিবার মতলব করিয়াছে, বিপিন সেটা কল্পনাও করিতে পারে নাই।

সদানন্দ অথবা মাধবীলতাও কল্পনা করিতে পারে নাই।

রাত্রি প্রায় দশটার সময় মাধবীলতাকে সঙ্গে লইয়া মহেশ চৌধুরী আশ্রমে আসিল, তার কিছুক্ষণের মধ্যেই তার আসল উদ্দেশ্যটা তিনজনের কাছেই পরিষ্কার হইয়া গেল। মাঝরাত্রে আশ্রমের পিছনের ঘাটে বাঁধা নৌকায় উঠিয়া সদানন্দ আর মাধবীলতা চলিয়া গেল। মাধবীলতা প্রথম দিন রাত্রে আশ্রমে আসিবার সময় নৌকা হইতে এই ঘাটেই নামিয়াছিল।

নৌকা চলিয়া গেলে মহেশ বলিল, 'আমরা সবাই মিলে এবার আশ্রমটা গড়ে তুলব বিপিন।'

ধরা-বাঁধা জীবন



মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ধরা-বাঁধা জীবন

—:*:—

এক

একদিনে ভূপেনের বৌ আর ছেলে মরিয়া গেল, কিন্তু ভূপেন কাঁদিল না। প্রথমে মরিল তার বৌ, কয়েক ঘণ্টা পরে ছেলেটা।

ভূপেনের আর ছেলেমেয়ে নাই। বছর দু'য়েক বয়স হইয়াছিল ছেলেটার। মাসখানেক আগে তার টাইফয়েড হয়। ছেলের সামান্য কিছু হইলেই ভূপেনের বৌ বড় অস্থির হইয়া পড়িত। ভাবিয়া ভাবিয়া এবং কারও বারণ না মানিয়া দিনরাত ছেলের সেবা করিয়া সে বড়ই কাবু হইয়া পড়িয়াছিল। আরও বড় একটা কারণ ছিল তার কাবু হইয়া পড়ার। মারা সে গেল সেই কারণটির শেষ ধাক্কায়—মরা একটা মেয়েকে জন্ম দিতে গিয়া।

প্রথম মরণটা যখন ঘটে, ভূপেন আনমনে একটা সিগারেট ধরাইয়া মেয়েদের কান্নার শব্দ কাণে আসা মাত্র আধপোড়া সিগারেটটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। ছেলের মরার সময়ও সে তেমনি আনমনে একটা সিগারেট ধরাইল এবং মেয়েদের কান্নার শব্দ নূতন আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠামাত্র আবার সিগারেটটা ফেলিয়া দিল।

বন্ধু ও প্রতিবেশী ভদ্রলোকেরা আসিয়াছিল। ভূপেনের বৌ মারা গেলে তারা ভাবিল, ছেলের ভাবনায় শোক মানুষটার চাপা পড়িয়া গিয়াছে, সে পরে কাঁদিবে, ছেলের একটা কিছু হইয়া গেলে। ছেলেটা মারা যাওয়ার পর তারা ভাবিল, পর পর দু'টি দুর্ঘটনায় মানুষটার ধাঁধাঁ লাগিয়া গিয়াছে, থতমত ভাবটা কাটিয়া গেলেই সে পাগলের মত মাথা কপাল কুটিয়া কাঁদাকাটা করিতে থাকিবে।

কিন্তু অল্পে অল্পে সময় কাটিয়া গেল, দেহ দুটিকে শ্মশানে নেওয়ার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিল, ভূপেন কাঁদিল না। না কাঁদিলে যে সব পাগলামী করার রীতি আছে, এ অবস্থায় সে রকম কোন পাগলামীও করিল না। কেবল মুখখানা তার দেখাইতে লাগিল অস্বাভাবিক রকম বিবর্ণ। কদিন দাড়ি কামায় নাই, স্নান হয় নাই দু'তিন দিন, ভূপেনের মুখখানা এমনিই শোকাতুর মানুষের মুখের মত হইয়া গিয়াছিল। সকলে তাই আরও বেশী অস্বস্তির সঙ্গে ভাবিতে লাগিল, মুখে যার গভীর মর্ম্মান্তিক শোকের এমন স্পষ্ট ছাপ পড়িয়াছে, সে কাঁদে না কেন?

দুটি মানুষ যে বাড়ীতে মারা গিয়াছে সদ্য সদ্য, সে বাড়ীতে অসাধারণ একটা অবস্থা সৃষ্টি হওয়াটাই স্বাভাবিক, সে জন্য কিছু আসিয়া যায় না, অস্বাভাবিক কিছু ঘটিলেই মানুষ পীড়া বোধ করে। ভূপেনের চুপচাপ থাকা ছাড়া এবাড়ীতে আর সব ঠিক মানানসই আছে। ভূপেনের মা আর পিসীমা চীৎকার করিয়া মরাকান্না কাঁদিতেছে, ভূপেনের দিদি বিমলার ঘণ্টায় ঘণ্টায় ফিট হইতেছে, ভূপেনের ছোটবোন মেঝেতে বা দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া ঠুকিয়া মাথা ফাটানোর চেষ্টা আরম্ভ করায় পাড়ার একটি বৌ দু'হাতে তাকে জড়াইয়া ধরিয়া আছে, ভূপেনের বৌদিদি ভিতরের বারান্দায় দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া গা এলাইয়া পড়িয়া আছে আর মৃদু ও মিহি গলায় গানের মতো সুর করিয়া কাঁদিতেছে, ভূপেনের দাদা পাগলের মত একবার ভিতর ও একবার বাহির করিতে করিতে হায় হায় করিতেছে। আর শোকের এই সমস্ত প্রকাশ্য অভিব্যক্তির মধ্যে চলিতেছে মরণের পরবর্ত্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার আয়োজন।

কোমরে গামছা জড়াইয়া আটদশ জন উৎসাহী ও অভিজ্ঞ মানুষ জুটিয়া গিয়াছে। হরদম বিড়ি সিগারেট পুড়িতেছে; বয়স্ক ভদ্রলোকদের মুখে নানা রকম দার্শনিক মন্তব্য শোনা যাইতেছে: বাঁচা মরার উপর মানুষের নাকি কোন হাত নাই, ভগবান কেন যে দেন আর কেন যে কাড়িয়া নেন, তিনিই জানেন, যাইতে আমাদের সকলকেই হইবে, দুদিন আগে আর পরে।

এ সমস্তের মধ্যে ভূপেনের নিঃশব্দ শোক বড়ই খাপছাড়া মনে হইতে লাগিল। প্রসন্ন

অভিজ্ঞ মানুষ। চিন্তিত মুখে সে আরেকজন অভিজ্ঞ মানুষকে বলিল 'এতো ভাল কথা নয়, একটু কাঁদাকাটা করা যে দরকার।'

ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রসন্ন ভূপেনের কাছে গেল।

'এম্নি অদৃষ্ট ভাই মানুষের, সংসার ক'রতে হলে সবাইকে এমনি ক'রে কাঁদতে হয়, কি করবে বল।'

—'আমার এ কি সর্ব্বনাশ হয়ে গেল প্রসন্নদা? কেন আমার এমন হ'ল প্রসন্নদা?'

কাঁদিতে কাঁদিতে মানুষ যে ভাবে এ ধরণের কথা বলে, অবিকল সেই রকম শোনাইল কথাগুলি। তবু বেশ বুঝা গেল ভূপেন কাঁদে নাই।

প্রসন্ন থাকে সহরের প্রায় অন্য প্রান্তে। ভূপেনকে কাঁদাইতে না পারিয়া সে হতাশ হইয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল। পরদিন আসিল প্রসন্নের বোন প্রভা। বাড়ীতে পা দিয়াই চোখ মুছিতে মুছিতে ধরা গলায় সে দাবী করিয়া বসিল, 'না না, এরকম করবেন না ভূপেনবাবু, একটু আপনি কাঁদুন। কেন চেপে রাখছেন জোর ক'রে?'

'কাঁদব?'—ভূপেন কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল।

'হ্যাঁ, কাঁদুন। প্রাণ ভরে কেঁদে নিন। তাতে কোন দোষ নেই। এরকম অবস্থায় কাঁদা যে দরকার—'

নিজের কান্না বন্ধ করিতে প্রভাকে নিজের মুখে রুমাল গুঁজিয়া দিতে হইল। এ তার লোক-দেখানো কান্না নয়, পারিলে না কাঁদিয়াই ভূপেনের সঙ্গে দেখা করার কাজটা সে সারিয়া যাইত। ভূপেনকে কাঁদাইতে আসিয়া ভূমিকা করিতে গিয়া নিজেই সে এমন ভাবে কাঁদিয়া ফেলিবে, তার ধারণাও ছিল না। সমস্ত শরীর তার থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে আর দু'চোখ দিয়া দর দর করিয়া জল গড়াইয়া পড়ে। এতখানি ব্যাকুল হইয়া প্রভা নিজে না কাঁদিলে ভূপেন হয় তো এখন কাঁদিয়া ফেলিতে পারিত, প্রভার বিকৃত মুখভঙ্গি দেখিতে দেখিতে তার মুখের এতক্ষণের কাঁদ কাঁদ ভাবটুকু পর্য্যন্ত ঘুচিয়া গেল।

দু'বছর আগে প্রভা ডাক্তারি পাশ করিয়াছে। পাশ করার অনেক আগে হইতেই সে মাঝে মাঝে আসিয়া ভূপেনের বাড়ীর ছেলে মেয়েদের চিকিৎসা করিয়া যাইত। মন তার কোনদিন নরম ছিল না, ভাবপ্রবণতা তার নাই। মনে মনে ভূপেন বোধ হয় একটু ভয়ই তাকে করে। ভূপেন তার প্রিয়জনের পর্য্যায়ে পড়ে সন্দেহ নাই, ভূপেনের বৌ আর ছেলেটাকেও সে স্নেহ করিত, তবু এ ভাবে তার কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপযুক্ত কারণ তো ভূপেনের বৌ আর ছেলের মরণ নয়। সহানুভূতির কান্না কি এমন হয়?

ব্যাপারটা ভূপেন ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। প্রভাকে সে কোনদিন কাঁদিতে দেখে নাই। বছরখানেক আগে প্রভার ছোট ভাইটি যখন মারা যায়, প্রভা নাকি তখন ভয়ানক কাঁদিয়াছিল। ভূপেন সে সময়ে এখানে ছিল না। আজ প্রভার কান্নার ভঙ্গিটা ভূপেনের অভিনব এবং খাপছাড় মনে হইতে থাকে।

কান্নার বেগ কমিয়া আসিলে প্রভা বলে, 'কি ক'রে সইবেন ভূপেনবাবু? পঞ্চুর কথা মনে হ'লে আজও যে আমার বুক ফেটে যায়? মনে হয়, আমার কেউ নেই, সব শূন্য হয়ে গেছে।'

এবার কতকটা বুঝিতে পারিয়া ভূপেন ভাবে, প্রভার তো নিজের ছেলেমেয়ে নাই, তাই ছেলেকে আর ভাইকে হারানোর তফাৎটা ঠিক ধারণা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। ছেলে মরিয়া গেলে মানুষের কেমন লাগে, ও তার কি বুঝিবে!

একটু ভাবিয়া ভূপেন বলিল, 'কেঁদো না প্রভা। শোক পাওয়া সংসারের রীতি, কি করবে বল। মানুষের তো কোন হাত নেই।'

প্রভা আরও জোরে কাঁদিয়া উঠিল।

'আমি চেষ্টা করলে হয় তো বিশুকে বাঁচাতে পারতুম ভূপেনবাবু।'

শুনিয়া ভূপেন ভাবিল, ডাক্তার হোক আর যাই হোক, প্রভা মেয়েমানুষ তো, এরকম আবোল-তাবোল কথা মনে হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

কেবল মেয়েমানুষ বলিয়াই প্রভার উপর আজ ভূপেন যেন বিশেষ মমতা বোধ করে। এবং বোধ হয় সেই জন্যই দুপুরবেলা উদ্দেশ্যহীনভাবে বাড়ীর বাহির হইয়া কি করিবে ভাবিতে গিয়া প্রথমেই ভূপেনের মনে হয়, প্রভাদের বাড়ী যাওয়ার কথা। কিন্তু মোটে কয়েক ঘণ্টা আগে প্রভা আসিয়া তার সঙ্গে দেখা করিয়া কাঁদিয়া গিয়াছে, এখন আবার তাদের বাড়ী যাইতে ভূপেনের সঙ্কোচ বোধ হয়। অন্য সময় অন্য অবস্থায় প্রভা আসিলেও একবার ছাড়িয়া দশবার তাদের বাড়ী যাওয়া চলিত, আজ বোধ হয় একটু খারাপ দেখাইবে গেলে। প্রভা কি ভাবিবে কে জানে।

ট্রামে উঠিয়া সে টিকিট করে সহরের অন্য প্রান্তে যাওয়ার, যেখানে প্রভাদের বাড়ী! কিন্তু চৌরঙ্গীতে নামিয়া গাড়ী বদল করার পরিবর্ত্তে টিকিটটা ফেলিয়া দেয়। তারপর কি ছবি দেখানো হইতেছে নাম না পড়িয়াই একটা সিনেমায় ঢুকিয়া পড়ে। টিকিট কেনার সময় সে বড়ই সঙ্কোচ বোধ করে, ভিতরে গিয়া বোধ করে অস্বস্তি। আজ কি তার সিনেমা দেখা উচিত? চেনা মানুষ কেউ তাকে এখানে দেখিলে কি মনে করিবে কে জানে! কেবল তাই নয়, ভূপেনের মনে হইতে থাকে, আজ সিনেমায় আসিয়া সে যেন সরমা আর নন্তুর স্মৃতিকে কেমন অপমান করিতেছে। ওরা দুজন যে সত্যই নাই, এ চিন্তায় ভূপেন এখনও অভ্যস্ত হইতে পারে নাই। ওদের যে পুড়াইয়া ফেলা হইয়াছে, এ কথাটা সব সময়েই মনে থাকে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে ওদের এতকালের অস্তিত্বের অনুভূতিও যেন আগের মতই জোরালো হইয়া আছে।

পর্দ্দায় একজনকে কাঁদিতে দেখিয়া ভূপেন ছবির দিকে মনোযোগ দিয়া কারণটা বুঝিবার চেষ্টা করে। তারপর ছবিটা তার ভাল লাগিয়া যায়, আর কিছু মনে থাকে না। কাহিনীটা উদ্ভট, অন্য সময় ভূপেনের বিরক্তি বোধ হইত, আজ অবাস্তব নরনারীর জীবনে স্রোতের মত খাপছাড়া অসম্ভব ঘটনা ঘটিতে দেখিয়া তার এমন মজা লাগে বলিবার নয়। এবং ছবি শেষ হওয়ামাত্র তার মনে হয়, এ জগতে যখন ধরা-বাঁধা কোন নিয়ম নাই, এখন তার প্রভাদের বাড়ী যাওয়ার মধ্যে দোষের কি থাকিতে পারে?

বাড়ীর মধ্যে প্রভা খুব হাসিতেছিল, বাহিরের ঘর হইতে শোনা যায়, এত জোরে। শুনিয়া ভূপেনের মস্ত একটা দুর্ভাবনা যেন কাটিয়া যায়। আজ সকালে প্রভা নন্তু আর সরমার জন্য কাঁদিতেছে মনে করিয়া প্রথমটা তার কিরকম খারাপ লাগিয়াছিল এবং কান্নাটা তার নিজের ভাই-এর জন্য জানিতে পারিয়া কিরকম নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়াছিল, তখন খেয়াল না হোক পরে ভূপেন সেটা বুঝিতে পারিয়াছিল। কথাটা জটিলও নয়, দুর্ব্বোধ্যও নয়। যতই কষ্ট হোক, মুক্তির একটা অবাধ্য অনুভূতিও যে প্রথম হইতে জাগিয়া আছে, সেটা না মানিয়া ভূপেনের লাভ কি? শীতকালের শেষাশেষি হাড়কাঁপানো শীতের মধ্যেও হঠাৎ একদিন আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন অনুভব করার মত স্ত্রী-পুত্রের শোকের মধ্যে হাল্কা ও ব্যাপক মুক্তির স্বাদ সে যদি পায়, প্রভার তো অভদ্র রকমের আনন্দ বোধ করাই উচিত। আহা, আজ কত কাল মেয়েটা শুধু তাকে একবার দেখিবার জন্য, তার দুটি কথা শুনিবার জন্য ব্যাকুল আগ্রহে ছুটিয়া ছুটিয়া তার বাড়ীতে গিয়াছে! বছরের পর বছর বোকার মত সে কিরকম নির্ব্বিকারভাবে প্রভার নীরব পূজা গ্রহণ করিয়া আসিয়াছিল ভাবিলে ভূপেনের কাণ গরম হইয়া ওঠে। সরমাকে বিবাহ করিবার সময় একবার তার মনেও হয় নাই, তার বৌ হওয়ার জন্য মনে মনে প্রভা ছটফট করিতেছে। ওরকম সাধারণ শ্রীহীন একটা মেয়ে যে আবার মনের মধ্যে এধরণের কামনা পোষণ করিতে পারে, এ ধারণাই তার ছিল না। প্রায় তিন চার বছর পরে প্রভার মনের অবস্থা সম্বন্ধে তার প্রথম সন্দেহ জাগে,—তাও প্রভার কথা তুলিয়া সরমা মাঝে মাঝে তাকে ঠাট্টা করিত বলিয়াই, কথাটা তার খেয়াল হইয়াছিল। তারপরেও ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে তার কি কম সময় লাগিয়াছে!

বুঝিয়াও যেন বুঝা যায় নাই, বিশ্বাস করিয়াও করিতে ভরসা হয় নাই। মন বড় শক্ত প্রভার, কথায় কাজে মনের ভাব সে সহজে ধরা পড়িতে দেয় না। তবে ক্রমে ক্রমে ভূপেনের নিজের দৃষ্টিশক্তি যেন তীক্ষ্ণ হইয়াছে, বোধশক্তি বাড়িয়াছে। প্রভার সম্বন্ধে যে কথাটা প্রথমে নিজের কাছেই উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনা বলিয়া মনে হইত, পরে নানারকম যুক্তি দিয়া সেই কথাটাকেই সে সত্য বলিয়া দাঁড় করাইতে শিখিয়াছে। প্রভার চোখের দৃষ্টিতে নেশার অস্পষ্ট ইঙ্গিতের মত একটা দুর্ব্বোধ্য স্বপ্নময় ভাব আছে বলিয়া যেদিন প্রথম মনে হইয়াছিল, ব্যাপারটা সেদিন রীতিমত হাস্যকর ঠেকিয়াছিল ভূপেনের কাছে। নিজের ছেলেমানুষী ভাবপ্রবণতার প্রমাণ বলিয়া মনে হইয়াছিল নিজের এই আবিষ্কার। কিন্তু আজকাল প্রভার চোখের দিকে চাহিয়া প্রায়ই সে স্পষ্ট দেখিতে পায়, কুয়াশার মত ঘোলাটে কিছু প্রভার দৃষ্টিকে যে নিষ্প্রভ করিয়া রাখিয়াছে। আর খাপছাড়া ঠেকে না। এরকম হওয়াই সঙ্গত মনে হয়। এতকাল মন যদি প্রভার আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়া থাকে প্রেম, চোখে তার ছাপ পড়িবে বৈকি?

হাসি থামাইয়া মুখ গম্ভীর করিয়া প্রভা নামিয়া আসিল, খানিকক্ষণ একেবারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া

থাকিয়া সে বোধ হয় ভূপেনের আকস্মিক আবির্ভাবের কারণটা বুঝিবার চেষ্টা করিল, তারপর হঠাৎ বসিয়া পড়িল নিজে।

'আজ আপনি আসবেন ভাবিনি।'

'কোথায় আর যাব বল? তুমি ছাড়া আমার কে আছে।'

নিজের অসহায় অবস্থাটা এমন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়া ভূপেন পরম তৃপ্তি বোধ করে। অনেককাল তপস্যা করার পর ভক্তকে বর দিতে আসিয়া দেবতার কেমন লাগে ভূপেনের জানিবার কথা নয়, তবু তার মনে হইতে থাকে, সে যেন ওইরকম একটি দেবতার পদ পাইয়াছে। বরদানের ভূমিকাটিও যে বেশ লাগসই হইয়াছে, প্রভার চকিত দৃষ্টিপাতে সেটুকুও সে বুঝিতে পারে। কিন্তু তারপর প্রভার মুখে যে ভয় আর ভাবনার স্পষ্ট ছাপ পড়ে, সেটা একটু দুর্বোধ্য মনে হয় ভূপেনের।

প্রভা একটু ভাবিয়া বলে, 'আপনার কথাই সারাদিন ভাবছিলাম।'

'তা জানি।'

শুনিয়া ভ্রূ কুঁচকাইয়া প্রভা যেন খানিকক্ষণ অবাক হইয়াই ভূপেনের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে।

'আমার কি মনে হয় জানেন? মনে হয়, আপনি কয়েকদিন কোথা থেকে ঘুরে এলে পারেন। কি আর করবেন এখানে থেকে?'

'ঘুরে আসতে বলছ? তা যেতে পারি—তুমি যদি সঙ্গে যাও।'

শুনিয়া প্রভা হঠাৎ হাসিয়া বলে, 'আপনি আশ্চর্য্য মানুষ। চা খাবেন?'

ভূপেন বলে, 'কেন খাব না?'

চা-ও খাওয়া হয়, কিছুক্ষণ গল্পগুজবও চলে। তারপর ভূপেন আবার বেড়াইতে যাওয়ার কথা তোলে। ধরা যাক ভূপেন গেল, সঙ্গে গেল ভূপেনের মা আর বোন, প্রভা কি তাদের সঙ্গে যাইতে পারে না?

—'তুমি বুঝি ভাবছিলে তোমায় নিয়ে একা পালিয়ে যাবার মতলব করেছি?'

প্রভা বলে, 'না, তা ভাবিনি। কিন্তু রুগীপত্র ফেলে আমি কি ক'রে যাব? এখুনি তো আমায় উঠতে হবে—একটা ডেলিভারি কেস আছে। আপনার সঙ্গে যে দুদণ্ড গল্প করব, তারও উপায় নেই।'

প্রভা ডাক্তার, রুগীপত্র ফেলিয়া ভূপেনদের সঙ্গে দেশ ভ্রমণে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়, বসিয়া যে ভূপেনের সঙ্গে একটু গল্প করিবে, সে সময়ও তার নাই। বাড়ী ফিরিবার পথেই ভূপেনের নিজস্ব জগতে একটা যেন ওলোট-পালট হইয়া যায়। এক মুহূর্ত্তে ভবিষ্যৎ হয় অর্থহীন, কল্পনা হয় তিতো, এমন তীব্র বিষাদ জাগে যেন কিছু পাপ করিয়াছে। এটুকু ভূপেন বোঝে যে ডেলিভারি কেসের দায়িত্ব সহজ নয়, না গিয়া প্রভার উপায় নাই, কিন্তু বুঝিলে কি হইবে? যত গুরুতর কাজই তার থাক, প্রভা তাকে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছে, আমার কাজ আছে, আপনি এবার যান। একথা এভাবে প্রভা যদি বলিতে পারে, এতদিন প্রভার সম্বন্ধে সে যা ভাবিয়া আসিয়াছে, তা তো সত্য হইতে পারে না।

সেইদিন বাড়ীর লোকে প্রথম টের পাইল, নিজের ঘরে আরাম-কেদারায় চিৎ হইয়া ছেলে আর বৌ-এর শোকে ভূপেন কাঁদিতেছে। ঘরে আলো জ্বলিতেছিল, ভূপেন চোখে হাত চাপা দিয়া শুইয়া আছে। পা টিপিয়া টিপিয়া কাছে গিয়া বৌদিদি দেখিয়া আসিল, গালে জলের স্রোতের দাগ।

তাই বটে। পুরুষ মানুষ কি আর চেঁচাইয়া কাঁদে

বৌদির কাছে খবর পাইয়া প্রায় সকলেই । চাপা আর্ত্তনাদের কয়েকটা অদ্ভুত শব্দ কাণে যাওয়ায় ভূপেন চোখ মেলিয়াই ছাখে, তাকে ঘিরিয়া আপনজনের ভিড়। এতক্ষণ সে ছেলে আর বৌ-এর কথাই ভাবিতেছিল। সব মনে হইতেছিল শূন্য, ভিতরে পাক খাইতেছিল একটা অসহায় যন্ত্রণা। চোখ দিয়া যে জল পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, ভূপেন জানিতেও পারে নাই। এখন টের পাইয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

ভূপেনের সজল উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি দেখিয়া বাড়ীতে একটা বিষম কাণ্ড বাধিয়া যায়। দিদির ফিট অনেকক্ষণ বন্ধ ছিল, একটা চীৎকার করিয়া সে ঢলিয়া পড়ে। ভূপেনের ছোটবোন অনু, দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া ঠুকিয়া মাথাটা যার এবরো-খেবরো হইয়া গিয়াছে, খানিকক্ষণ বিস্ফারিত চোখে দিদিকে দেখিয়া সেও এবার মূর্চ্ছা যায়।

বৌদিদি কাঁদিতে কাঁদিতে বলে, 'কি হ'ল ছাখো ঠাকুরপো।'

ভূপেন শান্তভাবেই বলে, 'হবে আবার কি, সব হিষ্টিরিয়া। ওদের চিকিৎসা হওয়া দরকার। প্রভাকে ডাকব ফোন ক'রে ?'

'এত রাত্রে ডাকবে প্রভাকে ?'

প্রভাকে বৌদিদি পছন্দ করে না।

প্রভা সব সময়েই যেন তার সমালোচনা করে। ছেলেমেয়েদের গাদা গাদা খাওয়ানো ভাল নয়, শিশু যে সব সময় ক্ষুধায় কাঁদে তা নয়, পেটের ব্যথাতেও অনেক সময় কাঁদে, মা'র নোংরামির জন্যই অনেক সময় ছেলেমেয়েদের অসুখ হয়, এই সব। সাতটি ছেলেমেয়ে বৌদিদির, কুড়ি বাইশ বছর সে স্বামীর ঘর করিতেছে, ডাক্তারিটা পাশ করিয়াই প্রভা যেন তার চেয়ে বেশী জানে—আজ পর্য্যন্ত যার একটা স্বামীও জুটিল না!

মুখে জলের ছিটা দিলেই একটু পরে এরা দু'জন উঠিয়া বসিবে, সেজন্য রাত এগারোটার সময় প্রভাকে ডাকিয়া পাঠানোর কোন অর্থই বৌদিদি বুঝিতে পারে না। তবে, সোজাসুজি বারণ করিবার সাহসও তার নাই। ক'দিন বাড়ীর লোকের ব্যবহারে সে জ্বালাতন হইয়া গিয়াছে। সরমা আর নন্তর অসুখের বাড়াবাড়ির সময় বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলিকে ভগবানের নামে ছাড়িয়া না দিয়া তাদের দিকে একটু নজর রাখিয়াছিল বলিয়া প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, ভূপেনের ছেলে আর বৌ-এর জন্য তার একটুও দরদ নাই। দু'জনে মরিয়া গেলে সে খুব কাঁদিয়াছিল, দারুণ শোকের মধ্যেও সকলে বলাবলি করিয়াছিল তার শোকের বাড়াবাড়ির কথা। ভূপেনের বৌ-এর সঙ্গে তার মনোমালিন্য ছিল বলিয়া, সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে কতগুলি ব্যাপারে ঠোকাঠুকি লাগিত বলিয়া, সে মরিয়া গেলেও যেন তার শোক হওয়া উচিত নয়! শোকের প্রথম ধাক্কায় সকলে যখন নানারকম পাগলামী আরম্ভ করিয়াছে, তখনও সে শিশুগুলিকে যত্ন করিয়াছিল, সকলকে একটু সংযত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সেজন্য দিদি যে তাকে কতবার শুনাইয়াছে ঠিক নাই: বেঁচেছিস্ বড়বৌ, না? বড়লোকের মেয়ে ছিল, সকলের আদুরে ছিল, হিংসেয় তাই জলে মরতিস্,—হাড়ে তোর বাতাস লেগেছে, না?

অন্য সময় তার সম্বন্ধে এ ধরণের কথা মনে আসিলেও বাড়ীর লোকে সাধারণতঃ চুপ করিয়াই থাকে, অথবা আড়ালে দু'চারজন চুপি চুপি নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে। বাড়ীতে একটা অসাধারণ অবস্থা সৃষ্টি হওয়ায় মুখে আর কারও আটক থাকে নাই, যা মনে আসিয়াছে মুখের উপর বলিয়া বসিয়াছে। প্রভাকে ডাকিতে বারণ করিলে ভূপেন যদি কিছু ভাবিয়া বসে, আর এখনকার মনের অবস্থায়, বলিয়া ফেলে? মেয়েদের কথা বৌদিদি গ্রাহ্য করে না, কিন্তু ভূপেন অন্যায় কিছু বলিলে বড়ই অপমান হইবে। সে অপমান সহ্য করার ক্ষমতা তার হইবে না, হয়তো চটাচটিই হইয়া যাইবে ভূপেনের সঙ্গে। এখন ভূপেনের সঙ্গে চটাচটি হওয়া উচিত হইবে না। বিবাহ করার আগে ভূপেনের সঙ্গে তার বড় ভাব ছিল। আবার ভূপেন একা মানুষ হইয়া গেল। বিবাহ যদি আবার সে করেও,—করিবে যে তাতে অবশ্য বৌদিদির কোন সন্দেহ নাই,—দু'একটা বছর তো এমনিই কাটিয়া যাইবে। এই সময়ের মধ্যে বৌদিদির সঙ্গে আবার কি আগের মত ভাব করিবে না ভূপেন? কয়েক মাস পরে বৌদিদির বড় মেয়েটার বিবাহে কর্ত্তব্যবোধে যতটা করুক, ভাইঝির উপর স্নেহের বশে যতটা করুক, বৌদিদির জন্য তার চেয়ে বেশী কিছু সে কি করিবে না?

দু'টি ননদকে মূর্চ্ছা যাইতে দেখিয়া মনের দুর্ব্বলতায় বৌদিদি কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। ভূপেনের শান্ত ভাব দেখিয়া আর প্রভাকে ডাকিবার কথা শুনিয়া চোখের পলকে সে কান্নাও বন্ধ করিয়া ফেলে, এত সব কথা তার ভাবাও হইয়া যায়। ভূপেনের পরামর্শ চাওয়ার জবাবে আমতা আমতা করিয়া চারিদিক বজায় রাখিয়া পাল্টা প্রশ্ন করে। স্পষ্ট বলে না যে, এতরাত্রে প্রভাকে ডাকা উচিত নয়। প্রভাকে ডাকাই যে ভাল, তাও বলে না।

কিন্তু তার কথা শুনিয়া ভূপেনকে মুখ গম্ভীর করিয়া নীরবে ভাবিতে দেখিয়া বৌদিদি একটু ভড়কাইয়া যায়। নিজের বক্তব্য আরও পরিষ্কার করিয়া বলে, 'তা, তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর। আমি ওসব কি বুঝি!'

ভূপেন জিজ্ঞাসা করে, 'প্রভাকে তোমার কেমন লাগে বৌদি?'

বৌদিদি লাগসই জবাব খুঁজিতে খুঁজিতে ভূপেন আবার জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা, সেদিন আমার নামে কিসব বলছিল না তোমাদের কাছে? আমি ভীষণ শক্ত মানুষ, দয়ামায়ার ধার ধারি না, এইসব?'

বৌদি বলে, 'কই না, ওসব কিছু তো বলে নি। ঠাকুরঝিদের কাছে যদি ব'লে থাকে—'

এতক্ষণে অমু উঠিয়া বসিয়াছে। ভূপেন তাড়াতাড়ি প্রভাকে ফোন করিতে নীচে চলিয়া গেল। সকলে সুস্থ হইয়া উঠিলে এতরাত্রে তাকে ফোন করার আর উপলক্ষ থাকিবে না।

প্রভা আসিয়া পৌছিতে পৌছিতে রাত্রি বারটা বাজিয়া গেল। দিদি এবং অমু তখন বেশ সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে।

সারাদিন প্রভার দেহ এবং মন দুয়েরই অনেক পরিশ্রম গিয়াছে। বাড়ী ফিরিয়া ঘুমানোর আয়োজন করিতে করিতে ভূপেনের জোর তাগিদে উঠিয়া আসিয়াছে। বিরক্ত হইয়া মুখ ভার করিয়া সে বলিল, 'কাল সকালে ডাকলেই পারতেন।'

ভূপেন বলিল, 'দুজনেই অজ্ঞান হয়ে পড়ল কিনা—'

প্রভা বলিল, 'ওরকম যারা কথায় কথায় অজ্ঞান হয়, তাদের গায়ে বালতি বালতি জল ঢেলে দিতে হয়। আমি ওর কি চিকিৎসা করব!'

ভূপেন নীচু গলায় আদর করিয়া বলিল, 'তুমি রাগ করেছ প্রভা?'

প্রভার বোধ হয় মনে পড়িয়া গেল এই মানুষটার সম্প্রতি ছেলে আর বৌ মারা গিয়াছে। সেও এবার শান্ত গলায় বলিল, 'না, রাগ করিনি। বড় ঘুম পেয়েছে কিনা—'

'এখানেই ঘুমিয়ে থাকো?'

এ প্রস্তাবে প্রভা রাজী হইল না। নিজের বিছানাটি ছাড়া তার ঘুম আসে না। তাছাড়া কাল ভোর হইতে না হইতে রোগী আসা আরম্ভ হইবে।

তখন ভূপেন বলিল, 'চলো তবে তোমাকে পৌছে দিয়ে আসি।'

প্রভা বলিল, 'উঁহু, রাত একটার সময় আপনি আমায় অতদূরে পৌছে দিতে যাবেন, তার কোন মানে হয় না। ফিরতে ফিরতে আপনার আড়াইটে তিনটে বেজে যাবে। কাল বোধ হয় সারারাত ঘুমোন নি—' সঙ্গে যে দাসী আসিয়াছিল, তার সঙ্গেই প্রভা ফিরিয়া গেল।

দুই

এমনিভাবে প্রভার সঙ্গে ভূপেনের একদিনে তিনবার দেখা হইয়া গেল, ছেলে আর বৌ-এর শোকের প্রথম ধাক্কায় সে যখন কাবু হইয়া পড়িয়াছে। তারপর প্রভার সঙ্গে দু'একদিন অন্তর দেখা হইতে থাকে, দিন কাটিতে কাটিতে মাস কাটিয়া যায়। ভূপেন স্পষ্ট করিয়া প্রভাকে কিছু বলে না, ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকে। ভাবে, কিছুদিন চুপ করিয়া থাকাই উচিত। ছেলে বৌ মারা যাওয়ার পর কিছু সময় কাটিতে না দিয়া প্রভাকে বলা সঙ্গত হইবে না যে, এবার বৌ হও প্রভা।

কেবল এইজন্যই যে ভূপেন চুপ করিয়া থাকে, তা নয়। ছেলে আর বৌ-এর শোকটাই তাকে বাধা দেয়। ভূপেন কাঁদে না, কিন্তু ভাবে। প্রায় সব সময়েই ভাবে। চোখ বুজিয়া ভাবিতে ভাবিতে কখনও সরমাকে কখনও নন্তুকে চোখের সামনে দেখিতে পায়, ওদের চোখের মুখের হাতের পায়ের চুলের দাঁতের এক একটি বৈশিষ্ট্য হঠাৎ এক সময় স্পষ্ট হইয়া ওঠে। ওদের হাসি কান্নার মুখ-ভঙ্গি মনে করিতে গিয়া শব্দ পর্য্যন্ত শুনিতে পাইয়া দু'একবার ভূপেন চমকাইয়া পর্য্যন্ত ওঠে।

সরমার বাক্স আলমারী ঘাঁটিতে ভূপেনের ভাল লাগে। মাঝে মাঝে দরজা বন্ধ করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওই খেলাতেই সে মাতিয়া থাকে। কত বিচিত্র কাপড় জামাই সরমার ছিল, প্রসাধনের কত বিভিন্ন সামগ্রী। গায়ে আঁটে না এত সোণার গয়না ছিল, তবু রাশি রাশি কাঁচের চুড়ি জমা করা আছে দেখিয়া ভূপেন যেন আশ্চর্য্য হইয়া যায়, নতুন করিয়া আজ যেন সে বুঝিতে পারে কি ছেলেমানুষই ছিল তার সরমা। দু'টি দামী কাপড়ের ভাঁজে খানিকটা আচার পাওয়া যায়। সরমার চুরি করিয়া আচার খাওয়ার সখ ছিল, কবে ধরা পড়িবার ভয়ে এখানে আচার গুঁজিয়া দিয়াছিল, তারপর আর মনে ছিল না। তিন শিশি ওষুধ একটি বাক্সের তলে লুকানো অবস্থায় পাওয়া যায়। মাস ছয়েক আগে সরমাকে শরীর ভাল করার জন্য ওষুধ দেওয়া হইয়াছিল। এতদিন পরে আজ ভূপেন টের পায় ওষুধ সরমা খাইত না, তাকে ফাঁকি দিয়াছিল। দুষ্টামিও কি কম জানিত তার সরমা!

অজস্র স্মৃতিচিহ্নের মধ্যে সরমা তার স্মৃতি আর পরিচয় রাখিয়া গিয়াছে। বাক্সটি খোলামাত্র যে গন্ধ নাকে লাগে, তাও যেন সরমারই একটা ঘনিষ্ঠ স্থায়ী অস্তিত্ব। ভূপেন জোরে শ্বাস টানে, সরমার প্রত্যেকটি দরকারী অদরকারী জিনিষ হাতে করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া ভাখে। কিছুক্ষণ কাটিয়া যাওয়ার পর সে স্পষ্ট বুঝিতে পারে, কেমন যেন একটা নেশা হইয়াছে।

সরমার স্মৃতিচিহ্নের বেলা এরকম হয়, নন্তর স্মৃতিচিহ্নের ব্যাপার অন্য রকম। সরমার জামা কাপড়ের সঙ্গেই নন্তর কত পোষাক আছে, বাক্সে আলমারীতে তার কত খেলনা, ঘরেও কত কি জমা করা আছে এখানে ওখানে। কিন্তু নন্তর কোন জিনিষ যেন সহজে ভূপেনের চোখেই পড়িতে চায় না। দেখিবার বা ঘাঁটিবার বিশেষ আগ্রহও তার নাই। কখনও যদি খেয়াল হয় যে ঘরের কোণের ছোট টেবিলটার উপরকার ছবির বই-এর গাদাটি ছিল নন্তর, ভূপেনের বুকের মধ্যে হুহু করিতে থাকে। এ যে নন্তর স্মৃতিচিহ্ন, আজ নন্ত নাই বলিয়া কতগুলি আস্ত আর মলাটছেঁড়া নতুন ও পুরাতন শিশুপাঠ্য বই দেখিয়া নন্তর কথা মনে করিয়া তার কষ্ট হইতেছে, এ সব ভূপেন ভাবেনা, ছেঁড়া মলাটটা দেখিয়া তার মনে পড়িয়া যায় না কি দুরন্ত ছেলেই ছিল তার নন্ত, একটা প্রায় অচিন্তনীয় ও অসহ্য যন্ত্রণা তার ভিতরে মোচড় দিতে থাকে।

তবে বেশীক্ষণের জন্য নয়। সরমার কথা মনে পড়িয়া যায়, মনে পড়িয়া যায় যে তার একটি ছেলে ছিল, সে ছেলেটি মরিয়া গিয়াছে এবং এইসব কথা মনে পড়িয়া যে গভীর শোক জাগে, তার নীচে নন্তর সম্বন্ধে মনের দুর্বোধ্য ও যন্ত্রণাদায়ক প্রক্রিয়াটা চাপা পড়িয়া যায়। শ্মশানে ভূতের ভয়ে যার মূর্চ্ছার উপক্রম হয়, ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া আসিয়া সে নিজের ঘরে বসিয়া ভূতের গল্প পড়িয়া পড়িয়া শিহরিয়া উঠিতে পারে। ভূপেনও কতকটা সেই রকম করে।

একদিন প্রভা বলিল, 'আপনি নাকি ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে কাঁদাকাটা করেন, বৌদির কাছে শুনলাম?'

ভূপেন বলিল, 'না, কাঁদাকাটা করব কেন? হৈ চৈ গোলমাল ভাল লাগে না, তাই দরজা বন্ধ ক'রে বসে থাকি।'

'চুপচাপ বসে থাকেন?'

'ঠিক বসে থাকি না—'

'আরও একমাসের ছুটি নেবেন শুনলাম? কোথাও যদি না-ই যান, ঘরের কোণে মন খারাপ ক'রে বসে থাকার জন্য ছুটি নিয়ে লাভ! তার চেয়ে কাজে কর্মে মেতে থাকা ঢের ভাল।'

ভূপেন একটু ভাবিয়া বলিল, 'একমাস নয়, তিন মাসের ছুটির দরখাস্ত করেছি। এ তিনমাসের মাইনে পাব। তারপর তিনমাস আদ্ধেক মাইনেয় ছুটি নেব, তারপর ছ'মাস বিনে মাইনেয়।'

প্রভা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, 'কেন?'

কথা হইতেছিল প্রভাদের বাড়ীতে, প্রভার ঘরে, দুপুরবেলা। সকালে প্রভা ভূপেনদের বাড়ী গিয়াছিল, ভূপেন বাড়ী ছিল না। ভূপেন তাই দুপুরবেলাই দেখা করিতে আসিয়াছে। দেরী করিয়া আসিলে অবহেলা মনে করিয়া প্রভার মনে যদি কষ্ট হয়? দুপুরবেলা এ সময়টা প্রভার একটু ঘুমানো অভ্যাস। চোখ দু'টী তার ঝিমাইয়া আসিয়াছিল। বিস্মিত হইলে প্রভা মাথাটা একটু পিছন দিকে ঠেলিয়া ঘাড়টা একটু বাঁকাইয়া আড় চোখে তাকায়, সেই সঙ্গে শরীরটাও একটু বিশেষ ভঙ্গিতে কাত হইয়া পড়ে। এটা তার চিরদিনের অভ্যাস। ভূপেনের অনেকবার দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল, কিন্তু কোনদিন চাহিয়া ছাখে নাই। আজ খুঁটিয়া খুঁটিয়া বিশেষভাবে দেখিতে দেখিতে প্রভার প্রশ্নের জবাব দিতে সে ভুলিয়া গেল।

প্রভার বিস্ময় কমিয়া গেল। অস্বস্তি বোধ করিয়া সে আবার বলিল, 'এতদিনের ছুটি নেবেন কেন?'

তখন ভূপেন বলিল, 'বছরখানেক না কাটলে তো আর আমাদের বিয়েটা হ'তে পারবে না। আমার যা মনের অবস্থা, তাতে আপিসের কাজ আমার দ্বারা হবে না প্রভা। তুমি যা ভাবছ তা কিন্তু নয় প্রভা, তোমার জন্যই মনটা আমার বেশী অস্থির হয়ে পড়েছে। সাত আট বছর তোমার মনে কষ্ট দিয়েছি ভাবলেই—'

প্রভার চোখে মুখে এবং দেহে আবার বিস্ময়ের ভঙ্গি ফুটিয়া ওঠে। প্রভাকে কি বলিবে ভূপেন অনেকবার ভাবিয়া রাখিয়াছিল, এতদিনে মুখস্থ হইয়া যাওয়ার কথা। আজ যে বলিবে, এটা অবশ্য ঠিক ছিল না, তবু ভাবিয়া রাখা কথাগুলির বদলে এসব কথা বলিয়া ফেলিল কেন, ভূপেন বুঝিতে পারে না। শান্তভাবে সরল ভাষায় প্রভাকে জানানো যে সে তাকে বহুদিন হইতে ভালবাসে এবং তেমনি সহজ শান্তভাবে বাকী জীবনটা একসঙ্গে কাটানোর জন্য তার সম্মতি চাওয়া, এর মধ্যে সাত আট বছর প্রভার মনে কষ্ট দেওয়ার প্রশ্ন তো নাই!

বিব্রতভাবে ভূপেন আবার বলিল, 'আমি বলছিলাম কি, লোকে যা ভাবে ভাবুক, আর মাসখানেকের মধ্যে আমরা বিয়েটা সেরে ফেলি এসো। এতদিন উপায় ছিল না, তাই কোন রকমে কাটিয়েছি, এখন আর তোমায় ছেড়ে একটা দিনও থাকতে পারছি না প্রভা।'

প্রভা নীরবে উঠিয়া জানালার কাছে সরিয়া গেল। জানালায় কিছুই দেখিবার নাই, কয়েক হাত তফাতেই পাশের বাড়ীর দেয়াল। মাঝখানে ইঁটপাতা সরু গলি, পায়ে পায়ে ইঁটগুলি ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। প্রভার মাথার পিছনে আলগা অসম্পূর্ণ খোঁপা দেখিতে দেখিতে ভূপেনের হঠাৎ আঘাত পাওয়ার মত তীব্র লজ্জা বোধ হয়। কেবল লজ্জা নয়, ঘুম বা নেশার ঘোর কাটিয়া গিয়া সচেতন হইয়া উঠিবার মত একটা অনুভূতি এমন স্পষ্টভাবে অনুভব করিতে আরম্ভ করে যে, তার মনে হয়, অনেকগুলি দিন একটা অদ্ভুত আত্মবিস্মৃতির মোহে আচ্ছন্ন হইয়া থাকিবার পর এই মুহূর্ত্তে সত্য সত্যই বুঝি তার চেতনা হইয়াছে। এই কয়েকদিন, সরমা ও নন্তুর মৃত্যুর পরের দিনগুলি, কিছুই সে সজ্ঞানে করে নাই।

কি ভাবিতেছে প্রভা? বুড়ো বয়সে বৌ মরা মাত্র আবার বিবাহ করার জন্ম তাকে ক্ষেপিয়া উঠিতে দেখিয়া হয়তো সে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। হয়তো বুঝিয়াই উঠিতে পারিতেছে না, স্ত্রী-পুত্রের জন্ম যার চোখের জল শুকানোর সময় পায় নাই, সে কেমন করিয়া এত সহজে আরেকজনের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করে। হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় আত্মবিস্মৃতির মুহূর্ত্তে কথাগুলি সে বলিয়া ফেলে নাই, প্রভা তা জানে। সেরকম কোন ভূমিকাই গড়িয়া ওঠে নাই। আজও নয়, আগেও নয়। প্রৌঢ় বয়সের স্বাভাবিক ধীরতার সঙ্গে প্রায় আবেগহীন ভাষায় সে ঘোষণা করিয়াছে তার প্রেম ও প্রয়োজনের প্রস্তাব। তার প্রেম ও তার প্রয়োজন। প্রভাকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া সে যেভাবে প্রভাকে বলিত, তুমি না গেলে কিন্তু চলবে না প্রভা, সেই ভাবে সে তাকে জানাইয়া দিয়াছে তাকে ছাড়িয়া একটা দিনও সে থাকিতে পারিতেছে না। গলাটা একটু কাঁপিয়া পর্য্যন্ত যায় নাই।

বিয়াল্লিশ বছর বয়স হইয়াছে। বিয়াল্লিশ বছর! অথবা তেতাল্লিশ? তেতাল্লিশ হওয়াও তো আশ্চর্য্য নয়। ভূপেন আশ্চর্য্য হইয়া যায়। নিজের বয়স সম্বন্ধে তার সঠিক ধারণা নাই, মনে মনে একটা আন্দাজী হিসাব রাখিয়াই সন্তুষ্ট হইয়া আছে? বছরের কি এত ছড়াছড়ি জীবনে যে, হিসাব রাখিতেও এত অবহেলা?

প্রভার কত বয়স হইয়াছে?

সরমার বয়সটা মনে আছে। আর নন্তুরা বিবাহের সময় সরমার বয়স ছিল সতের, দশ বছর পরে সে মারা গিয়াছে। নন্তু বাঁচিয়া থাকিলে এই ফাল্গুনে তার ন'বছর বয়স হইত।

সরমার চেয়ে প্রভা তিন চার বছরের বড়। প্রভার তবে ত্রিশের কাছে বয়স পৌছিয়াছে। তাই বটে। একটু তাই মোটা হইয়া পড়িয়াছে প্রভা আজকাল, একটু শিথিল হইয়া পড়িয়াছে তার দেহ আর মন, কথা আর চালচলনে আসিয়াছে গাম্ভীর্য্য। একদিন, অনেকদিন আগে, সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া ধাপে ধাপে পা ফেলিয়া প্রভাকে নামিতে দেখিয়া তার মন ভুলিয়াছিল, মনে হইয়াছিল তার নিজের জীবনের ছন্দ ও তরঙ্গ যেন রূপ ধরিয়া নীচে নামিয়া দূরে চলিয়া যাইতেছে। আজ সমতল মেঝেতে পা ফেলিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া থাকার সময় প্রভাকে একটু মোটা মনে হইয়াছে বটে।

বাহিরের সঙ্গে ভিতরেও প্রভার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কেবল তার নিজের পরিবর্ত্তন। ভূপেন ভাবে: এতগুলি বছর ধরিয়া চোখের সামনে ধীরে ধীরে প্রভার এই পরিবর্ত্তন না ঘটিয়া যদি চোখের আড়ালে ঘটিত? আজ হয়তো প্রভাকে এত সহজে মনের কথা সে বলিতে পারিত না। ইচ্ছা থাকিলেও সাহস হয়তো হইত না।

প্রভা ফিরিয়া আসিয়া সামনে একটা চেয়ারে বসিল। তার মুখ দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই ভূপেনের আকস্মিক আত্মপ্রকাশ তাকে কিছুমাত্র বিস্মিত বা বিচলিত করিয়াছে। তার শান্ত নির্ব্বিকার মুখের ভাব দেখিয়া ভূপেন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

'এখন ওসব আলোচনা থাক্, ভূপেনবাবু।'

কালও প্রভা তাকে ভূপেনবাবু বলিয়াছে, আট ন'বছর ধরিয়া বলিয়া আসিতেছে। অনেকদিন আগেই হয়তো প্রভা আপনি ছাড়িয়া তুমিতে নামিয়া আসিতে পারিত, শুধু চলিয়া আসিতেছিল বলিয়াই অভ্যাসের মত ভূপেনবাবু বলাটাই বজায় থাকিয়া গিয়াছে। আজ সম্বোধনটা ভূপেনের কাণে বিঁধিবার কোন কারণ ছিল না। অবুঝ শিশুর মত ভূপেন তবু এই অর্থহীন শব্দকে যাচিয়া সঙ্কেতের অর্থ দিয়া মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল।

'কেন?'

'আপনার যে রকম মানসিক অবস্থা—'

'আমার মানসিক অবস্থা ঠিক্ আছে।'

'তাই কি থাকতে পারে? বৌদি আর নন্তুর জন্ম আপনার মন—'

'ওদের কথা বাদ দাও প্রভা। ওদের আমি ভুলতে চাই।'

'ভুলতে চাইলেই কি ভোলা যায়? ভুলবার কথা হলে ভুলবার জন্য চেষ্টা করতে হয় না। আপনা থেকেই মানুষ ভুলে যায়। আপনি আজ যা বললেন, কেবল আমার জন্য বলেন নি। তা হলে এত শীগগির বলতে পারতেন না। ওদের জন্য আপনার ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে। সে কষ্ট সইতে পারছেন না বলেই এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আপনি ভাবছেন অন্য রকম, কিন্তু আপনার মনের তলে তাগিদ আছে, যে কোন উপায়ে হোক কষ্টটা যাতে সহ্যের সীমায় আনা যায়।'

ভূপেন আহত বিস্ময়ে প্রভার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। কোন দিন সে প্রভাকে মুখে কিছু বলে নাই, অন্যভাবে জানানোর কোন চেষ্টাও করে নাই, তবু এতকাল তার ধারণা ছিল প্রভা সব জানে। একটা অনির্দিষ্ট সুখের মত এই ধারণা তার মনে দিনের পর দিন স্থান পাইয়া আসিয়াছে। আর কিছু না হোক, প্রভা সব জানে। কতদিন প্রভার সঙ্গে নন্তুর অসুখের কথা আলোচনা করিতে করিতে দুজনে তারা নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছে, প্রভার ক্লিষ্ট মুখে গভীর শ্রান্তির ছাপ দেখিয়া সে কি করিবে ভাবিয়া পায় নাই। তারপর প্রভার মুখে ধীরে ধীরে শান্তি ও তৃপ্তির লাবণ্য ঘনাইয়া আসিতে দেখিয়া, নিজেও যে কি গভীর স্বস্তি বোধ করিয়াছে, বলিবার নয়। ভাবিয়াছে, হতাশার মধ্যে প্রভা এতক্ষণে সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাইল, এতক্ষণে তার মনে পড়িয়া গেল যে, সে একা নয়, সামনে যে মানুষটা বসিয়া আছে, সেও তাকে চায়।

আজ প্রভা তার ব্যাকুলতার মানে করিতেছে অন্য রকম। স্ত্রী পুত্রের শোকে তার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে, তাই সে তাকে চায়, শোকের অসহ্য জ্বালার মলম হিসাবে। আট বছর ধরিয়া তার মনকে জানিয়া রাখিলে তার কথার এ ব্যাখ্যা করা তো প্রভার পক্ষে সম্ভব হইত না।

প্রভা আবার বলিল, 'ছুটি নেবেন বলেছিলেন, তাই করুন আপনি। ছুটি নিয়ে ঘুরে আসুন বাইরে থেকে। মন শান্ত হয়ে যাবে।'

'মন তো বিশেষ অশান্ত মনে হচ্ছে না প্রভা।'

'নিজেই তো বললেন।'

'তুমি যা বলছ, আমি তা বলিনি।'

'আপনি কি বলতে চান বৌদি আর নন্তুর জন্য আপনার একটুও কষ্ট হয় নি? ওদের ভুলে গেছেন?'

'অমন কথা বলতে চাইব কেন?'

'তাইতো মানে দাঁড়ায় আপনার ব্যবহারের। হয় ওদের শোকে দিশেহারা হয়ে গেছেন, নয় ওদের মনে নেই। আর কি মানে হতে পারে বলুন?'

এতদিন পরে প্রভাকে মানে বুঝাইয়া বলিতে হইবে।

'তুমি জান না মানে?'

'ভেবে তো পাচ্ছি না।'

অভিভূতের মত খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া ভূপেন হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। শোক দুঃখে ভরা জীবনে তার আজ প্রথম এক যন্ত্রণাদায়ক ধাঁধাঁ আসিয়াছে। মিথ্যা আর ভুলে ভরা এক অবিশ্বাস্য দুর্ব্বোধ্য অভিজ্ঞতা।

যাওয়ার সময় প্রভা মৃদুস্বরে বলিল, 'রাগ করলেন?'

ভূপেন বলিল, 'না। রাগ করার কি আছে?'

তিন

প্রভার উপর রাগ করিয়াই ভূপেন ছুটির দরখাস্ত বাতিল করিয়া দিল। মন অশান্ত বলিয়া সে দিশেহারা হইয়া গিয়াছে, পাগলামি করিয়াছে? প্রভা বুঝুক, মন অশান্ত হইলেও সে দিশেহারা হয় না, পাগলামি করে না। দুঃখ কষ্ট সহ্য করিবার জন্য তাকে ছুটি লইয়া দূরে পলাইয়া যাইতে হয় না।

সরমা আর নন্তুর জন্য শোকের তীব্রতা সাধারণ নিয়মেই কমিতে থাকে। কেবল জাগিয়া থাকে একটা গভীর অভাব-বোধ। আঘাতের বেদনা দিয়া সে অভাব-বোধকে আর অবশ করিয়া রাখা যায় না, বৈরাগ্যের উদাসীনতা দিয়া অবহেলাও করা যায় না। রীতিমত অসন্তোষ লইয়া দিন কাটাইতে হয়। ফাঁকার মর্য্যাদাহানি ঘটে এবং অপবাদ জোটে ফাঁকির: প্রথম যৌবনের কাব্যোন্মাদনাকে মহাজন-ব্রতী—কম বেশী যে ব্রত সকলেরই পালনীয়—যেমন গাল দেয়।

স্নেহ করার সঙ্গে সরমাকে ভূপেন শ্রদ্ধা করিত, মনে মনে তাকে একটু ভয় করার অভ্যাসও বুঝি তার জন্মিয়া গিয়াছিল। তার এই বিস্ময়কর মানসিক প্রক্রিয়ার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা করা কঠিন।

প্রভাকে পাইয়া জীবনের পরিপূর্ণতা লাভের বাধা ছিল সরমা। সাত আট বছর ধরিয়া সে জানিয়া রাখিয়াছিল, সরমার জন্যই প্রভার সঙ্গে শুধু ভদ্র ব্যবহারের সম্পর্ক বজায় রাখিয়া তাকে

বাকী জীবনটা কাটাইয়া দিতে হইবে। তবু কোন দিন সে সরমার উপর বিদ্বেষ অনুভব করে নাই। বরং সর্ব্বদা সরমার কাছেই নিজেকে তার অপরাধী মনে হইয়াছে। সরমার জন্য বঞ্চিত জীবনযাপন করিতে হইবে বলিয়া না হোক, তার কাছে এই অপরাধের অনুভূতিতেই ভূপেনের মনে বিদ্রোহ জাগা উচিত ছিল, কারণ, মানুষের মন আত্মপীড়নের উপলক্ষকে ঘৃণা করে। কিন্তু ভূপেনের মনে প্রতিক্রিয়া হইয়াছে বিপরীত, সরমার জন্য সে বোধ করিয়াছে মমতা। কারণটা বোধ হয় এই যে, চিরদিন সে বিশ্বাস করিয়াছে সরমাকে কিছুদিন সত্যসত্যই সে ভালবাসিয়াছিল এবং সরমা তাকে সর্ব্বদা ভালবাসে, তার মনটাও সরমার সম্পত্তি, প্রভাকে দান করার কোন অধিকার তার নাই। সে প্রভাকে চায় জানিতে পারিলে বেচারী সরমা মনের দুঃখেই মরিয়া যাইবে, এই ছিল ভূপেনের ধারণা। অনেক সময় সে সরমার সেই মর্ম্মাহত অবস্থা কল্পনা করিত আর সহানুভূতি ও মমতায় সে নিজেই হইয়া পড়িত কাতর। সরমা যে অসুখী ছিল তা নয়, কিন্তু নিজের এই কল্পনা ভূপেনের মনে তাকে করিয়া রাখিত বিষাদময়ী।

সাধারণ জীবনের খুঁটিনাটি সুখ সুবিধা ও অভ্যাসের ব্যতিক্রমে বিরক্তি বোধ করিবার মত মানসিক অবস্থা ফিরিয়া আসিলে, ভূপেন অনুভব করিতে লাগিল, কতদিকে কতভাবে সরমার জীবনের সঙ্গে জীবনটা তার জড়াইয়া গিয়াছিল।

জীবনে তার প্রথমে আসিয়াছিল সরমা, তারপর মনে আসিয়াছিল প্রভা। তারপরেও সরমার সঙ্গেই তার জীবন কাটিয়াছে বছরের পর বছর, প্রভাকে সে চাহিয়াছে মনে মনে। আজও সে প্রভাকে চায় কিন্তু সরমাকে ছাড়া কি করিয়া তার দিন কাটিবে, তাও সে ভাবিয়া পাইতেছে না! সরমার সেবা, সংসারের ছোট বড় ব্যাপারে সরমার সঙ্গে পরামর্শ, সম্মুখে অথবা আড়ালে সরমার উপলব্ধ উপস্থিতি, এ সবও যে তার বাঁচিয়া থাকার জন্য এত বেশী প্রয়োজনীয়, ভূপেন তা জানিত না। সারাটি সন্ধ্যা প্রভাকে ঘিরিয়া মনে মনে স্বপ্ন রচনা করিয়া শুইতে গেলে আজও তার সরমার অভাবেই বিছানা খালি মনে হয়, মাঝরাত্রে ঘুম তার ভাঙ্গে সরমাকে চাহিয়া। ভূপেনের গভীর সংশয় জাগে। মাঝে মাঝে মনে হয়, প্রভাকে কাছে না পাইলেও তাকে কেন্দ্র করিয়া কল্পনা ও কামনার জাল বুনিতে বুনিতে দিন যদি বা কাটানো চলে, বাস্তব জীবনে সরমার অভাব সহ্য করিয়া বাঁচিয়া থাকা সম্ভব নয়।

কিন্তু প্রভাকে কেন্দ্র করিয়া কল্পনা ও কামনার জাল বুনিবার দিনও তার শেষ হইয়া গিয়াছে! প্রভা তার স্বপ্ন জানে না, মানে না। স্ত্রী পুত্রের জন্য নিজের ও বাড়ীর মানুষের কান্নার দিনগুলি কাটিবার আগেই তাকে লইয়া নূতন জীবন সুরু করিবার প্রস্তাব শুনিয়াই প্রভা চমকাইয়া গিয়াছে, ধরিয়া লইয়াছে এটা একটা শোকার্ত্ত মানুষের পাগলামি।

কথাটা ভাবিতে গেলেও ভূপেনের মাথা ঘুরিয়া যায়। প্রভা তাকে ভালবাসে না, প্রভা জানে না সে তাকে ভালবাসে! সাত আট বছর এমন একটা ভুল ধারণা সে পোষণ করিয়া আসিয়াছে, একি সম্ভব হয়? দিনের পর দিন কত ঘনিষ্ঠভাবে তারা মেলামেশা করিয়াছে, তবু ভুল ধরা পড়ে নাই?

এই চিন্তার জালার সঙ্গে ভূপেন অনুভব করে, বন্ধন আলগা হইয়া গিয়াছে। বাহিরে থাকিলে বাড়ী ফিরিবার তাগিদ আগেও ছিল না, যেখানে খুসী যাওয়ার বাধাও ছিল না। শুধু মনে পড়িত বাড়ীতে সরমা ও নন্তু, এই দু'জন আপনার জন আছে—নিজের ঘরে একটু একা থাকিবার জন্য মনটা ছটফট করিবার সময়েও যাদের খুসীমত কাছে আসিবার ও মনোযোগ আকর্ষণ করিবার অধিকার ছিল। মনোযোগ দাবী করিবার এখন কেউ নাই, কিছুই নাই! জীবনের যে অংশটুকু পরাধীন ছিল, তাও স্বাধীনতা পাইয়াছে।

এই মুক্তির প্রথম প্রতিক্রিয়া, সরমা আর নন্তুর চিন্তা ঠাণ্ডা হওয়ার আগেই প্রভার কাছে তার বিবাহের প্রস্তাব। বারুদের মত এই একটিমাত্র প্রতিক্রিয়ায় মুক্তির উচ্ছ্বাস উন্মাদনা যেন শেষ হইয়া গিয়াছে। বন্ধন নাই, এ অনুভূতিও অভাব বোধের মত ভোঁতা হইয়া গিয়াছে।

একদিন দু'টি পুরাণো বন্ধু বহুকাল পরে ভূপেনকে দুঃখের জগতে দুঃখের জীবনে একটু আনন্দ করার আহ্বান জানায়, বলে, 'এখন তো বাইরে রাত কাটাতে বাধা নেই, এসো না?'

দু'জনেই সংসারী, ধীর স্থির হিসাবী মানুষ, একজন সম্প্রতি মেয়ের বিবাহ দিয়া শ্বশুর হইয়াছে। শান্তিপূর্ণ সংসারে নিখুঁত গার্হস্থ্য জীবন তারা যাপন করে। চর্ব্বিস্নিগ্ধ দেহে, বেশভূষা চালচলনে উগ্র

আমোদ-প্রমোদের পিপাসার ইঙ্গিত বা অপচয়ের ছাপ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

'এখনো ওসব আছে নাকি তোমাদের?'

অজিত একটি ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর ম্যানেজার, ভূপেনের সঙ্গে এককালে তারই বন্ধুত্বের বন্ধন ছিল সব চেয়ে জোরালো। হতাশার স্তিমিত হাসি হাসিয়া সে বলে, 'মাঝে মাঝে—মাসে দু'তিন রাতের বেশী হয় না। আগের সে দিন কি আর আছে ভাই, বড় একঘেয়ে লাগে, মাঝে মাঝে তাই একটু—'

উৎসাহ জাগে না। ঝড়ের রাত্রির মত প্রথম যৌবনে কয়েকটি ফূর্ত্তির রাত্রি আসিয়াছিল, অভ্যস্ত হইতে পারে নাই। রজনীব্যাপী বেপরোয়া উল্লাসের চেয়ে রাত্রিশেষের অবসাদের স্মৃতি মনকে আজ বিষণ্ণ করিয়া দেয়। কতকটা অনাবশ্যক অপ্রিয় মুক্তির আরেকটা বড় রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে সে রাজী হয়, অনিচ্ছার সঙ্গে।

সন্ধ্যার পর দোকানের মত সাজানো ঘরে ঢুকিয়াই মন তার আরও দমিয়া যায়, গেলাসে প্রথম চুমুক দিবার সময় আতঙ্ক জাগে, তিনটি স্ত্রীলোকের সান্নিধ্য ভিতরের অমর অনাহত লাজুক তরুণটিকে পীড়ন করে, জীবনের সময় ও জবনীশক্তির স্বার্থপর সতর্ক প্রহরীর মত নিজেই সে এক মুহূর্ত্ত সময় ও একবিন্দু শক্তির অসার্থক অপচয়ের বিরুদ্ধে ক্রমাগত নিজেকে সাবধান করিয়া দিতে থাকে। মাঝরাত্রে যখন পা টলিতেছে, বিশ্বজগৎ হইয়া গিয়াছে ফেণা আর বুদ্‌বুদ্, তখনো নিজের কাছে কৈফিয়ৎ চলিতে থাকে যে, লাভ কি? আর আপশোষ করিতে হয় যে, হায়, নিজেকে ভুলিবার এত আয়োজনও যদি ব্যর্থ হইল, তবে আর বাঁচা কেন?

শশীতারা তীক্ষ্ণ গলায় গান ধরে,—'গায়ের ওপোর হুমড়ি খেয়ে ভিরমি গেল সে'। সেই সঙ্গে মুহুর্মুহু চোখ ঠারে। এক রাত্রির জন্য ভাড়া করা সে চোখের ইসারায় সাড়া দেওয়ার জন্যই যেন ভিরমি লাগিয়া যায়। শশীতারার গায়ে নয়, তাকিয়ার উপর। অভ্যাস নাই, বেহিসাবী মদ গিলিতে বন্ধুরা বারণ করিয়াছিল। অচেতন ভূপেনকে উদ্ভট ভঙ্গিতে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তারা সগর্ব্বে ভাবে, আমরা ওর মত নই, আমাদের মাত্রা-জ্ঞান আছে, ফূর্ত্তি করতে বসেও আমরা সংযম হারাই না। একটু রাগও তাদের হয়। বড় একঘেয়ে জীবন, ফূর্ত্তি কোনদিন জমে না, ভূপেন সঙ্গে থাকায় আশা করিয়াছিল হয়তো আজ জমিবে। রাত্রির পর রাত্রি বৃথা গিয়াছে, আরেকটা রাত্রি আজ ব্যর্থ হইয়া গেল। এখন আবার অন্য একটি রাত্রির ভরসায় বুক বাঁধিতে হইবে।

স্বর্ণ মোটাসোটা মানুষ, একবার সিঁড়ি দিয়া উঠিতেই তার হাঁপ ধরিয়া যায়। কাজ করার বদলে সে করে সংসার পরিচালনা। তার মনটা ভাল, মাথায় বুদ্ধি আছে, স্বভাবটি মিশুক ও মিষ্টি। সরমাকে সেও স্নেহ করিত। সরমার জন্যে মন কেমন করার সঙ্গে ভূপেনকে সহানুভূতি দেওয়ার জন্য উদ্যত হইয়া থাকিয়াও সুযোগ না পাইয়া সে বড় দমিয়া গিয়াছিল। তারপর ভূপেন এই সব কাণ্ডকারখানা সুরু করিয়া দেওয়ায় ভয়ে ভাবনায় সে যেন দিশেহারা হইয়া গেল।

কেবল ভূপেনের জন্য নয়, সংসারকে স্বর্ণ ভালবাসে, তার অখণ্ড নিয়মানুবর্ত্তী সুখের সংসার। সরমা এ সংসারের একটা দিক ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু মরণের বিরুদ্ধে তো নালিশ নাই। সরমার মত আরেকজনকে আনিয়া সে ভাঙন জোড়া দেওয়ার আশা ইতিমধ্যেই স্বর্ণের মনে উঁকি দিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রথমে কিছুকাল শুধু সমবেদনা জানাইয়া তারপর ধীরে ধীরে নূতন ভাবে জীবন আরম্ভ করিবার উৎসাহ জাগাইয়া তুলিবে, এই ছিল স্বর্ণের পরিকল্পনা। ইতিমধ্যে একদিন কথায় কথায় সে ভূপেনকে বলিয়াও ফেলিয়াছে: বুড়ো হয়েছ বলো না ঠাকুরপো। বিয়াল্লিশ বছর এমন কি বয়স মানুষের।

সরমার পরিবর্ত্তে আরেকজনকে আনা যায়, কিন্তু ভূপেন যদি নিজের সঙ্গে সংসারকেও ধ্বংস করিতে বসে, তবে তো কোন উপায় থাকিবে না।

উপেনের উপার্জ্জন কম, কোন মাসে সে সংসারে সামান্য খরচ দেয়, কোন মাসে দেয় না। সেজন্য কিছুই আসিয়া যায় নাই। সরমা কোনদিন স্বর্ণকে তার গৃহিণীর আসন হইতে সরাইয়া নিজে কর্ত্তৃত্ব করার চেষ্টা করে নাই। কেবল ভূপেনের সেবা আর সুখসুবিধার দায়িত্বটা সে নিজের আয়ত্তে রাখিয়াছিল, তাও স্বর্ণের প্রতিনিধির মত, স্বাধীনভাবে নয়। সমগ্রভাবে সংসারের ভার ছিল স্বর্ণের। টাকার প্রশ্ন আজও উঠিবে না, স্বর্ণ জানে। যার টাকাতেই সংসার চলুক, তাকে ছাড়া সংসার চলিবে না। নিজের কর্ত্তৃত্ব করার সাধ মিটাইতে ভূপেনের বড় ভাইয়ের স্ত্রী হওয়ার অধিকার খাটাইয়া গায়ের জোরে সে সংসারের গৃহিণীপদ অধিকার করে নাই, সংসার গড়িবার ও চালাইবার

ভারটা আপনা হইতে তার জুটিয়া গিয়াছে। কিন্তু ভূপেন যদি বিগড়াইয়া যায়, সংসারে যদি তার মন না থাকে, সংসার তো তবে আপনা হইতেই ভাঙিয়া পড়িবে, দেখা দিবে অভাব, বিশৃঙ্খলা আর অশান্তি।

ভয়ে ভাবনায় ব্যাকুল হইয়া একদিন সে প্রভার বাড়ী গেল। প্রভাকে সে তেমন পছন্দ করে না, ভূপেনের সঙ্গে তার মেলামেশাকে সে কোনদিন ভাল চোখে দেখিতে পারে নাই। স্পষ্ট কিছু মনে না হইলেও মনটা তার চিরদিন খুঁতখুঁত করিয়াছে। কিন্তু এই বিপদের সময় অত ভাবিলে চলিবে কেন!

সমস্ত শুনিয়া প্রভা বলিল, 'কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! মাথা নিশ্চয় খারাপ হয়ে গেছে ভূপেনবাবুর। এই বয়সে এ সব কি!'

স্বর্ণ বলিল, 'বয়স আর এমন কি বেশী?'

প্রভা মুখ ভার করিয়া বলিল, 'তা বৈ কি, হাওরটি আপনার এখনো ছেলেমানুষ আছে।'

স্বর্ণ বলিল, 'হঠাৎ ঘা খেলে মানুষের এরকম হয় ভাই। কেউ সন্ন্যাসী হয়ে যায়, কেউ মদ ধরে। এখন ঝোঁকটা কেটে গেলে বাঁচি। আমার কিছু বলতে সাহস হয় না, তুমি যদি একটু চেষ্টা কর, সামলে যেতে পারে।'

স্পষ্টভাবে স্বর্ণের এ অনুরোধ জানাইবার প্রয়োজন ছিল, প্রভাও সেই কথাই ভাবিতেছিল। এসব ব্যাপার সে ভাল বুঝিতে পারে না, মানুষের বেহিসাবী উন্মাদনা, আবেগের অসংযম। হিষ্টিরিয়ার সঙ্গে তার পরিচয় আছে, অনেকের চিকিৎসাও করিয়াছে। ভূপেন সত্যসত্যই পাগল হইয়া গেলে সে তার মানে বুঝিতে পারিত, হয়তো চিকিৎসার ব্যবস্থায় সাহায্যও করিতে পারিত। একজন ধীর স্থির শান্ত মানুষের মধ্যে এ সব পাগলামি কি করিয়া আসে, কে জানে!

মাঝখানে ভূপেনের সঙ্গে বার দুই তার দেখা হইয়াছে, ভূপেন সহজভাবেই তার সঙ্গে কথা বলিয়াছে, ভিতরে তার কি চলিতেছে কিছুই বুঝিতে পারা যায় নাই। প্রভার তাও ভাল লাগে নাই। সে আশা করিয়াছিল, তার সেদিনকার খাপছাড়া প্রস্তাব সম্বন্ধে আবার সে কথা তুলিবে— বিশ বছরের ভাবুক ছেলের মত উচ্ছ্বাসের আমদানী না করিয়া সহজভাবে আলোচনা করিবে ও বিষয়ে। একটা বুঝাপড়ার জন্য প্রভা সত্যসত্যই অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। ভূপেনের সঙ্গে কখনো কোনো বিষয়ে তার মনোমালিন্য হয় নাই, তাদের সম্পর্কে কোনদিন এতটুকু ভুল বোঝার স্থান ছিল না।

জীবনে অনেক রকম বিচিত্র অভিজ্ঞতা প্রভা সঞ্চয় করিয়াছে, তার মধ্যে সবচেয়ে অভিনব ভূপেনের সঙ্গে দিনের পর দিন সহজ ও গভীর অন্তরঙ্গতা বজায় রাখিয়া চলিবার অভিজ্ঞতা। মানুষের অন্ধ স্বার্থপরতা আর অফুরন্ত দাবীর সঙ্গে তো ভালভাবেই পরিচয় ছিল প্রভার, ভূপেন, কোনদিন অন্যমনেও তার কাছে মেলামেশার বেশী কিছু চাহিবে না, প্রথমে একথা তার কল্পনাতেও ছিল না। কল্পনা করিতেও চায় নাই। একটু অধীরতার সঙ্গে অন্য কল্পনাই বরং সে আরম্ভ করিয়াছিল, কবে কথা বলিতে বলিতে ভূপেন তার হাত ধরিয়া কাছে টানিয়া নিবে। তারপর দিন সপ্তাহ মাস কাটিয়া গিয়াছিল, মাঝে মাঝে ভূপেনের চোখে সে দেখিয়াছিল ক্ষুধা আর কাতরতা, কিন্তু কথায় সে কিছু বলে নাই, ব্যবহারে কিছু বুঝিতে দেয় নাই। তখন প্রভা বিশ্বাস করিতে পারে নাই, তাদের সম্পর্কে এই সীমা বজায় রাখিয়া জীবন কাটাইয়া দিতে ভূপেন প্রস্তুত হইয়াছে, মানুষের পক্ষে সে সংযম সম্ভব। পুরুষ অবুঝ, খেয়ালী তাদের প্রকৃতি, অস্থির তাদের অগভীর সঙ্কীর্ণ চিত্ত, দুদিনের বেশী কামনাকে তারা চাপিয়া রাখিতে পারে না। প্রভা তখন জানিত না, ভূপেনের দিকে আত্মসংযমের প্রশ্ন ছিল না, কারণ আত্মহারা প্রেরণাই তার মধ্যে ছিল অনুপস্থিত। প্রভাকে সে পাইবে না, যতদিন সরমা বাঁচিয়া আছে, প্রভাকে পাওয়ার স্বপ্ন দেখাও অর্থহীন, এই ছিল তার কাছে চরম সত্য। এবং এই সত্যকেই সে মানিয়া লইয়াছিল। মেলামেশায় পাছে বাধা সৃষ্টি হয়, প্রভা পাছে দূরে সরিয়া যায়, এই ছিল তার ভয়। একটা নির্দিষ্ট সীমা সে তাই কোনদিন অতিক্রম করে নাই।

এদিকে অসহিষ্ণু প্রভা পড়িয়া গিয়াছিল ধাঁধায়। এ অভিজ্ঞতা ছিল তার অভিজ্ঞতার বাহিরে। পুরুষ ঘনিষ্ঠ হয় যতখানি হওয়া সম্ভব, বছর পার হইয়া যায়, প্রকাশ্যে আর নির্জনে কাছাকাছি হওয়ার ভূমিকা করিয়া, অথচ কিছুই ঘটে না! এ কোন্ দেশী সম্পর্ক নারী ও পুরুষের? কিছুদিনের জন্য তখন প্রভার বড় কষ্টকর মানসিক বিপর্য্যয়ের মধ্যে কাটিয়াছিল। জীবনের অনেক সীমাহীন সম্ভাবনার দুর্ব্বোধ্য রহস্যময় অনুভূতি তাকে কখনো ব্যাকুল করিয়া রাখিত, কখনো সে অনুভব করিত খাপছাড়া আনন্দ, বিষাদের চাপে জীবন কখনো হইয়া উঠিত দুর্ব্বহ। বিষাদের পর

আসিত ক্ষোভ। দেহ মন তার যেন জ্বালা করিতে থাকিত। কোনদিন ভূপেনকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিত, কোনদিন করিত অপমান। কোন রকমে মানুষটাকে একবার জয় করিতে পারিলে, তাকে কি শাস্তি দিবে ভাবিতে ভাবিতে তার নিদ্রাহীন রাত কাটিয়া যাইত।

একদিন শ্রান্তির ছলে ভূপেনের কাঁধে মাথা রাখিয়া কয়েক মিনিটে সে কয়েকটা যুগ কাটাইয়া দিয়াছিল, প্রতি মুহূর্তে পরবর্তী মুহূর্তের অঘটন প্রত্যাশা করিয়া। নিজের সেই স্পষ্ট নির্লজ্জ পাশবিক অভিযানের কথা ভাবিলে আজও প্রভার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে। ভূপেন শুধু সন্তর্পণে তার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইয় দিয়াছিল। অনেকক্ষণ পরে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'একটু ভাল লাগছে প্রভা?'

কিছুই যেন অপ্রত্যাশিত নয়, খাপছাড়া নয়। হঠাৎ দুর্ব্বলতা বোধ করিয়াছে, মাথা ঘুরিয়া উঠিয়াছে, তার কাঁধে মাথা রাখিয়া তাকে আশ্রয় করিয়া প্রভা একটু বিশ্রাম করিবে বৈ কি। সঙ্কোচ বোধ করিলেই যেন প্রভার অন্যায় হইত।

তারপর হইতে প্রভা তাদের সম্পর্ককে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। অপমানের জ্বালাটুকু পর্য্যন্ত আর বোধ করে নাই।

দুপুরবেলা স্বর্ণ প্রভার কাছে গিয়াছিল, বিকালে প্রভা এ-বাড়ী আসিল। ঘণ্টা দু'য়েকের মধ্যেই সে মন স্থির করিয়া ফেলিয়াছে। মেয়েদের সঙ্গে দু'একটি কথা বলিয়াই সে উপরে উঠিয়া গেল। ভূপেন এখনো শুইয়া আছে শুনিয়া, একটু যে দ্বিধা মনে ছিল, তাও সে এবার বাতিল করিয়া দিল।

রোগী দেখিয়া দেখিয়া প্রভার এ সব কেমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। রোগীর বিছানায় বসার মত সে ভূপেনের বিছানায় বসে, তাপ নেওয়ার মত কপালে হাত রাখে, নাড়ী দেখার মত তার হাত ধরিয়া মুমূর্ষুকে ভরসা দেওয়ার মত হাসি হাসে।

'ছি, তোমার না চল্লিশ বছর বয়স হয়েছে? এসব ছেলেমানুষী কেন আবার?'

অনুযোগ দিয়া একটি কথাও বলিবে না ভাবিয়াছিল, অনেকদিনের অভ্যাসে আপনা হইতে মনের প্রধান নালিশটা অনুযোগের ভাষায় বাহির হইয়া গেল। চিকিৎসার প্রথম কিস্তি হিসাবে, আজ যাচিয়া ভূপেনকে অনেক কিছু দিবে ঠিক করিয়াছিল মনে পড়ায়, ছোটছেলেকে আদর করার মত ছোট একটি চুমু দিল।

ভূপেন কিছুই করিল না, বোকার মত শুধু কৈফিয়ৎ দিয়া বলিল, 'এই প্রথম প্রভা। বন্ধুরা জোর করে টেনে নিয়ে গেল। তুমি তো জানই, ওসব অভ্যাস আমার নেই।'

'অভ্যাস হতে কতক্ষণ!'

'না, সে ভয় নেই। এমন বিশ্রী লাগছে কি বলব তোমায়। ওরা যে কি আনন্দ পায়, ওরাই জানে।'

গত রাত্রির বেপরোয়া উল্লাসের চেয়ে অবসাদের স্মৃতিই ভূপেনকে বিষণ্ণ করিয়া রাখিয়াছে। কিছুই ভাল লাগে নাই। নিজেই সে যে সময় আর জীবনীশক্তির অসার্থক অপচয়ের এমন স্বার্থপর সতর্ক প্রহরী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কাল রাত্রির আগে কখনো খেয়াল হয় নাই। গায়ের জোরে বন্ধুদের সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলিতে গিয়া অচেতন হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল, এও কম লজ্জার কথা নয়। অভ্যাস নাই বলিয়াই কি তার সহ্য হয় নাই? এখনো দেহ মনের অবস্থা তার শোচনীয় হইয়া আছে। সকালে একবার এবং সারাদুপুর ঘুমানোর পর বিকালে আরেকবার স্নান করিয়াও মনে হইতেছে বাসি বেলফুলের গন্ধ যেন এখনো বাতাসে লেপটিয়া রহিয়াছে।

দুজনে অনেক কথা হয়,—অনেক। একযুগ আগে যে কথা বলা চলিত, সেগুলি অবশ্য মনের মধ্যে ভিড় করিয়াই থাকে, দু'জনে শুধু উচ্চারণ করিয়া যায় কথাগুলির সময়োপযোগী অনুবাদ। অনুবাদের ভাষা অতি সুবোধ্য, কিন্তু শব্দগুলির মানে এত কম যে, কিছু যেন প্রকাশ করাই কঠিন। তবু কথা বলিতে বলিতেই ভূপেনের জিভের বিস্বাদ জড়তা কাটিয়া যায়। বাসি বেলফুলের গন্ধ চাপা পড়িয়া যায় প্রভার পরিচিত সেন্টের গন্ধে, বসা সর্দ্দির মত মস্তিষ্কের ভোঁতা টনটনে অস্বস্তিবোধ কাটিয়া যায় প্রভার ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলে প্রভা বলিল, 'এখন যাই, একটা কেস আছে। চারটের সময় যাওয়ার কথা, সন্ধ্যে হয়ে গেল।'

উঠি উঠি করিয়াও প্রভা একটু দেরী করে। ছোট ঘড়িটির সেকেণ্ডের কাঁটা চলিতেছে দেখিয়াও কাণের কাছে ধরিয়া রাখিয়া পরীক্ষা করে ঘড়িটার প্রাণ আছে কিনা। তবু ভূপেনের মনে পড়ে না

প্রভা আজ যাচিয়া আসিয়া ধরা দিয়াছে, তার অনেকদিন আগেকার প্রায় চাপা-পড়া প্রস্তাবের সক্রিয় জবাবের মত বিদায় নেওয়ার সময় অন্ততঃ তাকে একটু গ্রহণ করা তার একান্তভাবে উচিত। চিরদিন সে আসে আর চলিয়া যায়। আসার মধ্যে প্রভা নিজেই আজ নতুনত্ব আনিয়াছে, যাওয়ার মধ্যে বৈচিত্র্য আনিবার দায়িত্বটা তার। কাল সন্ধ্যায় দুঃখীর বরফ-শীতল পানীয়ে প্রথম চুমুক দিয়া উষ্ণতা বোধ করার মত নূতন সম্ভাবনার উত্তেজনায় ভূপেন চাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ভবিষ্যতের দিন ও রাত্রিব্যাপী নিবিড় মিলনের কল্পনায় ছড়ানো সে সম্ভাবনার সূচনা যে আজ এই মুহূর্তে প্রভাকে একটু আদর করায়, সেই খেয়াল না হইলে ভূপেন কি করিবে। চিরদিনের প্রথাতেই সে প্রভাকে বিদায় দিল।

রাত দশটার সময় প্রভা ফোন করিল।

'রাজী তো হলাম, আমার কিন্তু ভয় করছে।'

'কিসের ভয়?'

'ঠিক ভয় নয়, কেমন যেন ভাবনা হচ্ছে।'

'কিসের ভাবনা?'

'কাল সকালে একবার এসো।' বলিয়া প্রভা কথা বন্ধ করিয়া দিল।

চার

দু'জনের বাড়ীতেই ব্যাপারটা মোটামুটি অনুমান করিয়া সকলে শঙ্কিত ও উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল। ছেলে-বৌ মারা যাওয়ার পরেই হঠাৎ ভূপেন যে ভাবে প্রভার দিকে ঝুঁকিয়াছিল, তাতে বৌদির ভয়ের সীমা ছিল না। মনে হইয়াছিল, শোক যে ভূপেনের হয় নাই সরমা ও নন্তুর জন্য, তার কারণও বুঝি এই। রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে সে প্রতীক্ষা করিয়াছিল, কি হয় কি হয়। কিন্তু কিছুই তখন হয় নাই। প্রভার জন্য ভূপেনের ব্যাকুলতা কমিয়া গিয়াছিল, ছেলে বৌয়ের জন্য সে কাতর হইয়া পড়িয়াছিল শোকে। প্রভার সঙ্গে ভূপেনের দেখা-সাক্ষাৎও যেন কমিয়া গিয়াছিল আগের চেয়ে। তারপর কোথায় এক রাণীকে সন্তান প্রসবের জন্য সাহায্য করিতে গিয়া প্রভা কিছু দিন এক রাজবাড়ীতে বাস করিয়া আসিল। তারপরেও কিছু ঘটিল না। ধীরে ধীরে সকলের দুর্ভাবনা কাটিয়া গেল। বৌদি কোমর বাঁধিয়া সরমার অভাব পূরণ করিবার চেষ্টা আরম্ভ করিয়া দিল। দিদির ফিট পর্য্যন্ত একটানা অনেকদিন স্থগিত হইয়া রহিল।

হঠাৎ দু'জনে আবার কি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে ছাখো! একদিনে যার ছেলে-বৌ মরিয়া যায়, জানাশোনা একজন লেডী-ডাক্তারকে তাড়াতাড়ি বিবাহ করিয়া ফেলাটা তার পক্ষে বড়ই অশোভন হয়, এটা খেয়াল করিয়া কি দু'জনে চুপ করিয়া ছিল এতকাল?

প্রভা বৌ হইয়া এ বাড়ীতে আসিলে কি অবস্থা দাঁড়াইবে, ভাবিতে গেলেও বৌদির বুক ধড়ফড় করে। এমনিই প্রভার যা দেমাক, বাড়ীর মানুষগুলিকে সে এমনিই যে রকম অবজ্ঞা করে, তাতে একেবারে গৃহিণী হইয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিলে মানুষকে সে কি আর টিঁকিতে দিবে? বিবাহ করার সাধ হইয়া থাকে, সরমার মত আরেকটি ভীরু নরম বৌ আনুক, কর্ত্তালি করার অভ্যাস যার নাই, সব বিষয়ে যে বৌদির মুখ চাহিয়া থাকিবে। প্রভাকে কেন? প্রাণ দিয়া এত সে সেবা করে ভূপেনের, তাকে জব্দ করার জন্য প্রভাকে কেন?

এদিকে প্রসন্ন ভয়ে ভয়ে বোনকে জিজ্ঞাসা করে, 'ডাক্তারি বুঝি ভাল লাগছে না প্রভা?'

'ভাল লাগছে না? কে বললে তোমায়?'

দু'একদিন পরে প্রসন্ন আবার বলে, 'একটা প্রফেসন নেওয়ার পর সেটা ছেড়ে দিলে মেয়েরা সুখী হতে পারে না প্রভা। ভারি অগৌরবের বিষয় হয়। পুরুষদের সঙ্গে সমান অধিকার চায়, অথচ স্বাধীনভাবে থাকবার সুযোগ পেলেও নিজেরাই সেটা বজায় রাখতে পারে না। সাধে কি পুরুষ জাত মেয়েদের দাবিয়ে রেখেছে!'

প্রভা মৃদু হাসিয়া বলে, 'তুমি যেমন বৌদিকে রেখেছ?'

সকলের বিপদ হইয়াছে, এখনো সবটাই নিছক সম্ভাবনার ব্যাপার, স্পষ্ট করিয়া ভূপেন ও প্রভা কিছু ঘোষণা করে নাই। স্পষ্ট করিয়া তাই তাদের কিছু বলাও যায় না। নিজের চাকরীর পঁচাত্তর টাকায় সংসার চালানোর কথা ভাবিলে প্রসন্নের কপাল ঘামিয়া ওঠে। প্রথম প্রথম প্রভা অবশ্য সাহায্য করিবে, কিন্তু সে আর কতদিন। তার ছেলেমেয়ে হইবে, নিজের সংসার গড়িয়া উঠিবে, তখন কি আর মনে থাকিবে বাপ দাদা ভাইপো ভাইঝির কথা? অথচ স্পষ্ট করিয়া ওরা কিছুই বলিবে না। এরকম অবস্থার মধ্যে মানুষ থাকিতে পারে!

অন্য মানুষের যারা বৌ, তাদের চিকিৎসা করিয়া শ্রান্ত হইয়া প্রভা বাড়ী ফেরে, নিজের ঘরের নির্জ্জনতায় পুরুষালি ভঙ্গিতে ইজিচেয়ারের হাতলে পা তুলিয়া চিৎ হইয়া নিজের বধূ-জীবন কল্পনা করে। এমনি বিষণ্ণ শ্রান্তির সময় ভূপেনের বুকে মাথা রাখিয়া বিশ্রামের কল্পনায় সর্ব্বাঙ্গে তার শিহরণ জাগে, নিঃশ্বাস জমা হইয়া দীর্ঘ অতৃপ্তির মত মুক্তি পায়। কিন্তু কত ভয় আর ভাবনাও যে বুক তার দুরু দুরু কাঁপাইয়া দেয়!

ভূপেনের দিক দিয়া তার ভয়ের কিছু নাই, সে তার কোন ইচ্ছায় কোন কাজে বাধা দিবে না, কিন্তু যে পরিবর্ত্তনগুলি অপরিহার্য্য, কারও ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর যে যোগাযোগগুলি নির্ভর করিবে না? যখন খুসী বাহির হইয়া গিয়া যখন খুসী সে ফিরিয়া আসে, দিবারাত্রি বাহিরে কাটাইলেও কেহ জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পায় না সে কোথায় ছিল। আপনজনের দিকে ইচ্ছা হইলে তাকায়, ইচ্ছা না হইলে তাকায় না। ঘরের দরজার মোটা পর্দ্দাটি টানিয়া দিলে সে একা হইয়া যায়, পর্দ্দা সরাইয়া ঘরে উঁকি দিবার সাহস পর্য্যন্ত কারও হয় না। নারী ও শিশুর মঙ্গলের জন্য সমিতি গড়িয়া মানুষের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করে। অসংখ্য অভ্যাসের ভেলায় ভাসিয়া চলে জীবন-স্রোতে। এসব যদি সে বজায় রাখে, ভূপেনের বৌ হওয়ার অর্থ কি? আর এই যে সব বিচিত্র উপকরণে জীবন গড়িয়া তুলিয়াছে, এগুলি ছাঁটিয়া ফেলিলে ভূপেনের বৌ হইয়া তার লাভ কি? শুধু অবসর মিলনের জন্য তো বিবাহের দরকার হয় না।

অথচ বিবাহ ছাড়া মিলনও তাদের বিস্বাদ হইয়া যাইবে। প্রভা ভাল করিয়াই তা জানে। তার নিজের জন্য হয়তো নয়, ভূপেনের জন্য! এই রকম প্রকৃতি ভূপেনের। শুধু প্রভাকে পাইলে তার চলিবে না, প্রভার জীবনও তার চাই।

প্রভা ঘরের চারিদিকে তাকায়। এ ঘর ছাড়িয়া ভূপেনের বাড়ীতে একটা ঘরে তাকে বাস করিতে হইবে। বাহিরে বারান্দায় গিয়া প্রভা সংসারের কলরব শোনে, আপনজনের চলাফেরা চাহিয়া ত্যাখে। ভূপেন যেমন তার বাড়ীর সংসারটির কর্ত্তা, সেও তেমনি এই সংসারের কর্ত্রী। তার নির্দ্দেশে এই সংসার চলে। এবার তাকে গিয়া চালাইতে হইবে ভূপেনের সংসার। সে টাকা পাঠাইবে, কিন্তু তার এই সংসারে কর্ত্তৃত্ব করিবে অন্য একজন। তার প্রচলিত নিয়ম আর ব্যবস্থাগুলিও হয়তো বাতিল হইয়া যাইবে দু'দিনের মধ্যে।

কেবল নিজের নিজের বিচার বিবেচনাই নয়, আসন্ন বিপদের মত তাদের মিলনের সম্ভাবনায় বাড়ীর মানুষের মধ্যে যে ভয় জাগিয়াছে, সেই ভয়ের উত্তেজনা সঞ্চারিত হইয়াও তাদের দমাইয়া দেয়। একটা রাত্রিও তাদের দূরে কাটাইতে ইচ্ছা করে না, ভিন্ন দুটি বাড়ীতে ভিন্ন দুটি ঘরে রাত জাগিয়া তারা পরস্পরের জন্য ছটফট করে। কিন্তু তাড়াতাড়ি বিবাহটা সারিয়া ফেলিবার তাগিদও কোন পক্ষ হইতে আসে না। আলোচনা সেদিন যতটুকু আগাইয়াছিল, সেইখানেই থমকিয়া থাকে। আর তাদের দূরে থাকিবার প্রয়োজন নাই, এইটুকু বুঝাপড়া করিয়াই যেন তারা একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়াছে। আর কিছু বলিবার বা করিবার প্রয়োজন যেন নাই। কাছাকাছি আসিলে মাঝে মাঝে বরং মনে তাদের এই অস্বস্তিই জাগিয়া উঠে যে, অন্যজন হয়তো হঠাৎ বলিয়া বসিবে, একটা দিন তবে এবার ঠিক করে ফেলা যাক?

মেজাজ দু'জনেরি বিগড়াইয়া যাইতে থাকে। কাম্য মিলনকে ঠেকাইয়া রাখিতেই ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা তাদের ফুরাইয়া যায়, অতি তুচ্ছ কারণে সমস্ত জগতের উপর রাগে তাদের গা জ্বালা করিতে থাকে। পরামর্শ করিয়া তারা যদি বিবাহ পিছাইয়া দিত, কোন কথা ছিল না। দীর্ঘ প্রতীক্ষার কথা ভাবিয়া মন শুধু তাদের ব্যাকুল হইয়া উঠিত। এখন তাও সম্ভব নয়। পরামর্শ করিতে হইলে এখন সব চেয়ে নিকটবর্ত্তী শুভ দিনটিতে বিবাহ চুকাইয়া ফেলিবার পরামর্শই করিতে হয়। তাই যে উদ্ভট অবস্থা তারা সৃষ্টি করিয়াছে, সেই অবস্থারই জের টানিয়া চলিতে চলিতে দম যেন তাদের ফুরাইয়া যাইতে চায়।

দু'বাড়ীর লোকেরাও ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া থাকে। সংসারের খরচের জন্য টাকা চাহিতে গিয়া বোনের কাছে অপমানিত প্রসন্ন কিছুক্ষণের জন্য এমন কথাও ভাবে যে, এর চেয়ে নিজের পঁচাত্তর টাকাতে সংসার চালানোর চেষ্টা করাও ভাল। ভূপেনের বাড়ীতে ছেলেমেয়ের একটু সর্দ্দি হইলে, মেয়ে-বৌয়ের একটু মাথা ধরিলে, প্রভাকে ডাকা হইত, প্রভাও ডাকিলেই যাইত। এখন বৌদির খোকার আটানব্বই পয়েণ্ট এক জ্বরের জন্য ব্যাকুলভাবে তাকে ডাকিলে ফোনেই সে খোকাকে ঘণ্টা দুই চৌবাচ্চায়

ডুবাইয়া রাখিবার উপদেশ দেয়, অমু মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে শুনিয়া বলে যে, একটা পেরেক যেন তার তালুতে ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। পেরেকটা এমনি না ঢুকিলে যে হাতুড়ি ব্যবহার করা চলিবে, এটুকু বলিয়া দিবার ইচ্ছাটা পর্য্যন্ত সে সম্বরণ করিতে পারে না।

বৌদি কাঁদো কাঁদো হইয়া ভূপেনের কাছে নালিশ জানায়, 'প্রভা আমায় এমনি করে অপমান করবে ঠাকুরপো?'

ভূপেন বলে, 'বেশ করেছে। ফোন করতে গিয়েছিলে কেন? রান্না হয়েছে?'

বৌদি বলে, 'এই হল।'

ভূপেন গর্জ্জন করিয়া উঠে, 'এই হ'ল! আপিস যাব না আমি?'

'ভাবছিলাম আজও ছুটি। কিছু তো বল নি ঠাকুরপো?'

'বলতে হবে কেন?'

আপিসের কথা ভূপেনের নিজেরও মনে ছিল না। এতক্ষণে মনে পড়িয়াছে, সাড়ে দশটার সময়! কবে ছুটি শেষ হয়, কখন আপিসের বেলা হয়, মনে করাইয়া দিবার কেউ নাই। সমস্ত জগৎ যেন তার সঙ্গে শত্রুতা আরম্ভ করিয়াছে।

সরমা যেন জীবনের আধারটা তোবড়াইয়া রাখিয়া গিয়াছে। কোনমতে নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারিতেছে না, কোথাও থাকিতেছে ফাঁক, কোথাও লাগিতেছে খোঁচা।

খাইতে বসিয়া তাড়াতাড়িতে খাওয়াটা ভূপেনের বেশী হইয়া যায়। সকলে যেন তাকে পীড়ন করার জন্যই আজ কাল বেশী বেশী এটা খাও ওটা খাও বলে। সরমাই শুধু তার খাওয়ার হিসাব জানিত, সরমাই শুধু সাহস করিয়া তাকে বলিতে পারিত, রাবড়িটা থাক, ওবেলা খেও। ভরপেটে দুবার সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া হাঁপ ধরিয়া গেলে গাড়ীতে উঠিবার সময় হঠাৎ তার মনে পড়িয়া যায়, এও অন্যায়। দরকারী কিছু ফেলিয়া ঘরের বাহির হওয়ার আগেই সরমার মত কেউ মনে পড়াইয়া দেয় না। সকলে মিলিয়া এমনভাবে তার মনটা বিগড়াইয়া দিয়াছে যে, দু'বার সিঁড়ি ভাঙ্গার আগে খেয়ালও হয় না, সে একটা হুকুম দিলেই দশবার সিঁড়ি ভাঙ্গিবার অনেক লোক তার বাড়ীতে আছে।

গাড়ীর চলনটা পর্য্যন্ত খাপছাড়া মনে হয়। চালকটির ছাঁটা ঘাড়ে অনেক উঁচু পর্য্যন্ত চামড়া বাহির হইয়া আছে। জগতের সমস্ত মানুষের উপর এতক্ষণ যে ক্রোধ ও বিরক্তি ভূপেনের মনে গুমরাইতেছিল, এই ছাঁটা ঘাড়ের ঔদ্ধত্য যেন তার সবটুকু আকর্ষণ করিয়া নেয়।

'গরুর গাড়ী চালাচ্ছ না কি?'

গাড়ীর স্পিড বাড়িবামাত্র কিন্তু আতঙ্ক জন্মে। রাস্তায় মানুষ ও গাড়ীর ভিড়, যদি অ্যাকসিডেণ্ট ঘটিয়া যায়?

'কত জোরে চালাচ্ছ? মাথা খারাপ নাকি তোমার?'

গাড়ী আস্তে চলিতে থাকে। ছাঁটা ঘাড় হইতে ভূপেন যেন চোখ ফিরাইতে পারে না। একবার জোরে, একবার আস্তে—ছাঁটা ঘাড়ের ওপাশে কি হাসি ফুটিয়াছে ছোকরার মুখে?

আপিসে ঢুকিবামাত্র কিন্তু ভূপেন গভীর আরাম বোধ করে। এখানে কোন পরিবর্ত্তন নাই। কোন নিয়ম, কোন বন্ধন, কোন দায়িত্ব এখানে শিথিল হয় নাই, নূতন রূপ নেয় নাই। গভীর স্বস্তির সঙ্গে ভূপেন ঘণ্টা বাজায়, কলম নাচায়, নাম সই করে, ধমক দেয়, পরামর্শ করে, প্রায় সমবয়সী ও প্রায় সমপদস্থ কর্ম্মচারীর সঙ্গে ইয়ার্কি দেয়।

আপিস হইতে বাহির হইয়া আপিসের বাহিরের বিপর্য্যস্ত জীবন ভাল করিয়া তাকে নাগালের মধ্যে পাওয়ার আগেই সে সোজা গিয়া হাজির হয় প্রভার কাছে।

ডাক্তারি ব্যাগের মুখ আটকাইয়া প্রভা বলে, 'আমি যে বেরিয়ে যাচ্ছি? ডেলিভারি কেস,—এখুনি যেতে হবে। কি ছেলেই বিয়োতে পারে বৌগুলো! আর যেন তাদের কাজ নেই।'

প্রভাকে বড় শ্রান্ত মনে হয়।

'কতকাল থেকে ছেলে বিয়োনো দেখছি! জন্মেই ছেলেগুলো কাঁদে,—না কাঁদলে কাঁদাতে হয়। আমার কি মনে হয় জানো? একটা ছেলে জন্মে যদি একটু হাসত।'

'তোমার ছেলে হয় তো—'

প্রভা চোখ বড় বড় করিয়া বলে, 'আমার ছেলে? ওসব পাবে না আমার কাছে। সময় মত ছেলে হলেই টিঁকতাম কি না সন্দেহ, এই বয়সে ছেলে বিয়োতে হলেই হয়েছে।'

প্রভা ডাক্তার। প্রভা সব জানে।

ভূপেন স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে। আবার এক অন্ধ আশঙ্কা তার ভীরু মনের গভীরতায় লাফ দিয়া

ঠেলিয়া উঠিতে থাকে। প্রভা সরমার অভাব মিটাইতে পারিবে না, প্রভার কাছে সে তা চায় না। কিন্তু নন্তুকেও সে ফিরিয়া পাইবে না? নন্তুকে আনিয়া দিতে হইলে নিজেকে প্রভার মরিতে হইবে?

আট বছর প্রভার সঙ্গে যে সম্পর্ক সে মানিয়া আসিয়াছে, যার মধ্যে সে পাইয়াছে মনের বিশ্রাম, জীবনের বৈচিত্র্য, কল্পনার আশ্রয়, তার সমাপ্তির সম্ভাবনাতেই ভবিষ্যৎ তার কাছে কেমন যেন নীরস হইয়া গিয়াছে। প্রভার সঙ্গে এক বাড়ীতে দিন আর এক শয্যায় রাত্রি কাটানোর কল্পনা পর্য্যন্ত তেমন উল্লাস ও উত্তেজনা জাগাইতে পারিতেছে না। নন্তুর মত আরেকজনকে পাওয়ার আশা প্রভার কাছে করা চলিবে না ভাবিয়া ভূপেন আরও বিষণ্ণ হইয়া যায়। এ যেন আরও একটা প্রমাণ যে আট ন' বছর যে ভাবে তারা কাটাইয়াছে তার কোন রকম পরিবর্ত্তন তাদের সহিবে না। লাভ হইবে না কিছুই, নষ্ট হইয়া যাইবে তাদের অমূল্য বন্ধুত্ব।

প্রভাও মুখ নীচু করিয়া ভাবিতেছিল, মৃদুস্বরে সে বলিল, 'এই একটা অসুবিধা আছে।'

ভূপেন বলিল, 'তুমি কি এইজন্য সেদিন বলেছিলে, তোমার ভয় করছে?'

'ঠিক এই জন্য নয়। কি হবে ঠিক বুঝতে পারছি না। আমরা যদি মানিয়ে চলতে না পারি?'

আগে ভূপেন হয় তো সঙ্গে সঙ্গে এ কথার প্রতিবাদ করিত, হাসিয়া উড়াইয়া দিত কথাটা। তারা মানাইয়া চলিতে পারিবে না, সে আর প্রভা! এখন সে জোর করিয়া কিছু বলিতে পারিল না, দ্বিধা ভরে শুধু বলিল, 'ঝগড়া আমাদের কখনো হবে না প্রভা।'

প্রভা একটু হাসিল, 'ঝগড়া? ঝগড়ার কথা কে ভাবছে? ঝগড়া হবে বৈ কি—হওয়াই ভাল। আমি ভাবছি অন্য কথা। মনে মনে হয়তো দুজনেই বিরক্ত হব, হয়তো মনে হবে বেশ ছিলাম আমরা—'

দুজনে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে। দুজনের মনেই যে আশঙ্কা পাক খাইয়া বেড়াইতেছিল, ভাষার মধ্যে স্পষ্ট হইয়া এতদিনে প্রকাশ পাইয়াছে। অস্বীকার করিবার ক্ষমতা নাই, তুচ্ছ করিবার উপায় নাই।

অনেকক্ষণ পরে ভূপেন বলিল, 'ওসব ভয় সবারি হয় প্রভা। হয় তো সব ঠিক হয়ে যাবে।'

প্রভা বলিল, 'আগে হলে সব ঠিক হয়ে যেত। আমরা যে বুড়ো হয়ে গেছি।'

একথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দুজনে তারা সত্যই বুড়ো হইয়া পড়িয়াছে। নূতন অ্যাড-ভেঞ্চার সুরু করিবার বয়স তাদের আর নাই। তীব্র জ্বালা বোধের সঙ্গে ভূপেনের মনে হয়, তাদের এত ভয়-ভাবনার কারণও হয়তো তাই। জীবনের সব চেয়ে বড় সার্থকতা হাতের মুঠায় আসিয়া পড়িলেও গ্রহণ করিতে তারা যে ইতস্তত করিতেছে, হিসাব করিতে বসিয়াছে ভবিষ্যতে কতখানি লাভ আর কতখানি লোকসান দাঁড়াইবে, সে শুধু বয়স তাদের বেশী বলিয়া।

'ওসব ভাবনা চুলোয় যাক প্রভা। যা ঘটবার ঘটবে, এখন থেকে ভেবে কোন লাভ নেই।'

'তুমি তো বলছ লাভ নেই। আমি যে না ভেবে পারি না!'

কথাটা ভূপেনকে আঘাত করে। এতক্ষণে তার যেন খেয়াল হয়, ভয় ভাবনা শুধু তার একার নয়, প্রভার মনেও তারই মত দ্বিধা জাগিয়াছে। নিজের পক্ষে তার কাছে যা ছিল একান্ত ন্যায়সঙ্গত চিন্তা, প্রভার মনে তার অস্তিত্ব তার অন্যায় মনে হয়। আনন্দে অধীর হইয়া দিন গোণার বদলে প্রভা তবে হিসাব করিতেছে সুবিধার ও অসুবিধার? তার কথা আলাদা। তার সরমা ও নন্তু ছিল, বহুদিন সে বাধ্য হইয়া একটা বিশেষ জীবন যাপন করিয়াছে, প্রভার সঙ্গে আবার সেই পুরাণো ধাঁচের জীবন নূতন করিয়া আরম্ভ করিবার আগে নানা কথা মনে আসার তার যুক্তি আছে। প্রভার কেন ভয় হইবে, ভাবনা জাগিবে? এতকাল একা একা নিজের ব্যর্থ অসম্পূর্ণ জীবন টানিয়া চলিয়া তার যখন সার্থকতার, পরিপূর্ণতার সময় আসিয়াছে?

'তোমার ভাবনার কি আছে বুঝতে পারি না প্রভা।'

'বুঝতে পারবে না। তুমি শুধু নিজের কথা ভাবছ।'

'হঠাৎ রাগ হল কেন?'

'রাগ নয়। সেদিন রাগ হয়েছিল, কোথাও কিছু নেই হঠাৎ সেদিন এসে বলেছিলে, এক মাসের মধ্যে বিয়েটা সেরে ফেলি এসো। ও বিষয়ে যেন আমার কিছু বলারও নেই, করারও নেই। আমার মত আছে কিনা, জিজ্ঞেস করারও দরকার মনে কর নি।'

'আমি ধরে নিয়েছিলাম তোমার মত আছে প্রভা।'

'তা জানি। তাই তো রাগটা কমে গেল। কিন্তু ওরকম ধরে নেবে কেন? তুমি নিজের দিক থেকে সব কথা ভাব, আমার কথা ভাব না।'

কব্জিতে বাঁধা ছোট ঘড়িটার দিকে চাহিয়া প্রভা চমকাইয়া উঠিল।

'ইস্, কথায় কথায় দেরী হয়ে গেল।'

ভূপেন বলিল, 'যেওনা প্রভা। আরও কথা আছে।'

'পরে কথা হবে। এখন সময় নেই।'

সময় নাই। একটি নারী বিপজ্জনক অবস্থায় ব্যথায় কাতর হইয়া পথ চাহিয়া আছে, তার সঙ্গে কথা বলিয়া সময় নষ্ট না করাই প্রভার কর্ত্তব্য। ভূপেন তা স্বীকার করে। বাড়ী ফিরিবার পথে সে তাই ভাবিতে থাকে, দু'হাতে সে যখন প্রভাকে বুকে বাঁধিয়া রাখিবে, তখনও প্রভা কি উৎকর্ণ হইয়া থাকিবে কখন টেলিফোনের ঘণ্টা বাজে? অন্য এক নারীর সন্তান প্রসবে সাহায্য করিবার আহ্বান আসিলে, মিলন স্থগিত রাখিয়া সে কি বলিবে, পরে আদর কোরো, এখন সময় নেই?

পাঁচ

শীত শেষ হইয়া আসিয়াছিল, কদিন হঠাৎ গরম পড়িয়াছে। হঠাৎ বলিয়া গরমটা অসহ্য মনে হইতেছে। শরীর কেমন জ্বালা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বপ্নময় ঘুমে বিশ্রাম না পাওয়ায় ভোঁতা আলস্য শরীরকে আশ্রয় করিয়াছে।

স্বর্ণের গায়ের রং আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। অধিকাংশ সময়েই সেমিজ সে গায়ে রাখিতে পারে না। গরমে এমন হাঁসফাঁস করে যে, শাড়ীখানি খুলিয়া রাখিতে পারিলেও যেন বাঁচে। মোটা হওয়ার আগে সে যে কি ভয়ঙ্কর রূপসী ছিল, ভাবিলেও মাথা ঘুরিয়া যায়। ভূপেন অবশ্য সে সময় তাকে দেখিয়াছিল কিন্তু আজ কোনমতেই একযুগ আগের স্বর্ণকে সে স্মরণ করিতে পারে না। তার মনে হয় স্বর্ণ যেন চিরদিন এমনি ছিল, অবিন্যস্ত একস্তূপ রূপলাবণ্যের মত।

একটি মেয়ে একদিন জড়িত পদে ভূপেনের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, অনেকদিন আগেকার স্বর্ণ বলিয়া যাকে ভাবিলেও ভ্রবা যাইতে পারে। চোখ দুটি কেবল তার খুব বড় বড়, সরমার যেমন ছিল।

মেয়েটিকে দেখিবার জন্যই সে যে এ বাড়ীতে আসিয়াছে, ভূপেনের তা জানা ছিল না। একটা বাজে অজুহাত দিয়া অজিত তাকে এখানে ধরিয়া আনিয়াছে। বাড়ীর লোকের কথাবার্ত্তা চালচলন আর অতিরিক্ত আদর যত্নের ভূমিকা প্রথমে তার শুধু একটু খাপছাড়া মনে হইয়াছিল। তারপর ছোট একটি ছেলের সঙ্গে চিরপ্রচলিত প্রথায়, কোন রকম সাজগোজ না করার সাজ করিয়া, মেয়েটি যখন নতমুখে ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া ঘরে আসিয়া কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া পড়িল, তখন সে বুঝিতে পারিল কি ঘটিতেছে। সমস্ত ব্যাপারটা এমন হাস্যকর মনে হইতে লাগিল তার! অজিতও জানে না, এ বাড়ীর উৎসুক মেয়ে পুরুষেরাও জানে না, কত বছর ধরিয়া ক'নে তার ঠিক হইয়া আছে, কে তার ভবিষ্যৎ বধূ। জানিলে এই কিশোরীকে যাচাই করিবার জন্য সামনে ধরিয়া দিত না।

অজিতকে বলিলে কি চমকটাই তার লাগিবে!

কৌতুকের অনুভূতি কিন্তু তার অল্পক্ষণেই মিলাইয়া যায়। মেয়ে দেখা আর মেয়ে দেখানোর পুরাণো রীতিগুলি চোখের সামনে ঘটিতে ঘটিতে তার মনে পড়াইয়া দেয় বহুকাল আগে সরমাকে দেখিতে যাওয়ার কথা। মনে পড়ে, সেদিনও অজিত তার সঙ্গে ছিল। ঘরের আসবাব ও বসিবার ব্যবস্থাও প্রায় ছিল এই রকম, এমনিভাবে ঘরে ঢুকিয়া পুতুলের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া বসিতে বলার পর এমনি সন্তর্পণে সরমাও সেদিন জড়সড় হইয়া বসিয়াছিল। মুখ তুলিতে বলিলে এমনিভাবে ধীরে ধীরে সরমা মুখ তুলিয়াছিল, নাম জিজ্ঞাসা করিলে জবাব দিতে গিয়া সরমার গলাও জড়াইয়া গিয়াছিল। বিন্দু বিন্দু ঘাম কি ফুটিয়াছিল সরমার মুখে? ভূপেনের মনে নাই। মেয়েটি ঘামিয়া উঠিয়াছে।

বিবাহের পর কতদিন সরমা নিজেকে দেখানোর এই অভিজ্ঞতার কথা বলিয়াছে। কি ভাবে বুক ঢিপ ঢিপ করে, মাথা ঝিম ঝিম করে, দম আটকাইয়া আসে, কিন্তু জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলিতে ভয় হয়।

'তোমায়? মাগো, তখন আবার তোমায় দেখব! আমি তখন শুধু ভাবছি, কতক্ষণে শেষ হয়, কতক্ষণে শেষ হয়।'

শাস্তির জন্য ভূপেন মমতা বোধ করে

'এবার ছেড়ে দাও, অজিত।'

গাড়ীতে উঠিয়া অজিত জিজ্ঞাসা করিল, 'পছন্দ হল না? একে যদি তোমার পছন্দ না হয়—'

'পছন্দ হয়েছে বৈ কি।'

'হতেই হবে। এ শর্মার আবিষ্কার তো।'

'এমন সুন্দরী মেয়ে খুব কম দেখা যায়।'

'ও বাবা, এর মধ্যে মজে গেছ?'

'মজবার কথা নয়? টুকটুকে আঙ্গুল দিয়ে কখন পাকা চুল তুলে দেবে ভেবে ধৈর্য্য ধরছে না তাই।'

'ও, তামাসা হচ্ছে। তারপর?

'তারপর আর কি। ওরা জিজ্ঞেস করলে বলে দিও, মেয়ে পছন্দ হয়েছে, কিন্তু পাত্র নেই। আমার ভাইপো'টির বয়েস মোটে ন'বছর।'

অজিত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, 'আধবুড়ী লেডী ডাক্তার ছাড়া তোমার পছন্দ হবে না জানলে ওদের কথা দিতাম না।'

'তাই উচিত ছিল।'

'তোমার মরণ ঘনিয়ে এসেছে বুঝতে পারছি। একটা কথা বলি শুনে রাখো। আমি এখনো মাঝে মাঝে এখানে ওখানে ফূর্তি করে রাত কাটাই, তবু বাড়ীতে আমার সুখ-শান্তি আছে, তোমার যা কস্মিনকালেও থাকবে না। তার কারণটা কি জানো? পারিবারিক জীবনে কতগুলি নিয়ম মেনে চলি, সুখী হতে হলে সব শালাকে যে নিয়ম মানতে হয়। আরে রাখো তোমার তর্ক, ওসব জানা আছে আমার। কোথায় কি খাটে সে জ্ঞান তোমার আদৌ নেই। একটা কথার জবাব দাও তো আমার, খাওয়ার অনিয়ম করলে ক'দিন তোমার পেট ঠিক থাকে? বাড়ীর জীবনটা ডাল ভাত খাওয়ার সামিল, রোজ পোলাও মাংস চলে না। সংসারী হওয়ার জন্য বিয়ে করবে, ঘরে আনবে একটা ত্রিশ বছরের লেডী ডাক্তার! তার কোন মানে হয়? অন্য উদ্দেশ্যে বিয়ে করলে কোন কথা ছিল না। প্রথম সংসার সুরু করলেও নয় বুঝতে পারতাম যাকে নিয়ে যেমন সংসার হোক খাপ খেয়ে যাবে। আনতে চাইছ নম্বর মার যায়গায় আরেকজনকে, যাকে আনছ তিনি একদম অন্য রকম। ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে ভেবে দেখেছ?'

ভূপেন কথা না বলায় অজিত একটু নরম গলায় বলিল, 'প্রভার নিন্দে করছি না ভাই। ত্রিশ বছর বয়স হয়েছে, ডাক্তারি করে, সেটা দোষের কথা নয়, আমার পিসীর বয়স সাতচল্লিশ, তিনিও লেডী ডাক্তার। তবে যে যা, সে তা। তার তো কোন উপায় নেই। তোমাদের বনবে না, এই হল আসল কথা।'

বাড়ী ফিরিতেই স্বর্ণ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে, 'কেমন দেখলে ঠাকুরপো মেয়েটাকে? ওকে দেখলে আমার কান্না আসে ঠাকুরপো।'

'কান্না আসে?'

'আমার তো জানাশোনা, আমি জানি। ওর চালচলন কাথাবার্ত্তা সব যেন তার মত, স্বভাবটি পর্য্যন্ত। কোথায় পেল কে জানে!'

দেখিতে সরমার মত নয়, সে রকম হওয়া এ জগতে কোন মেয়ের পক্ষেই সম্ভব নয়, তবে চালচলন, কথাবার্ত্তা, স্বভাব, সব সরমার মত। ভূপেন আশ্চর্য্য হইয়া যায়।

প্রভাকে বিবাহ করার কথা ভাবা যায় কিন্তু সরমার বিনিময়ে তাকে বাড়ীতে আনিবার কথা সত্যই কল্পনা করা যায় না। এই মেয়েটিকে কিন্তু সে ভাবে ভাবা চলে। বাড়ীর সকলের সঙ্গে এক হইয়া যাইবে, খালি পায়ে নিঃশব্দে ঘরের কাজ করিয়া বেড়াইবে, খাটে গদির বিছানা থাকিতে দুপুরবেলা মেঝেতে আঁচল বিছাইয়া ঘুমাইবে, নিজেকে একেবারে লোপ করিয়া ধরা দিবে ঠিক সরমার মত। প্রভা নয়, ঠিক এই মেয়েটির পক্ষেই যেন তা সম্ভব।

'ঠাকুরপো, সে গিয়ে অবধি সবার বুক খালি, ঘর খালি। তার অভাব তো আর কাউকে দিয়ে পূর্ণ হবার নয়, তবু শান্তিকে তুমি ঘরে আনো, আমাদের প্রাণ একটু হালকা হোক।'

বৌদি ঘন ঘন চোখ মুছিতে থাকে।

সন্ধ্যার পর ভূপেন প্রভাকে একবার ফোন করিল। প্রভার সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটাইয়া আসিবার জন্য মনটা তার উতলা হইয়া উঠিয়াছিল। প্রসন্ন খবর দিল প্রভা বাড়ী নাই, সকালে দশটার সময় বাহির হইয়া গিয়াছে, এখনো ফেরে নাই। বিকালে বাড়ীতে প্রভা একবার ফোন করিয়া জানাইয়া দিয়াছে, কখন সে বাড়ী ফিরিতে পারিবে কিছুই ঠিক নাই। একটা জরুরী কেসে সে আটকা পড়িয়া গিয়াছে।

প্রসন্নর কাছে নম্বর জানিয়া ভূপেন রোগীর বাড়ীতে প্রভাকে ফোন করিল।

প্রভা বলিল, 'কি করে ফিরব? রোগীর আমার এখন তখন অবস্থা। কি কষ্ট যে পাচ্ছে

বৌটা, দেখলে তোমাদের পুরুষমানুষদের অভিশাপ দিতে ইচ্ছা হয়।'

খট্ করিয়া প্রভার সাড়াশব্দ বন্ধ হইয়া গেল।

ঘরে বসিয়া ভূপেন ভাবিতে থাকে এবার কি করা যায়। কাজ করিতে, বই পড়িতে, ভাল লাগে না, বন্ধুদের সঙ্গে গিয়া গল্প-গুজবে সময় কাটানোর চিন্তাটাও সে বাতিল করিয়া দেয়। সিনেমায় যাইতে সে ভালবাসে না।

কিছু ভাল লাগে না। বড় একা মনে হয় নিজেকে। সময় বুঝিয়াই যেন অভাববোধের পীড়নটা আরও জোরালো হইয়া উঠিয়াছে। কাজের মধ্যে অন্যমনস্ক হওয়ার চেষ্টা করিবে ভাবিয়া কাজের ঘরে যাওয়ার জন্য জোর করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া আবার সে মত পরিবর্ত্তন করে। জানালায় দাঁড়াইয়া সহরের আলোকমালার দিকে চাহিতে চাহিতে অল্প দূরে অন্য বাড়ীর একটি আলোকিত ঘরের ভিতরে তার চোখ আটকাইয়া যায়। ক্যাম্প-চেয়ারে কাত হইয়া একটি লোক চুপ করিয়া পড়িয়া আছে, মেঝেতে পা রাখিয়া খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে একটি মেয়ে। তার প্রসারিত হাতের কনুই পর্য্যন্ত দেখা যায়, পুতুলের বালিশের মত ছোট একটি বালিশে কনুই রাখিয়া কি যেন করিতেছে মেয়েটি। ছেলেকে ঘুম পাড়াইতেছে নিশ্চয়। ছোট বালিশের ওপাশে নিশ্চয় একটি শিশু শুইয়া আছে, পড়িয়া যাওয়ার ভয়ে তাকে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে দেয়ালের দিকে খাটের শেষ প্রান্তে।

কেউ নড়ে না। না পুরুষটি, না তার বৌ। আট দশ মিনিট পরে বৌটি সোজা হইয়া দাঁড়ায়, ঘরের মধ্যে এদিক ওদিক একটু নড়াচড়া করিয়া বাহিরে চলিয়া যায়—দুজনের মধ্যে একটি কথাও হয় না। পুরুষটি তেমনি ভাবে পড়িয়া থাকে, একটা সিগারেট ধরাইয়া অর্দ্ধেক টানিয়া নিভাইয়া রাখে। কিছুক্ষণ পরে বৌটি আসিয়া এক কাপ চা লোকটির হাতে দিয়া আবার চলিয়া যায়, দাঁড়ায় না, গল্প করে না, ফিরিয়া তাকায় না। তারপর বহুক্ষণ সময় কাটিয়া যায়, বৌটি আসে না। চা শেষ করিয়া পেয়ালা নামাইয়া রাখিয়া লোকটি আবার সেই আধখানা সিগারেট খায়, মাঝে মাঝে উঠিয়া খাটে উপুড় হইয়া বোধ হয় ছেলেকেই একটু থাপড়াইয়া আবার ক্যাম্প-চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। এমন চুপচাপ বিনা কাজে মানুষ একা কি করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে ভাবিয়া ভূপেন অবাক হইয়া যায়। দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে তার পায়ে ব্যথা ধরিয়া যায়, তবু সে জানালা ছাড়িয়া নড়িতে পারে না। খারাপ লাগে না লোকটার? একা মনে হয় না নিজেকে? একটা বইয়ের পাতা উল্টানোর প্রয়োজন পর্য্যন্ত অনুভব করে না?

বহুক্ষণ পরে একটা ছোট বাটি হাতে বৌটি ঘরে আসে। ছেলেকে খাওয়ানোর জন্য দুধ আনিয়াছে বুঝিতে কষ্ট হয় না। কি যেন সে বলে লোকটিকে, সে কথা বলে না কিন্তু মুখে তার হাসি দেখা দেয়।

প্রতিদিন হয়তো এমনিভাবে লোকটি সন্ধ্যা যাপন করে, চুপচাপ একা বসিয়া ছেলেকে পাহারা দিয়া। বন্ধু, কাজ, বই, কিছুই তার দরকার হয় না। কেন দরকার হয় না, এতক্ষণে ভূপেন তা বুঝিতে পারিয়াছে। একাকীত্বের অনুভূতি লোকটির জাগে না। ছেলে তার সামনে খাটে শুইয়া ঘুমাইতেছে, কখন ঘুম ভাঙ্গিয়া কাঁদিয়া উঠে ঠিক নাই। বৌ তার ঘরের কাজ করিতেছে, কখন ঘরে আসে ঠিক নাই। নাও যদি ঘরে আসে, যখন খুসী নাম ধরিয়া ডাকিলেই আসিবে। না ডাকিলেও কাজ শেষ করিয়া বাহিরের সব প্রয়োজন মিটাইয়া সমস্ত রাত্রির জন্য সে তো আসিবেই—যত সময় যায়, ততই তার সেই আসিবার সময় কাছে আসে। সারাদিন হয়তো সে আপিসে খাটিয়াছে, ক্যাম্প-চেয়ারে গা এলাইয়া মনকে শিথিল করিয়া চুপচাপ পড়িয়া থাকাই লোকটির কাছে পরম উপভোগ্য বিশ্রাম। সময় কাটানোর কোন উপলক্ষই হয়তো সে চায় না। একাই সে থাকিতে চায়।

তাই বটে। সন্ধ্যা হইতে রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত সরমা যদি ঘরে না আসিত, এরকম একা কি মনে হইত তার নিজেকে? সরমা বাড়ীতে আছে, কাজ অথবা গল্পে ব্যস্ত হইয়া আছে, নন্তকে লইয়া জ্বালাতন হইতেছে, শুধু এইটুকু জানা থাকিলেই কি এই একাকীত্বের ভার অনেকটা হাল্কা হইয়া যাইত না? ওই লোকটির মত চুপচাপ হয়তো বসিয়া থাকিতে তার ভাল লাগিত না, নন্তকে পাহারা দিয়াও নয়, কিন্তু এমন ভোঁতা যন্ত্রণাদায়ক বিষাদ তার জাগিত না নিশ্চয়।

ঘরের দেয়ালে সরমার প্রকাণ্ড একটি ফটো টাঙানো আছে। তার পাশে নন্তর ছোট একটি

ফটো। শোয়ার ঘরে ভূপেন খুব কম আসে। সরমার ফটোর দিকে সে তাকায় না, ইচ্ছা করিয়াই তাকায় না। আজ জানালা হইতে সরিয়া আসিয়া একাগ্র দৃষ্টিতে বহুক্ষণ সে সরমার ফটোর দিকে চাহিয়া রহিল। না, সরমাকে সত্যই সে ভালবাসে নাই, প্রভাকে যেমন ভালবাসে। কিন্তু সরমা তার জীবনের অনেকখানি জুড়িয়া ছিল। তার দৈনন্দিন ধরা-বাঁধা জীবনে অতখানি অধিকার বিস্তারের ক্ষমতা প্রভারও কোনদিন হইবে না।

অনিবার্য্য অবিরাম মোহের মত প্রভা তার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, প্রভা আজ মরিয়া গেলে তার জীবনী-শক্তি ঝিমাইয়া পড়িবে, চেতনা স্তিমিত হইয়া আসিবে। সরমা মরিয়া যাওয়ায় তার কষ্ট হইতেছে, অসহ্য কষ্ট হইতেছে। দিনান্তে একত্র বসিয়া প্রভার সঙ্গে দু'দণ্ড কথা বলিতে না পারিলে সে বাঁচিয়া থাকিতে পারে, সরমাকে সর্ব্বদা কাছে না পাওয়ায় জীবনটাই তার দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে।

প্রভা সরমা হইতে পারিবে না। ওই অজানা অচেনা শান্তি মেয়েটি হয়তো সরমাকে নকল করিতে পারে, প্রভা পারিবে না।

কাজের ঘরে যাওয়ার জন্য বারান্দায় আসিতেই সংসারের বিচিত্র কলরব ভূপেনের কাণে আসে। পিসী কাকে বকিতেছে। রমলা শিখিতেছে গান। পাশের ঘরে বিমলা আর স্বর্ণ কথা বলিতেছে। মা ঠক ঠক করিয়া হামান দিস্তায় গুঁড়া করিতেছেন পানের মসলা। রান্নাঘর হইতে শব্দের বদলে ভাসিয়া আসিতেছে সম্ভারের তীব্র সুবাস। উপেনের সিগারের কড়া গন্ধও সেই ঝাঁঝালো সুবাসের নীচে প্রায় চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

নিয়ম আছে। সুখের সংসার পাতিবার কতগুলি নিয়ম আছে, চোখ কাণ বুজিয়া সেগুলি মানিয়া চলিতে হয়। অজিত এই কথা বলিয়াছিল, বলিয়াছিল, নিয়মগুলি সে সাধনার মত মানিয়া চলে বলিয়া সে সুখী। সাংসারিক সুখশান্তির আতিশয্যে অজিতের যে সত্যই ছোটখাট একটি ভুঁড়ি গড়িয়া উঠিতেছে, তাও চোখ মেলিয়া চাহিলেই দেখা যায়। তার কথাই কি ঠিক? সুখী হওয়া কি এত কঠিন আর সহজ? আট ন বছর ধরিয়া ভালবাসার ব্রত পালন করিবার পরেও যাকে ভালবাসা যায়, তাকে লইয়া সংসার পাতিয়া সুখী হওয়া যায় না, অজানা শান্তিকে লইয়া অনায়াসে পাতা যায় সুখের সংসার?

হয়তো তাই। সংসারে ভালবাসার স্থান নাই। সুখ-শান্তির সঙ্গে সম্পর্ক নাই ভালবাসার।

হঠাৎ-পড়া গরমের পর দু'দিনের জন্য বসন্তের নাতিশীতোষ্ণ বাতাস বহিতে সুরু করিল। যার বসন্ত শুধু তাকে তোলা কাব্যের পাতায় থাকে, তাকেও স্বীকার করিতে হইল বসন্তের বাতাসে দেহ মনের কমবেশী কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। মন উড়ু উড়ু না করুক, অন্ততঃ ক্ষুধা আর উৎসাহ যে একটু বাড়িয়াছে, বেশ বুঝা যায়।

বিকালে প্রভা নিজেই ভূপেনকে তার বাড়ী যাইতে বলিয়াছিল। বিকালে ভূপেন গিয়া শুনিল, দুপুরে সে কোথায় বাহির হইয়াছে, সন্ধ্যার আগেই ফিরিবে।

প্রসন্ন বলিল, 'তোমায় বসতে বলে গেছে।'

ভূপেন বলিল, 'আসতে না বললেই হত।'

প্রসন্নও মুখ ভার করিয়া বলিল, 'ওর ওই রকম স্বভাব।'

প্রসন্ন নিন্দা করায় ভূপেন তখন প্রভাকে সমর্থন করিয়া বলিল, 'ডাক এলে না গিয়ে তো উপায় নেই। রোগীর কথা আগে ভাবতে হবে বৈ কি।'

প্রসন্ন একটা নিঃশ্বাস ফেলিল। সে বড় আশ্চর্য্য নিঃশ্বাস, এত বেশী ক্ষোভে ভরা যে, শুনিলেই বুঝিতে পারা যায় নিঃশ্বাসটা ক্ষোভের, হতাশার নয়।

'ওকে ডাক্তারি পড়িয়েই ভুল করেছি ভাই। ভাই বিগড়ে যায় সেটা তেমন লাগে না, সে ব্যাটাছেলে। বোন যা খুসী তাই সুরু করলে সয় না। কিছু বলারও উপায় নেই। নিজে রোজগার করে, কারো অধীন তো নয়।'

ভূপেন স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া থাকে। তার কাছে প্রসন্ন প্রভার সম্বন্ধে এমন কথা বলিতে পারে, কাণে শুনিয়াও তার বিশ্বাস হইতে চায় না।

প্রসন্ন ধীরে ধীরে কামানো চিবুকে হাত বুলায়, বিষণ্ণ চিন্তিত মুখে অনেকটা স্বগতোক্তির মত বলে, 'ভাবি আর আপশোষ হয়, সময় মত বিয়ে দিয়ে ওকে যদি সংসার পেতে সুখী হবার সুযোগ দিতাম। এসব বিকার জন্মে জীবনটা ওর মাটি হয়ে যেত না। ধীরেন মিত্রের সঙ্গে কি সব কাণ্ড আরম্ভ করেছে আবার। একটা মাতাল গুণ্ডা লোক, আত্মীয়স্বজন যাকে বাড়ী ঢুকতে দেয় না, তার সঙ্গে মাখামাখি সুরু করলে দশজনে বলবে না দশ কথা। তোমায়

বলব কি ভাই, মানুষকে মুখ দেখাতে আমার লজ্জা করে।'

'কি বলছেন প্রসন্নদা? কিছুই বুঝতে পারছি না তো?'

'থাকগে, বলে কাজ নেই। এতকাল চুপ করে আছি, চুপ করে থাকাই ভালো।'

প্রসন্নের উদ্দেশ্য ভূপেন বুঝিতে পারে না। এখন পর্য্যন্ত প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা না করিলেও, প্রসন্ন নিশ্চয় অনুমান করিতে পারিয়াছে অল্পদিনের মধ্যেই প্রভাকে সে বিবাহ করিবে। এ সময় প্রভার বিরুদ্ধে এ সব বিশ্রী কথাগুলি তাকে জানানোর মানে কি?

প্রভার সম্বন্ধে সে কি তাকে সাবধান করিয়া দিতে চায়? বলিতে চায়, আমার বোনটি অতি খারাপ মেয়ে, তাকে নিয়ে তুমি বিপদে পড়বে, অতএব বুঝেশুযে কাজ কোরো? নিজের বোনের ক্ষতি করিয়া তার ভাল করার জন্য প্রসন্নের এতখানি আগ্রহ অতি খাপছাড়া মনে হয় ভূপেনের। সে অবশ্য বিশ্বাস করে না এসব কথা, প্রভার সঙ্গে তার দু'দিনের পরিচয় নয়, তবু এই রকম ধারণাই যদি বোনের সম্বন্ধে প্রসন্নের হইয়া থাকে, চুপ করিয়া থাকাই তো তার উচিত ছিল। সময়মত বিবাহ দিয়া বোনকে সংসারী ও সুখী করে নাই বলিয়া যদি তার আফশোষ, আজ বোনের সংসারী ও সুখী হওয়ার সম্ভাবনা যখন দেখা দিয়াছে, সে সম্ভাবনাকে প্রসন্ন নষ্ট করিয়া দিতে চায় কেন?

তাছাড়া প্রসন্ন কি ভুলিয়া গিয়াছে আজ কতকাল প্রভার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা, প্রভার সম্বন্ধে কিছুই তার অজানা নাই?

মুখ গম্ভীর করিয়া ভূপেন বলিল, 'প্রভার যা প্রফেসন, তাতে ভালমন্দ সব রকম লোকের সঙ্গেই ওকে মিশতে হয় প্রসন্নদা। কে কেমন মানুষ, অত হিসাব করে ডাক্তারি চলে না।'

'তা কি আমি জানি না ভাই? সে রকম হলে তো কথাই ছিল না। পরশু ধীরেন মিত্রের বাগান-বাড়ীতে রাত একটা পর্য্যন্ত কাটিয়ে এল।'

'কি বলছেন পাগলের মত?'

'পাগলের মতই বলছি ভাই। পাগল না হলে বোনের নামে এমন কথা কেউ বলতে পারে? তুমি পর নও ভূপেন, তুমিও ওর দাদার মত। আমায় ও মানে না, কিন্তু তোমায় শ্রদ্ধা করে, তোমার কথা শোনে। তুমি চেষ্টা করে হয়তো ওকে শুধরে নিতে পার।'

'প্রভা তো ছেলেমানুষ নয় প্রসন্নদা। ওর প্রায় ত্রিশ বছর বয়স হতে চলল।'

'এঁ্যা? তা বটে। সে কথা মিথ্যে বলনি। কি জান ভূপেন, কথাটা আমি ভুলেই যাই। এখনো মনে হয় ও যেন ছেলেমানুষ রয়ে গেছে। যাই হোক, তুমি যেন ওকে বলো না, আমি তোমায় কিছু বলেছি। রাগ হলে ওর আবার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।'

প্রসন্ন উঠিয়া যায়। ভূপেন চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। প্রভা তাকে শ্রদ্ধা করে, তার কথা শোনে। সে পর নয়, প্রভার সে দাদার মত। সে চেষ্টা করিলে এখনো প্রভাকে শুধরাইতে পারে। এ সব ভাবিয়াই কি প্রসন্ন প্রভার সম্বন্ধে বিশ্রী কথাগুলি তাকে জানাইয়াছে? সে কি তবে জানে না তার আর প্রভার মধ্যে কি বুঝাপড়া হইয়া গিয়াছে?

আধঘণ্টা পরে প্রভা আসিল, তথাকথিত ধীরেন মিত্রের গাড়ীতে স্বয়ং ধীরেন মিত্রের সঙ্গে। কিছুক্ষণের মধ্যে একেবারে প্রত্যক্ষ প্রমাণ হাজির হইবে জানিয়াই যেন প্রসন্ন ঠিক সময় বুঝিয়া প্রভার নামে তার অভিযোগগুলি ভূপেনকে জানাইয়া দিয়াছিল। প্রসন্ন কি জানে না পুরুষের মন কি রকম সন্দেহপ্রবণ! তার কাছে অত কথা শোনার পর একেবারে চোখের সামনে ধীরেন মিত্রের দামী মোটর গাড়ী হইতে নামিয়া আসিতে দেখিলে ভূপেনের মনটা যদি বিগড়াইয়া যায়, প্রসন্নর আগামী বিপদটাও হয়তো ফসকাইয়া যাইতে পারে।

ধীরেন বলিল, 'কেমন আছেন ভূপেন বাবু?'

'ভাল আছি।'

ভূপেনকে প্রভা কিছুই বলিল না। ব্যস্তভাবে ভিতরে যাইতে যাইতে ধীরেনকে শুধু বলিয়া গেল, 'একটু বসুন ধীরেন বাবু, আসছি।'

দুজনে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, গায়ে পড়িয়া আলাপ জমানোর চেষ্টা ধীরেন আর করে না। ভূপেন সত্যই বড় আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। মনের মধ্যে ক্ষীণ একটা প্রতিবাদ জোরালো হইয়া উঠিয়া ক্রমে ক্রমে প্রভার ব্যবহারের ক্রুদ্ধ অসমর্থনে পরিণত হইয়া যাইতেছিল। সত্যই এটা তো উচিত নয় প্রভার। প্রভাকে সে সন্দেহ করে না বটে, কিন্তু ধীরেনের মত মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করাই তো তার উচিত নয়; এবং কারো বলিয়া দিবার অপেক্ষায় না থাকিয়া নিজেরই

তার এটা বুঝা কর্তব্য ছিল। আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব যাকে এড়াইয়া চলে, তার সঙ্গে মোটরে চাপিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলে যে মানুষ সত্যসত্যই নিন্দা করিবে, এটুকু বুঝিবার মত বুদ্ধি প্রভার নিশ্চয় আছে।

প্রভা নামিয়া আসিয়া এক টুকরা কাগজ ধীরেনের হাতে দিল, তারপর মৃদুস্বরে কথা বলিতে বলিতে ধীরেনের সঙ্গে আগাইয়া গেল বাহিরের বারান্দা পর্য্যন্ত।

ভূপেন জানে এ সব কিছু নয়। কিন্তু জানিয়াও মনটা তার কেমন ব্যাকুল হইয়া উঠে। ধীরেনকে প্রভার এমন নির্ব্বিকার ভাবে গ্রহণ করা, ধীরেনের সঙ্গে তার এমন সহজ সম্পর্ক বজায় রাখা, তার কাছে প্রভার স্বতন্ত্র ও নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিত্বের অস্তিত্বকে স্পষ্ট করিয়া তুলিতে থাকে। প্রভার এই ব্যক্তিত্বই ধীরেনের সব চেয়ে বিপজ্জনক মনে হয়। ধীরেনের দুর্নাম আছে কি নাই, প্রভা হয়তো তা গ্রাহ্যও করে না। নিজে যদি সে মনে করে ধীরেনের সঙ্গে মেলামেশা চলিতে পারে, ধীরেনের সঙ্গে মেলামেশা সে করিবেই।

ধীরেনের বাগানবাড়ীতে প্রভার রাত্রিযাপনের কথাটা ভূপেন মনের তাকে তুলিয়া রাখিয়াছিল, কথাটা বিশ্বাস করিবে কি অবিশ্বাস করিবে, কিছুই ঠিক নাই। কথাটা সত্য হইলেও তার মানে কি দাঁড়ায় ভাবিবার চেষ্টা সে করে নাই। ধীরেনের সম্পর্কে ওদিক দিয়া কোন পীড়াদায়ক চিন্তা মনে আনিবারও যে প্রয়োজন নাই, এ ধারণা ভূপেনের নাড়া খায় নাই। তার বৌ হওয়ার আয়োজন করিতে করিতে প্রভা আরেকজনের বাগানবাড়ীতে সখ করিয়া রাত কাটাইতে যাইবে, এ চিন্তা মনে আনাও ভূপেনের হাস্যকর মনে হয়।

তবে প্রভাকে একবার জিজ্ঞাসা করা দরকার কি হইয়াছিল। শুধু কৌতূহল মেটানোর জন্য জিজ্ঞাসা করা, আর কিছু নয়।

'পরশু রাত্রে কোথায় ছিলে প্রভা ?'

'একজনকে ছেলে বিয়োতে হেল্‌প্ করছিলাম। আমার আর কাজ কি ?' প্রভা হাসিল, বলিল, 'চলো, ওপরে যাই।'

প্রসন্নই তবে মিথ্যা বলিয়াছে। প্রভা রোগীর বাড়ীতে ছিল, ধীরেনের বাগানবাড়ীতে নয়। হয়তো কিছু না জানিয়াই প্রসন্ন ধরিয়া লইয়াছে যে, রাত্রে প্রভা ধীরেনের বাগানবাড়ীতে ছিল। নয়তো প্রভাকে জিজ্ঞাসা করিলেই ধরা পড়িয়া যাইবে জানিয়া তার কাছে সে মিথ্যা বলিবে কেন ?

উপরে গিয়া ভূপেনকে ঘরে বসাইয়া প্রভা হঠাৎ বলিল, 'পরশু রাত্রির কথা জিজ্ঞেস করলে কেন ? ধীরেন বাবুর বাগানবাড়ীতে ছিলাম শুনেছ বুঝি ?'

ভূপেন নীরবে সায় দিল।

'তবে যে জিজ্ঞেস করলে কোথায় ছিলাম ?'

'বাগানবাড়ীতে ছিলে বিশ্বাস হয় নি।'

'বিশ্বাস হয় নি ? ও !'

প্রভা স্থির দৃষ্টিতে ভূপেনের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, দ্বিধা আর প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে। কি যেন বুঝিতে চাহিয়া সে বুঝিতে পারিতেছে না।

'ধীরেন বাবুর বাগানবাড়ীতেই ছিলাম।'

'কোন কারণ ছিল নিশ্চয়।'

'কি মানুষ তোমরা ! তবু কিছুতে স্বীকার করবে না মনে খটকা বেধেছে ! আমি পাছে কিছু মনে করি, তাই সন্দেহ করতে ভয় হচ্ছে, না ?'

'অত হিসেব করে কেউ সন্দেহ করে নাকি প্রভা ? সন্দেহ, অবিশ্বাসের কথা আমি ভাবিনি, ও সব বাদ দাও। তবে কাজটা তুমি সত্যি খুব অন্যায় করেছ।'

'সব না শুনেই বলছ অন্যায় ?'

'শুনেও তাই বলব।'

'বেশ, আগে শুনে নাও। ধীরেন বাবু ওখানে একটি মেয়েকে রেখেছেন। ভগবান জানেন কার মেয়ে, কোথা থেকে জুটিয়েছেন। পরশু সারারাত কষ্ট পেয়ে কাল ভোরে ওই মেয়েটার একটি ছেলে হয়েছে। ন'টা দশটার সময় আমি গিয়েছিলাম, তারপর আর ফিরে আসার উপায় ছিল না। আমি ফেলে চলে এলে মেয়েটা মরেও যেতে পারত।— অন্যায় করেছি ?'

'নিশ্চয়। একজন পুরুষ ডাক্তারকে ডাকিয়ে তুমি অনায়াসে চলে আসতে পারতে।'

'কেন ? নিজের রোগীকে অন্য ডাক্তারের হাতে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে আসব কেন ?'

'সংসারে থাকতে হলে কতগুলি নিয়ম মেনে চলতে হয় প্রভা। এমনি কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে দরকার মত সারারাত থেকে এলে কেউ কিছু বলার সুযোগ পায় না। কিন্তু ধীরেন মিত্তিরের বাগানবাড়ীতে তুমি রাত কাটিয়েছ শুনলে লোকে কি বলবে ভেবে দেখেছ ? ব্যাপারটা এমনিই তো কুৎসিৎ, তাছাড়া চাপা দেবার চেষ্টাও করা হয়েছে নিশ্চয় ? তুমি ছাড়া আর যদি ডাক্তার

না পাওয়া যেত তবে অন্য কথা ছিল। ব্যাপারটা যাতে জানাজানি না হয়, সেইজন্যই তো ধীরেন তোমাকে নিয়ে গেছে।'

'আমার অত সব ভাববার তো দরকার নেই। ডাক্তার হিসেবে আমায় ডেকেছে, ডাক্তার হিসেবে আমি গেছি। কে ডেকেছে, কোথায় ডেকেছে, আমার তা দেখবার দরকার।'

'গয়না কেড়ে নেবার মতলবে একটা গুণ্ডা যদি তোমায় ডাক্তার হিসাবে ডাকে, জেনে শুনেও যাবে তুমি?'

'ছেলেমানুষের মত কথা বলো না।'

প্রভা উঠিয়া যায়। ভূপেন জানে, সে এখনই ফিরিয়া আসিবে, শুধু আলোচনাটা বন্ধ করিবার জন্য সে উঠিয়া গেল। আসিয়া হয়তো বলিবে, তোমার জন্য চা আনতে বলেছি, চা খাবে তো এখন? বলিয়া এতক্ষণের তর্ককে একেবারে বাতিল করিয়া নূতন বিষয়ে কথা আরম্ভ করিবে।

যতক্ষণ প্রভা সামনে বসিয়া কথা বলিতেছিল, প্রতি মুহূর্ত্তে তার মনে কি ভাবের উদয় হইতেছে, ভূপেন স্পষ্ট অনুমান করিয়া যাইতেছিল। আগেও এটা সে খেয়াল করিয়াছে। প্রভা কি বলিবে, তার কথা শুনিয়া প্রভার মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া জাগিবে, আগে হইতেই সে যেন তা জানিতে পারে। সব দিন নয়, মাঝে মাঝে। যেদিন প্রভার সঙ্গে কোন বিশেষ কথা আলোচনা করিবার থাকে অথবা যেদিন প্রভাকে দেখিবার জন্য মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়ে, সেইদিন। হয়তো এই সব বিশেষ দিনে তার মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় সমস্ত জগতের সঙ্গে সম্পর্ক প্রত্যাহার করিয়া শুধু প্রভাকে আশ্রয় করে বলিয়া এটা সম্ভব হয়, প্রভার চোখের পাতা একটু কাঁপিয়া গেলে, অধরোষ্ঠের মিলন রেখার তুচ্ছ একটু ব্যতিক্রম ঘটিলে, তাও তার চোখ এড়ায় না, সে মানে বুঝিতে পারে। এমনি ভাবে কিছু না জানিয়াও সে জানিতে পারিয়াছিল যে, মাঝে মাঝে তার মনে হইত পৃথিবীর সমস্ত মানুষও বুঝি জানিতে পারিয়াছে তার ভালবাসার কথা, এত স্পষ্ট ছিল প্রভার নিঃশব্দ ভাষাহীন ঘোষণা।

আজ আগাগোড়া ভূপেনের মনে হইতেছিল, প্রভা তাকে কি যেন একটা আঘাত করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। এখন একা বসিয়া এই আশঙ্কাটাই তার প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে। কোন্ দিক দিয়া কি ভাবে আঘাতটা আসিবে সে বুঝিতে পারে না, কিন্তু তাকে যে মর্ম্মাহত হইতে হইবে, এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ হইয়া থাকে। অজানা বিপদের প্রতীক্ষা করার মন লইয়া সে প্রভার ফিরিয়া আসার প্রতীক্ষা করিতে থাকে।

প্রভা ফিরিয়া আসিয়া বলে, 'চা আনতে বললাম, আর সন্দেশ। বাড়ীতে তৈরী।'

ভূপেন বলিল, 'আমিও তাই ভাবছিলাম। সন্দেশের কথাটা বাদে।'

প্রভা বলিল, 'তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে আমার।'

ভূপেন বলিল, 'আমি তাও ভাবছিলাম প্রভা।'

বাহিরে শান্ত ভাব বজায় রাখিয়া ভূপেন উদ্বেলিত হৃদয়ে প্রতীক্ষা করে। ছোট টিপয়টিতে প্রভা হাত রাখিয়াছে, তার হাতের অঙ্গুলিগুলি আশ্চর্য্য রকম কোমল! কে বলিবে হাতটি একজন ডাক্তারের, অতি অনমনীয় কঠোর প্রকৃতির ডাক্তারের, যে স্ত্রীলোক হইয়াও স্ত্রীলোক নয়।

প্রভা চুপ করিয়া আছে দেখিয়া ভূপেন একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেল। আঘাত দিতে সে তো কখনো ইতস্তত করে না।

'কি বলছিলে প্রভা?'

'বলছিলাম, আমাদের ওটা ছ'মাস এক বছর পিছিয়ে দেওয়া যাক। তাড়াতাড়ি করার কি আছে!'

তাড়াতাড়ি! আট বছর অপেক্ষা করার পরেও প্রভার আজ তাড়াতাড়ি মনে হইতেছে! রাগ করিবে ভাবিয়াও কিন্তু ভূপেন রাগ করিতে পারে না। একটু অভিমান পর্য্যন্ত তার জাগে না। প্রভার কথা শুনিয়া তার অনুভূতির জগতে হঠাৎ এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া যায়, কতগুলি অনুভূতি যেন বাঁধা তারের মত অতিরিক্ত মোচরে টন টন করিতেছিল, হঠাৎ ঢিল হইয়া গিয়াছে। কিছুদিন হইতে একটা যে অস্বাভাবিক উত্তেজনা তাকে পীড়ন করিতেছিল, সর্ব্বদা শ্রান্তি আর বিরক্তিবোধ মেজাজ খারাপ করিয়া রাখিয়াছিল, সমস্ত মিলাইয়া গিয়া সে শুধু অনুভব করে অবসন্নতা। বার বার মনে হইতে থাকে, আরও ছ'মাস এক বছর কোন পরিবর্ত্তন দরকার হইবে না, আরও কিছুকাল প্রভাকে আগের মত কাছে পাওয়া যাইবে।

সেও কি বিবাহের দিন পিছাইয়া দিতে চাহিয়াছিল? প্রভা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিয়াছে, সে শুধু ইচ্ছাটা মনের মধ্যে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল?

'বেশ, তাই হবে।' ভূপেন বলে।

'তুমি এত সহজে রাজী হবে ভাবি নি। রাগ করবে না?'

'না। তোমার ওপর কখনো রাগ করেছি প্রভা?'

'একটা শুধু ভয় আছে আমার। আবার পাগলামি করবে না তো, যেমন আরম্ভ করেছিলে?'

ভূপেন মৃদু হাসিয়া মাথা নাড়িল।—'এই জন্যে তুমি রাজী হয়েছিলে, না? আমাকে বাঁচাবার জন্যে?'

'শুধু ওই জন্যে নয়।'

ঠাকুর চা, সন্দেশ আর জলের গ্লাস রাখিয়া গেল। ভূপেন খেয়াল করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল, জীবনের এমন গুরুতর ব্যাপারের যখন নিষ্পত্তি হইতে থাকে, তখনও পেটের তাগিদ চাপা পড়ে না, তার রীতিমত ক্ষুধা পাইয়াছে!

মুখে তুলিবার জন্য সন্দেশের প্লেটের দিকে সে হাত বাড়াইতে যাইতেছে, প্রভা উঠিয়া আসিয়া পাশে দাঁড়াইয়া নিজেই তার মুখে সন্দেশ তুলিয়া দিল।

ঠাকুর তখন চলিয়া গিয়াছে।

'শুধু ওই জন্যে নয়। কি যে হয়েছে আমার, ভাল বুঝতে পারি না। তোমায় নিয়ে কত রকম স্বপ্ন দেখি, কত কল্পনা করি, কিন্তু সত্যি সত্যি সব ঘটবে ভাবতে গেলেই কেমন ভয় হয়। মনে হয়, যেমন ভাবি সে রকম কিছুই হবে না, বিশ্রী লাগবে শেষ পর্য্যন্ত।'

চেয়ারের পিছনে সরিয়া গিয়া প্রভা ভূপেনের কাঁধে দুটি হাত রাখে। 'আমি ভাবছি, বিয়েতে কাজ নেই। অত ধরাবাঁধার মধ্যে আমরা যেতে পারব না। তার চেয়ে বরং—'

'তাও আমরা পারব না প্রভা।'

কপালে হাত রাখিয়া ভূপেনের মাথা নিজের শরীরে চাপিয়া রাখিয়া প্রভা অনেকক্ষণ তেমনি ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর অতি ক্লান্ত অতি মৃদু স্বরে বলিল, 'তা জানি। কিন্তু থাকতে পারছ না বলে তুমি যে পাগলামী সুরু করে দিয়েছিলে। আবার কি ঝোঁক চাপবে তোমার, কে জানে। তার চেয়ে সব কিছুই ভাল।'

'আর পাগলামী করব না প্রভা'।

কাণের কাছে মুখ নামাইয়া প্রভা ফিস ফিস করিয়া বলিল, 'শোন। তোমায় জানিয়ে রাখি। আজ থেকে আমি তোমার হয়ে রহিলাম। যেদিন খুসী যখন খুসী, আমাকে চাইলেই পাবে। রাত দুটোর সময় তুমি যদি আমায় ফোন করে ডাকো, ট্যাক্সি না পাই, পায়ে হেঁটে আমি তোমার কাছে চলে যাব। তুমি কিন্তু শান্ত হয়ে থাকবে, নিজেকে ধ্বংস করতে পারবে না। কেমন?'

ছয়

জীবনে যতদিন স্বাদ গন্ধ থাকে, মানুষের মনে হয় জীবনকে সে আয়ত্ত করিয়াছে, জীবন-কাব্যের সেই কবি। যে রকম স্বাদগন্ধই থাক,কটু অথবা মধুর, পাঁকের অথবা গোলাপের। স্বাদগন্ধ যখন উপিয়া যায়, প্রত্যাশা অথবা বিস্ময়ের দিন হয় শেষ, তখন মানুষের খেয়াল হয় জীবন তার অধিকারের বাহিরে, নিজের জীবনে নিজে সে কিছুই নয়।

প্রভার সঙ্গে শেষ বুঝাপড়া হইয়া গিয়াছে। বুঝিবার বা বুঝাইবার আর কিছুই বাকী নাই। স্বপ্ন আর কল্পনা সৃষ্টির কারখানায় বিচিত্র উপাদান সরবরাহের খেলা পরামর্শ করিয়া দুজনে বন্ধ করিয়া দিয়াছে। অনির্দ্দিষ্ট লক্ষ সম্ভাবনাকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া দাঁড় করানো হইয়াছে একটি মাত্র বাস্তব ও নির্দ্দিষ্ট সম্ভবনায়। যেদিন খুসী, চাহিলেই প্রভাকে পাওয়া যাইবে। চাহিবার সঙ্কোচ জয় করিতে হইবে না, না পাওয়ার ভয়ে কাতর হইতে হইবে না, প্রতীক্ষায় অধীর হইতে হইবে না, কোন আয়োজন করিতে হইবে না। এখন শুধু আছে চাওয়া এবং পাওয়া। তাছাড়া সমস্তই বাহুল্য, অনাবশ্যক। দুজনের মধ্যে সব ব্যবধান সংক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে ছড়ানো দিগন্তের যেদিকে খুসী মুখ করিয়া রওনা হওয়া, কাছে আসা আর দূরে যাওয়া, পথ ভোলা আর পথ খোঁজা, নদী মাঠ বন উপবন সাগর ও পাহাড় পার হওয়া, এ সবের আর প্রয়োজন নাই, তার আর প্রভার মধ্যে সোজা লাইন পাতা হইয়া গিয়াছে।

ভূপেন ভাবিতেও পারে নাই, এত সব রোমাঞ্চকর সম্ভাবনার এমন ভোঁতা পরিণতি হইবে। তার জানাও ছিল না প্রেম বাড়ে কমে, বাঁচে মরে। সেদিন প্রভার কাছে বিদায় লইয়া চলিয়া আসিবার সময়ও সে কিছু টের পায় নাই। একটা গুরুতর জটিল সমস্যার অতি সহজ ও সুন্দর মীমাংসা হইয়া গিয়াছে ভাবিয়া, তখন কেবল নিশ্চিন্ত হওয়ার শান্তিই সে অনুভব করিয়াছিল। সেই সঙ্গে ছিল প্রভার সঙ্গে সমস্ত বিরোধের অবসান ও সর্ব্বাঙ্গীন বুঝাপড়ার আনন্দ। শান্ত মধুর এক

অনির্ব্বচনীয় পুলকের মধ্যে কয়েকটা দিন তার কাটিয়া গিয়াছিল, মনে হইয়াছিল পৃথিবী কি সুন্দর, গৃহ কি মনোরম, বাঁচিয়া থাকা কি সুখের। তারপর শীতল জলে স্নানের প্রভাবের মত কি ভাবে যেন উপিয়া যাইতে লাগিল সেই অস্থায়ী আবেশ, ধীরে ধীরে মিথ্যা হইয়া যাইতে লাগিল সাময়িক সত্য। রসালো দিনগুলি হইয়া উঠিল নীরস দীর্ঘ সময়। পাখা মেলিয়া উড়িতে উড়িতে এক সময় তার আকাশটি পর্য্যন্ত রহিল না, পাখা গুটাইয়া অবসন্ন দেহে ভারাক্রান্ত মনে নামিয়া আসিতে হইল পাথর ঢাকা মাটির প্রলেপে বিছানো কাঁকরে।

ভূপেনের মানসিক স্থবিরত্বের সুযোগে সংসার ধীরে ধীরে তার মনোযোগ নিজের দিকে টানিয়া লইতে লাগিল। এতদিন সংসারের কোন বিষয়ে কেউ কিছু বলিতে আসিলেই ভূপেন বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল, এখন ছোট বড় সব বিষয়েই তার পরামর্শ ও নির্দ্দেশ পাওয়া যাইতে লাগিল। স্বর্ণের সাহস সকলের চেয়ে বেশী, সংসার পরিচালনার দায়িত্বটাও তার, ভয়ে ভয়ে সেই প্রথমে দুটি একটি সমস্যা তার দপ্তরে হাজির করিতে লাগিল। তারপর জানাজানি হইয়া গেল মেজাজ ভূপেনের ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, কথায় কথায় অকারণে সে আর চটিয়া উঠে না। তখন সাহস পাইয়া সকলে ঘেঁষিয়া আসিল তার কাছে, জানাইতে লাগিল অসংখ্য দাবী ও প্রার্থনা। ভীরু রমলা পর্য্যন্ত স্বর্ণের রায়ের বিরুদ্ধে তার কাছে আপীল পেশ করিতে গেল, তার গান শেখার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া না দিলে সে কিন্তু প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিবে, হ্যাঁ।

বাঁধ-ভাঙা বন্যার মত স্থগিত করা দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য ভূপেনকে ভাসাইয়া নেওয়ার উপক্রম করিল। কত কি যে তাকে করিতে হইবে তার ঠিক ঠিকানা নাই। পিসীর বড় মেয়েটার বিবাহ না দিলে নয়, পুরী যাওয়ার জন্য মা উতলা হইয়া পড়িয়াছেন, নৃপেন ম্যাট্রিক পাশ করিয়া এবার কোন কলেজে কি পড়িবে ঠিক করা দরকার, বিমলার ফিটের অসুখের বাড়াবাড়ি সুরু হইয়াছে, ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত, বাড়ীর প্রায় সকলের জন্য জামা-কাপড় কিনিতে এ মাসে বেশী টাকা দরকার, দু'বছর বাড়ীর কলি ফিরানো হয় নাই, মণ্টুর গায়ে ফোঁড়া উঠিয়াছে, খুকী সর্ব্বদা নখ কামড়ায়, আরও কত কি।

আগে এসব সরমার মারফতে তার কাছে পৌঁছিত। এতটুকু ব্যস্ততা বা উদ্বেগ সরমার দেখা যাইত না, ধীরে সুস্থে একে একে সমস্ত দরকারী অ-দরকারী খবরগুলি তাকে শুনাইয়া যাইত, যেখানে ব্যাখ্যা প্রয়োজন, নিজেই ব্যাখ্যা করিত। কোন্ বিষয়ের গুরুত্ব কতখানি, নিজে নিজে স্থির করিবার কি আশ্চর্য্য ক্ষমতাই সরমার ছিল! শুধু তার বলিবার ধরণেই সব বিষয়ে ভূপেনেরও স্পষ্ট ধারণা জন্মিয়া যাইত, মনে হইত কিছু না বলিয়াও সরমাই যেন তাকে বলিয়া দিয়াছে কোন্ বিষয়ে কি তার করা উচিত। এখন সোজাসুজি সংসারের বহুমুখী জটিলতার সংস্পর্শে আসিয়া মাঝে মাঝে ভূপেনের ধাঁধাঁ লাগিয়া যায়, নিজেকে অসহায় মনে হয়। সরমার জন্য তখন মন কেমন করিতে থাকে। সরমা থাকিলে আজ তার ভাবনা ছিল না। সমস্ত জটিলতা সরমা সরল করিয়া দিত, বসিয়া বসিয়া তার মাথা ঘামানোর প্রয়োজন হইত না।

যে সব ব্যাপারে কর্ত্তব্য ঠিক করিতে তার এত ভাবিতে হয়, ভাবিয়া ভাবিয়া সিদ্ধান্ত করার পরেও দ্বিধা সন্দেহে মন ভরিয়া থাকে, সরমা কেমন করিয়া সে সব ব্যাপারের মূল কথাটি এত সহজে ধরিতে পারিত? নিজেদের প্যাঁচালো বুদ্ধিতে জটিল যুক্তি তর্ক খাড়া করিয়া তারা যে বিষয় ঘোরালো করিয়া তোলে, সরমার মত মেয়েদের সহজ বুদ্ধিতে বোধ হয় সে সব সহজ ভাবেই ধরা পড়ে।

অনেক মেয়ের হয়তো এই স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে। যেমন শান্তি। বাঙালী পরিবার যেমন এক ছাঁচে ঢালা, তাতে শান্তি ও সরমা একই আবেষ্টনীতে মানুষ হইয়াছে মনে করা চলে। সরমার মত সেও হয়তো পাইয়াছে সহজ সরল বুদ্ধি। তবে সরমার অভিজ্ঞতা তার নাই, স্বামী পুত্র আর স্বামীর আত্মীয় পরিজনের বৃহৎ সংসারে কয়েকটা বছর কাটানোর আগে সে সব বেচারী পাইবেই বা কোথায়। বিবাহের সময় সরমা যেমন ছিল, লাজুক আর দিশেহারা, ও এখন সেই স্তরে আছে। সরমার মত হইয়া উঠিতে ওর অনেক সময় লাগিবে, অনেক।

কাজ আর সংসারের দায়িত্ব আশ্রয় করিয়া ভূপেন নিজেকে ভুলিবার চেষ্টা করে এবং এত সহজে নিজেকে ভোলা যায় দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া যায়। সে বুঝিতে পারে মূল্য দিলেই জগতের তুচ্ছ অবলম্বনও মূল্যবান হইয়া উঠিতে পারে। বিয়াল্লিশ বছর বয়সে নিজের বাড়ীর মানুষগুলির সম্বন্ধে সে

এক নূতন সত্য আবিষ্কার করে, বিভিন্ন স্বার্থ আর প্রকৃতি কতটুকু মমতাকে আশ্রয় করিয়া সামঞ্জস্য বজায় রাখিতে পারে। হিংসা বিদ্বেষ, কলহবিবাদ, ওই সামান্য প্রীতির বাঁধনটুকু ছিঁড়িতে পারে না, কলহের শেষে আবার অনায়াসে গলাগলি ভাব হয়। এটা সম্ভব হয় শুধু বাস্তবতার ভিত্তিতে তাদের সম্পর্ক দাঁড়াইয়া আছে বলিয়া। ছাড়াছাড়ি হওয়াটা তাদের কাছে মর্মান্তিক কিছু নয়, তবু ছাড়াছাড়ি হয় না। কারণ তার প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ মিলিয়া মিশিয়া আনন্দেই সকলে দিন কাটায়।

এ ভাবে জীবন কাটাইতে দোষ কি? কারো সঙ্গে এমন সম্পর্ক গড়িয়া তোলার প্রয়োজন কি, যে সম্পর্ক চুকিয়া গেলে বাঁচিয়া থাকাটাই ভয়াবহ শাস্তিতে পরিণত হয়?

যত দিন যায়, প্রভার বিরুদ্ধে একটা জোরালো অভিযোগ ভুপেনের মনে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকে। দুজনের সম্পর্ক সহজ করিয়া দেওয়ায় প্রথমে প্রভার কাছে তার কৃতজ্ঞতার সীমা ছিল না, তারপর ভীরু সন্দেহের মত ক্ষীণ একটা প্রতিবাদ মনে জাগিয়াছিল যে, প্রভা কি সত্যই খুব বেশী উদারতা দেখাইয়াছে? হতাশ অবসন্নতার ভাব কাটিয়া যাওয়ার সঙ্গে জীবনের অপার শূন্যতা পীড়ন আরম্ভ করিলে, এই প্রতিবাদের ভাষা ক্রমে ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। কেবলি মনে হইতেছে, তার দিক ভাবিয়া তো শুধু নয়, নিজেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য প্রভা তাকে মুক্তি দিয়াছে। প্রভা রেহাই চাহিয়াছিল। এমন অন্ধ আবেগের সঙ্গে রেহাই চাহিয়াছিল যে, ভবিষ্যৎ পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা পর্য্যন্ত ঘুচাইয়া দিয়া তাদের ভালবাসাকে সে চিরদিনের জন্য ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। প্রভা জানে বাসন্তী-পূর্ণিমা রাত্রের অনির্দ্দিষ্ট কামনা তার নয়, প্রতিদিন সে তাকে চায় জীবনের সুখ-দুঃখ হাসিকান্নার সাথী হিসাবে। জানিয়া শুনিয়া এ উদারতা দেখানোর কি মানে হয়, আমাকে চাহিলেই তুমি পাইবে। কি করিয়া প্রভা মনে করিতে পারিল ওভাবে সে তাকে কোনদিন চাহিতে পারে?

সমস্ত কি ছল প্রভার, তাকে ঘিরিয়া স্বপ্ন রচনার সেই কথা? স্বপ্ন কি প্রভা রচনা করিতে জানে? তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য হয়তো প্রভা ওকথা বলিয়াছে। অনেক দিনের বন্ধু সে, অনেকদিন হইতে তার প্রেমে উন্মাদ, সুতরাং উদারভাবে তাকে কতগুলি রোমাঞ্চকর কথা তো অন্ততঃ বলা উচিত, নিজেকে যখন দেওয়া চলে না। একটু শান্ত করা উচিত মানুষটার মন, তার জন্যই মন যখন তার এত উতলা হইয়াছে। প্রভা ডাক্তার, রোগীকে সে ওষুধ দেয়, আশা দেয়, তারও প্রেমোন্মাদনার চিকিৎসাই হয়তো প্রভা করিয়াছে।

চাহিলেই আমাকে পাইবে, একথাও হয়তো প্রভার মিথ্যা। সে কোনদিন চাহিবে না জানিয়াই ওকথা প্রভা বলিতে পারিয়াছে।

ভাবিতে ভাবিতে একদিন প্রভাকে আঘাত করিবার দুরন্ত ইচ্ছা জাগে ভুপেনের, কোনমতে এ ইচ্ছা সে দমন করিতে পারে না। প্রভার মিথ্যা ধরাইয়া দিতে হইবে, বুঝাইয়া দিতে হইবে ছেলে-ভুলানো কথায় ভুলিয়া থাকিবার মানুষ সে নয়। প্রভাকে এভাবে জব্দ করিয়া তার লাভ কি হইবে ভাবিয়া দেখিবার অবসর ভুপেন পায় না, ঝোঁকের মাথায় সন্ধ্যার পর সে প্রভার বাড়ী যাওয়ার জন্য বাহির হইয়া পড়ে। মন তার ভরিয়া থাকে গভীর বিষাদে কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তনের কথা সে ভাবে না।

সারাদিনের গরমের পর এখন পরম উপভোগ্য বাতাস বহিতে সুরু করিয়াছে। ভুপেন হাঁটিয়াই প্রভার বাড়ীর দিকে চলিতে থাকে। তাড়াতাড়ি করিবার কিছু নাই, উৎকণ্ঠিত আগ্রহে প্রতীক্ষা তো কেউ করিতেছে না তার জন্য। ফিরিয়া তার আসিতে হইবে, দু'দণ্ডের জন্য বিব্রত প্রভার মুখখানি দেখিয়া, প্রভার মনকে শেষ জানা জানিয়া।

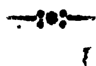
বাহিরের বসিবার ঘরে কেউ ছিল না, একটি স্তিমিত আলো জ্বলিতেছে। উপর হইতে কয়েকটি মানুষের কথা ও হাসি ভাসিয়া আসিতেছিল। ভুপেন একটা খালি চেয়ারে বসিয়া পড়িল। প্রভার কয়েকটি বন্ধু আসিয়াছে, দোতালায় প্রভার ঘরে তারা সানন্দে কলরব করিতেছে। প্রভার গলা শোনা গেল, কথাগুলি বুঝিতে পারা গেল না, তারপর কাণে আসিল প্রভার উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দ। এখনো সে হাসিতে ভুলিয়া যায় নাই। জীবন যাদের আনন্দে ভরপুর, ভিতরের হাসি যাদের শব্দে ফাটিয়া পড়ার জন্য সর্ব্বদা উদ্যত হইয়া আছে, তাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া সন্ধ্যাটি প্রভা উপভোগ করিতেছে।

ভুপেন ঈর্ষা বোধ করে না, সে শুধু আশ্চর্য্য হইয়া যায়। প্রভার জীবনেও হাসি ও আনন্দ আজ এত সুলভ! নিজে সে তবে হাসিতে ভুলিয়া গিয়াছে কেন? এ দোষ তো তার নিজের।

প্রেমকে এত বড় করিয়া তুলিবার কোন প্রয়োজন তো তার ছিল না, ব্যর্থতাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে কেউ তো তাকে অনুরোধ করে নাই। সরমা আর নন্তর জন্য শোক যদি তার হইয়া থাকে, হোক, প্রভা যদি স্বপ্ন আর কল্পনার জগৎকে অনুর্ব্বর মরুভূমি করিয়া দিয়া থাকে, দিক। আরও তো অনেক কিছু আছে জীবনে, সে সব অস্বীকার করিবার কোন কারণ তো নাই। হাতের খেলনা কাড়িয়া নেওয়া হইয়াছে বলিয়া অবোধ শিশু ঘরের আসবাব ভাঙিতে আরম্ভ করে। সে তো শিশু নয়।

প্রভার সঙ্গে আবার অনেকটা বুঝাপড়ার মতলব ভূপেনের কাছে হাস্যকর ছেলেমানুষী হইয়া যায়। কি হইবে প্রমাণ করিয়া প্রভার মনে কি ছিল আর কি ছিল না? তার চেয়ে প্রভাকে হাসিতে দেওয়াই ভাল।

ছোট বড়



মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ভালবাসা

দুপুরটা নিদারুণ অসহ্য। মন কেমন করার চোটে শরীরটাও অস্থির-অস্থির করে মালতীর। একটা অবাস্তব গর্ব, পরস্মৈপদী অহঙ্কার শুধু আঁকড়ে থাকে যে পরের জন্য মন কেমন করার নামই ভালবাসা। বিপিনের জন্য কী কেমনটাই করে তার মন!

মনে হয়, ভালবাসতে পারার ক্ষমতার তার শেষ নেই, তুলনাও নেই। জগতকে ডেকে ব'লতে ইচ্ছে হয়, আমার দিকে চেয়ে দেখো। এমন ভালবাসা দেখেছ কখনো? এমন ভালো কখনো বেসেছো? দেখবে কোথায়, বাসবে কাকে!

বিপিন তার স্বামী, এই যা। বিয়ে তাদের হয়েছে মোটে বছরখানেক। লোকে শুনলে মুচকে হাসবে, ভাববে যে তাই বলো, বাপের কিনে দেওয়া বরটি এখনো আনকোরা। কেউ মানবে না যে তার ভালবাসা এমন একটা বিশেষ কিছু। তার মন কেমন করার পরিমাণটা কে জানবে!

অনেকের মধ্যে দিন কাটে, ঘরে এবং বাইরেও, তবু মালতীর একেবারে একা হয়ে থাকার মারাত্মক অনুভূতি ঘোচে না। তারই ভালবাসার অসাধারণত্বে তার হৃদয় মন যেন অস্পৃশ্য হ'য়ে গেছে; জগতের জমজমাট জীবনের বিপুল আলোড়নের ছোঁয়াচ পায় না। বিপিনের কাছে থেকেও, বুকের সঙ্গে লেগে থেকেও, তার যে হৃদয়টি অপূর্ণতা অনাশ্বাসের ব্যথায় টনটনিয়ে থাকে, নিজের সেই হৃদয়টির জন্য তার এমনি মমতা যে অন্য হৃদয়গুলির ব্যথা বেদনা থেকে সেটাকে সে সর্ব্বদা সযত্নে বাঁচিয়ে চলে।

পাশের বাড়ীর বৌ। চিন্তিত মুখখানা কাতরতায় থমথম করছে। সাজা পানটি মুখে তুলতে ভুলে গিয়ে ধরে আছে হাতে।

—প্রাণ হাতে যাওয়া, প্রাণ হাতে ফেরা; দুকুরটা কাটে না ভাই।

শুধু দুকুরটা কাটে না? তাতেই এত! মালতীর শুধু দুপুর নয়, বুকের ধুকধুকানির কখনো তার বিরাম নেই। বাড়ী ফিরলেও কি শান্তি আছে? আজকের মত নয় নিশ্চিন্ত, কাল? কাল তো আবার যেতে হবে, ফিরতে হবে? সব সময়েই মনটা আকুলি-বিকুলি করে মালতীর।

দুপুর গমগম করে অভিশপ্ত স্তব্ধতায়, তার মধ্যে হঠাৎ ভেসে আসে মরণাহত উন্মত্ত সহরের হিংস্র আস্ফালন, আত্মনাশা আর্ত্তনাদের কলরব।

ঘরেই কি স্বস্তি আছে? কখন কি হয়, কখন কি হয়। এ বস্তিতে আগুন, ও বস্তিতে আগুন, এ পাড়ায় হানা, ও পাড়ায় হানা—বাপ্ রে। আমাদের মেয়েদেরই যত জ্বালা—ভয়েও মরি, ভাবনাতেও মরি। কাগজে—পড়ি এতগুলো মরেছে; এতগুলো হাসপাতালে গেছে—ওদের মা বৌয়ের কথা ভাবলে বুক ফেটে যায় ভাই, ঘোমটা দিক আর বোরখা পরুক, যে আবাগীর সর্ব্বনাশ হয়…

বুকটা যেন ফেটে যাবে মালতীরও অজানা অচেনা ওই আবাগীগুলির মত। বিপিন যদি না ফেরে আজ! কি করবে সে, পাগল হয়ে যাবে, না গলায় দড়ি দেবে! নিজেকে ওই আবাগীদের দলে কল্পনা করতে গিয়ে বিশ্ব-সংসার তার চোখে মিথ্যা হয়ে যায়। না, আর সে সইবে না বিপিনের পাগলামি। এমনিই কখন কি হয় ঠিক নেই, ওর আবার দাঙ্গা থামাবার কাজে মাথা গলানো চাই, শান্তি সেনায় যোগ দেওয়া চাই, ইচ্ছা করে বিপদে ঝাঁপ দেওয়া চাই।

আজ বাড়ী ফিরুক, আর বেরোতে দেবে না। কাজে পর্য্যন্ত যেতে দেবে না, ছুটী নেওয়াবে। যায় তো যাবে কাজ। বিপিনকে ঘরের কোণে আটকে রাখবে। আড়াল করে রাখবে বুক দিয়ে।

ফেরার সময় পার হয়ে যায়, বিপিন ফেরে না। সতীনাথকে একা আসতে দেখা যায়। মালতীর চোখ পথে পাতাই ছিল। কাজের পর বাড়ী ফিরলে ওর সঙ্গে আসে বিপিন, কি গল্প করতে করতে আসে, তাও তার জানা। বিপিন তাকে এক সময় শোনাবেই প্রতিদিন, সতীনাথ কি বলছিলো জানো?…

বাইরে ধুলো পড়া রোয়াকে গিয়ে দাঁড়ায়। অদূরে গলির ওপাশে ছোট বস্তিটি আবর্জনার স্তূপ হয়ে আছে। বর্ষা হয়ে যেদিন রাস্তায় এক হাঁটু জল জমেছিল, তারপর অনেকদিন পোড়া ঘর-ধোয়া কালিমাতে রাস্তাটা কালচে দেখিয়েছে। প্রায় বছর ঘুরে এল বৈকি। এমনি

ভুলে থাকে মালতী বিপিনের চিন্তায় মশগুল হয়ে, কিন্তু ওই ভস্ম-স্তুপের দিকে চোখ পড়লেই তার মনে পড়ে যায় দিন-দুপুরে সেই বীভৎস কোলাহল, আগুনের রক্তিম শিখা আর মন প্রাণ চিরে দেওয়া অবর্ণনীয় আর্তনাদ। কেন তাকে দেখতে হয়েছিল সে দৃশ্য, শুনতে হয়েছিল সে আওয়াজ! জগতে কত সুন্দর দৃশ্য আছে, কত মধুর ধ্বনি আছে, সে সবও তো সে দেখতে চায় নি, শুনতে চায় নি।

কী ধীরে ধীরে অনিচ্ছুক পদে হেঁটে আসছে সতীনাথ। তাকে রোয়াকে দেখেই মাথা নীচু ক'রে চোখ পেতে রেখেছে পথে।

কাছে এসে চোখ তুলে তাকায় সতীনাথ। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

কি হয়েছে বলুন। শীগগির বলুন।

সতীনাথ বলে, মালতী শোনে। মালতী আর্তনাদ করে ওঠে না, কাঁদে না, শব্দ করে না। সে নিজেই মিথ্যা অকারণ হয়ে গেছে, সব ফুরিয়ে গেছে তার। সে ঘর করত স্বামী আর এই আতঙ্ক নিয়ে, এই ছিল বিয়ের পর এক বছর তার জীবনের অবলম্বন, তার বেঁচে থাকার মানে। এখন বিপিনও নেই, তার আতঙ্কও নেই।

চলুন যাই। দেখে আসি।

কি আর দেখবেন? সতীনাথ ইতস্ততঃ করে, ও না দেখাই ভাল।

আপনি চলুন তো। ওসব পরে বলবেন।

ভেতরে তবে একটা খবর দিয়ে আসি।

কে সঙ্গে যায়, কে যায় না, কে কাঁদে, কে কি বলে, কিছুই খেয়াল থাকে না। কি উদ্দেশ্যে কোথায় চলেছে তাও বুঝি তার মনে থাকে না। রাজপথে মানুষ তার মন হরণ করেছে। এই সহরের, এই বিষণ্ণ অভিশপ্ত সহরের পথেও এত মানুষ চলে, এত ব্যস্ততা দেখা যায়! ডাইনের ওই গলির ভিতরটা যদি বা জনহীন শ্মশানের মত, বাঁয়ের গলিতে মানুষের চলাচল। এই রাজপথ জনমুখর, চোখে-মুখে এত শঙ্কা নিয়ে কেন মানুষ বেরিয়েছে পথে? কি এমন কাজ এদের যা করতেই হবে, যে জন্য বিপদকে মানতে পারছে না, প্রাণের ভয়কে অগ্রাহ্য করছে? এদের ঘরে যে আবাগীরা আছে—

ওরা কি বলছে? কিসের মিছিল?

কে যেন জবাব দেয়, ওরা দাঙ্গা করতে মানা করছে। শান্তি প্রচারে বেরিয়েছে।

মালতী চেয়ে থাকে তফাতের গতিশীল ছেলে-মেয়েদের দিকে, কান পেতে আওয়াজ শোনে। এগোতে এগোতে ক্রমে তারা কাছে আসে, আওয়াজ স্পষ্ট হয়, কথাগুলি তার মনের মধ্যে শত ধ্বনি সহস্র প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করে। এরা তার দুর্ভাগ্য ঠেকাতে বেরিয়েছে? এরা বন্ধ করতে বেরিয়েছে তার সর্ব্বনাশ? এরা তার কাছে আবেদন জানাচ্ছে মরণ-যজ্ঞের আগুন নেভাতে এগিয়ে আসতে!

সঙ্গী ছাড়া হয়ে পায়ে পায়ে মালতী এগিয়ে যায়। ঠিক এই জন্য যেন সে বাড়ী থেকে বেরিয়েছিল, এমনি ভাবে শোভাযাত্রায় যোগ দেবার উদ্দেশ্যে। মেয়েদের মধ্যে মিশে সে একাকার হয়ে যায় পর মুহূর্ত্তে।

তথাকথিত

আধা-সরকারী হাসপাতালের এল-এম-এফ ডাক্তার মতিলাল কুঁচিয়ে কুঁচিয়ে বাঁকা চোখে তাকায় সমবেত আরোগ্যপ্রার্থীদের দিকে। কি যেন ভেবেছে তাকে দশ গাঁয়ের লোকগুলি। বিনে মাইনের কেনা চাকর। সবাই ভিড় করে আসে হাসপাতালে, যার সর্দি কাসি, কাল যে মরবে—সবাই। বিছানা থেকে টেনে ওঠানোর জন্যই যে রোগীটার মরার সম্ভাবনা, তাকে পর্য্যন্ত তুলে আনে —বিনা পয়সায় তাকে দেখতে, আর ফিকে রঙের জলো ওষুধ নিতে। বেতন যা পায়, যেন এরাই দেয় তাকে, দশগুণ উসুল করে নেবার দায়িত্বও যেন এরাই গ্রহণ করেছে কর্ত্তব্য হিসাবে। কত সামান্য তার ফি, এরা মরণাপন্ন রোগীকে পর্য্যন্ত এক ক্রোশ পথ বয়ে আনবে সেই ফি ফাঁকি দিতে।

কথায় কথায় ধমকে উঠে মতিলাল, পেটের পিলেটা একটু গুঁতিয়ে, জিভটা এক নজর দেখে, একটা কথা শুধিয়ে, ফস ফস করে প্রেসক্রপসন লেখে হাসপাতালের ষ্ট্যাম্প মারা ছোট ছোট কাগজের টুকরোয়। এ টিকিট একবার হারালে আর রক্ষা নেই। একদিন দু'চার ঘণ্টা ধন্না দিয়েই ফিরিয়ে দেবে, পরদিন এলে অন্য সকলকে দেখবার পর তার দিকে বিরক্তিভরা নজর পড়বে। কম শাস্তি দিয়ে গায়ের জ্বালা যদিও মতি ডাক্তারের একটুকু কমে না, ওতে পয়সা নেই।

বাঁধা টাইমের এক মিনিট দেরী করে রোগী এলে সেদিন আর তার ভাগ্যে ওষুধ জোটে না।

দেড় কোশ হেঁটে এইছি বাবা।

দেড় কোশ হেঁটে, বাবাকে বলো গে'।

কম্পাউণ্ডার অবিনাশ মুচকে হাসে।

রোগী বেছে তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে মতি ডাক্তার, সযত্নে বিশেষভাবে পরীক্ষা করে। গম্ভীর মুখে যতদূর সম্ভব ভড়কে দেয় রোগীকে আর তার সাথী যদি কেউ থাকে, গাল দেবার বদলে প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষীর মতই বকুনি দেয় হাসপাতালে না আনার জন্য।

দিনরাত শুয়ে থাকবে। ওঠা একদম বারণ।

আজ্ঞে।

ঠিকমত ওষুধ পড়া চাই আজ। কাল আবার দেখে ওষুধ পাল্টাতে হবে। বুঝলে ত? নড়াচড়া করলে বিপদ হবে—শুয়ে থাকবে, বিছানা ছেড়ে উঠবে না—খবর্দার। নাড়ি কাল দেখে নতুন ওষুধ দেব।

আজ্ঞে।

কিন্তু হায়রে! পরদিন হয় গরুর গাড়িতে শুইয়ে রোগীকে হাসপাতালেই আনা হয়, নয় তো আত্মীয়স্বজন কেউ আসে রোগীর অবস্থার বিবরণ জানিয়ে ওষুধ নিতে।

না দেখে ওষুধ দেব কি করে?

আজ্ঞে যা হোক দিয়ে ছান।

যা হোক দিয়ে দেবো? একি খেলা নাকি? তেমন ব্যারাম নয়, নিজে পরীক্ষা না করে ওষুধ দেওয়া যায় না। এক টাকা ভিজিট লাগবে, আট আনা সাইকেল।

আজ্ঞে শুধিয়ে আসি তবে।

সেই যে যায়, আর ফিরে আসে না। তাকে দেড়টা টাকা দিয়ে বাড়ীতে ডেকে দেখিয়ে ওষুধ না খাইয়েই কি বেঁচে যাবে রোগীটা, সেরে উঠবে? রোগী দেখা সাঙ্গ করে পাশের ঘরে উঠে গিয়ে জানালার ফাঁকে ওষুধের প্রত্যাশায় শিশি হাতে সারি বাঁধা অর্ধ-উলঙ্গ মানুষগুলির দিকে শ্রান্ত চোখে তাকিয়ে মতি ডাক্তার ভাবে। একটু ভয়ও করে তার, এসব কথা কর্তাব্যক্তিদের কানে গেলে আবার মুস্কিল আছে। মানুষটা একটু ভীরুও বটে সে।

দুর্ভিক্ষের নিপীড়নে ভাঙাচোরা রুগ্ন মানুষগুলি যেন তার জীবনের ব্যর্থতা আর হতাশার দাম্বিক—কি আছে ওদের যে সে আশা করবে কোনদিন ওরা তাকে কিছু দেবে। হতভাগ্য দেশের হতভাগ্যদের মধ্যে পড়ে তারও বর্তমান-ভবিষ্যৎ আঁধার হয়ে রইল। তাকে বাড়িতে ডেকে ফি দেবার ক্ষমতা আছে যে ভদ্রলোকদের, তারাও অল্পজ্বরে হাঁচি-কাসি পেট খারাপের ওষুধ নিতে হাসপাতালে আসবে, রোগ একটু কঠিন হলে ডাক্তার আনবে সদর থেকে। কদাচিৎ রাতবিরেতে হঠাৎ কিছু হলে অগত্যা তাকে ডাকা।

সেদিন সকালে ডাক এল চাটুয্যে বাড়ী থেকে। বড় ছেলে ত্র্যম্বক এসেছে কলকাতা থেকে, তার পেটে ব্যথা। এখুনি একবার যেতে হবে ডাক্তারবাবুকে।

তা জানে মতিলাল। জরুরী না হলে দরকার কি তাকে হয়! তবু, চাটুয্যেদের অবস্থা ভাল, গাঁয়ে প্রতিপত্তি আছে। হয়তো আজ তার চিকিৎসা দেখে এমন আস্থা আসবে যে, ভবিষ্যতে ছোট-বড় সব রোগে তাকে একবার না ডাকলে মনটা খুঁত খুঁত করবে বাড়ীর লোকের। আগ্রহ চেপে মতি ডাক্তার বলে, এত রোগী ফেলে—

তাড়াতাড়ি একবার আসতে হচ্ছে ডাক্তারবাবু!

হুকুমের মত শোনায়। কিন্তু উপায় কি? চাটুয্যেরা বড়লোক, তাদের প্রতিপত্তি আছে।

ত্র্যম্বক ছিল কলকাতায়। মনোহর সুঠাম চেহারার দায়ে জীবনটা অপচয় করার উৎসাহে বেসামাল হয়ে ত্রিশে পা দেবার আগেই তার সব ফুরিয়ে গিয়েছে। এখন শুধু জের টেনে চলার ব্যর্থ চেষ্টার নেশা। শুধু কল্পনা করা তাদের, যাদের চোখের আয়নায় তাকে দেখার প্রতিক্রিয়ায় নিজেকে দেখে মনে হত, আর কি চাই! এক নজর দেখলেই আজ বোঝা যায় দেহটাই শুধু ধ্বংস হয়ে যায় নি, জীবনের স্বাদগন্ধও কিছু অবশিষ্ট নেই। বছর ত্রিশেক বয়সে।

কি রেটে নিজেকে সে খরচ করেছে, মতি ডাক্তার তা আন্দাজ করতে পারে।

আরেকটা রোগ হওয়ায় কি ভেবে চলে এসেছে দেশের বাড়ীতে। রোগটা বিশ্রী, লিভার বিগড়ে গিয়ে পৃথিবীর সব কিছু হলদে করে দেয়, চোখের আলো পর্য্যন্ত। চামড়া হলদে হয়ে যায় হলুদ-বাটা কোমল হাতগুলির মত।

কড়া একটা ইনজেকসন দিন—ওপিয়াম টোপিয়াম যা আছে।

ইনজেকসন দরকার নেই। একটা বড়ি দিচ্ছি, খান।

বড়ি টড়ি রাখুন—ডাবল ডোজ ইনজেকসন দিন। ইনজেকসন দেবার—? সংশয় ভরে তাকায় ত্র্যম্বক।

সব আছে মশাই, সব আছে। মতি ডাক্তারের এখন সীমাছাড়ানো গাম্ভীর্য্যপূর্ণ নাটকীয় আত্মবিশ্বাস, যেন দ্বিতীয় বি সি রায়,—ইনজেকসনের চেয়ে বড়িতে তাড়াতাড়ি কাজ দেবে। আমি ডাক্তার, আমি বলছি, কথা শুনুন। ব্যথাটা আপনার পেটে—কলিকও নয়। ইনজেকসন দিয়ে নার্ভ অবশ করে ব্যথা কমাতে যত সময় লাগবে, ওষুধটা পেটে গেলে তার চেয়ে তাড়াতাড়ি কাজ হবে।

ব্যথাতুর হয়ে ত্র্যম্বক সন্দিগ্ধ বিস্ময়ে বলে, বলেন কি!

তা ছাড়া, আপনার এই কণ্ডিসনে ইনজেকসন আমি দিতে পারব না। সদর থেকে বড় ডাক্তার ডাকুন।

দিন যা দেবেন।

দুটো বড়ি জলে গুলে তাকে খাইয়ে দিল মতিলাল। ব্যথা বেদনার প্রতিকাররূপে এই বিষাক্ত বড়িগুলি বিখ্যাত, ত্র্যম্বকও নাম জানে, ব্যবহার করেছে। মতিলালের রকমসকমে মনে হল, এগুলি যেন তারই বিশেষ আবিষ্কার। ত্র্যম্বকের অবস্থা বিবেচনায় একটা বড়ির বেশী এ বিষ দেবার সাহস অন্য ডাক্তারের হত না। মতিলালেরও বুকটা একটু কাঁপছিল। দশ মিনিটের মধ্যে ত্র্যম্বক ঘুমিয়ে পড়ল। বিকালে আবার এল মতি ডাক্তার।

কলকাতায় থাকাই আপনার উচিত ছিল, মতি ডাক্তার জানাল, শুধু জণ্ডিসের চিকিৎসা নয়, অনেকদিন ধরে আপনার চিকিৎসা দরকার।

চিকিৎসায় কিছু হবে না। ব্যথাটা একটু কমিয়ে দিন, তাতেই হবে এখনকার মত।

এ মরা মানুষের কথা। মতিলাল সবিনয়ে হাসল। মনে তার গড়ে উঠেছিল পরিকল্পনা, অসাধ্য সাধনের চেষ্টার আর মোটা কিছু উপার্জ্জনের।

আজ্ঞে, তা বলবেন না। কোন কোন রোগ আছে, যার চিকিৎসা নেই,—সাধারণ স্বাস্থ্যহানি সব অবস্থায় সারিয়ে দেওয়া যায়।

স্বাস্থ্যহানিটা সাধারণ দেখলেন নাকি? বিষণ্ণভাবে হাসে ত্র্যম্বক, কিছু বুঝি বাগাতে চান? কিন্তু আমায় ভোলাতে পারবেন না। কলকাতার বড় বড় ডাক্তার পারে নি।

মতি ডাক্তার ব্যথিত কণ্ঠে বলল, ডাক্তারকে ফি নিতে হয় বাঁচার জন্যে, ডাক্তার চিকিৎসা বেচে না মশায়। আমি কলকাতার ডাক্তার নই। ফি'র কথা আমি ভাবি না। ভাবছিলাম, আমি গাঁয়ের ডাক্তার, আমার চিকিৎসায় কি আপনাদের বিশ্বাস হবে?

তেরচা মন অকারণে খোঁচা দিতে পারে অনায়াসেই, কিন্তু আঘাত করা হয়েছে টের পেলেই, অস্বস্তিতে নেতিয়ে যায়। ত্র্যম্বক ব্যস্ত হয়ে বলে, না না তা নয়, তা নয়। বিশ্বাস হবে না কেন?

সেদিন ওই পর্যন্ত। পরদিন মতি ডাক্তার আবার কথাটা তুলল। অনেক ভণিতা করে জানাল যে, ত্র্যম্বক যদি তাকে সুযোগ দেয়, সে তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল করে তোলার দায়িত্ব নিতে রাজী আছে। ফি সে এক পয়সা এখন নেবে না, ত্র্যম্বক ভাল হয়ে ওঠার পর সে প্রশ্ন উঠবে।

আগের মত হবো?

না। মতিলাল জোর দিয়ে বলল, না। যে বয়স যায়, যে তেজ যায়, তা কি ফেরে? তবে শরীরে আপনার গ্লানিবোধ থাকবে না, দুর্বলতা থাকবে না। লোকে দেখে টের পাবে না দেহটা আপনার ভেঙে পড়েছিল।

খানিকটা খেলার ছলেই যেন রাজী হয় ত্র্যম্বক।

করুন চিকিৎসা। যদি পারেন, আপনাকে হাজার টাকা দেব।

একটু যদি লিখে দ্যান, মতি ডাক্তার সবিনয়ে ভিক্ষা চাওয়ার মত বলে, এক বছর দু'বছর লাগবে, একটা লিখিত কণ্ট্রাক্ট থাকলে মন্দ হয় না। এও নয় লিখে দিন যে, আপনার খুসী হলে দেবেন, খুসী না হলে দেবেন না, আমার কোন দাবী থাকবে না। কথাটা বললেন, একটু শুধু লিখে দিন, ভুলে টুলে গেলে মনে পড়বে এই আর কি!

মিছেমিছি কষ্ট করবেন ডাক্তারবাবু। কিছু হবে না।

আপনি ভাল হয়ে যাবেন।

এই না বলে মতি ডাক্তার কোমর বেঁধে লেগে গেল ত্র্যম্বককে ভাল করতে, একটা মরা মানুষকে বাঁচিয়ে তুলতে। রোজ সে আসে চাটুয্যে-বাড়ীতে, রোজ সে ব্যবস্থা দেয় এটা করুন ওটা করুন, এটা খান ওটা খান, এ থেকে বিরত হোন, ওসব স্থগিত রাখুন। কিছু মানে ত্র্যম্বক, কিছু মানে না। মতি ডাক্তার অসহ্য হয়ে ওঠে তার কাছে। সেটা টের পেয়ে মতিলাল দু'চারদিন ধারে কাছে ভেড়ে না, অদৃশ্য হয়ে থাকে।

দু'চার দিন ধারে কাছে না ঘেঁষলে একটু যেন ত্র্যম্বক মতি ডাক্তারের সঙ্গ চায়, তার ফেনানো ফাঁপানো মিথ্যা আশা আশ্বাস ভরসার কথাগুলি শোনার প্রয়োজন বোধ করে, বেশীর ভাগ না মানলেও তার নির্দেশ উপদেশ ব্যবস্থার কথা শুনতে বেশ একটু ইচ্ছা জাগে। ভাঙ্গা মানুষ মরা মানুষ তো এতখানি হতাশ হতে পারে না যে, কেউ তাকে জোড়া দেবার বাঁচাবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে জেনেও চুপচাপ মুখ গুঁজে মরবে। নির্ভীক বেপরোয়া আশ্বাসের মত সঞ্জীবনী আর কিছু নেই। তাই না জগতের ডাক্তাররা মুমূর্ষুর দেহে সুনিশ্চিত মরণকে প্রত্যক্ষ দেখেও বলে, ভয় কি, সেরে উঠবেন।

একটা সুবিধা হয়েছে মতি ডাক্তারের। জণ্ডিস কাবু করেছে বটে ত্র্যম্বককে, আবার সেই সঙ্গে বিস্বাদ বিশ্রী করে দিয়েছে সিগারেট থেকে তার সব নেশা। নতুন বিষ শরীরে আনা ঠেকানো গেছে সহজেই।

একজনকে আশা আশ্বাস দিতে দিতে একটি ঝলসানো জীবনকে পাপমুক্ত করার সাধনায় টাকা আর পশারের লোভেই মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে আশ্চর্য্য এক আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠতে থাকে মতি ডাক্তারের মধ্যে, এতদিনের শ্রান্ত হতাশ জীবনের রূপ বদলে যেতে থাকে অদ্ভুত রকম।

অন্তর যেন নতুন এক ভাষায় গুঞ্জন করে বলে যে, টাকা তো আসবেই, পশার তো হবেই, কিন্তু কি হবে সে টাকা আর পশার, যদি না—

যদি না কি? সেটা কোনমতেই স্পষ্ট হয় না গাঁয়ের আধা-সরকারী হাসপাতালের এল-এম-এফ ডাক্তার মতিলালের কাছে। শুধু মনে হয় আরও কতগুলি কিছু না হলে, যেখানে যাদের মধ্যে যা কিছু নিয়ে বসবাস ও জীবনযাপন তার মধ্যে কিছু সামঞ্জস্য কিছু সার্থকতা না এলে, শুধু নিজের টাকা আর পশার নিয়ে বুঝি সে রকম খুশী হওয়া যাবে না।

বাঁধা টাইমের পরে যে রোগী আসে, তাকে আজও ধমক দেয় মতি ডাক্তার কিন্তু কেন যেন ব্যঙ্গাত্মক গালটা আসে না।

বলে, বাপু তুমি কি চাকর রেখেছ হাসপাতালের ডাক্তারবাবুকে, যখন খুশী আসবে আর হুকুম দেবে ওষুধ দিতে?

দেড় কোশ হেঁটে এইছি বাবা।

দেড় কোশ হেঁটে যাও। কাল ফের দেড় কোশ হেঁটে এসো সময় মত। তোদের জন্য মরব নাকি আমি? আয় ইদিকে, চটপট আয়। ব্যাটার নড়তে লাগে দশ ঘণ্টা। জিভ বার কর।

সে বেচারা কাতর হয়ে বলে, কর্তা, মরণ ভাল ছিল মোর।

মতি ডাক্তার গ্রাহ্য করে না, বলে, জ্বর কদ্দিন?

আজ্ঞে চলছে ঘুষ ঘুষ ঢের দিন থে'।

কাসি আছে নাকি?

আছে।

রক্ত পড়ে?

একটু একটু পড়ে আজ্ঞে।

তার দিকে চেয়ে থাকে মতি ডাক্তার। ছেঁড়া লুঙ্গি পরা খালি গা একটা জ্যান্ত ভূত, পেট ভরে দুবেলা ভাত জোটে না, তার এই রাজকীয় রোগের এখন কি চিকিৎসার ব্যবস্থা সে করে, ওষুধ দেয়। রাজা টাজা হলে নয় বলে দেওয়া যেত মাসখানেক দুধ ঘি মাছ মাংস আঙ্গুর বেদানা খেয়ে এসো ওষুধ নিতে।

খাটো কোথা?

সদরের কাপড়-কলে। শরীরে বয়না তাই দেশের ঘরে এলাম যে জ্বরটা যদি ছাড়ে, দেহটা যদি সারে।

বেশ করেছো। দেশে ঘরে মরেও সুখ আছে।

চোখে যেন জল এসে যায় মতি ডাক্তারের। তিন ছেলের মা তার বৌ, মেয়েলি রক্তপাতের রোগে সে মরমর। একটা হাসপাতালের ভার-প্রাপ্ত ডাক্তার সে, নিজের স্ত্রীর চিকিৎসার উপায় জানে, ব্যবস্থা জানে না। তবু ওষুধ খাওয়ায় স্ত্রীকে, হাসপাতালের বিনা পয়সার ওষুধ। একেও ওষুধ লিখে দিতে হবে তাকে, এও শিশি ভরে নিয়ে গিয়ে খাবে হাসপাতালের বিনা পয়সার ওষুধ।

সবাই যদি এমনি ভাবে ভোগে, কি করবে সে ত্র্যম্বককে ভাল করে তুলে?

ত্র্যম্বকের রক্ত পরীক্ষা হতে যায় কলকাতায়, ওষুধ আসে কলকাতা থেকে, দুষ্প্রাপ্য ফুড, দামী ফল। মতিলাল রুগ্না স্ত্রীর শিয়রে বসে আবার ডাক্তারী বই ঘাঁটে, ত্র্যম্বকের দেহ থেকে পুরানো রোগের দুর্ধর্ষ জীবাণু তাড়াবার চেষ্টা কতদূর এগোলো সযত্নে হিসাব করে, ছোট্ট খাতাটিতে লিখে রাখে কবে ইনজেকশন দেওয়া হল, কটা হল। হাসপাতালের ষ্টকে এসব ওষুধ নেই, যুদ্ধ কিন্তু এই গাঁয়ে পর্যন্ত এনে দিয়েছে ওই রোগের অভিশাপ। অন্য অসুখের চিকিৎসা করাতে আসে, চেপে ধরলে, আশ্বাস দিলে, বুঝিয়ে বললে, অনেক টালবাহানার পর স্বীকার করে। পুরানো দিনের দীর্ঘ ক্লান্তিকর চিকিৎসার ব্যবস্থা ওদের জন্য—সে ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ নেই হাসপাতালে, জোড়াতালি দিয়ে চালাতে হয়। ত্র্যম্বকের চিকিৎসা করতে আনন্দ পায় মতি ডাক্তার। সে যেন ভুলে যায় সে পাড়াগাঁয়ের অর্ধশিক্ষিত এল-এম-এফ ডাক্তার, মনে হয় সে যদি সব সরঞ্জাম পেত, ওষুধ আর পথ্য, রোগ সে নির্মূল করে দিতে পারত দেশ থেকে।

আশার সঞ্চারে জীবনের প্রতি প্রকাশ্য মমতা লক্ষ্য করা যায় ত্র্যম্বকের মধ্যে, তীব্র অভিমানী অবহেলার ভাব কেটে যাচ্ছে। চিকিৎসা সম্পর্কে তার আগ্রহ এসেছে। আশা করতে আরম্ভ করায় এদিকে আবার আশঙ্কাও তুচ্ছ হয়ে নেই যে সত্য সত্যই কি সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া যাবে?

বলে, কলকতার কাউকে কন্সাল্ট করা দরকার মনে করেন কি?

আমাকে বিশ্বাস হচ্ছে না?

না না, তা নয়। আপনি দরকার মনে করেন নাকি জিজ্ঞেস করছিলাম।

বলে, ফির কিছুটা আপনি নিন ডাক্তারবাবু। অনেক খাটছেন।

আপনার খুশী।

দু'শো টাকার নোট ত্র্যম্বক মতি ডাক্তারের হাতে তুলে দেয়, সে সত্যই কৃতজ্ঞতা বোধ করছিল। রাত দুপুরে মতি ডাক্তার বিছানা ছেড়ে ওঠে। আলো জেলে বাক্স খুলে নোটের তাড়াটা আরেকবার হাতে নেয়। এগার বছর সে ডাক্তারি করছে, আজ পর্যন্ত কোনদিন কোন রোগীর কাছ থেকে এক সাথে পাঁচটা টাকা ফি পায়নি। জীবিকার জন্য ডাক্তারী শেখার এই প্রথম বাস্তব অর্থ, রূপ ধরা সার্থকতা। কিন্তু তেমন সুখ হচ্ছে কই, আহ্লাদ?

হাসপাতালের বিনা পয়সার ডাক্তার হিসাবে ছাড়া তার আসল রোগীদের মধ্যে এতটুকু পশার তার বাড়েনি, ওদের কাছ থেকে মাসে পনেরটা টাকাও আসে না। ওদের দেওয়ার ক্ষমতা না বাড়লে কোনদিন যে তা আসবে, সে ভরসাও নেই, সবার অবস্থা বরং আরও শোচনীয় হচ্ছে ক্রমে ক্রমে। তার চেনা অখিল প্র্যাকটিস করে সদরে, যুদ্ধের বিপর্যয় তাকে কোন রকমে দিন চলার অবস্থা থেকে 'কল'এর চাপে নাওয়া খাওয়ার সময় না পাওয়ার অবস্থায় এনে দিয়েছে, ফি ডবল করা সত্ত্বেও। কারণ? দেওয়ার ক্ষমতা বেড়েছে শহরের মানুষের। আর সে যাদের ডাক্তার, যারা তার আসল পশারের একমাত্র আশা ভরসা, তারা দলে দলে উৎখাত হচ্ছে জমি থেকে, একটা টাকা এমনি নিত্যকার বেঁচে থাকার জরুরী দরকারে না লাগিয়ে তাকে দিয়ে বাঁচার চেষ্টার মানেই খুঁজে পাচ্ছে না।

স্ত্রী বলে, কি হল?

মতি ডাক্তার বলে, না কিছু না। ভাবছিলাম ফি আরও কমিয়ে দেব নাকি।

রাত দুপুরে মতি ডাক্তার ফি কমিয়ে পশার বাড়াবার কথা ভাবছে, ফি'র দুশো নগদ টাকা হাতে নিয়ে।

স্বাস্থ্যের পরিবর্তন স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে থাকে ত্র্যম্বকের, সেই সঙ্গে মনেরও। বছর খানেক পরে সত্য সত্যই তাকে মানুষের মত দেখায়, মানুষের মতই মনে হয় তার কথাবার্তা চাল-চলন ব্যবহার। ঘোলাটে দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে এসেছে, জোর বেড়েছে মনের। তবে তখনো বাকী থাকে মেরামতের কাজ, এক যুগ ধরে উদ্দাম উল্লাসে যা চুরমার করা হয়েছে ভেঙ্গে ভেঙ্গে, একটা বছরে তা কি সম্পূর্ণ মেরামত হয়? বর্ষা উন্নতি ব্যাহত করে, একটু তাকে কাবু করে রেখে যায়। বর্ষার সময়টা পশ্চিমে কোথাও চেঞ্জে যাবার কথা তোলে মতি ডাক্তার, ত্র্যম্বক রাজী হয় না। বেশী দিনের জন্য মতি ডাক্তারকে ছেড়ে দূরে থাকার মত মনের জোর তখনও তার আসে নি।

সমাজ সংসার অল্পে অল্পে মনটা আকর্ষণ করছে ত্র্যম্বকের। পারিবারিক ব্যাপারে বিদ্বেষী উদাসীনতা নেই, ফাল্গুনে বোনের বিয়ের নামেই কলকাতা পালানোর বদলে দায়িত্ব নিয়ে

খেটে খুটে অনেকটা রেহাই দিল বুড়ো দেবেন চাটুয্যেকে। জোত জমি বিষয়কর্মও সে দেখা শোনা আরম্ভ করেছে, অবাধ্য প্রজাকে নাকে খত দেওয়াতে কান মলাতে উৎসাহ বোধ করেছে।

দেবেন চাটুয্যে সদয় ব্যবহার করেছে মতি ডাক্তারের সঙ্গে। কল টিপে তার দশ টাকা বেতন বাড়িয়ে দিয়েছে, পাল পার্বণে তাকে ডেকে নেমন্তন্ন খাওয়ায়, মাঝে মধ্যে মাছটা ফলমূলটা পাঠিয়ে দেয় তার বাড়ীতে। বিশেষ কৃতজ্ঞ সে অবশ্য নয়, হাসপাতালের ডাক্তার চিকিৎসা করেছে ছেলের, তাতে কৃতজ্ঞতার প্রশ্ন কি থাকতে পারে। একেবারে হাজার টাকা ফি দেবার কথাটা বরং তাকে বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ করে রেখেছে। কাণ্ডজ্ঞান কোনদিনিই ত্র্যম্বকের ছিল না, বিনা পয়সায় চিকিৎসা করারই যার কথা, তাকে একেবারে হাজার টাকা কবুল করার কোন মানে হয়? গোড়ায়, ছেলের সম্পর্কে যখন কোন আশা ভরসাই ছিল না, তখন কেন প্রতিবাদ করে নি, সেকথা কেউ অবশ্য তাকে জিজ্ঞাসা করে না।

বৈশাখে ছেলের বিয়ে দেব ভাবছিলাম মতিলাল। একটি বড় সড় সুন্দরী মেয়ে পেয়েছি, ম্যাট্রিক পাশ দিয়ে আই-এ পড়ছে। বত্রিশ চলছে ছেলের, বয়স হয়ে গেল—

আজ্ঞে সে তো ভাল কথা। তবে কি না, আরও মাস ছয়েক—

তাই ভাল। বৈশাখে থাক, অগ্রাণেই শুভকর্ম সারা যাবে।

ত্র্যম্বক সম্পর্কে মতি ডাক্তারের কথা আগ্রহ্য করার ভরসা দেবেনের নেই, ত্র্যম্বকের নিজেরও নেই—এখন পর্য্যন্ত।

মতিলাল সগর্বে লক্ষ্য করে তার মৃত রোগীটির মুখে চোখে নতুন স্বাস্থ্যের জ্যোতি, আর অর্থহীন জীবনে নব নব উদ্দেশ্য উপচারের সমাবেশ। টাকা সে আরও দেড়শো পেয়েছে দু'দফায়, একবার একশো, পরের বার পঞ্চাশ। চাইতে হয়েছে দু'বারেই। শেষবার একটু বিব্রত, একটু অসন্তুষ্ট মনে হয়েছে ত্র্যম্বক আর দেবেন দু'জনকেই।

অন্য প্রসঙ্গে কথাচ্ছলে দেবেন জানিয়েছে, মাইনে তোমার দশ টাকা বাড়লো হে, আমি না উঠে পড়ে লাগলে আর কারও সাধ্যি হত না বোর্ডকে রাজী করায়।

হাজার টাকার আর কতটা আদায় করা যাবে, একটু খটকা জেগেছে মতি ডাক্তারের মনে। জীবনে অনেক পাওনাই আদায় হয়না মানুষের।

এদিকে ফি সে কমিয়ে দিয়েছে গরীবদের জন্য। সাইকেলের জন্য চার আনা বাঁধা, ওটা দিতেই হবে সকলকে, তার ওপর চার আনা আট আনা যে যা পারে দেবে। আরও গরম হয়েছে তার ব্যবহার রোগীদের সঙ্গে—শত্রুভাবে নয়, বন্ধুভাবে, আত্মীয়তা বোধের তাপে। ধমক আর বকুনি তার চলে অনর্গল, রোগীরা যেন খুশি হয়, স্বস্তি বোধ করে।

বাপকে মেরেছো রক্ত বমি করিয়ে, কাঁথা জড়ানো মুকুলের জ্বর দেখে পেটের পিলেটা টিপতে টিপতে বলে, চার জ্বর নিয়ে তুমি এসেছো পিলে ঠাসা দশ মাসের গভ্ভো দেখাতে। ফের যদি জ্বর গায়ে হাসপাতালে আসবি হারামজাদা, তোর পিলে আমি অপারেশন করে কাটবো।

ধুঁকতে ধুকতে মুকুল মরার মত হাসে।

আট গণ্ডা পয়সা জোগাড় রাখবি, আঙুল তুলে শাসিয়ে বলে, চার আনা সাইকেল, চার আনা ফি। কাল জ্বর ছাড়লে গিয়ে গা ফুড়ে ওষধ দিয়ে আসব।

অগ্রাণে বিয়ের সাতদিন আগে থেকে সানাই পোঁ ধরেছে দেবেনের বাড়ীতে। মাঠে বিবাদ বেধেছে ধানের ভাগ নিয়ে, ধান কেটে চাষীর ঘরে তোলা নিয়ে চাষী আর জোতদারে। আহত লেঠেল ক'জন জড়ো হয়েছে দেবেনের বাড়ীতে, ঘন ঘন লোক যাচ্ছে হাসপাতালে মতি ডাক্তারকে ডেকে আনতে। ত্র্যম্বকের হাতেও একটু চোট লেগেছে। মানুষ তাকে সত্যই করে দিয়েছে মতি ডাক্তার চিকিৎসা করে, এমনি বেড়েছে তার তেজবীর্য্য যে নিজে লাঠি ধরে সে লোকজনের সঙ্গে গিয়েছিল বিদ্রোহীদের সায়েস্তা করতে, তারই লাঠি আচমকা প্রথম আঘাত হানে, ঘায়েল করে ফেলে দেয় মুকুলকে।

মতি ডাক্তারের পাত্তা নেই। আহত চাষীদের ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে ওষুধ দিতে সে ব্যস্ত—হাসপাতালের ওষুধ, যে হাসপাতাল আধা-সরকারী, যে হাসপাতালের বোর্ডে আছে দেবেন চাটুয্যে নিজে।

কাতরাতে কাতরাতে চোখ মেলে মতি ডাক্তারকে চিনতে পেরে মুকুল দাঁত বের করে একটু হাসে। তার হাড় পাঁজরা খানিকটা ঢাকা, পেটের পিলেটা ছোট হয়ে গেছে। ত্র্যম্বকের মত তাকেও একরকম মানুষ করেছে মতি ডাক্তার, দামী দামী ওষুধপত্র ছাড়াই, শুধু গা ফুঁড়ে কুইনিন দিয়ে আর কুইনিন খাইয়ে।

তোকে কে লাঠি মারলে রে? দেবেন বাবুর ছেলে? বেশ। বেশ। সকৌতুকে সায় দিয়ে দিয়ে মতিলাল মাথা নাড়ে, দেখলি তো মতি ডাক্তারের হাতযশ? কলকাতার ডাক্তাররা হাল ছেড়ে দিয়েছিল, এই মতি ডাক্তার ভাল করেছে দেবেন-বাবুর ছেলেকে। লাঠির ঘায়ে তোকে আজ কাবু করে।

হাসপাতালে ফিরতেই দেবেনের লোক বলল, কোথা গিয়েছিলেন ডাক্তারবাবু? শীগগির আসুন, কর্ত্তা ডাকছেন।

দাঁড়াও বাপু দাঁড়াও। একটু জিরিয়ে নিই।

যেতে হবে। হাজার টাকার সাতশো টাকাই এখনো বাকী।

কিন্তু না গিয়ে যদি চলতো? যদি মরতে দেওয়া যেত ওদের সব কটাকে বিনা চিকিৎসায়? তার হাতযশ ত্র্যম্বককে পর্য্যন্ত?

চালক

দোতলা বাস রাস্তা কাঁপিয়ে চলে, দু'হাতে ষ্টিয়ারিং ধরে থাকে অজিত। গাড়ির ঝাঁকানি, ষ্টিয়ারিংয়ের কাঁপুনি, ইঞ্জিনের গর্জ্জন আর গুরু-গম্ভীর ভারিক্কি গতি তার মধ্যে অপূর্ব্ব আনন্দের আলোড়ন তোলে, সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে সে অনুভব করে পৌরুষের সার্থকতা। ক'দিন ধরে সে বাসটা চালাচ্ছে, কিন্তু এত বড় একটা দৈত্যকে আয়ত্তে পাবার গর্ব, হাত ও পায়ের ইঙ্গিতে খুশিমত থামানো, আস্তে বা জোরে চালানোর রোমাঞ্চ এতটুকু কমেনি, পুরানো হয়নি।

ষ্টার্ট দিতে, গাড়ির চলন্ত ইঞ্জিনটার একটানা দাপরানিতে, গিয়ার বদলাতে, ষ্টিয়ারিং ধরে থাকতে আর ব্রেক কষতে গিয়ে সে টের পায়, আগে সে যে ছোট বাসটা চালাত তার চেয়ে এ ইঞ্জিনের জোর কত বেশি, কত বড় আর ভারি এ-বাসটা! গাড়িতে প্যাসেঞ্জার কম হলে অজিতের মনটা খুঁত খুঁত করে, বিরাট একটা ক্ষমতার যেন অপচয় ঘটছে, ছোট ছেলের কাজ করতে হচ্ছে জোয়ান-মদ্দ জবরদস্ত মানুষকে। ওপরে-নীচে গাদাগাদি করে প্যাসেঞ্জার উঠলে গাড়ি চালানোর উল্লাস তার বেড়ে যায়। একতলা বাসগুলির দিকে সে তাকায় অনুকম্পার দৃষ্টিতে। নিজেও সে যে কয়েক বছর ধরে একতলা বাস চালিয়ে এসেছে মাত্র কয়েকটা দিন আগে পর্য্যন্ত, তা যেন সে ভুলেই গেছে একেবারে। মন তার চিরদিন ছিল দোতলা বাসের দিকে, স্বপ্ন সফল হওয়ামাত্র একতলা বাসের দিনগুলি তুচ্ছ নগণ্য হয়ে গেছে তার কাছে। এক-তালা বাসের ড্রাইভারি পাবার পর যেমন তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল ক্লিনার থাকার দিনগুলি।

সিনেমার সামনের ষ্টপে অনেক হবু প্যাসেঞ্জার দাঁড়িয়ে আছে চোখে পড়েছিল দূর থেকেই। আজ ঠিক টাইমে পৌছানো গেছে, সিনেমার দুপুরের শো'টা সবে ভেঙেছে। এইজন্যই গাড়িটা সে এতক্ষণ থামিয়ে থামিয়ে ঢিমে চালিয়ে নিয়ে এসেছে, এখানে বোঝাই প্যাসেঞ্জার তুলে এবার জোরে চালিয়ে টাইম পুষিয়ে নেবে। সারা ট্রিপটা চলবে বোঝাই গাড়ি, ওপরে নীচে ঠেসে গিয়ে বাইরে পর্যন্ত বাদুড় ঝুলবে প্যাসেঞ্জার—ছুটির দিন হলেও, প্যাসেঞ্জারের অভাব ঘটে না।

তফাৎ থেকে সিনেমার সামনে জমানো প্যাসেঞ্জার দেখেই অজিত হুস্ করে স্পিড বাড়িয়েছিল, স্পিডের মাথায় পিছু হেলে প্রাণপণে ব্রেক কষে গাড়ি থামায়। অ্যাক্সিডেণ্ট বাঁচাবার জন্য ছাড়া এরকম বাড়াবাড়ি করা উচিত নয় খেয়ালের খাতিরে, গাড়ীর প্যাসেঞ্জাররা হুমড়ি খেয়ে ব্যথা পায়, গাড়ীরও ক্ষতি হয়। কিন্তু মাঝে মাঝে বাহাদুরি করার ঝোঁকটা সে সামলাতে পারে না। কণ্ডাক্টর কেদার খিঁচিয়ে উঠে গাল দেয়। সে পুরানো লোক, নিয়ম ভঙ্গে বিরক্ত হয়। তার সহকারী ছোঁড়া উল্লাসে চেঁচিয়ে তারিফ জানায়। হবু প্যাসেঞ্জারের মধ্যে দাদা বৌদি আর তাদের দুটি মেয়েকে দেখে অজিতের খুশির সীমা থাকে না।

মীনা! খুকু! বায়স্কোপ দেখতে এইছিলি? উঠে পড়! উঠে পড়! মীনা ভুরু কুঁচকে ঠোঁট বাঁকায়, তার বয়স প্রায় ষোল। খুকু সবে দশে পা দিয়েছে, সে আগে আড়চোখে মা-বাবার মুখের ভাবটা দেখে নিয়ে হুট্ করার ভঙ্গিতে মুখ তুলে ঝাঁকি দিয়ে অবজ্ঞা জানায় স্পষ্টভাবে। অজিত চেয়ে থাকে রাস্তার অপর দিকে। বেলারাণী হাতে দলা পাকানো ছোট্ট রুমালটি তিনবার নাকে ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে তিনবারই নাক সিঁটকোয়।

অজিত হাই তোলে। অকারণে হর্ণটা বাজায়, পা টিপে টিপে ইঞ্জিনকে গর্জে গর্জে তোলে। আর সে তাকায়ও না দাদা-বৌদি ভাইঝিদের দিকে, সোজা সামনে রাস্তায় চোখ পেতে রাখে। কনডাক্টরের ইঙ্গিত পেয়েই গাড়ী ছেড়ে দেয়।

দোতালা বাসের ড্রাইভারের এই আসনে বসে না থাকলে এ-ভুলটা সে নিশ্চয় করত না। পথ দিয়ে পায়ে হেঁটে চলতে চলতে হঠাৎ ওদের দেখলে, এমন কি একতলা বাস চালাবার সময়ও ওদের বাসের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে, আকার-ইঙ্গিতেও সে প্রকাশ পেতে দিত না যে, ওদের সে দেখেছে, ওরা তার আত্মীয়। দোতলা বাস চালানোর গর্বে আনন্দে ভুলেই গিয়েছিল ওদের কাছে সে ভদ্রলোক নয়; সে নিছক বাস-ড্রাইভার, শিক্ষিত ভদ্র পরিবারের কলঙ্ক। খুশিতে আত্মহারা হয়ে নইলে কি সে রাস্তায় এত লোকের সামনে আত্মীয়তা ঘোষণা করে ওদের এমন লজ্জা দেয়—বাড়ীতেও যে চেষ্টা করার কথা দোতলা বাস চালাতে শুরু করার পরেও সে ভাবতে পারিনি? মাঝবয়সী হাবা ভদ্রলোকটিকে ব্রেক-কষা ষ্টিয়ারিং ঘোরানোর কৌশলে প্রাণে বাঁচিয়ে দিয়ে, সে ভেবেছিল তাকে এমন একটা বিরাট বাস চালাতে দেখে অবজ্ঞা করার বদলে ওরা আশ্চর্য হয়ে যাবে, সম্মান করবে তাকে।

চুলোয় যাক। দোতলা বাসে উন্নতি হয়েছে শুনেও নিজের বৌ যার নাক সিঁটকোয়, তার আবার দাদা বৌদি ভাইঝিদের কাছ থেকে খাতিরের প্রত্যাশা!

সেটাই তার লাস্ট ট্রিপ। হিসাবমত আগের ট্রিপটাতেই তার ডিউটি শেষ হত, ইন্দ্রজিৎ সিং সময়মত না আসায় আরেকবার ঘুরে আসতে হয়েছে শহরের অপর প্রান্ত থেকে।

ইন্দ্রজিৎ পথেই গাড়ীতে ওঠে, বাড়ীর গলিটার মুখ পর্যন্ত বাস চালিয়ে নিয়ে অজিত নেমে যায়।

তখন আসন্ন সন্ধ্যা। বিড়িওলা রহমৎ তার জন্য বেছে-রাখা কড়া শেঁকা বিড়ির প্যাকেটটি হাতে তুলে দিয়ে পয়সা নিয়ে হেসে বলে, ক'টা চাপা দিলে আজ?

এক শালাকে দিচ্ছিলাম। বাবুর হাতে রেশনের শাড়ি দেখে মায়া হল, সামলে নিলাম। বৌটা বুক চাপড়াবে?

একসঙ্গে আটজন হাসে এ রসিকতায়, ছ'জন যারা বিড়ি পাকাচ্ছিল, রহমৎ আর অজিত। টাটকা একটা বিড়ি ধরিয়ে অজিত এগোয়—আস্তে আস্তে। হাড়ভাঙা খাটুনির পরও বাড়ী পৌঁছতে যেন তার অনিচ্ছা। দোতলা বাস চালাবার পরিশ্রম সহজ নয়, হাড়-মাসে সে টের পাচ্ছে শ্রান্তি, তবু যেন মন চায় না বাড়ী পৌঁছতে। বাড়ীর দুয়ার পর্যন্ত যেন তার আসল জীবনের, বাঁচার আনন্দের সীমা: তারপর শুধু কষ্ট। ভদ্র পরিবারে ভদ্রভাবে আত্মগোপন করে থাকার বিশ্রী কষ্ট। দি গ্রেট ক্যালকাটা লণ্ড্রী অ্যাণ্ড টেলারিং শপের কানাইয়ের সঙ্গে সে দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে কথা বলে। ট্যাক্সিচালক হরণামের ঘরের সামনে একহাত রোয়াকটুকুতে বসে জিগ্‌গেস করে তার ছেলেটার অসুখের খবর। বাড়ী পৌঁছানো যেন পিছিয়ে দিচ্ছে, যতক্ষণ পারে ঠেকাচ্ছে। খিদেয় পেট জ্বলছে তবু!

বাড়ীর চৌকাট ডিঙোলেই সে আর মানুষ থাকবে না, হয়ে যাবে হালদার পরিবারের লজ্জা আপশোস, কলঙ্ক, জন্ম-বয়াটে, ম্যাট্রিক পাশে অক্ষম, বিড়ি ফোঁকা, দেশি খাওয়া কাঠখোট্টা ভূত—এককালীন মোটর ক্লিনার; অধুনা বাস ড্রাইভার।

সদর পেরিয়েই অজিত সামনে পড়ে বুড়ো বাপের। সেঁতসেঁতে উঠানের চেয়ে আধ-হাত উঁচু বারান্দায় সেকেলে বেঢপ শক্ত কাঠের চেয়ারে বসেছিল রসিক হালদার, হাতে গড়গড়ার নল। অজিতের মা মোক্ষদা দু-তিন দিন অন্তর আছড়ে কলকে ভাঙে—টানাটানির সংসারে তামাক খেয়ে, দু'টাকা সের তামাক খেয়ে, পয়সা নষ্ট করা তাঁর সয় না। গড়গড়া বা নলটা মোক্ষদা ভাঙেন না। এইজন্য ভাঙেন না যে, ওসব নতুন কিনতে পয়সা লাগে অনেক এবং কেনা যে হবেই পৃথিবী চুলোয় গেলেও, সেও তো জানা কথাই। কলকে সস্তা।

তোমার সঙ্গে কথা আছে।

রসিক বলে গম্ভীরভাবে, কথার আগে ও পরে গড়গড়ার নলে জোরে জোরে টান দিয়ে।

অজিত আশ্চর্য হয়ে যায়। তার সঙ্গে কথা বলার জন্যই কি রসিক আজ এখানে ঘাঁটি আগলে বসে আছে? নতুন কি দোষ করেছে, নতুন কি কলঙ্ক লেপেছে হালদার পরিবারে, অজিত ভেবে পায় না। দাদা-বৌদি-ভাইঝিরা এসে কি নালিশ করেছে প্রকাশ্য রাজপথে তাদের সঙ্গে কথা বলতে যাওয়ার অমার্জনীয় স্পর্ধার বিরুদ্ধে? রসিক কি তাকে সতর্ক করে দেবে যাতে ভবিষ্যতে আর কখনো এরকম কাজ না করে?

বলুন।

অজিত বলে বিস্ফোরণ-আটকানো বোমার মত মৃদুস্বরে। বাবা। চার ছেলের বাবা। দুটি চাকরে আর একটি এম-এ পড়া ছেলের জন্যই যার পিতৃত্বের পরম সার্থকতা, মোটর সাফ করা আর বাস চালানো অভদ্র ছোটলোক ছেলেটা তিন ছেলের ভদ্রজীবনে কলঙ্ক আমদানী না করে, এই যার শেষ জীবনের চরম ভয়। সে যে ভাই, এই কলঙ্ক সয়ে যাওয়াই ওদের পক্ষে অসীম উদারতা—এই যার বিশ্বাস এবং এই উদারতার জন্য তিনটি উপযুক্ত ছেলের কাছে যিনি রীতিমত কৃতজ্ঞ। অজিত জানে, মুস্কিল ওইখানে। তার জন্য বড় প্রাণ কাঁদে বুড়ো বাপটার। তিনি চান, ভাই তিনজনের কাছে নিজের অস্তিত্ব যতদূর সম্ভব লোপ করে, চোখকান মুখ বুজে মাথা নীচু করে সে এই বাড়ীতেই সুখে বাস করুক বৌ আর ছেলেটা নিয়ে।

সংসারে সে খরচ দেয়—কিছু বেশিই দেয় দুটি রোজগেরে ভাইয়ের চেয়ে। ওদের অন্য খরচ বেশি, ভদ্রভাবে জীবন যাপনের খরচ, তাই তার চেয়ে প্রত্যেকের অনেক বেশি দেওয়া উচিত হলেও, কয়েক বছরের মধ্যে দু' এক মাস ছাড়া কোনবারেই বেশি দিতে পারে নি। দিতে পারে, অজিত জানে, দিতে পারে। ব্যাঙ্কে জমানোটা একটু কমালেই দিতে পারে।

মুখ হাত ধুয়ে চা'টা খেয়ে আয়।

আজ যেন কেমন একটা ভাবান্তর ঘটেছে রসিকের, সে অনুভব করে। এমনভাবে রয়ে সয়ে ভূমিকা করে তাকে সমালোচনা ও উপদেশ শোনানো রসিকের অভ্যাস নয়।

চা' খেয়েছি। চান করে ভাত খাব একেবারে। কি বলছিলেন?

তুমি বড় ব্যস্তবাগীশ। গড়গড়াটা টানতে টানতে রসিক বলে, গুরুতর কথা শান্ত মনে বিচার করতে হয়।

আমার মন বেশ শান্ত আছে, অজিত শ্রান্তকণ্ঠে বলে, সারাদিন খেটেখুটে এসে চানটান করে খেয়ে বিশ্রাম না করে, সাংসারিক ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে পারব না। কি বলছেন বলুন। নয়তো কাল বলবেন।

এই তো দোষ তোমার। রসিক বলে, আপশোসের সুরে কিন্তু বেশি চটে না গিয়ে, সেটা আরও আশ্চর্য করে দেয় অজিতকে,—বিষয়ের গুরুত্ব বোঝো না তুমি। কথাটা হল কি, তুমি বরাবর অসিত সুজিতের সমান সংসার খরচ দিয়ে এসেছ। ওদের ডবল দেওয়া উচিত ছিল। যাকগে, অসিতের মেয়ের বিয়ের ভাবনা আছে, সুজিতের বৌটা নিত্য রোগী, এক মেয়ে বিয়োতে ওর হাজার টাকা খরচ—ভবিষ্যতে কি যে করবে ভগবান জানেন। আমি বলি কি, ওদের সঙ্গে তোমার কোন মিল নেই, ওরা একরকম, তুমি আরেকরকম। কি দরকার একসাথে থাকবার? আমার জন্যে আমার ভয়ে একসাথে থেকেছে, নয়তো কবে তোমায় খেদিয়ে দিত। এ অবস্থায়, আমার মতে, তোমার ভিন্ন হওয়া উচিত। ওই বাড়তি ভাঁড়ার ঘরটা তুমি রান্নাঘর করতে পার—কাল থেকে তাই হবে। কাল পয়লা না?

বেশ তো। তাই হবে।

অজিতের সংক্ষিপ্ত গা-ঝাড়া জবাব বড়ই ক্ষুণ্ণ করে রসিককে।

একবার ভাবলে না, বৌমার সঙ্গে পরামর্শ করলে না, বলে বসলে তাই হবে? তোমার এই মতিগতির জন্য—

উদাসীন ভাবটা ত্যাগ করে এবার অজিত জোর দিয়ে ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, সংসারের ব্যবস্থায় আমার মতিগতির প্রশ্ন কি? আমি কিছু করতে গেলে বলতে গেলেই বরং আপনিও রাগ করেন, আপনার বৌমাও ক্ষেপে যান। আপনারা পরামর্শ করে যা ভাল বোঝেন তাই করুন।

একি একটা কথা হল অজিত? রসিক বলেন কাতরভাবে, তোমার আয় বেড়েছে শুনে থেকে ভাবছি। সুজিতের চাকরীটাও গেল। অনেক আগেই তোমায় ভিন্ন হতে বলা বোধ হয় উচিত ছিল, ভুল করেছি মনে হয়। লেখাপড়া শিখলে

না, মানুষ হলে না, ভেবেছিলাম ভাইদের সঙ্গে থাকলে সময়ে অসময়ে তবু—

নলটা ঠোঁটের কাছে আলগোছে ঠেকে থাকে, চিন্তার অনেকগুলি রেখা ফুটে থাকে চামড়ার কুঁচকানিতে।

বৌমাও যেন কেমন। ওরা পছন্দ করে না, আমল দেয় না, তবু বেহায়ার মত লেপ্টে থাকবেন। নাঃ, কাল থেকেই তুমি ভিন্ন হয়ে যাও।

তাই হবে।

কাল ভিন্ন রান্নাঘরে ভিন্নভাবে লক্ষ্মী তার আর খোকার জন্য রান্না করবে, এটা তার কাছে অতি সামান্য ব্যাপার। বাড়িতে সে একবেলা খায়। দশ জনের সঙ্গে মিলেমিশে খাওয়া তার অভ্যাস। সেটা বাইরে হোটেলে সম্ভব হয়, বাড়িতে ভাইরা তার সঙ্গে খায় না। সময় মত দু'একদিন হঠাৎ হাজির হয়ে আসন পেতে সবার সাথে বসে খেতে গিয়ে সে দেখেছে, খাওয়া যেন মাটি হয়ে গেল ভাইদের, পরিবেশন উদ্‌ভট হয়ে গেল মেয়েদের, লক্ষ্মীর পর্য্যন্ত। পরে লক্ষ্মী ঘরে গিয়ে কেঁদে বলেছে, কেন তুমি বসতে গেলে ওনাদের সঙ্গে? আমি গলায় দড়ি দেব।

সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় সামনে পড়ে সুজিতের বৌ সুমনা। পাশে সরে দেয়াল ঠেলে সরিয়ে দশ-বিশ হাত ব্যবধান সৃষ্টির চেষ্টাটা সুমনা এমন কুৎসিতভাবে করে যেন গুণ্ডার হাতে মান বাঁচাতে ভদ্রমেয়ে সতী বৌ ইঁটের দেয়ালে কবর চাইছে। সুজিতের আবার চাকরী গেছে। সুমনার স্নায়ুগত ব্যারামটা মাসখানেক হল আবার বেড়ে গেছে শুনেছিল লক্ষ্মীর কাছে, বোধ হয় মাসখানেক সুজিতের চাকরীর মেয়াদ আছে এটা টের পাওয়ার পর।

আগের বার যখন বেকার ছিল সুজিত, সুমনাকে দিয়ে সে মাঝে মাঝে টাকা চেয়ে পাঠাত তার কাছে। পাঠাত লক্ষ্মীর কাছেই কিন্তু সুমনা টাকার দরকারটা জানাত তাকে, বলত, দাদা, দশটা টাকা চাইতে এসেছি। মেলামেশা ছিল তখন তাদের মধ্যে। সুজিতের চাকরী হবার পর সে আর সুজিত দু'জনেই কথা বলাও প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিল। আবার বেকার হয়েছে সুজিত। কিন্তু এমন করে কেন সুমনা তা হলে? হিসাব মত আবার তো সুমনার এখন দাদা বলে ডেকে তার সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করা উচিত। অনেক টাকা কি ব্যাঙ্কে জমিয়ে ফেলেছে সুজিত? রক্তে আগুন ধরে যায় অজিতের, হাসি পায়। মেয়েটার পরিচয়হীন পেট মোটা কোমড়ে একটা লাথি কষিয়ে দেবার সাধটা সে দমন করে। বলে, ভীষণ মদ খেয়ে এসেছি। ভয়ানক খুন চেপেছে।

মাগো! সুমনা আর্তনাদ করে মৃদু অস্ফুটস্বরে, সে নিজে আর সামনের খুনেটা ছাড়া কেউ যাতে না শুনতে পায়।

এক মুহূর্তে নিজের কাছে ছোট হয়ে যায় অজিত। এইসব বিকারের বস্তা, খাপছাড়া দুঃখী জীব—এদের ওপরেও মানুষ রাগ করে।

অজিত বলে, বৌমা, ওষুধ খাও নি?

সুমনা বলে, খেয়েছি তো?

অজিত বলে, না, খাওনি। এখনি ওষুধ খাবে যাও। বোনটি আমার, মা'টি আমার, ওষুধটা রোজ খেতে হবে।

সুমনা কেঁদে ফেলে, জলকাচা মোটা শাড়ীর মত, মোচা কাটা কলাগাছের মত অঝোরে কেঁদে ফেলে, দাদা, ওষুধ খেলে ঘুম পায় যে? রাগ করে যে ঘুমোলে?

অজিত সটান ওপরে চলে যায়। এ সমস্যা তার ধরাছোঁয়ার এলাকায় নয়। সমস্যাটা স্পষ্ট হতে দিয়ে বরং বোকামিই করে ফেলেছে সে। যার শোচনীয় দুঃখে হঠাৎ মনটা মায়ায় ভিজে গিয়েছিল, কাটখোট্টা বাস ড্রাইভার হলেও ভদ্র হালদার পরিবারের ছেলে বলেই হয়তো,—সে হয়তো সিঁড়ি কটা বেয়ে নামতে নামতেই সুর পাল্টাবে। সরু গলার চিকণ আওয়াজে চিরে দেবে সেঁতসেঁতে উঠানের গুমটো নিশ্চল বাতাসকে, বলবে, সিড়ি দিয়ে উঠবার সময় মেজো ভাসুর গায়ে তার হাত দিয়েছিল, মদের কি গন্ধ তার মুখে।

এসব ভদ্রঘরের মেয়ে বৌকে বিশ্বাস নেই।

জামা ছাড়ে অজিত। লক্ষ্মী সামনে এসে হেসে বলে, ওমা, আজ যে এত সকাল সকাল এলে?

অজিত আরেকবার অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে যায়। শুধু আশ্চর্য নয়, অবাকও। লক্ষ্মী তার সঙ্গে হাসিমুখে 'ঘরোয়া অর্থহীন কথা বলছে। শাড়ী গয়না ক্রিম পাউডার কিছু তার আজ আনবার কথা নয়, আনেও নি জানে লক্ষ্মী।

ইস্। মুখটা শুকিয়ে গেছে তোমার। জামা কাপড় খুলে লুঙ্গিটা পরে এসে বসো। একটু হাওয়া করি। ঘেমে নেয়ে গেছ একেবারে।

বাড়ি এসে জামাকাপড় ছেড়ে রোজ সে লুঙ্গি পরে। সে প্রক্রিয়া লক্ষ্মী তাকিয়েও ভাখে

না। আজ লক্ষ্মী অনুমোদনের হাসি হেসে অপেক্ষা করার ভঙ্গিতে বসে হাত নাড়ে, পা নাচায়, মাথা বাঁকায়।

কি বলছ? জিগ্‌গেস করে অজিত, আপশোসের সুরে।

বলছি গো, বলছি। মুখ হাত ধুয়ে এস না?

জামাকাপড় ছেড়ে লুঙ্গি পরে মগভরা জল নিয়ে বারান্দায় মুখ হাত ধুয়ে অজিত গম্ভীর মুখে বিছানায় এসে বসে একটা বিড়ি ধরায়। তোমার নাকি ভাসুর ঠাকুরের সমান মাইনে হয়েছে? লক্ষ্মী শুধোয় পাশে বসে, তার বাঁ হাতে বিড়ির আগুন জলছে বলে বাঁ হাতটা টেনে বুকে রেখে।

দাদার মাইনের সমান দাঁড়াবে।

ওমা! কোথায় যাবো! লক্ষ্মী যেন মূর্চ্ছা যাবে। মূর্চ্ছা যাবার বদলে সে খানিকক্ষণ নেতিয়ে পড়ে থাকে অজিতের বুকে। তারপর বলে, ঠাকুরপোর চাকরী গেছে জানো?

তাই নাকি?

চেপে চুপে রেখেছিলেন কথাটা, তা এ কি আর লুকোনো যায়? সুমির রকমসকম দেখেই আমার সন্দেহ হচ্ছিল।

অজিত নীরবে হাই তোলে। একটা বিড়ি ধরায়।

এসো না, শোও না দুদণ্ড? খেটেখুটে এসে কি বিশ্রাম করতেও সখ যায় না একটু? আস্তে আস্তে ঘামাচি মেরে দি, কি ঘামাচি হয়েছে গায়ে! ইস! মাগো! আর শুনেছ? বাবা বলছিলেন, ভাসুর ঠাকুর সংসারে পঁচিশ টাকা কম দেবেন বলেছেন। ওঁর নাকি নিজের খরচ বেড়েছে। ঠাকুরপো তো ছাটাই। বাবার কাছে নাকি দু হাজার টাকা চেয়েছে, ব্যবসা করার জন্যে। ঠাকুরপো করবে ব্যবসা! বৌ যার রোজ কাঁদে যে, এর চেয়ে একটা হিজরের সঙ্গে বিয়ে হলে অন্তত কোর্টে গিয়ে নালিশ ফ্যাসাদ করে—

বিদ্যুতের আলোয় ঘর স্পষ্ট, মানুষ স্পষ্ট, দৈন্য অভাব অভদ্রতা সব কিছুই স্পষ্ট।

অজিত বলে খিদে পেয়েছে।

ওমা! মাগো! খিদে পাবে না?

খাওয়ার আয়োজন করতে করতে লক্ষ্মী বলে, বাবা বলছিলেন যাই হোক তাই হোক, আমার এই ছেলেটাই ভাল। সংসারে ঠিকমত টাকা দেয়, নিজের আর বৌয়ের বাবুগিরিতে সব উড়িয়ে দেয় না।

বারান্দায় কেউ নেই, আশেপাশে কেউ নেই, তাদের ঘরোয়া প্রেমালাপ শুনবার মাথাব্যথা কারো আছে কিনা সন্দেহ, তবু অজিতের কাণের কাছে মুখ নিয়ে লক্ষ্মী ফিসফিসিয়ে বলে, বাবা আমায় বললেন, ছেলেদের মধ্যে তুমিই শুধু বিশ্বাসী। ওসব বাবুদের ওপর ভরসা নেই। তোমাকে ভিন্ন করিয়ে তোমার সঙ্গে থাকতে চান বাবা। যা করা উচিত, তাতো তুমি করবে অন্তত: মুখ্যু হও আর যাই হও।...

ছেলে মানুষি

ব্যবধান টেঁকেনি। হাত দুই চওড়া সরু একটা বদ্ধ প্যাসেজ বাড়ীর সামনের দিকটা তফাৎ করে রেখেছে, দু'বাড়ীর মুখোমুখি সদর দরজাও এই প্যাসেজটুকুর মধ্যে। পিছনে দু'বাড়ীর ছাদ এক, মাঝখানে দেয়াল উঠে ভাগ হয়েছে, মানুষ-সমান উঁচু। টুল বা চেয়ার পেতে দাঁড়ালে বড়দের মাথা দেয়াল ছাড়িয়ে ওঠে।

ব্যবধান টেঁকেনি। কতটুকু আর পার্থক্য জীবনযাপনের, সুখদুঃখ হাসিকান্না আশা আনন্দের, ঘৃণা ভালবাসার। সকালে কাজে যায় তারাপদ আর নাসিরুদ্দীন, অপরাহ্নে ফিরে আসে অবসন্ন হয়ে। ব্যর্থ স্বপ্ন উৎসুক কল্পনা দিন দিন জমে ওঠে একই ধরণের, ক্ষোভ দিনে দিনে তীব্র হয় দুটি বুকে একই শক্তির বিরুদ্ধে। ইন্দিরা আর হালিমা যাপন করে বন্দী জীবন,—রাঁধে বাড়ে বাসন মাজে স্বপ্ন ছাখে আর অকারণ আঘাত মুখ বুজে সয়ে চলে অবুঝ নিষ্ঠুর সংসারের। ইন্দিরার কোলে একদিন আসে গীতা। পরের বছর অবিকল তারই বেদনাকে নকল করে হালিম পৃথিবীতে আনে হাবিবকে।

যদিবা টিকতে পারত খানিক ব্যবধান, দুরন্ত দুটি ছেলে মেয়ে মানুষের তৈরী কোন কৃত্রিম দূরত্ব মানতে অস্বীকার করে তাও ভেঙে দেয়। কাছে আনে পরিবার দুটিকে। অন্তরঙ্গ করে দেয় ইন্দিরা আর হালিমকে।

একদিন একটি শুভ লগ্নে দুটি ছেলে মেয়ের বিয়ে হয় পাড়ায়। গীতা পায় নতুন খেলা। মার শাড়ী ভাঁজ করে সে পরে, সিঁদুরের টিপ আর চন্দনের এলোমেলো ফোঁটা আঁকে কপালে আর গালে, পাড় দিয়ে বাবার লাল টুথ ব্রাশটির মুকুট এঁটে সে কনে সাজে হাবিবের। কপালে চন্দন লেপে গলায় গামছা পাকানো উড়ুনি ঝুলিয়ে দিয়ে হাবিবকে বরবেশে সেই সাজিয়ে দেয়। শাশুড়ীর অভিনয় করতে হয় ইন্দিরা আর হালিম দু'জনকেই। উলু দিয়ে বরণ করতে হয় জামাইকে ইন্দিরার, বৌকে হালিমার। খাবার আনিয়ে জামাই-আদরে বৌ-আদরে দু'জনকে খাওয়াতে হয় মুখে খাবার তুলে দিয়ে। নইলে নাকি খায় না নতুন বর-বৌ। থেকে থেকে দু'জনে তারা ফেটে পড়ে কৌতুকের হাসিতে। তাতে রাগতে রাগতে হঠাৎ বিয়ের কনের লজ্জা-সরম ভুলে গিয়ে মেঝেতে হাত পা ছুঁড়ে কান্না সুরু করে গীতা। তারপর থেকে তাদের হাসতে হয় মুখে আঁচল গুঁজে।

মাকে নকল করে গীতা হাবিবকে ডাকে, ওগো? ওগো শুনছ? জামাই। এই জামাই! ডাকছি যে?

হাবিব বলে, অ্যাঁ?

অ্যাঁ কি? অ্যাঁ না। বলে কি গো?

হালিমা আর ইন্দিরা ঢলে পড়ে পরস্পরের গায়ে।

মুখ ভার করে থাকে পিসী। হালিমা বাড়ী ফিরে যাওয়ামাত্র বলে, এ সব কি কাণ্ড বৌমা?

কেন পিসীমা?

চা খাওয়ালে, বেশ করলে। তা চা যে খেয়ে গেল কাপে মুখ ঠেকিয়ে, কাপটা শুধু ধুয়ে তুলে রাখলে সব বাসনের সাথে? গঙ্গা জলের ছিটেও দিতে পারলে না? ভিন্ন একটা কাপ রাখলেই হয় ওর জন্যে। জাতধর্মো রইল না আর।

গঙ্গা জলে ধুয়েছি।—ইন্দিরা অনায়াসে বানিয়ে বলে।

এ বাড়ীতে নাসিরুদ্দীনের মায়েরও মুখ ভার।

ও বাড়ী থাকলেই পারতে? এত বাড়াবাড়ি ভাল নয়। ওরা পছন্দ করে কিনা কে তা জানে।

হালিমাও হাসি মুখেই বলে, চা না খাইয়ে ছাড়লে না। দেরী হয়ে গেল।

তুমি তো খেয়ে এলে চা খুসী মনে। তুমি দিও তো একদিন কেমন খায়?

চা তো খায়।

সব কাজ পড়ে আছে সংসারের, সময় মত সুরু হয় নি। নাসিরের মার আসল রাগ কেন হালিমা জানে, তাই জবাব দিতে দিতে সে চটপট কাজে লেগে যায়। বিশেষ কিছুই আর শুনতে হয় না তাকে।

ঘণ্টাখানেক পরে দেখা যায় ছোট নাতনীকে কোলে নিয়ে সদর দরজায় দাঁড়িয়ে নাসিরুদ্দীনের মা আর ছোট নাতি কোলে প্যাসেজে দাঁড়িয়ে তারাপদর পিসী গল্প জুড়েছে সুখদুঃখের।

ব্যবধান টেঁকে নি।

কাজ সেরে দুপুরে হালিমা যেদিন একটু অপরাধিনীর মতই এসে বসে, সেদিনও নয়। মৃদু অস্বস্তির সঙ্গে বলে হালিমা, একটা কাণ্ড হয়েছে ভাই।

ওমা, কি হয়েছে?

তোমার মেয়ে একটু গোসত খেয়ে ফেলেছে। আজ আমাদের খেতে হয় জানো। হাবিব খেতে বসেছে, আমি কিছুতে দেব না, বেটি এমন নাছোড়। হঠাৎ পাত থেকে নিয়ে মুখে পুরে দিলে।

কিছু হবে না তো? ইন্দিরা বলে চমকে গিয়ে।

হালিমার মুখ দেখে তারপর ইন্দিরা হাসে, বলে, কি যে বলি আমি বোকার মত। হাবিবের কিছু হবে না, ওর হবে! খেয়েছে তো কি আর হবে, ওইটুকু মেয়ে। কাউকে বোলো না কিন্তু ভাই।

তাই কি বলি? হালিমা স্বস্তি পায়—বাব্বা, আমি জানি না? ও রোজ আলি সাব আর তার বিবি এসে কি দাবড়ানি দিয়ে গেল। হাবিব তোমাদের সরস্বতী পুজোয় অঞ্জলি দিয়েছে, প্রসাদ খেয়েছে, এ-সব কে যেন কানে তুলে দিয়েছিল।

শোন বলি তবে তোমায় কাণ্ডখানা।—ঘরে কেউ নেই, তবু ইন্দিরা কাছে সরে নীচু গলায় বলে, হাবিব অঞ্জলি দিয়েছে বলে পিসীর কি রাগ! উনি শেষে পঞ্জিকা খুলে আবোল তাবোল খানিকটা সংস্কৃত আউড়ে পিসীকে বললেন, সরস্বতী পুজোয় দোষ হয় না, শাস্ত্রে লিখেছে। তখন পিসী ঠাণ্ডা হয়ে বললে, তাই নাকি!

শান্ত দুপুর। ফিরিওলা গলিতে হেঁকে যাচ্ছে, শাড়ী-সায়া-সেমেজ চাই। দুজনে তারা খড়ি নিয়ে মেঝেতে কাটাকাটি খেলতে বসে। হাই ওঠে, বুজে আসে চোখ। চোখে চোখে চেয়ে ক্ষীণ শ্রান্ত হাসি ফোটে দুজনের মুখে। আঁচল বিছিয়ে পাশাপাশি একটু শোয় তারা দুটি স্ত্রী, দুটি মা, দুটি রাঁধুনী, দুটি দাসী।

ঘুমোয় না। সে আরামের খানিক সুযোগ জোটে বেলা যখন আরও অনেক বড় হয় গরমের দিনে। আজকাল শুধু একটু ঝিমিয়ে নেবার অবসর মেলে। ঝিমানো চেতনায় ঘা মারে স্তব্ধ দুপুরের ছাড়াছাড়া শব্দগুলি। তার মধ্যে সব চেয়ে স্পষ্ট হয়ে থাকে ছাতে হাবিব আর গীতার দাপাদাপির শব্দ।

ব্যবধান টেকেনি। কেন যে সেটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল আচমকা এমন ভয়ানক এমন বীভৎস রূপ নিয়ে, কেন এত হানাহানি খুনোখুনি চারিদিকে বোঝে না তারা, থতমত খেয়ে ভড়কে যায়, দুরু দুরু করে বুক। সেবার মাঝে মাঝে বুক কেঁপেছিল সাইরেনের আওয়াজে জাপানী বোমার দিনগুলিতে, দূর থেকে হাওয়ায় ভর করে উড়ে আসা অনিশ্চিত বিদেশী বিপদের ভয়ে। তার চেয়ে ব্যাপক, ভয়ানক সর্ব্বনাশ আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে দেশের বুকে, সহর জুড়ে, পাড়ায় ঘরের দুয়ারে। বুকের জোরালো ধড়ফড়ানি থামবার অবকাশ পায় না আজ, বাড়ে আর কমে, কমে আর বাড়ে।

তবে কথা এই যে, এটা মেশাল পাড়া। নিজেরাই বলাবলি করে নিজেদের মধ্যে যতটা নিরুপায় নয় তার চেয়ে অনেক বেশী মরিয়ার মত। এতেই অনেকটা ভরসা খাড়া আছে মারাত্মক আতঙ্ক গুজব আর উস্কানির সেজাসুজি প্যাঁচালো আর চোরাগোপ্তা আঘাত সয়ে, যে আঘাত চলেছেই। বাস্তব একটা অবলম্বনও পাওয়া গেছে সকলে মিলে গড়া পিস-কমিটিতে, বিভ্রান্ত না করে যার জন্মলাভের প্রক্রিয়াটাও জাগিয়েছে আস্থা। কারণ, বড় বড় কথা উথলায়নি সভায় আদর্শমূলক ভাবোচ্ছ্বাসে, মিলনকে আয়ত্ত করার চেষ্টা হয় নি শুধু মিলনের জয়গান গেয়ে, এই খাঁটি বাস্তব সত্যটার উপরেই বেশী জোর পড়েছে যে এ পাড়ায় হাঙ্গামা হলে সবার সমান বিপদ, এটা মেশাল পাড়া।

হয়তো এ পাড়ায় শুরু হবে না সে তাণ্ডব, কে জানে। চারি দিকে যে আগুন জ্বলেছে। তার হলকাতে ছ্যাঁকা লেগে লেগেই মনে কি কম জ্বালা। সবহারা শোকাতুর দিশেহারা আপন জনেরা এসে অভিশাপ দিচ্ছে, বলছে মারো, কাটো, জবাই করো, শেষ করে ফ্যালো। এ এসে ও এসে বুঝিয়ে যাচ্ছে মারা ছাড়া বাঁচার উপায় নেই।

অনেক কালের মেশামিশি বসবাস। হয়তো তেমন ঘনিষ্ঠ নয় মেলামেশা সবার মধ্যে, সেটা আসলে কিন্তু এটা সহর বলেই। পাখা সবারি পঙ্গু, মানুষকে হাঁস মুরগী করে রাখা মর্জি মালিকের। পাখা ঝাটিয়ে চলতে হয় জীবনের পথে।

তাই তো বলি পাখী নাকি আমারা, হালিমা বলে মুখোমুখি জানলায় দাঁড়িয়ে, তাড়া খেয়ে খেয়ে আজ এখানে কাল সেখানে উড়ে বেড়াব? গাছের ডালে বাসা বানাব?

আর বোলো না ভাই, ইন্দিরা বলে, মাথা ঘুরচে কদিন থেকে। এসব কি কাণ্ড। এ্যাঁ কি রাঁধলে?

তেমন প্রাণ-খোলা আলাপ কিন্তু নয়, কদিন আগের মত। গলায় মৃদু অস্বস্তির সুর দু'জনেরি; চোখ এড়িয়ে সন্তর্পণে জানালা দুটির একটি করে পাট খুলে কথা কইছে, কাজটা যেন অনুচিত, আসা যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে হঠাৎ। দুজনের বাড়ীতেই আচমকা আশ্রয় নিতে আত্মীয় স্বজনের আবির্ভাব ঘটেছে বলেই নয় শুধু, বাড়ীর মানুষ বারণ করে দিয়েছে মেলামেশা, ঘনিষ্ঠতা—অন্ততঃ সাময়িক ভাবে।

কি যে হবে ভাবছি।

দুধে নাকি বিষ মেশাচ্চে গয়লারা। দুধ জ্বাল দিয়ে আগে বেড়ালটাকে খানিকটা খাওয়াতে হয়, ছেলেপিলেরা খিদেয় কাঁদে, দেওয়া বারণ। আধঘণ্টা বেড়ালটা কেমন থাকে দেখে তবে ওরা পায়। রুটি আনা বন্ধ করেছেন। রুটি যারা বানায় তাদের মধ্যে তোমরাই নাকি বেশী। একটুকরো রুটি আর চা জুটত সকালে, এখন শুধু একটু গুড়ের চা খেয়ে থাকো সেই একটা দুটো পর্য্যন্ত।

এত লোক বেড়েছে, ডাল তরকারি ছিটে ফোঁটা এক রোজ থাকে, আর এক রোজ একদম সাফ। ভাতেও টান পড়ে।

আজ চিড়ে খেয়েছি নুন দিয়ে। গুড়ও নেই।

চোখে চোখে চেয়ে খানিক মাথা নীচু করে থাকে দু'জন। ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায় জানালার পাটদুটি।

ছেলে-মেয়ের সংখ্যাও বেড়ে গেছে দু'বাড়ীতে। অন্য অঞ্চল থেকে উৎখাত হয়ে তারা বড়দের সঙ্গে এসে আশ্রয় নিয়েছে। মুখ চেনাচিনিও হয় নি বড়দের মধ্যে কিন্তু ছেলেমেয়েদের কে ঠেকিয়ে রাখবে? তাদের মেলামেশার দাবী রাজনীতির ধার ধারে না, আপোষ অনুমতির তোয়াক্কা রাখে না, জাতধর্মের বালাই মানে না। স্কুল নেই, লেখা-পড়া নেই, বেড়ানো নেই, বাড়ীর এলাকার বাইরে যাওয়া পর্য্যন্ত বারণ। বড়দের মুখে অন্ধকার, বাড়ীতে থমথমে ভাব, মুমূর্ষু রোগী থাকলে ঘন ঘন ডাক্তার আসবার সময় যেমন হয়। ওরা তাই করে কি, হাবিব আর গীতার নেতৃত্বে নিজেরাই আয়োজন করে মিলে মিশে খেলা ধুলো করার। বাড়ীতে ঠাঁই নেই, নিজেরাই তৈরী করে নেয় খেলাঘর। হাঙ্গামা করতে হয় না বেশী, বাইরের প্যাসেজে দুপাশের দেয়ালে দুটো পেরেক পুঁতে একটা কাপড় টাঙিয়ে দিতেই প্যাসেজের শেষের অংশটুকু পরিণত হয়ে যায় চারিপাশ ঘেরা ছোটখাট একটি ঘরে। কিছু চাল ডাল ডাঁটাপাতা যোগাড় হয়েছে। গীতা এনে দিয়েছে ছোট তোলা উনুনটি আর তেলমশলা। তরকারির অনটনে সবার মন খুঁত খুঁত করতে থাকায় হাবিব এক ফাঁকে বাড়ীর ভেতর থেকে সরিয়ে এনেছে কিছু আলু পেঁয়াজ আর একটা আস্ত বেগুণ। জোরালো পরামর্শ চলছে, সব কিছু দিয়ে এক কড়া খিচুড়ি রাঁধা অথবা খিচুড়ি, ভাজা, তরকারী সবই রাঁধা হবে। রান্নার ভার নিয়েছে মেহের, তার বয়স ন' দশ বছর, এই বয়সেই বড়দের আসল রান্নার কাজে তাকে সাহায্য করতে হয় বলে তার অভিজ্ঞতার দাবী সবাই বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছে।

কিন্তু উনুনে তাদের আঁচও পড়ে না, রান্নাও সুরু হতে পায় না। টের পেয়ে হাঁ হাঁ করে ছুটে আসে দু'বাড়ীর বড়রা। মেহেরের বাপের নিকা-বৌ হুরুন্নেসা মেয়ের বেণী ধরে মাথা টেনে গালে চড় বসায়। পুষ্পর মাসীমা এক ঠোনায় রক্ত বার করে দেয় ভাগ্নীর ঠোঁটে। কান ছাড়াতে হাত পা ছোঁড়ে গীতা, লাথি লাগে তারাপদর পেটে। হাবিব কামড় বসিয়ে দেয় নাসিরুদ্দিনের হাতে। বাচ্চাদের কাঁদাকাটা বড়দের হৈ চৈ মিলে সৃষ্টি হয় আওয়াজ। প্রতিবেশীরা ছুটে এসে কি হয়েছে জানতে চেয়ে বাধিয়ে নেয় রীতিমত হুল্লোড়, প্যাসেজের মুখে গলিতে জমে ওঠে লাঠি রড ইঁট হাতে ছোটখাট কয়েক মুহূর্ত্ত, আর কয়েক মুহূর্ত্তে স্থির হয়ে যাবে মেশাল পাড়ায় ভাগ্য—জীইয়ে রাখা শান্তি অথবা অকারণে ডেকে আনা সর্ব্বনাশ। কান্না ভুলে বড় বড় চোখ মেলে ছেলেমেয়েরা চেয়ে ত্যাখে বড়দের অর্থহীন কাণ্ড।

ভলান্টিয়ার সঙ্গে নিয়ে পিস কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক দু'জন ছুটে আসায় অল্পের জন্য হাঙ্গামা ঠেকে যায়। সম্পাদক দু'জন ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলেন।

ভিড়ে ভাঙ্গন ধরে। দু'চার মিনিটের মধ্যে ভলান্টিয়াররা ভিড় সাফ করে দেয়।

তখন যুগ্ম সম্পাদক দু'জন পরামর্শ করে ভলান্টিয়ারদের পাঠান পাড়ায় পাড়ায় সত্য ঘটনা প্রচার করতে। এমন স্পর্শ-কাতর হয়ে আছে মানুষের মন যে, এরকম তুচ্ছ ঘটনাও দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়তে পারে মারাত্মক গুজব হয়ে।

বিকালে একটা লরী আসে পুলিশ ও সৈন্যের ছোট একটী দল নিয়ে। চারিদিক তখন শান্ত। বুটের আওয়াজ তুলে কিছুক্ষণ তারা এদিক ওদিক টহল দেয়। এ বাড়ীর দরজায় ঘা মেরে, এর ওর দোকানে ঢুকে, জিজ্ঞাসা করে কোথায় গোলমাল হয়েছিল। জবাব শোনে আশ্চর্য ও অবিশ্বাস্য, যে কোথাও গোলমাল হয় নি। ক্রুদ্ধ অসন্তুষ্ট মনে হয় তাদের, আগমন কি তাদের অনর্থক হবে? গলির মোড়ে নিতাই-এর দোকানের একপাশে তক্তপোষ পেতে চারজন সশস্ত্র সৈন্যের ঘাঁটি বসিয়ে লরী ফিরে যায় বাকী সকলকে নিয়ে। নতুন এক সশঙ্ক অস্বস্তিবোধ ছড়িয়ে পড়ে মেশাল পাড়ায়। সাঁজবাতির আগেই বন্ধ হয়ে যায় দোকানপাট, মানুষ গিয়ে ঢোকে কোটরে, শূন্য হয়ে যায় পথ।

এ বাড়ী থেকে কথা শোনা যায় ও বাড়ীর। কিন্তু কথার আদান প্রদান বন্ধ হয়ে গেছে। চুপি-চুপি দু'এক মুহূর্ত্তের জন্য মখোমুখি জানালার পাটও একটু ফাঁক হয় না। এ বাড়ী ভাবে ও বাড়ীর জন্য মিলিটারী এসে পাড়ায় গেড়ে বসেচে, কি জানি কখন কি হয়। ছেলে মেয়েদের বাড়ীর বাইরে যাওয়া বারণ। ঘরের জেলে তারা কয়েদ।

ছাত ভাগ করা দেয়ালের এপাশ থেকে গীতা বলে, আসবি হাবিব?

মারবে যে?

না, পিসীর ঘরে চুপি চুপি খেলব।

পিসী বকবে তো?

দুর। রান্না করে নেয়ে আসতে পিসীর বিকেল বেজে যাবে।

ছাতের সিঁড়ির মাঝে বাঁকের নীচু লম্বাটে কোটরটি পিসী বহুদিন দখল করে আছে, তার নীচে দোতলায় কল-ঘর। লম্বা মানুষ এঘরে দাঁড়ালে ছাতে মাথা ঠেকবে। পিসীর নিজস্ব হাঁড়ি-কুঁড়ি কাঠের বাক্স কাঁথা বিছানায় কোটরটি ভরা। কুশের আসন পেতে এ ঘরে পিসী আহ্নিক করে। আমিষ-রান্নাঘরে একবার ঢুকলে স্নান করে শুদ্ধ হবার আগে পিসী আর এ ঘরে আসে না।

ঘরের মধ্যে এ ভাবে লুকিয়ে চুপি চুপি কি খেলা করবে, হাবিবকে নিয়ে এ বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে যোগ দেবার উপায় নেই, ওদেরও ডাকা যায় না এখানে। তাই নতুন খেলা আবিষ্কার করে নিতে হয়।

দাঙ্গা দাঙ্গা খেলবি? গীতা বলে।

লাঠি কই? ছোরা কই? প্রশ্ন করে হাবিব।

গীতা বলে, দাঁড়া।

গীতা চুপি চুপি অস্ত্র সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। তারাপদর খুর আর ছুরি। খুরটি পুরানো, কামানো হয় না, কাগজ পেন্সিল দড়ি কাটার কাজেই লাগে। পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে অনেক কষ্টে গীতা ভেতর থেকে দরজার ছিটকিনি এঁটে দেয়। হাবিবের চেয়ে সে একটু ঢ্যাঙা।

তুই আকবর আমি পদ্মিনী। আয়!

খেলা, ছেলে-খেলা। অসাবধানে কখন যে সামান্য কেটে যায় একজনের গা অপরের অস্ত্রে।

মারলি?

ব্যথা পেয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে সে প্রতিশোধ নেয় অপরের গায়ে। জেদি দুরন্ত ছেলে-মেয়ে দু'জন, ব্যথায় রাগে অভিমানে দিশেহারা হয়ে কাটাকাটি হানাহানি সুরু করে ভোঁতা খুর আর ভোঁতা ছুরি দিয়ে। সেই সঙ্গে চলে গলা ফাটিয়ে আর্ত কান্না। ইন্দিরা পিসীমারা ছুটে আসে কলরব করে। ছুটে আসে ওবাড়ীর হালিমা মুক্লেসারা। তারা সিঁড়িতে উঠে পিসীর কোটরের দরজার সামনে ভিড় করে থাকায় তারাপদ ও বাড়ীর অন্য পুরুষদের দাঁড়িয়ে থাকতে হয় সিঁড়ির নিচে।

সদর দরজায় বাড়ীর অন্য পুরুষদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে নাসিরুদ্দিন হাঁকে, তারাপদ!

দু'টি মাত্র শিক বসানো ছোট্ট একটি খোপ আছে পিসীর ঘরে, একসময় একজনের বেশী দেখতে পারে না ভেতরের কাণ্ড। এক নজর ভেতরে তাকিয়ে ইন্দিরা আর্তনাদ করে উঠে, মেরে ফেলল! মেয়েটাকে মেরে ফেলল গো।

দরজায় ধাক্কা মারতে মারতে চেঁচায়: খোল! খোল! দরজা খোল! খুনে ছোঁড়া দরজা বন্ধ করে খুন করছে মেয়েটাকে। দরজা খোল!

হালিমাও এক নজর তাকিয়ে অবিকল তেমনি সুরে আর্তনাদ করে ওঠে, মেরে ফেলল! ছেলেটাকে মেরে ফেলল!

দরজায় ধাক্কা মারতে মারতে চেঁচায়। খোল! খোল! দরজা খোল! খুনে ছুঁড়ি দরজা বন্ধ করে খুন করছে ছেলেটাকে! দরজা খোল্।

পিসী চেঁচায়, হায় হায় হায়। সব ছোঁয়াছুঁয়ি করে দিলে গো!

নিচে থেকে নাসিরুদ্দীন হাঁকে তারাপদ! আমরা অন্দরে ঢুকব বলে দিচ্ছি!

পিসীকে ঠেলে সরিয়ে ইন্দিরা আর হালিমা একসঙ্গে পাগলিনীর মত খোপের ফোকর দিয়ে ভেতরে তাকাতে চায়, মাথায় মাথায় ঠেকাঠেকি হয়ে যায় দু'জনের। আক্রমণে উদ্যত বাঘিনীর মত হিংস্র চোখে তারা পরস্পরের দিকে তাকায়।

ভেতরে ততক্ষণে গীতা আর হাবিবের হাত থেকে অস্ত্র খসে পড়েছে। বাইরের হট্টগোলে চুপ হয়ে গেছে তারা। কিন্তু লড়াই থামায় নি, আগে কে হার মানবে অপরের কাছে! নিঃশব্দে মেঝেতে পড়ে জড়াজড়ি কামড়া-কামড়ি করে। ভেঙে চুরমার হয়ে যায় পিসির হাঁড়িকুঁড়ি।

হায়, হায়! সব গেল গো, সব গেল!

নাসিরুদ্দিনকে ওপরে ডেকে আনে তারাপদ।

সেই লাথি মেরে দরজা ভাঙে। দরজাটা ঠিক ভাঙে না, ছিটকিনিটা খসে যায়।

ওপর ওপর চামড়া কাটাকুটি হয়েছে খানিকটা, কিছু রক্তপাত ঘটেছে। নিজের নিজের সন্তানকে বুকে নিয়ে কিছুক্ষণ ইন্দিরা আর হালিমা ব্যাকুল দৃষ্টি বুলিয়ে যায় তাদের সর্বাঙ্গে। তারপর প্রায় একই সময় দুজনে মুখ তোলে চোখে অকথ্য হিংসার আগুন নিয়ে। দুজনেই যেন অবাক হয়ে যায় অপর কোলে আহত নির্জীব অপরের সন্তানটিকে দেখে, বহুকাল ভুলে থাকার পর দুজনেই যেন হঠাৎ আবিষ্কার করেছে অন্য জনও মা, তার সন্তানের গায়েও রক্ত।

বাইরে আবার ভিড় জমেছিল। আবার অনিবার্য্য হয়ে উঠেছিল সংঘর্ষ। তারাপদ আর

নাসিরুদ্দীন দু'বাড়ীর এই দুই কর্তাকে পাশাপাশি সামনে হাজির করতে না পারলে পিস-কমিটি এবার কোনমতেই ঠেকাতে পারত না সর্বনাশ।

আইভিন লাগিয়ে নাইয়ে খাইয়ে দু'বাড়ীতে শুইয়ে রাখা হয় হাবিব আর গীতাকে। ছুটির দিন, ঢিমে তালে সংসারের হাঙ্গামা চুকতে চুকতে এমনিই দুপুর গড়িয়ে যেত আগে, এখন আবার বাড়তি লোকের ভিড়। বিকেলের দিকে কিছুক্ষণ আগে পরে দু'বাড়ীতে খোঁজ পড়ে ছেলেমেয়ে দুটির।

খোঁজ মেলে না একজনেরও।

আবার তন্ন তন্ন করে খোঁজ হয় বাড়ী, আনাচ কানাচ, চৌকির তলা। গীতা বাড়ীতে নেই। হাবিব বাড়ীতে নেই।

শঙ্কায় কালো হয়ে যায় দু'বাড়ীর মুখ। কিছুক্ষণ গম গম করে স্তব্ধতা, তারপর ফেটে পড়ে মুখর গুঞ্জন।

এবাড়ী বলে বুক চাপড়ে: শোধ নিয়েছে। ভুলিয়ে ভালিয়ে ডেকে নিয়ে গিয়ে হয় গুম্ করে রেখেছে, নয়—

ও বাড়ী প্রতিধ্বনি তোলে মাথা কপাল কুটে।

তারাপদ বলে, গীতা নিশ্চয় আছে তোমার বাড়ীতে নাসির।

নাসিরুদ্দীন বলে, হাবিবকে তোমরা নিশ্চয় গুম্ করেছ তারাপদ।

এবার আর রোখা যায় না, আগুনের মত গুজব আর উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এত চেষ্টা করেও উস্কানিদাতারা এ মেশাল পাড়ার শান্তিতে দাঁত ফোটাতে পারে নি, এমনি একটি সুযোগের জন্য তারা যেন ওৎ পেতে ছিল, সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দেখতে দেখতে বাড়ী দুটির সামনে জড়ো হয় দু'দল উন্মাদ মানুষ। এরা এ বাড়ীতে চড়াও হবে, ওরা এ বাড়ীতে। কিন্তু দল যখন দুটি তখন আগে বাইরে রাস্তায় লড়াই করে অন্য দলকে হটিয়ে জয়ী হতে না পারলে কোন দলের পক্ষেই বাড়ী চড়াও হওয়া সম্ভব নয়।

মারামারি হবেই। সেটা জানা কথা। আগেই বেধে যেত, পিস্-কমিটির চেষ্টায় শুধু দু'দশ মিনিটের জন্য ঠেকে আছে।

যুগ্ম-সম্পাদক বলেন, আমরা তল্লাস করছি বাড়ী।

জনতা সে কথা কানে তোলে না। তাদের শান্ত রাখতে গিয়ে গালাগালি শোনে, মারও খায় কয়েকজন ভলান্টিয়ার। তবু তারা চেষ্টা করে যায়। গলির মোড়ের সৈন্য চার জন চুপচাপ বসে আছে।

এমন সময় কে একজন চেঁচিয়ে ওঠে, ওই যে হাবিব! ওই যে।

আরেকজন চেঁচায়, ওই তো গীতা!

সকলের দৃষ্টিই ছিল নিচের দিকে, এ অবস্থায় কে চোখ তুলে তাকাবে ওপরে। কারো নজরে পড়েনি যে, নাসিরুদ্দীন আর তারাপদর বাড়ীর চিলেকুঠির ছাত থেকে কিছুক্ষণ ধরে পাশাপাশি একটি ছেলে ও মেয়ে মুখ বাড়িয়ে নীচের কাণ্ড কারখানা লক্ষ্য করছে। ছাত ভাগ করা দেয়ালের দু'পাশে দু'বাটীর ছাতের সিঁড়ির চিলেকুঠি একটাই। কখন যে তারা দু'জন চুপি চুপি সকলের চোখ এড়িয়ে ওই নিরাপদ আশ্রয়ে খেলতে উঠেছিল! মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে কয়েকজন কলরব করে ওঠে, পাওয়া গেছে! দু'জনকেই পাওয়া গেছে!

সবার চোখের সামনে হারানো ছেলে মেয়ে দু'টোর অকাট্য জলজ্যান্ত আবির্ভাব হল বলেই যে মারামারি ঠেকান যেত, তা নয়। হিংসায় উত্তেজনায় জ্ঞান হারিয়ে যারা খুনোখুনি করতে এসেছে, অনেকে তারা জানেও না ওদের দুটিকে নিয়েই আজকের মত গণ্ডগোলের সূত্রপাত। হঠাৎ এই খাপছাড়া ঘটনায়, দু'দলেরই কিছু লোক চঞ্চল হয়ে সোল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠায়, ব্যাপারটি কি জানবার জন্য যে কৌতুহল জাগল জনতার মধ্যে, সঙ্গে সঙ্গে পিস-কমিটীর সম্পাদক দু'জন সেটা কাজে লাগিয়ে ফেলায় ঘটনার মোড় ঘুরে গেল।

জনতা সাফ হয়ে যাবার অনেক পরে আবার লরী বোঝাই মিলিটারী এল।

বহুক্ষণ সার্চ চলে নাসিরুদ্দীন আর তারাপদর বাড়ীতে, গুম করা ছেলেমেয়ে দুটির সন্ধানে। হালিমা আর ইন্দিরার গা ঠেসে দাঁড়িয়ে ভীত চোখে তাই দেখতে থাকে গীতা আর হাবিব।

স্থানে ও স্থানে

চেনা লোক বলে, পালাচ্ছেন তো।

বুক যার ছোট হয়ে গেছে ভয়ে, উপায় থাকলে আজকেই সপরিবারে পালাত নিজেই, তার প্রশ্নটা হয় ঝাঁঝালো, মন্তব্য যা যোগ হয় প্রশ্নের সঙ্গে, তার ঝাঁঝ আরো বেশী।

পালাব কেন? নরহরি বলে, স্ত্রীকে আনতে যাচ্ছি।

দু'একজন তাকে যারা ভাল করে চেনে, বিশ্বাস করে।—সেকি, এখন আনবেন? পনেরই আগষ্ট যাক্? দু'একমাস দেখুন কি দাঁড়ায়, নিজে থাকেন আলাদা কথা, এ সময় মেয়েছেলেদের আনাটা—

পেটের দায়ে থাকতেই যখন হবে, দেরী করে লাভ কি। কিছু হবে না ধরে নেওয়াই ভাল, তাতে মনের জোর বাড়ে।—নরহরি জবাব দেয়।

ষ্টিমারে অসম্ভব ভিড়।—পলাতক আছে, সবাই নয়। ভিড় এ ষ্টিমারে বরাবর হয়, জীবনযাত্রার প্রয়োজনে, ছড়ানো জীবনের সঙ্গে যোগসূত্রের কল্যাণে, এমনি গরুছাগলের মতই মানুষ বরাবর যাতায়াত করে আসছে। তার মধ্যেও যেন কেমন শান্তি শৃঙ্খলা সামঞ্জস্য ছিল নদীর বিস্তৃতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানো একটা উদারতা। আজ সকলের চোখে মুখে নড়াচড়ায় কথা বলায় ভঙ্গিতে সমবেত গুঞ্জনে, একটা চাপা উত্তেজনা, প্রত্যাশা ও ভয়, দম্ভ ও পরাজয়, উদ্বেগের চঞ্চলতা। অথচ অসংখ্য ব্যবহারে মুহূর্তে মুহূর্তে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সীমা-সংখ্যাহীন অচেতন আদানপ্রদানে, সবাই ঠিক আগের মতই মানুষ। মনে হয় বাইরে থেকে আরোপ করা কৃত্রিম এক চেতনা যেন আবর্ত্ত আর সংঘাত সৃষ্টি করেছে।

ট্রেণে এক দুর্ঘটনা ঘটল। মাঝরাতে একটা অসম্পূর্ণ ডাকাতি হয়ে গেল মেয়েদের কামরায়। দশ বার জন ডাকাত, সকলেই অস্ত্রধারী, দু'জনের অস্ত্র আগ্নেয়। গাড়ীতে সেপাই পুলিশ ছিল কিনা টের পাওয়া গেল না, ডাকাতেরা অন্ধকারে মিলিয়ে যাবার আগে। আগের ষ্টেসন থেকে ছাড়ার পর গাড়ীর গতি একবার মন্থর হয়ে আসে, লোকগুলি তখন কামরায় ওঠে। ঠিক ওখানে দুটি ষ্টেশনের মাঝামাঝি ওই নির্জ্জন যায়গায়, গাড়ীর গতি এরকম কমে যাওয়ার কৈফিয়ৎ পরে দিতে হবে, এটুকু ভাবনাও নেই গাড়ী যারা চালায় তাদের। গয়না-গাঁটি সব সংগ্রহ করে একটি তরুণীকে সাথী করে নির্দ্দিষ্ট স্থানে চেন টেনে নেমে পালাবার ব্যবস্থাই বোধ হয় তাদের ছিল। কিন্তু উঁচানো ছোরা বন্দুক গ্রাহ্য না করে মেয়েটির মা আগেই চেন টেনে বসায় তাকে আহত করে অসমাপ্ত রেখেই লোকগুলি নেমে পালায়। একদল যাত্রী হৈ হৈ করে নেমে এসে তাড়া করে। বন্দুকের গুলি তাদের ঠেকাতে পারে নি, ঠেকিয়েছিল অজানা মাঠ জঙ্গল অন্ধকার।

এটা জানা ছিল না নরহরির, সে শুনেছিল অন্য কথা। এসব নিত্যকার ঘটনা আর এ রকম হামলা হলে নাকি যাত্রীরা সাড়া দেয় না, মটকা মেড়ে পড়ে থাকে বা বসে ঝিমোয়। শেষটা তা হলে সত্যি নয়!

শিয়ালদায় গাড়ী পৌছল দেরীতে, এটাও নিত্যকার ব্যাপার। বিছানা বগলে ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে নরহরি একবার তাকিয়ে দেখল এই অতি পরিচিত সহরের ষ্টেশনের বাইরের অংশটুকুকে। সম্প্রতি যে বিজাতীয় আক্রোশ তার জন্মেছে এই সহরটির প্রতি, তাই যেন উথলে উঠে নিরস্ত করেছে তার পদক্ষেপ। ছাত্রজীবনের আনন্দ উত্তেজনা স্বপ্নের সমারোহে বিয়েবাড়ীর আলো আর সানাইয়ের তানে সুমিত্রাকে বাপের বাড়ী আনা নেওয়ার বিরহ-মিলনের মাধুর্য্যে কি প্রিয় ছিল এ সহর তার কাছে। কদিন আগেও ছিল। প্রিয় আর রোমাঞ্চকর তারই জমজমাট গৌরব। ঢাকায় বসে সে কাগজে খবর পড়েছে আর খুশী হয়ে অনুভব করেছে তার নিজের চঞ্চল রক্তের তাপ। ছাত্র অভিযানের জয়, লাখ নাগরিকের মিলন-অভিযানের জয়, ধর্ম্মঘটের জয়, মিলিটারী অত্যাচার, পুড়িয়ে মারার জয়, জয়ের পর জয়। তারপর যে একটানা দীর্ঘ বীভৎসতায় মেতেছে কলকাতার লোক, তাও নরহরির কাছে সহরটিকে অপ্রিয় ঘৃণ্য করে তুলতে পারে নি। ক্ষোভে দুঃখে অভিমানে সে শুধু মুষড়ে গিয়েছে, কাতর হয়েছে।

আজ সে মনে প্রাণে ঘৃণা করে কলকাতাকে। এতদিন তার ধারণা ছিল যে, অন্ততপক্ষে নিজের নিজের সম্প্রদায়ের স্বার্থ নিয়ে মারামারি করে এ

সহরের হিন্দু-মুসলমানরা। তার সে ভুল ভেঙ্গে গেছে। এ সহরে হিন্দুও থাকে না, মুসলমানও থাকে না। এটা বজ্জাতদের আস্তানা!

সুমিত্রার বাপের বাড়ী পর্য্যন্ত হয় তো পৌঁছবে না, পথেই ঘায়েল হয়ে যাবে। সে আতঙ্ক আছে। কিন্তু যদি মরে, মরবে সে বিষাক্ত সাপের ছোবলে। কলকাতা সাপভোজী সাপের আস্তানা। হিন্দু সাপ মুসলমান সাপ বলে তো কিছু থাকতে পারে না, নিছক সাপ।

অতুলবাবুই অভ্যর্থনা করল জামাইকে, এসো বাবা এসো। ভয়ে ভাবনায় ছিলাম তারটা পেয়ে থেকে। বেয়ান ভাল আছেন? কবরেজের ওষুধ খেয়ে কমেছে একটু?

মা পুরী গেছেন ওমাসে।

ও:! তা ভাল আছেন তো? পুরীও নিরাপদ নয় মোটে। কাগজে যা পড়ছি বাবাজী, মাথা ঘুরে যায়। উড়িষ্যার ছোঁড়াগুলি নাকি দল বেঁধে বাঙ্গালী মেয়েদের ওপর অত্যাচার করছে।

মার বয়েস তো প্রায় সত্তর হল।

বড় শালা পরিমল বলল, ওনার ভয় নেই। কিন্তু যুবতী বাঙ্গালী মেয়ে তো অনেক আছে উড়িষ্যায়। এদিকে গুণ্ডারা থাবলা দিচ্ছে বাঙ্গালী মেয়ের ওপর, ওদিকে উড়িয়ারা অত্যাচার সুরু করেছে, কি বিপদ ভাবতো!

মেজ শালা শ্যামল বলল, দু'টো উড়িয়াকে আচ্ছা করে শিক্ষা দিয়েছি আজ, জন্মে ভুলবে না। মুড়ি মুড়কির দোকানের ওই অর্জ্জুন আর সতীশ বাবুর চাকরটাকে। সুধীনবাবুর ঝি আর অর্জ্জুনের বৌটাকে ছেলেরা ধরেছিল। তা আমরা ভেবে দেখলাম কি, যতই হোক আমরা শিক্ষিত ভদ্রলোক, মেয়েছেলের গায়ে হাত দেওয়া উচিত হবেনা। ভেবে চিন্তে ভাই ছেড়ে দিলাম। জানো নরহরি, ভদ্র হয়েই আমরা আজ বিপদে পড়েছি। ওদের মেয়েছেলের ওপর যদি অত্যাচার চালাতে পারতাম, ওরা ঠাণ্ডা হয়ে যেত।

নরহরির খিদে পেয়েছিল। বমিও পেতে থাকে।

আদর অভ্যর্থনা হয় নিখুঁত। বড়লোক নয় নরহরির শ্বশুর, অথচ ভেজিটেবিল ঘিয়ে ভাজা লুচির সঙ্গে সন্দেশ দেওয়া হয় তাকে জলখাবার। ঘরে তৈরী মিষ্টি ছানা নয়, দোকানের দামী সন্দেশ। খাবারের দোকান সব বন্ধ, তবু।

কার ছেলে কাঁদছে গলা ফাটিয়ে, তার বাচ্চাটার আওয়াজের মতই যেন মনে হয়। শালী সুষমা তাকে শান্ত করছে, চুপ, চুপ, শীগগির চুপ,—মুবলমান ধরে নেবে!

পাল্টা ছড়াও শুনেছে নরহরি চুপ, চুপ, শিখ আসছে।

তা দুমুখা ক্রিয়ার দু'মুখী প্রতিক্রিয়া হবেই।

অতুল সাবধান করে দেয়, কাজ না থাকলে বেরিয়ে কাজ নেই।

শ্যামল ব্যাখ্যা করে বলে, বেরোনো মানেই প্রাণ হাতে করে যাওয়া। এখানে হাঙ্গামা নেই, যেখানে যাবে সেখানেও নেই, কিন্তু যেতে হয়তো হবে এমন এলাকা দিয়ে—

মুস্কিল ওইখানে, পরিমল বলে সায় দিয়ে, কোন এলাকাটা সেফ, নয়, জানাটানা থাকলেও স্বয়ং খানিকটা—

নরহরির মুখ দেখে ছোট শালা অমল বলে, আচ্ছা, অত বলতে হবে না, জামাইবাবুর প্রাণের মায়া আছে। দরকার থাকলে বেরোবেন, যেদিক সেদিক ঘুরবেন না, ব্যাস্।

তুই তো বলেই খালাস—পরিমল চটে বলে জামাইবাবু জানবে কি করে? ব্যাটারা ট্রাম চালু রেখেছে চাদ্দিকে। নরহরির মনে হতে পারে না ট্রাম যখন চলছে এদিকে ভয় নেই? ব্যাটাদের এরিয়ায় ভুল করে ঢুকলে সঙ্গে সঙ্গে টেনে নামিয়ে—

ভুল করে তোমাদের এরিয়ায় ঢুকলে সন্দেশ খাইয়ে দাও না?

গম্ভীর হয়ে যায় বাপদাদাদের মুখ। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের মত ছোঁড়ার বিশ্রী গা-জ্বালানো কথাবার্ত্তা।

নরহরি সবিনয়ে বলে, বেরোবো আর কোথায়, দু'একটা জিনিষপত্র কেনা। কারো সাথে দেখা করার সময় হবে না। গোছগাছ করে দিনে দিনেই ষ্টেশনে চলে যাব সবাইকে নিয়ে।

সত্যি সুমিকে নিয়ে যাবে বলছ নাকি? পরিমল বলে।

চিঠি পান নি?

চিঠি তো পেয়েছি! মানে বাপু বুঝতে পারিনি চিঠির তোমার।

মাথা খারাপ না হলে কেউ—

থাক্, থাক্। অতুল বলে হবে'খন ওসব কথা। নেয়ে খেয়ে জিরিয়ে নাও, ওবেলা বসে পরামর্শ করা যাবে। আজ তোমাদের যাওয়া হয় না।

নেয়ে খেয়ে জিরিয়ে নাও, আমার মেয়ের সঙ্গে আগে বোঝাপড়া কর, মাথা তোমার ঠাণ্ডা

হোক, ওবেলা আমরা তোমায় ছেঁকে ধরব। এ রাজনীতি নরহরি জানে।

আরও ঠাণ্ডা হয়ে, আরও সবিনয়ে নরহরি বলে, আজকেই রওনা দিতে হবে। চিঠি লেখার সময় ভেবেছিলাম দু'একদিন থাকতে পারব। সে উপায় নেই। বোঝেন তো অবস্থা।

ট্রেনেও ঠিক করে নি আজকেই ফিরে যাবে। কাল থেকে পরশু রওনা দেবে ভাবা ছিল। রাজপথে সহরের সন্ত্রস্ত চেহারা, বাস থেকে ক্ষণকালের দেখা পাশের গলি থেকে বেরিয়ে আসা কতগুলি লোকের নির্ভয়ে নির্ব্বিকার চিত্তে একজন পথচারীকে, একক পথচারীকে কুৎসিৎ মৃত্যুদানের ঘটনা, এ বাড়ীর হিংস্র বদ্ধ আবহাওয়া, তার দম আটকে আনছে। পরম শুভাকাঙ্খী এই সব আত্মীয়কে মনে হচ্ছে শত্রু।

ব্যাপারটা কি বল তো? আলোচনা পিছিয়ে দেবার আশা ছেড়ে অতুল বলে, যে পারে পালিয়ে আসছে, যে না পারে সে অন্তত মেয়েছেলেকে সরিয়ে দিচ্ছে, আর তুমি বলছ সুমিকে নিয়ে যাবে।

যে পারে সেই পালিয়ে আসছে না। এমন ঢের লোক আছে যারা অনায়াসে চলে আসতে পারে, তারা ওখানে থাকা ঠিক করছে।

সে আর কদ্দিন থাকবে। শ্যামল হেসে বলে তোমার তাড়া-হুড়োটা পড়ল কিসে? টিঁকতে যদি ওরা দেয়, তখন নয় নিয়ে যেও সুমিকে, এখন কেন?

কাজ বজায় রাখার জন্য নিতে হচ্ছে। ওলটপালট হচ্ছে তো চারিদিকে, কতক লোক থাকবে, কতক নতুন লোক আসবে, কিছু লোকের কাজ যাবে। এঁদের না নিয়ে গেলে কাজটা যেতে পারে আমার।

সে কি।

তাই তো স্বাভাবিক। ঘরসংসার পেতে যারা আছে, যারা থাকতে চায়, তারা নিশ্চয় প্রেফারেন্স পাবে। আমি বৌ ছেলে পাঠিয়ে দেব কলকাতায়, পালাবার জন্য এক পা বাড়িয়ে থাকব, আমায় খাতির করবে কেন?

বলেছে নাকি? তোমার তো হিন্দু আপিস। হিন্দু হয়ে কর্ত্তা তোমায় একথা বলল?

নরহরি শ্রান্ত চোখে তাকায়।—কর্ত্তাকে তো থাকতে হবে ওখানে, ওদেশের লোক হয়ে? যখন খুসী ফেলে পালিয়ে আসার জন্য তৈরী থাকব, তবু কর্ত্তা আমায় পায়ে তেল দিয়ে রাখবে? যে পরিবার নিয়ে থাকবে বলে আছে, তাকে ছাড়াবে আমায় রেখে?

যায় যাবে অমন কাজ। শ্যামল বলে বীরের মত, চাকরীর জন্য বৌকে অমন বিপদের মধ্যে নেওয়া যায় না। অল্পবয়সী মেয়ে বৌ একটিকে ওরা ছাড়বে না।

কয়েক লাখ অল্পবয়সী মেয়ে বৌকে ওখানে থাকতেই হবে শ্যামল। তোমার বোন যদি যান, আর একটি মোটে বাড়বে।

ওসব কথা রাখো, বিচক্ষণ অতুল বলে, ভয় তো আছে। কাজ যদি যায় অগত্যা যাবে, উপায় কি। কলকাতায় চলে আসবে, একটা কিছু খুঁজে পেতে নেবে।

ঘরবাড়ী ফেলে চলে আসব? আপনাদের তো হাজার হাজার লোকের চাকরী যাচ্ছে, চাকরী দেবে কে আমায়?

সে যা হয় হবে, উপায় কি। তাই বলে—

আপনি তো বলে খালাস্।

সুমির মত অনেককেই যে থাকতে হবে পূর্ব্ববঙ্গে ছড়িয়ে, এ কথাটা গায়েও মাখল না কেউ, তুচ্ছ হয়ে উড়ে গেল। বোধ হয় ধারণায় আসে না। অন্য সকলের যা হয় হোক, এর মেয়ে আর ওদের বোন সুমিত্রা নিরাপদ থাকলেই হল। সুমিত্রা তার বৌও বটে, শত শত বৌয়ের কি হবে না হবে একথাটা সে কেন টেনে আনছে তার নিজের বৌয়ের প্রসঙ্গে, বুঝে উঠতে পারছে না এরা। একটু স্তম্ভিত হয়ে গেছে তার কথাবার্ত্তায়।

তোমার মতলব ভাল নয় নরহরি, শ্যামল সক্রোধে বলে, স্ত্রীকে ঘুষ দিয়ে তুমি চাকরী রাখতে চাও।

অতুল অতি কষ্টে বিবাদ সামলায় স্ত্রীর সাহায্য পেয়ে, সৌভাগ্যক্রমে চড়া গলার আওয়াজ পেয়েই নরহরির শাশুড়ী হলুদলঙ্কা মাখা হাতেই ছুটে এসেছিল। মেয়েরা উঁকি ঝুঁকি মারছিল দরজার আশেপাশে, আলোচনার গুরুত্ব বুঝে সাহস করে ঘরে ঢোকে নি, এবার ঘরে ঢুকেও তফাতে দাঁড়িয়ে এবং বসে রইল। সুমিত্রা ঝনাৎ ঝনাৎ চাবির রিঙের আওয়াজ করল তিনচারবার পিঠে আছড়ে আছড়ে।

তবু, গুম খেয়ে যাবার আগে নরহরি ঘোষণা করল, হাজার হাজার স্ত্রীর যদি বিপদ থাকে, আমার স্ত্রীরও থাকবে।

চুপ করে থাকা উচিত জেনে পরিমলও তবু বলে, পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা যে ডুমড়, এতো জানা কথাই।

গুম খেয়ে যাবে ঠিক করেও নরহরি বলে, আমরা যদি ডুমড় হই, আপনাদের জন্য হব। আপনারাই আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু।

অমল আগাগোড়া চুপ করে ছিল। সে মুখ খুললেই দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের কথার চেয়ে তার কথায় বেশী জালা ধরে বাড়ীর লোকের গায়ে।

পার্কসার্কসের আমার একটি চেনা লোক বলছিল, এবার সে ধীরে ধীরে বলে এবং এমনই আশ্চর্য্য যে তার কথা শেষ পর্য্যন্ত শুনলে গায়ে জালা ধরবে জেনেও সবাই যেন ধৈর্য্য ধরে মন দিয়ে তার কথা শোনে,—এ্যাদ্দিন হিন্দুদের শত্রু ভাবতাম, এবার দেখছি আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রের জাতভাইরাই আমাদের দফা সারবে।

তুই চুপ কর। কথা শোনার পর অতুল তাকে ধমকায়।

সুমিত্রা সুমিষ্টই আছে। অনেকদিন দেখা না হওয়ায় সে মিষ্টতা ঘন হয়ে প্রায় দানা বেঁধেছে। আজ রবিবার, আপিসের তাড়া নেই, রাঁধা বাড়া খাওয়াদাওয়া ঢিমে তালে চলেছে। আজকের গাড়ীতেই সুমিত্রাকে নিয়ে নরহরি রওনা দিলে অবশ্য একটা তাড়াহুড়োর প্রয়োজন ছিল, কিন্তু বাড়ীর লোক জানে শেষ পর্য্যন্ত নরহরিকে পাগলামি ছাড়তেই হবে, সুমিত্রাকে সে রেখেই যাবে এখানে এবং দু'একটা দিন সে নিজে এখানে থাকবে। তবু, সংশয় আছে সবার মনে। মুখে যাই বলুক, মনে মনে সবাই জানে সমস্যা সহজ নয়, মোটেই তারা আয়ত্ত করতে পারেনি সমস্যার আগামাথা। নরহরি যেমন হোক একটা সিদ্ধান্ত করেছে। হৃদয়াবেগ যথাসম্ভব বাদ দিয়ে নিজের ভালমন্দ হিসাব করেই সিদ্ধান্ত করেছে। সহজ হবেনা ওকে টলানো।

চিরদিন একটু জেদি আর একগুঁয়েও বটে সে —বাঙাল তো। সেবার ওর বড়খোকার চিকিৎসা করছিল এ পরিবারের বিশ্বস্ত কবিরাজ, ও সবার মত উড়িয়ে দিয়ে সোজা গিয়ে ডেকে এনেছিল চারটাকা ভিজিটের এলোপ্যাথি ডাক্তার—শ্বশুর-বাড়ীতে পা দেবার দু'ঘণ্টার মধ্যে।

বলেছিল, আমার ছেলে যদি মরে, আমি যে চিকিৎসায় বিশ্বাস করি, সেই চিকিৎসায় মরুক।

কি কাটা কাটা কথা। ছেলেটা অবশ্য বেঁচে গেছে ভগবানের দয়ায়, কিন্তু ভগবান না করুন কিছু যদি ভালমন্দ হত ছেলেটার, আজ কোথায় মুখ থাকত নরহরির? কী আপশোষটাই তাকে করতে হত গুরুজনের কথা না শোনার জন্য, গুরুজনকে অবজ্ঞা করার জন্য।

তাই, তাড়া না থাকলেও বারোটার মধ্যে খাইয়ে দেওয়া হল নরহরিকে। ঘর ও বিছানা দেওয়া হল শুতে। একটার মধ্যে সুমিত্রা ঘরে গেল। তার ছেলেটা ও বাচ্চা মেয়েটা জিম্মা রইল দিদি ও বৌদিদিদের হেফাজতে।

ঘণ্টাখানেক জীবনমরণ সমস্যার কথা না ওঠাই উচিত ছিল তাদের মধ্যে, কিন্তু সুমিত্রা ভাবল কি, বিরহে একেবারে চরমে চড়ে আছে মানুষটা, খাঁ খাঁ করছে, গুরুতর ব্যাপারটার মীমাংসার এ সুবিধাটুকু না ছাড়াই ভাল। আগে বোঝাপড়া হোক, নরহরি স্বীকার করুক এখনকার মত বাপের বাড়ীতেই সে তাকে রাখবে, তারপর হাসিমুখে নিজেকে সে সঁপে দেবে। ব্যাকুল হয়ে পাগল হয়ে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়বে বুকে। ব্যাকুল সেও কি হয়নি? কিন্তু মাথাগরম পুরুষমানুষের পাগলামি সামলে চলতে একটু সংযত না হলে চলবে কেন মেয়েমানুষের!

এসেই ঝগড়া সুরু করলে? বেশ তুমি। পান চিবানো বন্ধ রেখে পানরাঙা ঠোঁটে হাসে সুমিত্রা, একটু বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে আধভেজা চুল শুকনো তোয়ালেয় ঝাড়বার আয়োজন করে।

আমি ঝগড়া করলাম? আশ্চর্য্য হয়ে বলে নরহরি, চিঠি লিখে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে তোমায় নিতে এলাম, এখন বলছেন যেতে দেবেন না। তোমায় আমি যেখানে খুসী নিয়ে যাই, তাতে ওদের কি?

মনে মনে একটু চটে যায় বৈ কি সুমিত্রা।

ওরা আমার বাপ মা ভাই বোন যে গো। ভাবনা হবে না?

হুঁ। আমি তোমার কেউ নই।

বাঃ বাঃ, কি যে বলে। তোমার হাতে সঁপে দিলেন আমায়, তুমি বুঝি রাস্তার লোক? বাপভাই বুঝি রাস্তার লোককে ঘরে ডেকে শুতে দেয়? আমি বুঝি রাস্তার লোকের—

জমে না, সুবিধা হয় না। অনেক হিংসা অনেক বিবাদ, অনেক ভয়ঙ্কর মৃত্যুর বাস্তবতা সব যেন ওলটপালট করে দিয়েছে, খিল দেওয়া ঘরের নির্জ্জন নিরিবিলি মাধুর্য্যের ভূমিকা পর্য্যন্ত ভারাক্রান্ত হয়েছে কোটি জীবনের গুরুভার সমস্যায়।

আমি তো আজকেই যাব ভাবছিলাম।

আমাকে নিয়ে?

তবে কি? তোমাকে নিতেই তো এলাম।

ক্রমে কলহ এবং কান্না। এসব আগে হয়েছে অনেক, আজ যেন কী বিষে বিষাক্ত করেছে কলহ কান্নাকে। এ অস্ত্রও তেমন ফলপ্রদ নয় দেখে আবার মিষ্টি হয়ে উঠে নরহরির বুক আশ্রয় করল সুমিত্রা। তাদের স্বামীস্ত্রীর ভালবাসা কত নি বড়, কত ঘাতসহ হয়েছে সন্তানের পিতামাতার ভালবাসা হয়ে। তবু যেন ফাটল ধরল, ভেঙ্গে যাবার উপক্রম করল আজকের আঘাতে।

তুমি যদি বলো, নরহরি যেন দেশরক্ষার প্রতিজ্ঞা নেবার মত করে বলল, আজ না গিয়ে পরশু যেতে রাজী আছি। কিন্তু তোমায় যে হবে।

আমি মরতে যেতে পারব না।

আমি যে মরব?

সুমিত্রা চুপ করে থাকে।

এ ছেলেখেলা নয়, নরহরি বলে, রাগ অভিমানের কথা নয়। যদি না যাও আমার সঙ্গে এখন, বাকী জীবনটা বাপের বাড়ীতেই কাটাতে হবে তোমায়—বিধবার মত।

আমায় নয় মেরে ফেল তুমি।—আর্তনাদ করে ওঠে সুমিত্রা, রাত বিরেতে কে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে আমাকে, যা খুশী করবে আমায় নিয়ে, তার চেয়ে তুমিই আমায় মেরে ফেল নিজের হাতে!

শ্রান্ত ক্লান্ত চোখে চেয়ে থাকে নরহরি। বিষণ্ণ বিপন্ন ভাবে। কোথায় যেন ছোট একটা ছেলে কাঁদছে। এ বাড়ীতেই বোধ হয়, তার ছেলেটার মত গলা। অন্যের কাছে থাকতে না চেয়ে মার জন্যই বোধ হয় কাঁদছে।

ষ্টেশন রোড

শহরের বাজার অঞ্চলের রাস্তা থেকে যেন খানিকটা মাইল তুলে এনে যেন বসিয়ে দেওয়া হয়েছে একটা মাথা ষ্টেশনে ঠেকিয়ে। ফাঁকা মাঠ আর ক্ষেতের মধ্যে দু'মাইল দূরের শহরটার এক টুকরো একটা খাস্তা নমুনার মত। দু'মাইল দূরেও শুধু আরম্ভ শহরের, ফাঁকা মাঠ পেরিয়ে ষ্টেশন রোড সেখানে আপিস আদালত এলাকায় পৌঁছে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে গেছে এদিক ওদিক। ষ্টেশনের কাছের নমুনাটা শহরের মাঝামাঝি অঞ্চলের, যেখানে দোকানপাট বাজার হাট।

ষ্টেশন ঘেঁষে ষ্টেশন রোডের এই নোংরা ঘিঞ্জি সমৃদ্ধির সেটাই আসল কারণ। চারিদিকে ছড়িয়ে পাতা আছে আইনী মামলার জাল, এ শহরটা তার জেলা-কেন্দ্র। প্রতিদিন বহুলোক আসে চারিদিক থেকে, ট্রেনে এবং বাসে, পায়ে হেঁটে প্রদেশে থেকে প্রদেশে টানা সুদীর্ঘ সরকারী পথটা দিয়ে বাস চলাচল করে মহকুমা থেকে মহকুমা শহরে, লাইনের ওপারে ষ্টেশন। সামনে দাঁড়িয়ে জল নিয়ে জিরিয়ে আবার রওনা দেয়। বাসের যাত্রীদেরও শহরে যাবার পথ এই ষ্টেশন রোড। মামলা ছাড়া নানা কাজে অকাজেও মানুষ শহরে আসে। ফেরার তাগিদে অনেকে সময় পায় না শহরের অতদূর বাজারে গিয়ে কেনাকাটা করতে। এমন মানুষও থাকে অনেক যারা কেনাকাটার কথা ভুলে থাকে সামনে দোকান পাট নজরে পড়া পর্য্যন্ত। দোকান দেখে আচমকা কিছু কেনার সখও জাগে কারো কারো, সঙ্গের পয়সার কামড়ানিতে। তা ছাড়া প্রতিদিনই থাকে কম বেশী একদল অসময়ের যাত্রী, একটা ট্রেন আসে রাত সাড়ে বারোটায়, আরেকটা তিনটেয়। ভোর পাঁচটায় বাস ছাড়ে একটা। এসব যাত্রীরাও তো বসবে খাবে শোবে ঘুমোবে জিনিস কিনবে, দরকারী বা সখের। কেউ নেশাও চাইবে, কেউ মেয়েলোক। শ্রান্ত ক্লান্ত মর্মাহত দিশেহারা গেঁয়ো চাষী অন্তত এক ভাঁড় চা তো চাইবে মরিয়া হয়ে। তা ছাড়া, লাইনেরই ওপারে আছে কয়েকটা শাল কাঠ আর শালপাতা চালানের কারখানা গুদাম। এ জেলায় এ ব্যবসাটা খুব ফলাও। মালিকেরা এবং বাবুরা শহর থেকে গাড়ী

সাইকেলে যাতায়াত করেন। যারা খাটে, তারা পাশেই থাকে বেশীর ভাগ। শহরের বাজার অনেক দূর হয় তাদের পক্ষে।

শহরের খাস বাজারের প্রায় সব কিছু কেনা-বেচার ব্যবস্থাই তাই আছে ষ্টেশন রোডের এই ছোট্ট নকল শহরে, বড় বড় দালান আড়ত আর দোকান ছাড়া। পান বিড়ি সিগারেট, চা সরবৎ, মিষ্টান্ন, চিড়া-মুড়ি, পবিত্র হিন্দু হোটেল, সামসুদ্দীনের নামহীন খানাপিনা বাস বসতের আস্তানা, মুদী আর মনোহারী, পবিত্র হোটেলটার পিছনে লাইসেন্স-প্রাপ্ত করালীচরণের দেশী মদ, মুকুন্দের কাচ এনামেল এলুমিনিয়মের বাসন, রসিক সা'র জামা কাপড় চাদর গামছা, মুকুন্দ ও রসিকের দোকানের মাঝ-খানের তিন হাত ফাঁক দিয়ে গিয়ে পিছনের ন্যাড়া বটগাছটার তলে সকালে বিকালে মাছ তরকারী, কয়েকটা টিনের চালাঘরে দেহ বেচা স্ত্রীলোক, ঘনশ্যামের চপ কাটলেট বেচা 'বাবুজ্‌ রেষ্টুয়ারেন,' কানাই কম্পাউণ্ডারের নিউ কিউর ডিসপেন্-সারী, ধীরেন কবিরাজের মহামায়া ঔষধালয়, তরফদারের জলচিকিৎসা ও হোমিওপ্যাথি,—কি নেই!

পাল্লায় অবশ্য হার মানে শহরের সঙ্গে ষ্টেশন রোড, সে কথা বলাই বাহুল্য, শহরের বাজারে আসল কারবার পয়সাওয়ালাদের, এখানে মাতব্বরী গেঁয়ো চাষী আর কাঠকাটা পাতা-বোনা খাটুয়ের, দোকানের চাকর মুন্সী পান-বিড়িওলার, দু-একজন ইঞ্জিনের ড্রাইভার ও খালাসীর, টিকিটবাবু ও কুলীদের। তবু আরেক পাল্লায় পুষিয়ে নেয়। যতই ধুমধাম সমারোহ থাক শান্ত রাত্রে শহরের বাজার এলাকায়, ষ্টেশন রোডের এ জিনিস নেই, এমন জীবন্ত বৈচিত্র্য। দিনের শেষে ষ্টেশন রোড ঘুমের দেশে যায় না, কর্মব্যস্ততার অবসানে শুরু করে অবসর যাপন, আত্মপ্রকাশ, চেনা অচেনা প্রাণের যোগাযোগ। শহর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেন স্বকীয়তায় প্রতিষ্ঠিত হয়। নিত্য নতুন মানুষ এসে ঠেকে যায় এখানে রাত্রির জন্য। যাত্রার দল, কবিওয়ালা, সাধু বৈষ্ণব ফকির। মাঝে মাঝে অনেক রাতে জমে ওঠে বাছা বাছা পালার বাছা বাছা গানওয়ালা অংশ, কবি গাওন, একতারা বা তিনতারার সাথে গান, ছড়া বা পাঁচালি। গণেশ অপেরা যাবে পাটসাহীর জমিদারবাবুর মেয়ের বিয়েতে দুরাত্রি পালা গাইতে, ভোর ভোর রওনা দেবে গরুর গাড়ীতে, রাতটা কাটাবে এখানে। ষ্টেশন রোডের মানুষরা খুশি। খাওয়া শোয়ার খাসা ব্যবস্থা করে দেয় সবাই মিলে চাঁদা ক'রে।

গানটান শোনাও দু-চারখানা?

অধিকারী দিনকাল বোঝে, হালচাল জানে। খুদিরামের ফাঁসির কালেও বুঝত, হরিশ্চন্দ্রের পালায় ঢুকিয়ে দিত ফাঁসির গান, আজ আরও বেশী বোঝে। পুরাণ আছে, রাধাকৃষ্ণের বিরহ প্রেমও আছে, কিন্তু আরও বেশী করে ফলাও হয়ে বজায় আছে ওই ফাঁসির গানের ধারা। সে বলে, মতি? এই ছোঁড়া শুনছিস? সেই গানটা শোনা দিকি। পয়সা না পাই পুণ্যি আছে। ইষ্টিসানে রাত কাটাতে এত আদর এত দরদ বাপের জন্মে পেইছিস শালা কোথাও? গা ব্যাটা, গা। প্রাণ খুলে গা।

নিজে সুর করে গেয়ে অধিকারী ধরিয়ে দেয়—

রোদে জলে খাটি খাটি
আপন দেহ করে মাটি,
মাগো মাটি সোনা খ'টি
তোমার বুকে ফসল ফলায়।
রক্ত মাসের সার দিয়ে মা,
গরীব চাষী ফসল ফলায়॥
ইংরেজ রাজার ছানা
জোত জমিদার দৈত্য দানা
সেই ফসলে দিয়ে হানা,
চাষীর মাথায় ডাণ্ডা চালায়।
পুলিশ চালায় গুলি মাগো,
পাক পিয়াদা ডাণ্ডা চালায়॥

বাইরের গাইয়ে মানুষ বা দল কেউ না থাকলে নিজেরাই আসর জমায়, গান হয় পুরানো হারমোনিয়ম বাজিয়ে। সামসুদ্দীন আর ময়রা-দোকানের বনমালী গাইতে জানে। সামসুদ্দীনের জবর গলা, সে গান ধরলে চারদিক গম গম করতে থাকে। বিনা আহ্বানে বিনা আয়োজনে মাঝে মাঝে জমায়েত হয় অন্য রকম, টিকিটবাবু, মনোহর বা নিতাই কম্পাউণ্ডার ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনর্গল কথকতা করে যায়, চারিদিক থেকে বাঘ কুমীর কেউটের মত দাঁত খিঁচিয়ে ফোঁসফোঁসিয়ে মরণ কি ভাবে করছে তার চরম অভিযান আর চিরদিনের মৃত্যুমুখী জীবন কি ভাবে লড়ছে তাদের দাঁত ভাঙতে, ফোঁসফোঁসানি থামাতে। সব চেয়ে জমে এই জমায়েত। দুরকম ভাবে জমে দু'জনের এই কথকতায়। মনোহরের গুরুগম্ভীর বর্ণনায় গা ছম ছম করে, শ্রোতার কথার আবেগে উত্তাল হয়ে ওঠে হৃদয়, তীব্রতায় আগুন ধরে যায় রক্তে, দাঁতে দাঁতে

চেপে হাত মুঠো করে ফেলে অনেকে। নিতাই আবার অন্যরকম, সে থেকে থেকে সকলকে হাসায়, বুকে জ্বালা ধরিয়ে শুধু মুখে হাসায়। আগাগোড়া তার কথা ও সুর হয় ব্যঙ্গ বিদ্রূপ হাসিতামাসায় কিন্তু তারই ঝাঁঝে ঝাঁতে যেন ছ্যাঁকা লাগে সকলের। তারা হাসে যেন সায় দিয়ে যে ঠিক ঠিক, ওসব দলন পেষণ নিছক রসিকতা প্রজার সাথে রাজার, গরীবের সাথে বড়লোকের, আমরাও বুঝি ও রসিকতা, আমরাও জানি রসিকতা করতে!

কিছুই ওলোটপালোট করতে পারে না ষ্টেশন রোডের নৈশ জীবনের স্বকীয়তা। চেষ্টা করে কেউ এটা গড়ে তোলে নি, বিপর্যয় বিক্ষোভ নির্যাতন মন্বন্তরের মধ্যে আপনা থেকে সৃষ্টি হয়ে গেছে এখানকার পথাশ্রয়ী জীবনের এই আত্মপ্রকাশের ভঙ্গিটা। দীর্ঘ ব্যবধানে মাঝে মাঝে জোরে নাড়া খেয়েছে, যার মধ্যে সব চেয়ে জোরালো ছিল একুশ আর ত্রিশ সালের সেই আলোড়ন, বিশ পঁচিশ হাজার মানুষ যখন এখানে ভীড় করত নেতাকে দর্শন করতে, অভ্যর্থনা করে শহরে নিয়ে যেতে! দুবার গভীর রাত্রে আর একবার ভোরে পুলিশ আচমকা ঘিরে ফেলেছে ষ্টেশন আর ষ্টেশন রোড,—সন্ত্রাসী যুগের বিপ্লবী ধরতে। তিনবারই শিকার ফসকে যাওয়ায় তন্ন তন্ন খুঁজে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেছে ষ্টেশন রোডের আনাচ কানাচ। আবার ঝিমিয়ে শান্ত হয়ে একভাবে চলতে শুরু করেছে জীবন, প্ল্যাটফর্মের কাঁকরে পথের ধুলায় যাত্রীর পদক্ষেপ, গাড়োয়ানের সঙ্গে ভাড়া নিয়ে ঝগড়া, দোকানে দোকানে দরাদরি কেনাবেচা, হোটেলের সামনে কুকুরের কামড়াকামড়ি, অপরাহ্নে শ্রান্ত অবসন্ন যাত্রীর প্রত্যাবর্তন, সন্ধ্যার পর নকল করা সদর বাজারের মাতালের হল্লা, স্ত্রীলোকের চিৎকার, একে একে বন্ধ করা দোকানের ঝাঁপ কপাট, ষ্টেশনের পাকা মেঝেতে আর হোটেলে তক্তপোষের মাদুর চাদর জড়িয়ে যাত্রীদের শুয়ে বসে ঝিমিয়ে আসা, তার মধ্যে এখানে ওখানে ছাড়া ছাড়া ভাবে কয়েকজনের জেগে থাকা তাস জুয়া খেলে অশ্লীল গান গেয়ে। সাড়ে বারোটার গাড়ীর যাত্রী জানালায় কপাল কুটে টিকিট-বাবুকে জাগিয়ে শেষ মুহূর্তে টিকিট পায়, গাড়ী থেকে যাত্রী নেমে দেখতে পায় একটু যে সাড়া জাগিয়েছিল ষ্টেশনে গাড়ীটা এসে, গাড়ী চলে যাবার পর দেখতে দেখতে তা ঝিমিয়ে গেল। সে সব বদলে দিয়ে গেছে গত বছরগুলি। আলোহীন অন্ধকার ষ্টেশন রোডে দূর গাঁয়ের যাত্রী তার গাঁয়ের স্বাধীন হবার কাহিনী বয়ে নিয়ে এসেছে, সঙ্গীন বুলেটের বেড়াজালে ঘেরা গাঁয়ের পুড়ে ছাই হবার বিবরণ। আহত শোকাতুর সর্বস্বান্ত মানুষ ছিটকে এসে আছড়ে পড়ে গুমরে গুমরে কেঁদেছে এখানে, অভিশাপ দিয়ে দিয়ে ফুঁসছে। ভীড় করে এসেছে খাদ্যের সন্ধানে বুভুক্ষু নরনারী, ষ্টেশনে ষ্টেশন-রোডে মাথা গুঁজে মরেছে। ওদের খিচুড়ি দিয়ে ওষুধ দিয়ে বাঁচাতে এসেছে একদল ছেলেমেয়ে, ষ্টেশন রোড চেয়ে চেয়ে দেখেছে কতটুকু উপকরণ নিয়ে ওদের কতবড় অসম্ভবকে সম্ভব করার প্রাণপণ চেষ্টা! লাইনের ওপারে বাস চলার পথ ধরে হাজার অর্ধ-উলঙ্গ মানুষের শোভাযাত্রা এসে এই ষ্টেশন রোড বেয়ে এগিয়ে গেছে ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলো ঘেরাও করে বস্ত্রের প্রতিশ্রুতি আদায় করতে। পাটগড়ের চাষী-বিদ্রোহের নমুনা স্বরূপ চালান এসেছে এগারটি আহত ও পাঁচটি মৃতদেহ, রাত সাড়ে বারোটা থেকে বেলা দশটা পর্য্যন্ত প্ল্যাটফর্মে পাশাপাশি শুয়ে থেকেছে শহরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থার অভাবে। এখানকার বলাই দেখে এসেছে কলকাতার ছাত্রদের শুধু হাতে গুলির বাধা ভেদ করে এগোনো। এই সেদিন সামসুদ্দীন দেখে এসেছে উনত্রিশে জুলাই সারা কলকাতার হরতাল, কাক চিলটি পর্য্যন্ত আকাশে ওড়েনি!

চারিদিকের মানুষের পদার্পণ ঘটে ষ্টেশন-রোডে। চারিদিকের আলোড়ন এখানে ঢেউ তোলে।

নিতাই ছিল শহরে সুরেশ ডাক্তারের মস্ত ডাক্তারখানায় কম্পাউণ্ডার সেলসম্যান। বড় দরকারটার সময় ডাক্তারখানার আলমারী থেকে আড়ালে চলে গিয়েছিল দরকারী ওষুধের মোটা ষ্টক। ওষুধের অভাবে মানুষ মরছিল ষ্টেশন রোডের রিলিফ হাসপাতালে। একদিন হঠাৎ উধাও হয়ে যায় সুরেশ ডাক্তারের চোরা বিক্রীর হিসাবে অন্ততঃ দশ হাজার টাকার সেই ওষুধ—সারা শহরে পোষ্টার দেখা দেয় সুরেশ ডাক্তারের বদান্যতার, ষ্টেশন রোডের রিলিফ হাসপাতালে তিনি এগার-শো টাকার ওষুধ দান করেছেন, নিজের কম্পাউণ্ডারকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য পুরা বেতনে ছুটি দিয়াছেন রিলিফ হাসপাতালে কাজ করার জন্য! সুরেশ ডাক্তারের দু-পাটি দাঁতই বাঁধানো, নিজের হাত পা কামড়ে নতুন দাঁত কিনতে হয়েছিল কিনা জানা যায় না।

সে ওষুধ শেষ হয়ে গেছে কবে। রিলিফ হাসপাতালও উঠে গেছে। এখানে ছোট ডিস্পেনসারিটি খুলে বসেছে নিতাই, বিক্রী খুব, কিছু খয়রাতও যায়।

মনোহর বলে নিতাইকে, এ বদনাম তোমার ঘুচল না, সুরেশ ডাক্তারের দানের ওষুধ গাপ করে দোকান দিয়েছ। সাহদা উকিল টিকিট কাটতে কাটতে বলছিল কি বেশ তো উন্নতি হয়েছে নিতাইয়ের ডাক্তারখানার, এ যুগে চোরেরি কপাল খোলে।

চোর আর বাটপাড়ের, নিতাই হাসে, বদনাম ঘুচবে কি, আজও কি ভুলতে পেরেছে ডাক্তারবাবু গায়ের জ্বালা? এখনো বলে বেড়ায়। মেয়ে চোরকে মাফ করেছে, আমায় ভুলতে পারে!

নিতাই-এর জায়গায় নতুন যে কম্পাউণ্ডার এসেছিল, সুরেশ ডাক্তারের একটি মেয়ে তার সঙ্গে পালিয়েছিল পিরীতের স্বাধীনতা প্রকাশ করতে।

সামসুদ্দীন খবর জানতে আসে, গাড়ী লেট হবে নাকি?

বেশী না, আধ ঘণ্টা।

কলকাতার গাড়ীর জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে কয়েকদিন ধরে সকলেই। টাটকা খবর পাওয়া যাবে সেখানে অবস্থা কি রকম।

নিতাই বলে, খপর আর কি, সেই খুনোখুনি। বাবা এস্পায়ারের সেকেণ্ড সিটি, আগে স্বাধীনতা না বাগালে মান থাকে?

ইস্—আফশোষ করে মনোহর, সব ভেস্তে যাবে।

খোদা নারাজ, জানা গেল খোদা নারাজ! সামসুদ্দীন সায় দেয়।

গাড়ী আসে, অনেক গুজব ও টাটকা খবর নিয়ে। খবর শুনে ম্লান হয়ে যায় উৎসুক মুখগুলি, উদ্বেগের দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে।

গাড়ী ছেড়ে যাবার পর মনোহর ব্যস্তভাবে বেরিয়ে আসে। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে বলে, পদ্মলোচনকে নামতে দেখলাম মেয়ে নিয়ে।

চলে গেল নাকি?

ওই যে হোথা।

একপাশে ঝুলিঝোলা ঠিকঠাক করে পদ্মলোচন তারের যন্ত্রটার কাপড়ের ওয়াড় খুলছিল। বেঁটে খাটো এস্রাজের মত আকার যন্ত্রটার। সরু মোটা দুটি মোটে তার, মীড় বাঁধা নেই, বেহালার মত ছড় টেনে বাজাতে হয়। এগার বারো বছরের মেয়েকে সাথে নিয়ে পদ্মলোচন এই যন্ত্র বাজিয়ে গান গেয়ে ভিক্ষা করে বেড়ায় স্থান থেকে স্থানান্তরে। মেয়েটির গলা আশ্চর্য্যরকম মিষ্টি! পদ্মলোচনের মোটা গলা আর তারের মিহি বাজনার সঙ্গে সুর মিলিয়ে তার চিকন কচি গলার গান আবেশ ও আরাম এনে দেয় কানে। লোকে দাঁড়িয়ে গান শোনে তাদের, যেচে পয়সা দেয়। রোজগার মন্দ হয় না। আগে তারা দুবার ষ্টেশন-রোডের নৈশ আসরে গান গেয়ে গেছে।

চললে নাকি? মনোহর বলে, থেকে যাও না আজ? চাঁদা তুলে দেব।

আজ না বাবু, পদ্মলোচন বলে সবিনয়ে, ফেরার দিন থেকে শুনিয়ে যাব। শহরে চলি আজ। হাঙ্গামা নেই তো বাবু শহরে?

না। হাঙ্গামা কিসের?

খুব জোরের সঙ্গে ভরসা দিয়ে বলতে পারে না মনোহর যে কিছু হবে না। চারিদিকে গুজব আর উস্কানি। এসে ছুঁয়েছে ষ্টেশন-রোডকেও, আমল পায় নি। এসেছে শহর থেকে।

এ শহরে এলে পদ্মলোচন অন্তত আট-দশ দিন কাটিয়ে যায়। কিন্তু পরদিন বেলাবেলি সে ফিরে আসে ষ্টেশনে মেয়ের হাত ধরে হন্তদন্ত হয়ে। ছোটখাট একটা হাঙ্গামা বেধেছিল বাজার এলাকায় সামান্য একটা উপলক্ষ নিয়ে, গুজবে ফেঁপে সেটা চারদিকে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। অনিশ্চিত ভয় ও অবিশ্বাস ছায়ার মত আগে থেকেই ভেসে বেড়াচ্ছিল বাতাসে। হাঙ্গামা শেষ হয়ে গিয়েছিল অল্পেই। গুজবও ফেঁসে যেত আপনা থেকে বাস্তব না পেয়ে, আতঙ্কও অনিশ্চিত হাল্কা ছায়ার মত শুধু বাতাসেই ঘুরে বেড়াত। একশো চুয়াল্লিশ আর সাঁজবাতি জারি হওয়ায় গুজব আর আতঙ্ক দুটোই সত্য হয়ে উঠেছে। খাদ্য ও বস্ত্র কমিটির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানবার উদ্দেশ্যে বড় একটা সভা ও শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল আজ, সেটা বাতিল হয়ে গেল।

পদ্মলোচন একা নয়, অসময়ে ষ্টেশন আর ষ্টেশন-রোড ভরে যায় সাড়ে পাঁচটা ও সওয়া সাতটার গাড়ীর যাত্রীর ভীড়ে। অবসাদের ছাপ নেই, শুধু ভয় ও ভ্রান্তির বিহ্বলতা। আপশোস ও বিরক্তি। গাঁয়ের মানুষ গাঁয়ে ফিরে যেতে ব্যাকুল। এ জেলার মফস্বল অঞ্চলে কোন কোন গাঁয়ে সাম্প্রদায়িক কলহের সুদূর সম্ভাবনাও নেই, এক সাথে গাঁয়ের লোক অন্য এক ভয়ঙ্কর লড়াই

পড়েছে, এত সহজে তার স্মৃতি ভুলবার নয়, অনেক ভিটেতে ছাই সরিয়ে আজও ঘর ওঠে নি। এই শহরকে শুধু খানিকটা উর্বরা করেছে রাজনৈতিক আবর্জনার পচা সার, আত্মহত্যার বিষের চারা যাতে গজাতে পারে, বৃক্ষ হয়ে উঠবার আগেই শুকিয়ে মরে যাবার সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে।

টিকিট? মনোহর বলে প্রায় ধমক দিয়ে, টিকিট কেন পদ্মলোচন? ফেরায় দিন গেয়ে যাবে কথা দিয়েছিলে!

কিন্তু টিকিটবাবু—.

ভয় নেই। ষ্টেশনে থাকবে। পাঁচ টাকা চাঁদা তুলে দেব। অমৃত আর সামসুদ্দীন ঘুরছিল চারিদিকে যাত্রীদের মধ্যে, তারাও পদ্মলোচনকে ভরসা দিয়ে বলে, ষ্টেশনে ভয় কি তোমার?

সওয়া সাতটার গাড়ী চলে যাবার পর ষ্টেশন প্রায় ফাঁকা হয়ে আসে, পড়ে থাকে শুধু দশটা আর সাড়ে বারোটার গাড়ীর কিছু যাত্রী। দুটি ভদ্র পরিবার ওয়েটিং রুমে আশ্রয় নিয়েছে। সকলের আগেই এরা দু-একটা ব্যাগ পুঁটলি স্যুটকেশ নিয়ে দিশেহারা অবস্থায় ষ্টেশনে ছুটে এসেছিল প্রথম যে গাড়ী পাবে তাতেই পশ্চিমে রওনা দেবে বলে। এখানে এসে একটু ধাতস্থ হয়েছে। উকিল সারদাবাবুর ভাই বরদা এককালে মনোহরের ক্লাশফ্রেণ্ড ছিল। মনোহরের সঙ্গে কথা বলে ফিরে গিয়ে বরদা নিজের ও অন্য পরিবারের লোকগুলির সঙ্গে কথা বলার পর বিশেষভাবে দিশেহারা ভাবটা কেটেছে তাদের। মালপত্র ছাড়া বিদেশে গেলে সত্যই বড় কষ্ট হবে, খালি বাড়ীতে জিনিস পত্রও তছনছ হয়ে যাবে হয়তো। ষ্টেশনে ভয় নেই। একটু দেখা ভাল। কাল গাড়ীতে উঠলেই হবে দরকার যদি হয়।

ষ্টেশন ও ষ্টেশন-রোডে সশস্ত্র পুলিশ পাহারা এসে গিয়েছে সন্ধ্যার আগেই। টহল থামিয়ে তারা ঘাঁটি আগলে বসে সা-র দোকানের রোয়াকে আর ষ্টেশনের সাধারণ লোকের চারিদিক খোলা সাধারণ বিশ্রামাগারে—ষ্টেশনে ঢুকবার পথও সেটা। ধাক্কা সামলে দ্রুত আত্মস্থ হতে থাকে ষ্টেশন-রোড। মুখে মুখে জানাজানি হয়ে যায় যে পদ্মলোচন আর মেয়ে উপস্থিত আছে, নতুন নতুন গান বেঁধেছে পদ্মলোচন। নতুন গান?

'ভোর হল, গোঠে চল, ও ভাই বলাই।'

"খেলায় কাল হারিয়েছি বলে রাগ করিতে নাই।"

—এই বলে গান শুরু করে গতবার পদ্মলোচন গেয়েছিল।—

> ভাবছ কেন কলির কথা,
> (যখন) প্রজায় রাজায় নাই মমতা,
> বলি শোন সে বারতা,
> তোমারে বলাই।
> ভোর হল, গোঠে চল যাই।
> আজকে যারা পুণ্যবলে,
> রাজা হয়ে প্রজা পালে,
> (তারাই) কংস হয়ে কলিকালে,
> জন্মাবে ঠাঁই ঠাঁই।
> মর্ত্তভূমে জন্ম নেবার
> দুঃখ শেষ হবে আমার,
> প্রজারূপে শেষ অবতার
> হবে আমার ভাই।

ভোর হল, বেলা হল, গোঠে চল ভাই।...

পদ্মলোচন নতুন গান বেঁধেছে। কে জানে কি গান? অসীম আগ্রহ, ও উৎসাহ ষ্টেশন-রোডের। ভাড়া-খাটা স্ত্রীলোক কটি পর্য্যন্ত বলে তাদের দেহের ভাড়াটেকে, তা হবে না বাবু, শুনতে আমি যাবই, টিকিটবাবু কম্পাউণ্ডারবাবু কইবে আর পদ্মলোচন মেয়ের সাথে গাইবে, ও না শুনে পারব না। না পোষায়, পয়সা ফিরে নাও, অন্য ঘরে যাও।

সামসুদ্দীন তাগিদ দেয় তার নামহীন সরাই-খানার খাটুয়েদের, চটপট সারো, একটা দুটো পাইতে হবে আজ।

খাইয়েদের বলে, না, না, যাব, আল্লা রসুল, জান কবুল। হেথা ওসব কিছু নেই, একদম নেই। চলেন দেখবেন, মালুম হবে।

প্রত্যাশা উৎসাহ আগ্রহ আয়োজন দেখে মনে হয় আজ বোধ হয় আরও বেশী জমজমাট হবে ষ্টেশন-রোডের নৈশ আসর অন্য দিনের চেয়ে। গাড়ী-তলাউ-এ লোক জমে আজ অন্য দিনের চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু পদ্মলোচন সবে তার তারের যন্ত্রের কান মোচড়াতে আরম্ভ করেছে, বাধা আসে।

এসব চলবে না। একশো চুয়াল্লিশ, সাঁঝবাতি জারি হয়েছে। এত লোকের ভিড় চলবে না। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ছত্রভঙ্গ হয়ে সকলকে ফিরে যেতে হবে যার যার এলাকায়। নইলে—

থম থম গম গম করে চারিদিক। পদ্মলোচনের মেয়ে দুবার কাসে, মুখে আঁচল চাপা দেয়।

মনোহর হঠাৎ উঠে বলতে শুরু করে, ভাইসব, আমরা এ অন্যায় হুকুম মানবো না, আমরা—

নিতাই কম্পাউণ্ডার বাঁ হাতটা চেপে ধরে তার মুখে, ডান হাতে কাছা ধরে হেঁচকা টানে তাকে বসিয়ে দেয়।

যাত্রাদলের সং-এর ঢং-এ বলে, এই তো ব্যাপার। কিন্তু একটু গান বাজনাও কি বারণ?

জবাব আসে গর্জনে।

বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা, নিতাই বলে সং-এরই ঢং-এ গর্জনের মিড়ে গলা চড়িয়ে, তাই হবে। মোরা আইন মানবো। টাউন এলাকার আইন মোরা টাউন এলাকায় আলবৎ মানবো। চলো ভাই, মোরা টাউন ছেড়ে যাই। লাইনের ওপারে টাউন নাই। চলো সবাই, আইনও বাঁচাই, গানটানও গাই।

সকলের দ্বিধা দেখে জীবনে বোধ হয় এই প্রথম রসিকতা ভুলে নিতাই ধমকে ওঠে, গরু ছাগল নাকি? কথা বোঝো না, মানে বোঝো না, না? চটপট চলো—রেল লাইনের ওপারে।

প্রদেশ থেকে প্রদেশে টানা সরকারী রাস্তার গায়ে লাগা টাউন এলাকার বাইরের গ্রাম চিলতলা। কাদা শুকিয়ে গেছে বর্ষান্তের মাঠের। তাছাড়া, কে এখন মানছে শুকনো কাদা না ধুলো না ঘোড়ার নাদিতে অপরিচ্ছন্ন গাড়ী-তলাউ। সামসুদ্দীন তার নামহীন সরাইখানা থেকে ডে-লাইটটা এনে টাঙিয়ে দেয় মরা গাব গাছটার ডালে। হারমোনিয়ম বাজিয়ে সে-ই শুরু করে একশো চুয়াল্লিশ আর শাঁখবাতি আইন এলাকার একশো গজ দূরে ষ্টেশন-রোডের নিষিদ্ধ গান, আজ আমাদের শুরু রে ভাই…

তারপর পদ্মলোচন গান ধরে তার তারের যন্ত্র বাজিয়ে:

তুমি যে দুখীর ভগবান,
এতদিনেও মিলবে কি প্রমাণ—

তার মেয়ে গায় মিষ্টি চিকন চড়া মিহি গলায়:

বাঁচন মরণ তোমার বিধান,
হে ভগবান,
নিজের বিধান মানো, নইলে হয় বেমানান—

পেরাণটা

'বঁধুর লেগে পেরাণটা যে কাঁদে, আহা কাঁদে।'

তেপান্তরের মাথা-ভাঙা মাঠে গলা ছেড়ে দিয়ে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে গান গাওয়ার কি যে আরাম। গতি তার মন্থর হয়ে আসে। অবেলায় অঘ্রাণের পড়ন্ত রোদ, শান্ত ফাঁকা মাঠে একা একা বোধ করছিল সাধু সেখ। তাই গুণ গুণ করে গান ধরে ফেলেছিল নিজেরই অজান্তে। দেখতে দেখতে গলা খুলে সুর চড়েছে। তা, মন্দ মানুষের কি গুণগুণিয়ে গাওয়া পোষায় মেয়েলোকের প্যান-প্যানানির মত?

শক্ত মাটি মাঠের, লাঙল দিলে ফলা ঢুকবে না, তবু এ মাটি আঁকড়ে কামড়ে দুর্বা ঘাস ছেয়ে আছে চারিদিক, যদিও তারা রুক্ষ জীর্ণ কমতেজী। এ মাটিতে বুঝি শিশিরও শোষে না। বৃষ্টির জলও ভেতরে পশে না, ওপর ওপর মাটি ভিজিয়ে পশ্চিম দিকে ঢাল বেয়ে গড়িয়ে গিয়ে কাঁসাই নদীতে বন্যা ডাকায়। এমনিভাবে যদি ধান গজাত, এই দুর্বা ঘাসের মত, যেখানে মাটি সেইখানেই। সরেশ মাটিতে তেজী সবুজ ঘন হয়ে, শক্ত পতিত জমিতেও না হোক যা হোক এই মাঠের ঘাসের মত। কোন শালার তা হলে আর শিরদাঁড়া বেঁকিয়ে চষতে হত না পাজী বজ্জাত নিমকহারাম পরের ক্ষেত, হাজত-খানায় বসবাস হত না ফসল নিয়ে কামড়াকামড়ি করে। মাঠে ঘাটে ক্ষেতে আলে বন বাদাড়ে আপনি গজানো অজস্র ধান গাছে থই থই করত চারিদিক? কাটো, মাড়াও, ঢেঁকিতে নয় কলে ছাটাও, দু'বেলা পেট ভরে যার যত খুশী ভাত খাও সারাবছর, গরুছাগলকে খাওয়াও।

গলা তার আরও চড়ে যায়, আরও কাঁপে।

—বঁধুর লেগে পেরাণটা মোর কাঁদে, পরাণ বঁধুরে!

এ গান সে জানে একলাইন, সুর জানে একলাইনের। অন্য গানও জানে, এমনি এক-

লাইন দু'লাইন। একা না হলে তাই সে গান গায় না, এমনি ফাঁকা মাঠ না পেলে গলা ছাড়তে পারে না। ধানের ভাগ নিয়ে লড়াই করে জেল খেটে গাঁয়ে ফেরার পথে এই মাথা-ভাঙা মাঠে তার দরকার ছিল গলা ছেড়ে গান ধরার।

দূরে দূরে গাছ ঢাকা গাঁ। মাঠে এখানে ওখানে থোকা থোকা নীচু ঝোপ, বুনো কুল, কুকুরশোকা, ঝাঁকাটি গাছের। দক্ষিণে নদীর ওপারে ঘন শালবন। শুকনো ঠাণ্ডা বাতাস বইছে ওদিকে হাতে মুখে খসখসে ছোঁয়াচ লাগিয়ে। নদী শুকিয়ে গেছে এর মধ্যেই, চওড়া বালির বুকে এখন ঝিরঝির বইছে আধমরা ক্ষীণ ঝরণা।

আল্লা, আজ নমাজ পড়ার সময় নাই। ধুলায় ধুসর গা হাত পা, নদীতে গিয়ে অজু করে নমাজ পড়তে গেলে এই জনহীন ফাঁকা মাঠে তাকে ঘিরে আঁধার রাত নেমে আসবে, চারিদিকে তাকে ঘিরে সুরু হবে বিপথের ইসারা আর হাতছানি, তার হাতিয়াদল গাঁয়ের পথের দিশা সে হারিয়ে ফেলবে বেমালুম।

আঁধারকে সে ভয় করে না। একবছর আগে যখন দিনান্তের নমাজ পড়ার জন্ম আল্লার এই জগতটাকে বরবাদ করে দিতে পারত, তখন ভয় করত এই জগতের আঁধারকে। বনবাদাড়ে কত আঁধার রাত কাটিয়েছে ফসলের লড়ায়ে নেমে, কত নমাজ পড়া তার বাদ গেছে তারপর। আঁধারের ভয় কেটে গেছে। তবে ওই সূর্য্য অস্ত গেলে এ মাঠে সে দিক হারিয়ে ফেলবে, চেনা চেনা চিহ্নগুলি দেখতে পাবে না, কোনদিকে এগোলে তার গাঁ ঠাহর পাবে না। দিনের আলোয় পথ চিনে তাকে পৌছতে হবেই গাঁয়ের কাছাকাছি।

গানের অজুহাতে ক্লান্ত ব্যথিত পায়ে ঢিল পড়েছিল। বেলার দিকে চেয়ে আবার সে জোরে চলা সুরু করে। সূর্য্য শালবনে ডুবু ডুবু। যেখানে তারার আলোতেও তার হাতিয়াদল গাঁয়ের পথ খুঁজে নেওয়া যায়, সেখানে গিয়ে পৌছতে পারবে কি সময় মত ?

অঘ্রাণের সন্ধ্যায় গা ঘেমে যায় সাধু সেখের, তৃষ্ণায় শ্রান্তিতে ভারি মনে হয় দেহটা। আজ গাঁয়ে ঘরে পৌছতে না পারলে গাঁয়ে ফেরা হয় তো তার মিছেই হবে, একটা রাত ঘরে থাকতে পারবে না, গাঁয়ের লোকের সাথে আলাপ করতে পারবে না, ওয়ারেণ্ট এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াতেই সময় যাবে।

হাজতবাসের দিনগুলিতে কি ঘটেছে গাঁয়ে, কেমন আছে তার গাঁয়ের লোক, আপন জন, কি করছে তার কুলবাস্থ, দেখে শুনে জেনে বুঝে না নিলে তো চলবে না তার !

চলতে চলতে রাত ঘনিয়ে আসে, অস্পষ্ট হয়ে আসে দিবা আর দিক্‌চিহ্ন, হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় সাধু সেখ। দূরে, অনেক দূরে, ও কিসের আলো ? তারার চেয়ে স্পষ্ট হয়ে আকাশে ঝুলে আছে ?

আল্লা, রাজবাড়ীর স্বাধীনতা-উৎসবের ফানুষ-বাতিটাই শেষে তাকে গাঁয়ের পথ দেখালো। আজও ওরা ওই বাতিটা জ্বালিয়ে রেখেছে ?

ওরা পারে। রাজবাড়ীতে স্বাধীনতা-উৎসবের ফানুষ-বাতি দু'তিন মাস জ্বালিয়ে যেতে পারে। গাঁয়ে গিয়ে ঘরে গিয়ে সাধু দেখতে চায় ডিবরি পিদিম জ্বলছে কিনা তাদের ঘরে।

কুয়াশা ঘুঁটের ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে গন্ধময় ঘন রাত নেমেছে হাতিয়াদলে। সবার আশায় ভরা উৎসুক দিনটা শেষ হয়েছে হতাশায়। আজ আর তবে এল না মহীন শ্রীপতি সাধু সেখ। এন্তেআলি মিছেই তাদের ফাঁকা খবর দিয়ে ভুলিয়েছে যে, ওরা তিনজনেই ছাড়া পেয়েছে, গাঁয়ে ফিরছে। সকালে ওদের নিয়ে সদর সহরে সভা শোভাযাত্রার পালা, তারপর রওনা দিয়ে বিকেল নাগাদ তিনজনে গাঁয়ে পৌছবে। বিকেল ফুরিয়ে এলে মাথা নেড়েছে হাতিয়াদলের মানুষ। এত সহজেই যেন হাজত থেকে মানুষ খালাস পায় ডাকাতির দায়ে কয়েদ হয়ে। ডাকাতি করেছে না করে নি, মানুষ ওরা ভাল কি মন্দ, সে তো আইনের প্যাঁচ বাবা, দায়ে তো ফেলেছে ডাকাতির। সাধুখাঁর আড়ত লুটে জেলে গিয়েছিল সুদাস ঘোষেরা। আজ ছ সাত সাল কাটল, তারা ফিরেছে কি ? এমন আজগুবি খবর দেয় কেন এন্তেআলি ? ঘরে বাইরে এন্তেআলির মুসকিল।

সে যত বলে কোন কারণে হয় তো তারা আটকে গেছে কাল নিশ্চয় ফিরবে, গাঁয়ের লোক বিজ্ঞের মত মাথা নাড়ে।

বলে, খবর দিত। তোমার মত মোদের অত হেলাছেদ্দা করে না, না এলে খবর দিত আজ এলো নি, কাল এসবে।

কিছুদিন আগেও সচ্ছল অবস্থা ছিল এন্তে-আলির, ধানের সচ্ছলতা। তখন যা ছিল মানুষটার কঠিন একগুঁয়ে স্বভাব, আজ সবার কাছে তা

হয়েছে হেলাছদ্দা, অবজ্ঞা। মানুষটা সব কিছুতে যুক্তি খোঁজে, সোজাসুজি বিশ্বাস করা না করার চেষ্টা তার কাছে বিরক্তিকর অথচ তাকে আজ আগের চেয়ে সমান মনে হয়।

নতুন চিন্তাচেতনা মত তাকে নিয়ে তাই বিব্রত বোধ করে হাতিয়াদলের চাষী সমাজ।

তার নিকা বৌয়ের তোতলামি আজ বেড়ে গেছে। ধৈর্য্য ধরে তার কথা শোনা আর মানে বোঝা হয়েছে কঠিন ব্যাপার। তবে দু'চারবার শোনার পর টের পাওয়া গেছে জিজ্ঞাস্য তার একটাই। সাধু সেখের সম্বন্ধে। উত্তেজনা আর তোতলামি বাড়ার কারণটাও তাই।

সাধু সেখের সে ভাতিজা, মেয়ের মত তাকে মানুষ করেছে লোকটা। নিকার পরেও তোতলা ফুলবানু মসগুল হয়ে আছে মানুষটার বাপের বাড়ীর দরদে। অনেক ভেবে চিন্তে এন্তেআলির সাথে মেয়েটার নিকে বিয়েই স্থির করেছিল সাধু সেখ। বোকা হাবা তোতলা মেয়ে ফুলবানু, এন্তেআলির সাথেই তার বনবে ভাল। রূপ-যৌবনের কাঙাল এন্তেআলি, একদম পাগল বলা চলে। সাদি বৌটা তার চালাক চতুর কাজেকর্মে পটু, কিন্তু দেখতে মোটে তেমন নয়। অনেক বছর এন্তেআলিকে জমিয়ে রাখবে ফুলবানু। ততদিনে ছেলে হবে মেয়ে হবে, ঘরসংসার জমাট বেঁধে উঠবে। পাগলামিও কমে যাবে এন্তেআলির।

ফুলবানু ঘর করতে এসেছিল কেঁদেকেটে সর্দি-ভরা নাকের নোলক ছিঁড়ে রক্তপাত করে। তার আহ্লাদ আবদার সমানই বজায় আছে। চোত ফাল্গুনে তার বাচ্চা হবে।

সাথে করে না এলে কিসের জন্য?—এই হল মোট জিজ্ঞাসা ফুলবানুর। তার পেরাণের আসল জিজ্ঞাসাটা বুঝতে সাঁঝ পেরিয়ে গেছে এন্তে-আলির। আগে একা না চলে এসে এন্তেআলি যদি সাধু সেখকে ফুলবানুর দোহাই দিয়ে সাথে নিয়ে আসত, ফের কিছু একটা কাণ্ড করে বসার সুযোগ পেতনা সাধু সেখ। নিশ্চয় সে ফের হাজতে গেছে, নয় গুলি খেয়ে জখম হয়েছে, নইলে এল না কেন? এত দূর থেকে প্রাণের টানে ফুলবানু টের পেয়েছে। সাধু সেখের জন্য মুর্গী যে রেঁধেছে ফুলবানু, এখন তা খাবে কে?

এটা আন্দাজ করে ভড়কে যায় এন্তেআলি। কলকের গুলপোড়া তামাকের ধোঁয়া টেনে নিয়ম মাফিক ছাড়তে ভুলে একচোট সে কাসে। বড় বিবিকে শুধোয় কাসি সামলে কোন্ মুর্গী?

ছোট মোরগটা।

কলকের আগুনে ফুলবানুর গোবর-মেশানো রাঙামাটি লেপা ঘরের ভিতের মত মসৃণ চামড়ায় ছেঁকা দিয়ে ফোস্কা পেড়ে প্রায় ফেলেছিল এন্তেআলি, পেটের মধ্যে উদ্ভূত একটা খিদের আগুন চাড়া দিয়ে ওঠায় দাঁতে দাঁত কড়মড় করে ক্ষান্ত হয়। মুর্গি। মুর্গির ঝোল আর ভাত। বাড়ী ফিরতে ফিরতে তেপান্তরের মাথা ভাঙা সারা মাঠটা সে হিসাব করতে করতে এসেছিল, বড় মোরোগটা বেচে দেবে পাঁচসিকে দেড়টাকায়। তাছাড়া আর দিন চলার, একটা দিন ও চলার উপায় নেই। সদর বাজারে ওটার দাম ন'সিকে আড়াই টাকা, গগনবাবু নিত্য ওর চেয়ে বেশী দরে সায়েব পাড়ায়, ইষ্টিসনের সাহেবী খানাপিনার হোটেলে, বাজারের ধারে মাগীপাড়ায় কত মুর্গি বেচেছে। হাতিয়াদলে রাজবাড়ী আছে, ইস্কুল আছে, থানা আছে, চাখান', রেস্তরখানা আছে, সবই রাজবাড়ীর কাছে পাকা রাস্তায়। পুলিশের লোকের তাঁবু পড়েছে রাজবাড়ীর দীঘির পাশে মাঠ জুড়ে। ওখানে হয়তো বা বড় মোরগটার দাম সাতসিকে দু'টাকা মিলে যেতে পারে।

তবে সে সাহস না করাই উচিত হবে। হয় তো কেড়েই নেবে চুরি করা মুর্গি বলে'। তার চেয়ে—

বড় মোরাগটা গেলে, ছোট মোরগ আর দুটো মুর্গি থাকবে। ছোট মোরগটা থেকে মুর্গি দুটো আর ডিম পাড়বে কিনা জানা নেই।

এত জটিল হিসাব ছিল এন্তেআলির। গাঁটে একটা আধলা নেই, সদর ইষ্টিসানে মাল বয়ে আর রেলগাড়ীর সিঁড়িতে বসে ভোলাঘাট ইষ্টিসন তক পাঁচ দশসের চোরা চাল পৌঁছে দিয়ে কিছু রোজগারের ফিকিরে কাল সদরে গিয়েছিল। সাধু সেখের পাল্লায় পড়ে আজকেই গাঁয়ে ফিরতে হল।

মুর্গি আন, ভাত আন, হারামজাদিরা!

একা মাংস ভাত সাবাড় করে না, দুই বিবির সাথে বসেই মুর্গির ঝোল আর ভাত ভাগাভাগি করে খায় এন্তেআলি। ভাজা ফতুর কুঁড়েতে যেন ভোজবাজি! বড়বিবির দিকে আড় চোখে চেয়ে চোখ টিপে সে মুরগীর একটা ঠ্যাং ফুলবানুর ভাজা তোবড়ানো এল্যুমিনিয়ামের থালায় তুলে দেয়।

মরণ মোর! ফুলবানু ঠোঁট ফুলিয়ে বলে। মুগি মারার জন্য যে এ গঞ্জনা সে তা বোঝে।

ফুলবানু মুষড়ে গেছে। খেয়ে উঠে তামুক না পেয়ে মুষড়ে যায় এন্তেআলি। আবার সে তাই গঞ্জনা দেয়, একটুকু তামাক আনতে নারে, মুগি কেটে খায়!

পেরাণটা কেমন করে বাপটার লেগে বোঝোনা তুমি? বলে হাউ হাউ করে কাঁদতে সুরু করে ফুলবানু।

বড়বিবি ধোয়ামোছা করছিল, কয়েক লহমা ঠায় দাঁড়িয়ে কাঁদন শুনল, তারপর এগিয়ে গিয়ে ঠাস করে চড় বসিয়ে দিল ফুলবানুর গালে। মা যেমন মেয়েকে মারে।

এন্তেআলি ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে সায় দেয়, মেয়ের ভালর জন্য তাকে শাসন করলে স্নেহশীল বাপ যেমন সমর্থন করে কাজটা। বলে, একটুকু তামুক খাওয়াতে পারিস কান্নুর মা? পারিস যদি তো তোতে মোতে আজ বড় খাতির!

দিই তামুক, দিই।

তাড়াতাড়ি ফোঁস করে ওঠে ফুলবানু বড়বিবি কিছু বলার সুযোগ পাবার আগেই। বলে সে বাপের বাড়ী থেকে তামাক চেয়ে আনতে বেরিয়ে যায়। কাছাকাছিই বাড়ী সাধু সেখের। তবু সাঁঝের পর কম বয়সী পোয়াতি বৌয়ের পক্ষে সেটাও বেশ কিছু দূর বৈকি!

হারামজাদির সাথে পারি না। এন্তেআলি ব'লে।

বড়বিবি কিছু বলে না। এন্তেআলির কথাটা সে ভাবছিল, মানুষটা সত্যই কি তার সাথে শোবে আজ রাতে? বড়বিবির বয়স গড়িয়ে যায় নি, মনে মেয়ে মানুষের সাধ আস্বাদ আছে, ফুলবানু আসার পর এটা একরকম ভুলেই গেছে এন্তেআলি।

সেই যে যায় ফুলবানু আর তার দেখা নাই।

হারামজাদির সাথে পারি না।—এন্তেআলি আবার বলে উঠে লাঠিটা বাগায় বেরোবার জন্য। বহুদিন পরে মাংস ভাত খেয়ে তার ঘুম আসছিল। যদিও টানাটানির ভাত কটা ভাগাভাগি করে খেয়ে মোটেই পেট ভরে নি।

সাধু সেখের বাড়ীতে ভিড় জমেছে।

সাধু বলে, বেটি বলল, খবর দি, ডেকে আনি? মোর মজা লাগল গরজ দেখে। রোস না তুই, বসে থাক চুপ মেরে। এন্তেআলি হাজির হবে ঠিক।

সবার মুখে হাসি ফুটে মিলিয়ে যায়।

গজেন বলে, মেয়ার নালিশের কথাটা বল? তোমার তরে মুর্গী রাঁধলে, সাত তাড়াতাড়ি মেরে দিয়ে বসে আছে। সে কথাটা বল!

এ তামাসা নয়, যদিও বলা হয়েছে তামাসা করার সুরে। এ স্রেফ খোঁচা দেওয়া, নিন্দা করা। হারু যে গলা খাঁকরি দেয়, সেটাও আসলে গজেনের খোঁচায় সায় দেওয়া।

তোরাফের পিসী মুখ ফুটে স্পষ্ট করে বলেই বসে, নোলা বটে বাবা!

অপমানের গরমে গোমড়া হয়ে উঠেছে এন্তেআলির মুখ। সে ঝেঁঝেঁ বলে, রাত হয়ে গেল, তুমি এলে নাকো, খাব না তো করব কি? রাঁধা জিনিষটা ফেলে দেব?

ধপ করে সে বসে। আবার বলে, যত শালার ঝকমারি। আর মুর্গী নাই? কাল রেঁধে খাওয়াতে মানা কার? কাঁদাকাটা নালিশ বজ্জাতি, হাঃ!

চাল কুথা পাব কাল? আড়াল থেকে ফুলবানু শোনায়, চাচা কাল রইবে নি।

রইবে নি? এন্তেআলি অবাক হয়ে শুধায় সাধু সেখকে।

সবার এত বদমেজাজের, সাধু সেখের জন্য রাঁধা ভাতমাংস খেয়ে ফেলার খুঁতটা এত বড় করে ধরার কারণটা তখন সে টের পায়। ছেড়ে দেবার দু'ঘণ্টা পরে শ্রীপতি আর মহীনকে ফের ধরেছে নতুন ওয়ারেণ্টে। সাধুকেও ধরত, সে চালাক মানুষ, ব্যাপার আঁচ করে আগেই কেটে পড়েছে।

পেরাণটা চাইল না বাবা আর আটক রইতে। কিছুকাল ফেরার থাকি, গা ঢাকা দিয়ে। ও সরকারী শ্বশুরঘরে মোটে মন বসে না। দাড়ির ফাঁকে সাধু সেখ হাসে, ইংরেজ ভেগে গেছে কবে, আইনকানুন পালটে যাবে সব, আজ না তো কাল। না যাবে না? জমিদার জোতদার রইবে না, দারোগা পুলিশ মোদের পিটতে এসবে না ওদের হয়ে। দেশের মানুষ রাজা হয়েছে, চাষীপেরজা মোদের কথা মানবে তো বটে, আজ না তো কাল? না মানবে না? তাই মন করলাম কটা দিন ডুব মেরে কাটিয়ে দিলে আর ভয়টা কি!

শ্রীপতির ভাই ভূপতি বলে, ওরা সরে পড়তে পারল না?

ছেড়ে দিয়ে আবার ওদের ধরার বিবরণ দেয় সাধু। জেলের দরজাতেই ফের নাকি ধরত তাদের, পরোয়ানা এসে পৌছতে দু'ঘণ্টা দেরী হয়ে গিয়েছিল এদিকে তাদের ঘরে বসিয়ে রেখে সবাই ছুটোছুটি করছে তাড়াতাড়ি শোভাযাত্রা বার করে দিতে, তারা তিনজনে বসে ফুঁকছে বিড়ি। আল্লার কি মর্জ্জি, বিড়ি ফুঁকতে সুখ পেল না, তাদের ইচ্ছে হল তামুক খাবে। একবাবু পয়সা দিল আর সাধু গেল দোকান থেকে তামুক আনতে। বাবুদের ঘরের মিঠে তামুক তো মুখে রুচবে না। দোকান আর কদ্দুর, এই সাধুর বাড়ী থেকে শিব-মন্দির যতটা ততটা হয় কি না হয়, যেতে আসতে কতটুকু বা সময়। তারি মধ্যে ঝপ করে পুলিশ এসে খপ করে ফের ওদের দু'জনকে ধরে ফেলল। দূর থেকে লালপাগড়ী দেখে—

পেরাণটা খানিক যে কি ওলটপালট করল, কি বলি তুমাদের। ভাবল'ম কি যে দুর্ম্মোরি মোর মন্দ মতি, একলাটি পেলিয়ে যাব, একসাথে হাজত থেকে বেরুলাম তিনজনায়? যেচে যাই, ধরা পড়ি, একসাথে ফের হাজত যাব। তা মোদের ওই নকুল মাইতি, ইস্কুলে পড়ছে ফাষ্টো কেলাশে, ঘরে একটি পাশে সে মস্ত মস্ত হরফে লিখতে ছিল শোভাযাত্রার সুটিশ। দু'পা এগিয়েছি ধরা দেব বলে, দেখি কি নকুল এসছে এদিক উদিক চাইতে চাইতে। সেই মোকে ভাগিয়ে দিলে। বললে, ডুব মেরে মেরে থাকবে যাও, সবার সাথে উপোস করবে যাও, অত জেলের ভাত খায় না।

পেরাণটা, ভূপতি বলে, জানো সাধু পুড়তিছে ভাইটার লেগে। নিরেট কথা বলি, মন করে কি, জেলের ভাত খাক। ঘরে ফিরে ভাত পাবে না। জেলের ভাত খাক্। জানো সাধু, ওর বৌটা মরেছে ম্যালেরিয়া জ্বরে। খপরটা চেপে গেছি।

ভূপতির চেহারাটাই জ্বর আর উপোসের চরম প্রমাণ। অত প্রকট না হোক, প্রমাণের ছাপটা আছে সবার চেহারাতেই। কেউ তাই কথা কয় না।

লোক বেড়েই চলে সাধু সেখের দাওয়ায়। দেখা যায়, এ গাঁয়ের লোক শুধু নয়, আশেপাশের গাঁ থেকেও লোক আসছে। পুরুষ চাষী নয় সবাই। অনেক মেয়েলোক, নানা বয়সের।

এসো মোরা দীঘির পাড়ে বসি।

অশোক রাজার আমলের দীঘি শুকিয়ে বুজে পুকুর হয়ে গেছে। তারও পাড়ে দুর্ব্বা ঘাসের আসন। শীতের রাত্রে নিরুপায় হয়ে তারা সেইখানে গিয়ে বসে। কি ঘন আঁধার রাত, কি ঘন কুয়াশা। তার মধ্যে রাজবাড়ীর ফানুষ আকাশ-প্রদীপ ঝাপসা দেখা যায়।

সাধু সেখ বলে, ওই ফানুষটা ভেঙে চুরে দিয়ে আসতে পার তোমরা কেউ? ও দেখলে বিগড়ে যায় পেরাণটা।

দীঘি

সন্ধ্যার কুয়াশা নামছে।

ছাড়া ছাড়া কুয়াশা আলতো ভাবে দীঘির জল ছুঁয়ে থাকে। আস্তে আস্তে পাক দিয়ে ওঠে, নড়ে চড়ে বেড়ায়, বাতাসে ভেসে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে জল মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে। এপাড়ে জমিদারের গোয়াল থেকে গাঢ় ঘুঁটের ধোঁয়া মন্থর গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে, অদূরে গাঁয়ের চেহারা সন্ধ্যার ছায়া, কুয়াশা আর ঘুঁটের ধোঁয়ায় আবছা হয়ে এসেছে।

দীঘল লম্বাটে দীঘি, চওড়া যে নেহাৎ কম এমনি তা নয়, লম্বার তুলনায় কম। দক্ষিণের পাড় বাঁধের মত উঁচু, ওদিকে খুঁড়ে যেতে যেতে নাকি এক সারিতে তফাতে তফাতে তিনটি দেবমূর্ত্তিতে ঠেকে কোদালে বাধা পড়েছিল। সেই লাইনে সীমা হয়েছিল দক্ষিণ তীরের। বিশালতর চৌকোণা না হয়ে দীঘি তাই এরকম লম্বাটে হয়ে আছে। পাঁচ পুরুষ আগে খোঁড়া দীঘি। জলদ উদ্ভিদে ভরে গেছে দীঘির বুক জলের নীচে, সকালে বেলা বেড়ে আর বিকালে বেলা পড়ে এসে সূর্য্যের আলো যখন খানিক তেরচা ভাবে পড়ে, টলটলে স্বচ্ছ জলের নীচে যেন এক অদ্ভুত গাঢ় সবুজ রহস্যপুরীর আবরণ

খুলে যায়। উত্তর বা দক্ষিণ তীরে দাঁড়ালে এটা হয়। পূব পশ্চিম তীরে দাঁড়ালে ঝলমলে আলোয় চোখে শুধু ধাঁধা লাগে।

তিন তীরে ঘাট, দক্ষিণ ছাড়া। প্রকাণ্ড বাঁধানো ঘাট, চওড়া সিঁড়ি। আজ ভেঙে-চুরে গেছে, বড় বড় ফাটল ধরেছে, ইঁট খসে পড়েছে। তবু অনেকের শোয়া-বসার মত অটুট সমতল ঠাঁই আজও মিলবে অনেক ঘাটের চত্বরে।

হাসিতুল্লা চুপ করে বসে থাকে ঘাটে। শূন্য নির্জ্জন চারিদিক, নির্জ্জনতাই যেন ঘন হয়েছে ছায়া আর কুয়াশার রূপে। অজু করে গামছা বিছিয়ে নামাজ পড়েছিল হাসিতুল্লা, তারপর থেকে বসে আছে। অল্প বেলা থাকতে যখন সে পৌঁছেছিল এখানে, তখনও জনমানুষহীন ছিল ঘাট, দীঘির আশে পাশে মানুষ চোখে পড়েনি। শিং ভাঙ্গা বুড়ো একটা গরু শুধু চরছিল দক্ষিণের উঁচু বাঁধে। গাঁয়ের দিকে দু'চারজন মানুষকে দেখা গিয়েছিল এদিক ওদিক চলাফেরা করতে, তারাও যেন লুকোচুরি খেলছিল আপন মনে, এ ঘরের আড়াল থেকে বেরিয়ে খানিক দৃশ্যমান থেকে আড়াল হয়ে যাচ্ছিল গাছপালা ঝোপঝাড় বা অন্য বাড়ীর পিছনে। দীঘির পানে কেউ এগিয়ে আসে নি। নারী পুরুষ ছেলে মেয়ে একজনও নয়।

বেশী তফাৎ নয় গাঁয়ের এদিককার ঘর ক'খানা। মুখহাত ধুতে জল নিতেও আসে নি মেয়েপুরুষ একজন। দীঘির জল কি খারাপ হয়ে গেছে? বিষাক্ত বলে বর্জন করেছে সকলে? কি স্পর্দ্ধা।

দীর্ঘ পথ হেঁটে এসেছে হাসিতুল্লা, অনেক দূরের গাঁ থেকে। জমিদার ডাক দিয়েছে, জরুরী হুকুম, আজের মধ্যে এসে পৌছানো চাই যেমন করে হোক, কোন অজুহাত চলবে না। এমনি আহ্বানের জন্য বাপের আমল থেকে প্রস্তুত হয়েই থাকে হাসিতুল্লারা। আরো আগে দিনে দিনে পৌছতে পারত হাসিতুল্লা, রওনা দিতে দেরী হয়ে গেল বিবির জন্য। তার বিবির জ্বর খুব বেড়েছে।

জোরে জোরে একটানা হেঁটেছে বিশ্রামের জন্য না দাঁড়িয়ে, বসে থাকতে আরাম লাগছে বেশ। খানিকটা অভিভূত হয়ে পড়েছে চারিদিকের অদ্ভুত স্তব্ধতা আর নির্জ্জনতায়। যতবার সে এসেছে এ গাঁয়ে, সকালে বিকালে যখন তাকিয়েছে দীঘির দিকে, আশেপাশে মানুষ দেখে এসেছে চিরদিন, শুনে এসেছে মানুষের গলার আওয়াজ। গাঁয়ের লোক দীঘির জলে স্নান করে, ঘাটে বসে জটলা পাকায়, দীঘি ঘেঁষে চলাচল করে, পাশের মাঠে গরু বাঁধে ছেলে ছোকরারা খেলাধূলো হৈ চৈ করে। সুদীর্ঘ দীঘিটি ওপাড়ের জমিদার বাড়ীকে তফাৎ করে রাখে গাঁয়ের জীবন থেকে। গাঁয়ের জীবন দীঘির এ তীরে পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হতে জমিদার কখনো বারণ করে নি।

কি ব্যাপার তবে? একটা লোক নেই আশে পাশে যে তাকে ব্যাপার জিজ্ঞাসা করে হাসিতুল্লা।

জমিদার বাড়ীও কেমন যেন নিঝুম, আঁধার আঁধার। দু'একটা আলো জ্বলছে, গোয়াল থেকে ঘুঁটের ধোঁয়া উঠছে, কোন সাড়াশব্দ নেই। উঠি উঠি করেও হাসিতুল্লা বসে থাকে। কান খাড়া করে রাখে পূজার বাজনার আওয়াজের জন্য। পুঁটলিটা পাশে পড়ে আছে, পাকা বাঁশের মোটা লাঠিটা সে শক্ত করে ধরে থাকে। লাঠি ধরা মুঠির মত কঠিন তার মুখ। দু'পুরুষ তাদের লাঠির মালিক জমিদার, জমিদারের মান রাখার জন্য এই লাঠি।

অনেক দেরীতে পূজার বাজনা বাজে জমিদারের গৃহমন্দিরে। বাজনায় যেন তেমন জোর নেই, জমকালো আওয়াজ নেই। মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে যায় হাসিতুল্লার।

যখন সে ওঠে তখন রাত্রি হয়ে গেছে। কুয়াশার জন্য আজ ঠাণ্ডা কম। ঠাণ্ডাকে ডরায় না হাসিতুল্লা, মাঘের ঠাণ্ডাকেও নয়, এতো অঘ্রাণের হিম। জগতে কাউকে ডরায় না হাসিতুল্লা, কিছুকে ডরায় না, তার লাঠিখানা হাতে থাকতে। তবে কিনা সন্ধ্যাবেলা জনহীন দীঘির ঘাটে গা ছম ছম করে, সেইসব কিছুর জন্য যা জগৎ ছাড়া, তার জানা চেনা মাটির পৃথিবীর যা নয়।

অমনি একটা কিছুর মতই ছায়াটা কাছে আসে।

একটু শিউরে ওঠে দেহটা হাসিতুল্লার। ক'বার সে তাড়াতাড়ি পলক ফেলে চোখের।

ছালাম।

মানুষের গলার আওয়াজ। হাসিতুল্লা স্বস্তি বোধ করতে থাকে।

কন থে আইলা মিয়া? আরে, হাসিতুল্লা নাকি!

চিনবার নারলাম তুমারে।

রোজেনালিরে চিন?

অ'—তুমি রোজেনালির চাচা। চিনছি। ইষ্টিমারে তুমি পিটাইছিলা ফিরিঙ্গিটারে, হাজত গেছিলা। ছাড়া পাইলা কবে?

রও মিয়া, হাসাইওনা। কোন সালের কথা কও জাননি? ছাড়া পাইলাম, নিকা করলাম, ব্যাটা বেটি পয়দা করলাম দু'গা, তুমি আইজ জিগাও ছাড়া পাইলাম কবে। ঘুমাইয়া নি ছিলা দুই দশ সাল?

আরও তিনটে ছায়া এসে যোগ দেয় রোজেনালির চাচার সঙ্গে। এবার অন্য ভয় জাগে হাসিতুল্লার, কে জানে কি মতলব এ:দর। লাঠিটা সে শক্ত করে ধরে।

পথ ছাড়। পথ ছাইড়া দাও।

পথ ছাড়াই আছে।—নবাগত একজন বলে।

পথ ঠেকাইছে কেডা? রোজেনালির চাচা বলে ভোতা স্বরে, মন চায় যাওগা, ঠেকামু ক্যান? জিগাইলাম কি, আইছ ক্যান? না আইলে ভাল করতা, বদ কাজে আইছ। ধানের পাওনা ভাগ মোরা নিমু। মকুম বাঁচুম খোদারে জানাইয়া থুইছি। কয়ডারে মারবা তুমি, কয়জনারে ঠেকাইবা? মিছা আইছ বাই, বদ কামে আইছ। ফিরা্যা যাও, ঘরে ফির্যা যাও।

আরেকটা ছায়া বলে, খাতির পাইবা না, মিছা আইছ। কত বন্দুক পুলিশ আনছে, তোমারে পাত্তা দিব?

দীঘির ঘাটে চারজন কয়েকমুহূর্ত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। মাঝখানে একেবারেই যেন ঝিমিয়ে পড়েছিল, আচমকা মহাসমারোহে পূজার বাজনা বেজে উঠে জমিদার বাড়ীতে, ঢোল, কাঁসি, ঘণ্টা।

হাসিতুল্লা যেন বুকে জোর পায় খানিকটা। বলে, নিমকহারামি করুম না।

কার নিমক খাইছ তুমি? কিসের নিমক-হারামি?

হাসিতুল্লা নীরবে এগিয়ে যেতে চাইলে—তামুক খাইয়া যাও। যা মন চায় কইয়ো তুমি, তামুক খাইয়া যাও।

পথ ছাড়, পথ ছাইড়া দাও!—চীৎকার করে ওঠে হাসিতুল্লা, বাঁশের লাঠিটা বেকায়দায় ঘুরিয়ে দেয় মাথার ওপর দিয়ে, তারপর ছুট দেয় দীঘির উত্তর পুব কোণায় জমিদারের গোয়াল ঘরের দিকে।

এরা খানিক দাঁড়িয়ে থাকে। ধিক্কারজনক একটা আওয়াজ করে নটবর বলে, কই নাই হালার পুত বুঝবো না? পাগড়ী বাইন্ধা চৌকিদারী কইরা খায় আর একখান লাঠি দিয়া বৌরে পিটায়, মস্ত মরদ! বলতে বলতে তার মাথা বিগড়ে যায়, ক্রুদ্ধ স্বরে প্রশ্ন করে, ফালডা দিয়া বিঁধলা না ক্যান হারামজাদারে? জাত-ভাই বইলা? নামাজ করে বইলা?

একটা লোহার রড, ঘষে ঘষে একটা ডগা ছুঁচালো করে বর্শার মত মারাত্মক অস্ত্র করা হয়েছে, সেটা ছিল দরগা সেখের হেফাজতে। এ খোঁচা সয়না দরগা সেখের, হাতের ওই অস্ত্রটা দিয়েই সে ঘায়েল করতে যায় নটবরকে। রোজেনালির চাচা বাঁ হাতে বাগিয়ে নেয় ডাণ্ডাটা, ডান হাতে একটা চড় কষিয়ে দেয় দরগা সেখের গালে।

বলে, ইয়ের পুত, তোরে কইছিলাম কি?

দরগা চুপ করে থাকে। তার বয়স মোটে বাইশ তেইশ।

—কইছিলাম না বৌয়ের বুকে সেক দিবি মালসায় আগুন জ্বাইলা, কামের কামে মন নাই, বিবাদ করে। তোমারে কই নটু বাই, যা তা কও ক্যান? জাত বাই। লাঠি দিয়া মাথা ভাঙ্গবো, জাতভাই!

খানিক চুপ করে থেকে বলে, আল্লা!

লেঠেল যত জমা হয়েছে কাছারী বাড়ীর পিছন দিকে পুরাণো মণ্ডপ-চত্বরে তার বহর দেখে বিশেষ আশ্চর্য হয় না হাসিতুল্লা। ব্যাপার সে খানিক আন্দাজ করেছিল দীঘির ঘাটেই। কে না আন্দাজ করতে পারে আজকের দিনে। চারিদিকে অনেক ঘটনা ঘটছে। এরকম ঘটনা।

এখানে আসর বসে যাত্রা গান কবি কীর্ত্তনের মস্ত চৌকো পাকা ভিত, গোল গোল মোটা থাম, নীচু ছাদ, চারিদিক খোলা। বেড়া দিয়ে ঘেরা হয়েছে চারিদিক তাদের থাকার জন্য। ইষ্টিমারের ডেকের মত কাঁথা-কাণির বিছানা পড়েছে সারা মেঝে জুড়ে। একরাতের হানাদারি লাঠিবাজীর ব্যাপার নয়। চারিদিকে কাছে দূরে গাঁয়ে গাঁয়ে বর্জ্জাতি জুড়েছে চাষী প্রজারা, ব্যাপার সোজাও নয়, সহজে মিটবারও নয়।

লণ্ঠনের আলোয় চেনা চেনা মুখ খোঁজে হাসিতুল্লার চোখ, তার রক্তে সাড়া জেগেছে স্বধর্ম্মী এতগুলি মানুষের কথাবার্ত্তার গুঞ্জনে, এরা ছাড়া কে বুঝবে লাঠি খেলতে জানা লাঠিয়ালদের, লড়ায়ে সৈন্যদের প্রাণের আত্মীয়তা।

তারপর কয়েকটা চেনা মুখ, কয়েকজন জানা মানুষ মেলে কিন্তু একটু দমিয়ে দেয় হাসিতুল্লার

প্রথম উৎসাহ। এরা কেন তাদের দলে? এরা তো লড়ায়ে লেঠেল নয়। পিছন থেকে একলা মানুষের মাথায় লাঠি মেরে কাদের ফেরার হয়ে আছে, সোণা জেল খেটেছে চুরির দায়ে। খুন জখম চুরি ডাকাতি মেয়ে লুটের লেঠেল এরা, এরা তো লড়ায়ে লেঠেল নয়। ব্যগ্র হয়ে হাসিতুল্লা অন্ত চেনা মুখ খোঁজে, অন্ত জানা মানুষের সন্ধান করে। যারা তার নিজের জাতের লেঠেল, মনিব হুকুম দিলে মরবে জেনেও একা পঞ্চাশ জনের মোহড়া নেয়, কিন্তু দুর্ব্বল অসহায়ের উপর, আঁধার রাতে চুপি চুপি পিছন থেকে শত্রুকে মারার হুকুম মনিব দিলেও সে হুকুম অমান্ত করে।

লাজু ওস্তাদেরে দেহিনা?

আসে নাই।

বড় আলি?

তেনাও আসে নাই।

লালপুরের গোপেন?

আইছিল, চুপে চুপে ভাগছে। ডরাইছে বুঝি ব্যাপার দেইখ্যা।

মনে মনে বলে হাসিতুল্লা: ডরাইছে। লালপুরের গোপেন ডরাইছে, তুমি মস্ত বীরপুরুষ।

মুখ গোমড়া করে বসে থাকে হাসিতুল্লা। যে জমায়েতকে গোড়ায় আপন মনে হয়েছিল, ঘনিষ্ঠ হয়ে আর তাদের আত্মীয় ভাবতে পারছে না। সকলের যে সমবেত গুঞ্জন উল্লসিত করেছিল, কি কথা আর কেমন হাসি ঠাট্টা দিয়ে তা তৈরী জেনে মনটা বিগড়ে গেছে। কাল এরা পুলিশ দলের সাথে হানা দিয়েছিল কোদপুর গাঁয়ে। একটা মোটে মেয়ে ছিল গাঁয়ে, একটু হাবাটে পাগলা মত, তবে কচি বয়েস, খাপসুরুৎ চেহারা। হাসিতুল্লার কাণের কাছে ক'জন বলাবলি করে মেয়েটাকে নিয়ে অন্তের মজা করার গল্প, তারা ভাগ পায় নি। শূন্ত গাঁয়ে হঠাৎ কোথা থেকে এসে মেয়েটা ছেমুদ্দীন মণ্ডলের ঘরের দাওয়ায় খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে কি রকম হাবার মত তাকিয়ে ছিল, কে প্রথম টেনে নিয়ে গিয়েছিল, শেষে কে ঘর থেকে বেরিয়ে কি রকম ভঙ্গীতে আপশোষ করে বলেছিল, মরে গেছে।

দাড়িতে হাত বুলায় হাসিতুল্লা, মাথাটা এদিক ফেরায় ওদিক ফেরায়, যেন ফাঁদে পড়েছে। এদের সে জানে। ভাল করে জানে। মগজে এদের শয়তানের বাসা, শক্তের ভয়ে আঁধারে লুকিয়ে থাকে, খুঁজে বেড়ায় একা অসহায় মেয়েছেলে, এমনি করে কষ্ট দিয়ে মেরে সুখ পায়। বাইরে যদি মেয়ে না মেলে, নিজের বাড়ীতে উলঙ্গ করে খুঁটিতে বেঁধে মারে বাড়ীর মেয়ে বৌকে।

কুর্ত্তা পরা গগন আসে ক্রুদ্ধমূর্ত্তিতে, ধমকে বলে ফের হল্লা সুরু করছ? আস্তে আস্তে কথা কও কইলাম।

গোমস্তার চোখরাঙানিতে চুপ মেরে যায় এতগুলি মরদ লাঠিয়াল। হাসিতুল্লার প্রাণটা জালা করে।

এ কাদের সাথে ভিড়ছে সে। চাপা গলায় কথা সুরু হয় গগন চলে যেতেই। গগনের বিরুদ্ধেই নালিশের কথা। তার ধমকানির বিরুদ্ধে নয়, তাদের পাওনা টাকায় সে যে মোটা ভাগ বসায়, তাদের খাওয়া দাওয়া পান তামুকের বরাদ্দে ভাগ বসায়, তারই বিরুদ্ধে।

কত্তারে কও না গিয়া? না তো নায়েব বাবুরে? হাসিতুল্লা বলে তাদের।

তুমি কওনা গিয়া? কানমলা খাইয়া আসবা।

হাসিতুল্লা এদিক ওদিক খোঁজে গগনকে, কর্ত্তা-বাবু নয় তো নায়েব বাবুকে সে সেলাম জানাবে। দুপুরুষ এ সেলাম জানাবার সম্মান তারা ভোগ করে এসেছে। গতবার যখন সিথুয়ার চরে বিবাদে পুলিশের সাথে লড়তে এসেছিল সে আর বড় আলি, গোপেনরা, জমিদারবাড়ী বেশী রাতে পৌঁছেও তাকে খবর পাঠাতে হয়নি, কর্ত্তাবাবু নিজে নেমে এসে সেলাম নিয়েছিল, বলেছিল, আইছ হাসিতুল্লা? ওই হালারা চরে পুলিশ আনছে, হাত করছে পুলিশেরে, আমার মান রাখনের ভার তোমার।

আজ গগন তাকে দেখেও দেখল না।

জমিদার বাড়ীর অদূরে কলাবাগানের পাশে পুলিশের তাঁবু পড়েছে। এগার বিঘা জমি নিয়ে জমিদারের নাম করা কলাবাগান, বাবুর খোঁড়া ছোট ছেলেটার সখের বাগান, কত রকম কলা যে কাঁদির পর কাঁদি ফলে যায়। গাঁয়ের মানুষ দেখতে পারে চেয়ে চেয়ে, কোনদিন চাখতে পারে না, পূজাপার্ব্বণে প্রসাদ বিতরণের সময় যদি দুএক টুকরা জুটে যায়।

বৈঠকখানায় দারোগা, কয়েকজন জোতদার, ছোট জমিদার, নিয়ে কর্ত্তার বৈঠক। কর্ত্তার হাতে গড়গড়ার নল, দারোগা বাবুর মুখে সিগারেট। কাঁচের গেলাসে রঙীন পানীয়। পর্দ্দা ঠেলে থমকে দাঁড়ায় হাসিতুল্লা।

কেরে তুই।

সেলাম কর্তা। ডাক দিছেন, আইছি।

আরে ব্যাটা হারামজাদা—

দারোগা বাবুর হুঙ্কার থামিয়ে কর্তা বলে, হাসিতুল্লা, গগনের কাছে যাও। এখানে কি ? একজন পুলিশ তাকে হাত ধরে টেনে নামিয়ে দেয় বারান্দার নীচে।

এদিক ওদিক চেয়ে কাছারি-বাড়ীর নির্জ্জনতম দিকে গিয়ে একা একটু বসতে চায় হাসিতুল্লা। রুদ্ধ ঘরের ভিতরে সে চাপা কান্না শোনে মেয়েছেলের।

রাত্রির গাঢ় কুয়াশার দিকে চেয়ে হাসিতুল্লা বলে, আল্লা।

হারাণের নাতজামাই

মাঝরাতে পুলিশ গাঁয়ে হানা দিল।

সঙ্গে জোতদার চণ্ডী ঘোষের লোক কানাই ও শ্রীপতি। কয়েকজন লেঠেল।

কনকনে শীতের রাত। বিরাম বিশ্রাম ছেঁটে ফেলে উর্দ্ধশ্বাসে তিনটি দিনরাত্রি একটানা ধান কাটার পরিশ্রমে পুরুষেরা অচেতন হয়ে ঘুমোচ্ছিল। পালা করে জেগে ঘরে ঘরে ঘাঁটি আগলে পাহারা দিচ্ছিল মেয়েরা। শাঁখ আর উলুধ্বনিতে আকস্মিক আবির্ভাব জানাজানি হয়ে গিয়েছিল গ্রামের কাছাকাছি পুলিশের আবির্ভাবের। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ সমস্ত গাঁ ঘিরে ফেলবার আয়োজন করলে হারাণের ঘর থেকে ভুবন মণ্ডল সরে পড়তে পারত, উধাও হয়ে যেত। গাঁ শুদ্ধ লোক যাকে আড়াল করে রাখতে চায়, হঠাৎ হানা দিয়েও হয়ত পুলিশ সহজে তারা পাত্তা পায় না। দেড়মাস চেষ্টা করে পারিনি, ভুবন এ গাঁ ও গাঁ করে বেড়াচ্ছে যখন খুসী।

কিন্তু গ্রাম ঘেরবার, আঁটঘাট বেঁধে বসবার কোন চেষ্টাই পুলিশ আজ করল না। সটান গিয়ে ঘিরে ফেলল ছোট হাঁসতলা পাড়াটুকুর কখানা ঘর যার মধ্যে একটি ঘর হারাণের। বোঝা গেল আঁটঘাঁট আগে থেকে বাঁধাই ছিল।

ভেতরের খবর পেয়ে এসেছে।

খবর পেয়ে এসেছে মানেই খবর দিয়েছে কেউ। আজ বিকালে ভুবন পা দিয়েছে গ্রামে, হঠাৎ সন্ধ্যার পরে তাকে অথিতি করে ঘরে নিয়ে গেছে হারাণের মেয়ে ময়নার মা, তার আগে পর্য্যন্ত ঠিক ছিল না কোন পাড়ায় কার ঘরে সে থাকবে। খবর তবে গেছে ভুবন হারাণের ঘরে যাবার পরে। এমনও কি কেউ আছে তাদের এ গাঁয়ে ? শীতের তে-ভাগা চাঁদের আবছা আলোয় চোখ জ্বলে ওঠে চাষীদের, জানা যাবে সাঁঝের পর কে গাঁ ছেড়ে বাইরে গিয়েছিল। জানা যাবেই, এ বজ্জাতি গোপন থাকবে না।

দাঁতে দাঁত ঘষে গফুরালী বলে, দেইখ্যা লমু কোন হালা পিঁপড়ার পাখা উঠছে। দেইখ্যা লমু।

ভুবন মণ্ডলকে তারা নিয়ে যেতে দেবে না সালিগঞ্জ গাঁ থেকে। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরছে ভুবন এতদিন গ্রেপ্তারী ওয়ারেণ্টকে কলা দেখিয়ে, কোনও গাঁয়ে সে ধরা পড়েনি। সালিগঞ্জ থেকে তাকে পুলিশ নিয়ে যাবে ? তাদের গাঁয়ের কলঙ্ক তারা সইবে না। ধান দেবে না বলে কবুল করেছে জান, সে জানটা দেবে এই আপনজনটার জন্তে।

শীতে আর ঘুমে অবশপ্রায় দেহগুলি চাঙ্গা হয়ে ওঠে। লাঠি সড়কি দা' কুড়ুল বাগিয়ে চাষীরা দল বাঁধতে থাকে। সালিগঞ্জে মাঝরাতে আজ দেখা দেয় সাংঘাতিক সম্ভাবনা।

গোটা আষ্টেক মশাল পুলিশ সঙ্গে এনেছিল, তিন চারটে টর্চ্চ। হাঁসখালি পাড়া ঘিরতে ঘিরতে দপ্‌দপ্‌ করে মশালগুলি তারা জ্বেলে নেয়। দেখা যায় সব সশস্ত্র পুলিশ, কানাই ও শ্রীপতির হাতেও দেশী বন্দুক।

পাড়াটা চিনলেও কানাই বা শ্রীপতি হারাণের বাড়ীটা ঠিক চিনত না। সামনে রাখালের ঘর পেয়ে ঝাঁপ ভেঙে তাকে বাইরে আনিয়ে রেইডিং পার্টির নায়ক মন্মথকে তাই জিজ্ঞেস করতে হয়, হারাণ দাসের কোন বাড়ী ?

তার পাশের বাড়ীর হারাণ ছাড়াও যেন কয়েক গণ্ডা হারাণ আছে গাঁয়ে। বোকার মত রাখাল

পাল্টা প্রশ্ন করে,—আজ্ঞা, কোন্ হারাণ দাসের কথা কন?

গালে একটা চাপড় খেয়েই এমন হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে রাখাল, দম আটকে আটকে এমন সে ঘন ঘন উঁকি তুলতে থাকে যে, তাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করাই অনর্থক হয়ে যায় তখনকার মত। বোবা হাবা চাষাগুলো শুধু বেপরোয়া নয়, একেবারে তুখোর হয়ে উঠেছে চালাকিবাজীতে।

এদিকে হারাণ বলে, হায় ভগবান।

ময়নার মা বলে, তুমি উঠ্‌লা কেন কও দিকি?

বলে কিন্তু জানে যে তার কথা কানে যায়নি বুড়োর। চোখে যেমন কম দেখে, কানেও তেমনি কম শোনে হারাণ। কি হয়েছে ভাল বুঝতেও বোধহয় পারেনি, শুধু বাইরে একটা গণ্ডগোল টের পেয়ে ভড়কে গিয়েছে। ছেলে আর মেয়েটাকে বুঝিয়ে দেওয়া গেছে চটপট, এই বুড়োকে বোঝাতে গেলে এত জোরে চেঁচাতে হবে যে, প্রত্যেকটি কথা কাণে পৌঁছবে বাইরে যারা বেড় দিয়েছে। দু'এক দণ্ড চেঁচালেই যে বুঝবে হারাণ তাও নয়, তার ভোঁতা ঢিমে মাথায় অত সহজে কোন কথা ঢোকে না। এই বুড়োর জন্য না ফাঁস হয়ে যায় সব।

ভুবনকে বলে ময়নার মা, বুড়া বাপটার তরে ভাবনা।

ভুবন বলে, মোর কিন্তু হাসি পায় ময়নার মা। ময়নার মা গম্ভীর মুখে বলে হাসির কথা না। গুলিও করতে পারে। দেখন মাত্তর। কইবো হাঙ্গামা করছিলেন।

তাড়াতাড়ি একটা কুপি জ্বালে ময়নার মা। হারাণকে তুলে নিয়ে ঘরে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে হাতের আঙ্গুলের ইসারায় তাকে মুখ বুজে চুপচাপ শুয়ে থাকতে বলে। তারপর কুপির আলোয় মেয়ের দিকে তাকিয়ে নিদারুণ আপশোষে ফুঁসে ওঠে, আঃ! ভাল শাড়ীখান পরতে পারলি না?

বলছ নাকি? ময়না বলে।

ময়নার মা নিজেই টিনের তোরঙ্গের ডালাটা প্রায় মুচড়ে ভেঙ্গে তাঁতের রঙীন শাড়ীখানা বার করে। ময়নার পরণের ছেঁড়া কাপড়খানা তার গা থেকে একরকম ছিনিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি এলোমেলো ভাবে জড়িয়ে দেয় রঙীন শাড়ীটি।

বলে, ঘোমটা দিবি। লাজ দেখাবি। জামায়ের কাছে যেমন দেখাস। ভুবনকে বলে, ভাল কথা শোনেন, আপনার নাম হইল জগমোহন, বাপের নাম সাতকড়ি। বাড়ী হাতীনাড়া, থানা গৌরপুর—

নতুন এক কোলাহল কানে আসে ময়নার মার। কান খাড়া করে সে শোনে। কুপির আলোতেও টের পাওয়া যায় প্রৌঢ় বয়সের সুরুতেই তার মুখখানাতে দুঃখ দুর্দশার ছাপ ও রেখা কি রুক্ষতা ও কাঠিন্য এনে দিয়েছে। ধুতি পরা বিধবার বেশ আর কদমছাটা চুল চেহারায় এনে দিয়েছে পুরুষালি ভাব।

গাঁ ভাইঙ্গা রুইখা আইতেছে। তাই না ভাবতেছিলাম ব্যাপার কি, গাঁর মাইনষের সাড়া নাই।

ভুবন বলে, তবেই সারছে। দশবিশটা খুন-জখম হইব নির্ঘাৎ। আমি যাই, সামলাই গিয়া।

থামেন আপনে, বসেন, ময়নার মা বলে, ত্যাখেন কি হয়।

শ' দেড়েক চাষী চাষাড়ে অস্ত্র হাতে এসে দাঁড়িয়েছে দল বেঁধে। ওদের আওয়াজ পেয়ে মন্মথও জড়ো করেছে তার ফৌজ হারাণের ঘরের সামনে—দু'চারজন শুধু পাহারায় আছে বাড়ীর পাশে পিছনে, বেড়া ডিঙ্গিয়ে ওদিক দিয়ে ভুবন না পালায়। দশটি বন্দুকের জোর মন্মথের, তার নিজের রিভলভার আছে। তবু চাষীদের মরিয়া ভাব দেখে সে অস্বস্তি বোধ করছে স্পষ্টই বোঝা যায়। তার সুরটা রীতিমত নরম শোনায়—স্রেফ হুকুমজারির বদলে সে যেন একটু বুঝিয়ে দিতে চায় সকলকে উচিত আর অনুচিত কাজের পার্থক্যটা, পরিণামটাও।

বক্তৃতার ভঙ্গিতে সে জানায় যে, হাকিমের দস্তখতী পরোয়ানা নিয়ে সে এসেছে হারাণের ঘর তাল্লাস করতে। তল্লাস করে আসামী না পায়, ফিরে চলে যাবে। এতে বাধা দেওয়া হাঙ্গামা করা উচিত নয়, তার ফল খারাপ হবে। বে-আইনী কাজ হবে সেটা।

গফুর চেঁচিয়ে বলে, মোরা তাল্লাস করতি দিমুনা।

প্রায় দুশো গলা সায় দেয়, দিমুনা।

এমনি যখন অবস্থা, সংঘর্ষ প্রায় সুরু হয়ে যাবে, মন্মথ হুকুম দিতে যাচ্ছে গুলি চালাবার, ময়নার মার খ্যানখেনে তীক্ষ্ণ গলা শীতার্ত থমথমে রাত্রিকে ছিঁড়ে কেটে বেজে উঠল, রও দিকি তোমরা, হাঙ্গামা কইরো না। মোর ঘরে কোন আসামী নাই। চোর ডাকাইত নাকি যে ঘরে আসামী রাখুম? বিকালে জামাই আইছে, শোয়াইছি

মাইয়া জামাইরে। দারোগাবাবু তাল্লাস করতে চান, তাল্লাস করেন।

মন্মথ বলে, ভুবন মণ্ডল আছে তোমার ঘরে।

ময়নার মা বলে, ছাখেন আইসা, তাল্লাস করেন। ভুবন মণ্ডল কেডা? নাম তো শুনি নাই বাপের কালে। মাইয়ার বিয়া দিলাম বৈশাখে, দুই ভরি রূপা কম দিছি ক্যান, জামাই ফিয়্যা তাকায় না। দুই ভরির দাম পাঠাইয়া দিছি তবে আইজ জামাই পায়ের ধুলা দিছে। আপনারে কমু কি দারোগাবাবু, মাইয়াটা কাইন্দা মরে। মাইয়া যত কান্দে, আমি তত কান্দি—

আচ্ছা, আচ্ছা।—মন্মথ বলে, ভুবনকে না পাই, জামাই নিয়ে তুমি রাত কাটিও।

গৌর সাউ হেঁকে বলে, অত চুপে চুপে আসে কেন জামাই ময়নার মা?

গা জ্বলে যায় ময়নার মার। বলে, সদর দিয়া আইছে! তোমার একটা মাইয়ার সাতটা জামাই চুপে চুপে আসে, মোর জামাই সদর দিয়া আইছে!

গৌর আবার কি বলতে যাচ্ছিল, কে যেন আঘাত করে তার মুখে। একটা আর্ত্ত শব্দ শুধু শোনা যায়, সাপেধরা ব্যাঙের একটিমাত্র আওয়াজের মত।

ময়নার রঙীন শাড়ী ও আলুথালু বেশ চোখে যেন ধাঁধা লাগিয়ে দেয় মন্মথের, পিচুটির মত চোখে এঁটে যেতে যায় ঘোমটা পরা ভীরু লাজুক কচি চাষী মেয়েটার আধপুষ্ট দেহটি। এ যেন কবিতা। বি, এ, পাশ মন্মথের কাছে, যেন চোরাই স্কচ হুইস্কির পেগ, যেন মাটির পৃথিবীর জীর্ণক্লিষ্ট অফিসিয়াল জীবনে একফোঁটা টসটসে দরদ। তার রীতিমত আপশোষ হয় যে যোয়ান মর্দ্দ মাঝবয়সী চাষাড়ে লোকটা এর স্বামী, ওর আদরেই মেয়েটার এই আলুথালু বেশ।

তবু মন্মথ জেরা করে, সংশয় মেটাতে গাঁয়ের দু'জন বুড়োকে এনে সনাক্ত করায়। তার পরেও যেন তার বিশ্বাস হতে চায় না। ভুবন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে গায়ে চাদর জড়িয়ে যতটা সম্ভব নিরীহ গোবেচারী সেজে। কিন্তু খোঁচা খোঁচা গোঁপদাড়ি ভরা মুখ, রুক্ষ এলোমেলো একমাথা চুল, মোটেই তাকে দেখায় না নতুন জামায়ের মত। মন্মথ গর্জ্জন করে হারাণকে প্রশ্ন করে, এ তোমার নাতনীর বর?

হারাণ বলে, হায় ভগবান!

ময়নার মা বলে, জিগান মিছা, কানে শোনে না, বদ্ধ কালা।

অ! মন্মথ বলে।

ভুবন ভাবে এবার তার কিছু বলা বা করা উচিত।

এমন হাঙ্গামা জানলে আইতাম না কর্ত্তা। মিছা কইয়া আনছে আমারে। সড়াইলের হাটে আইছি, ঠাইরেণ পোলারে দিয়া খপর দিলেন, মাইয়া নাকি মর মর, তখন যায় এখন যায়।

তুমি অমনি ছুটে এলে?

আসুম না? রতিভরি সোণারূপা যা দিব কইছিল, তাও ঠেকায় নাই বিয়াতে। মইরা গেলে গাও থেইকা খুইলা নিলে আর পামু?

ওঃ! তাই ছুটে এসেছ? তুমি হিসেবী লোক বটে। মন্মথ বলে ব্যঙ্গ করে আর কিছু করার নেই, বাড়ীগুলি তাল্লাস ও তছনচ করে নিয়ম রক্ষা করা ছাড়া। জামাইটাকে বেঁধে নিয়ে যাওয়া চলে সন্দেহের যুক্তিতে গ্রেপ্তার করে, কিন্তু হাঙ্গামা হবে। দু'পা পিছু হটে এখনো চাষীর দল দাঁড়িয়ে আছে, ছত্রভঙ্গ হয়ে চলে যায় নি। গাঁয়ে গাঁয়ে চাষাগুলোর কেমন যেন উগ্র মরিয়া ভাব, ভয় ডর নেই। ঘরে ঘরে তাল্লাস চলতে থাকে। একটা বিড়াল লুকানোর মত আড়ালও যে ঘরে নেই, সে ঘরেও কাঁথা কালি হাঁড়িপাতিল জিনিষ-পত্র ছত্রখান করে খোঁজা হয় মানুষকে।

মন্মথ থাকে হারাণের বাড়ীতেই। অল্প নেশায় রঙীন চোখ। এ সব কাজে বেরোতে হলে মন্মথ অল্প নেশা করে, মাল সঙ্গে থাকে কর্ত্তব্য সমাপ্তির পর টানবার জন্য,—চোখ তার রঙীন শাড়ীজড়ানো মেয়েটাকে ছাড়তে চায় না। কুরিয়ে কুরিয়ে তাকায় ময়নার কুড়ি বাইশ বছরের যোয়ান ভাইটা, উসখুস করে ক্রমাগত। ভুবনের চোখ জ্বলে ওঠে থেকে থেকে। ময়নার মা টের পায়, একটু যদি বাড়াবাড়ি করে মন্মথ, আর রক্ষা থাকবে না!

মেয়েটাকে বলে ময়নার মা, শীতে কাঁপুনি ধরেছে, শো' না গিয়া বাছা? তুমিও শুইয়া পড় বাবা। আপনে অনুমতি ভান দারোগাবাবু, জামাই শুইয়া পড়ুক। কত মানত কইরা, মাথা কপাল কুইটা আনছি জামাইরে,—ময়নার মা'র গলা ধরে যায়, আপনারে কি কমু দারোগাবাবু—

ময়না ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। ভুবন যায় না।

আরও দু'বার ময়নার মা সস্নেহে সাদর অনুরোধ জানায় তাকে, তবু ভুবনকে ইতস্ততঃ করতে দেখে বিরক্ত হয়ে জোর দিয়ে বলে, গুরুজনের কথা শোন, শোও গিয়া। খাড়াইয়া কি করবা? ঝাঁপ বন্ধ কইরা শোও।

তখন তাই করে ভুবন। যতই তাকে জামাই মনে না হোক, এরপর না মেনে কি আর চলে যে সে জামাই? মন্মথ আস্তে আস্তে বাইরে পা বাড়ায়। পকেট থেকে চ্যাপ্টা শিশি বার করে ঢেলে দেয় গলায়।

পরদিন মুখে মুখে এ গল্প ছড়িয়ে যায় দিগ-দিগন্তে, দুপুরের আগে হাতীপাড়ার জগমোহন আর জোতদার চণ্ডী ঘোষ আর বড় থানার বড় দারোগার কাছে পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়। গাঁয়ে গাঁয়ে লোকে বলাবলি করে ব্যাপারটা আর হাসিতে ফেটে পড়ে, বাহবা দেয় ময়নার মাকে। এমন তামাসা কেউ কখনো করে নি পুলিশের সঙ্গে, এমন জব্দ করেনি পুলিশকে। ক'দিন আগে দুপুরবেলা পুরুষশূন্য গাঁয়ে পুলিশ এলে ঝাঁটা বঁটি হাতে মেয়ের দল নিয়ে ময়নার মা তাদের তাড়া করে পার করে দিয়েছিল গাঁয়ের সীমানা! সে যে এমন রসিকতাও জানে, কে তা ভাবতে পেরেছিল?

গাঁয়ের মেয়েরা আসে দলে দলে, অনিশ্চিত আশঙ্কা ও সম্ভাবনায় ভরা এমন যে-ভয়ঙ্কর সময় চলেছে এখন, তার মধ্যেও তারা আজ ভাবনা চিন্তা ভুলে হাসিখুশীতে উচ্ছল।

মোক্ষদার মা বলে একগাল হেসে গালে হাত দিয়ে, মাগো মা ময়নার মা, তোর মক্তি এত?

ক্ষেন্তি বলে ময়নাকে, কিলো ময়না, জামাই কি কইলো? দিছে কি?

লাজে ময়না হাসে।

বেলা পড়ে এলে, কাল যে সময় ভুবন মণ্ডল গাঁয়ে পা দিয়েছিল প্রায় সেই সময়, আবির্ভাব ঘটে জগমোহনের। বয়স তার ছাব্বিশ সাতাশ, বেঁটে খাটো যোয়ান চেহারা, দাড়ি কামানো, চুল আঁচড়ানো। গায়ে ঘরকাচা সার্ট, কাঁধে মোটা সুতির সাদা চাদর। গাঁয়ে ঢুকে গটগট করে সে চলতে থাকে হারাণের বাড়ীর দিকে, এপাশ ওপাশ না তাকিয়ে, গম্ভীর মুখে।

রসিক ডাকে দাওয়া থেকে, জগমোহন নাকি? কখন আইলা?

নন্দ বলে, আরে শোন, শোন, তামুক খাইয়া যাও।

জগমোহন ফিরেও তাকায় না।

রসিক ভড়কে গিয়ে নন্দকে শুধোয়, কি কাণ্ড বুঝ্‌লা নি?

কেমনে কমু?

অবাক হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে দু'জনে।

পথে মথুরের ঘর। তার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা আছে জগমোহনের। নাম ধরে হাঁক দিতে ভেতর থেকে সাড়া আসে না, বাইরের লোক জবাব দেয়। ঘরের কাছেই পথের ওপাশে একটা তালের গুঁড়িতে দু'জন মানুষ বসে ছিল নির্লিপ্তভাবে, একজনের হাতে খোঁটা শুদ্ধ গরু-বাঁধা দড়ি।

তাদের একজন বলে, বাড়ীতে নাই। তুমি কেডা, হারামজাদাটারে খোঁজ ক্যান?

জগমোহন পরিচয় দিতেই দুজনে তারা অন্তরঙ্গ হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে।

অ! তুমিও আইছ ব্যাটারে দুই ঘা দিতে?

তা ভয় নেই জগমোহনের, তারা আশ্বাস দেয়, হাতের সুখ তার ফসকাবে না। কাল সন্ধ্যায় গেছে গাঁ থেকে, এখনো ফেরেনি মথুর, কখন ফিরে আসে ঠিকও নাই, তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না জগমোহনকে। মথুর ফিরলে তাকে যখন বেঁধে নিয়ে যাওয়া হবে বিচারের জন্য, সে খবর পাবে। সবাই মিলে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলার আগে তাকেই নয় সুযোগ দেওয়া হবে মথুরের নাক কানটা কেটে নেবার, সে ময়নার মার জামাই, তার দাবী সবার আগে!

শাউড়ী পাইছিলা দাদা একখান!

নিজের হইলে বুঝতা। জগমোহন জবাব দেয় ঝাঁঝের সঙ্গে চলতে আরম্ভ করে। শুনে দুজনে তারা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে অবাক হয়ে!

অচমকা জামাই এল, মুখে তার ঘন মেঘ। দেখেই ময়নার মা বিপদ গণে। ব্যস্ত সমস্ত না হয়ে হাসি মুখে ধীরে শান্তভাবে অভ্যর্থনা জানায়, তার যেন আশা ছিল, জানা ছিল, এ সময় এমনি ভাবে জামাই আসবে, এটা অঘটন নয়! বলে, আস বাবা আস। ও ময়না, পিড়া দে। ভাল নি আছে বেবাকে? বিয়াই বিয়ান পোলামাইয়া?

আছে।

আরেকটুকু ভড়কে যায় ময়নার মা। কত গোসা না জমা আছে জামাই-এর কাটা ছাঁটা এই কথার জবাবে। ময়নার দিকে তার না-তাকাবার

ভঙ্গিটাও ভাল ঠেকে না। পড়ন্ত রোদে লাউমাচার শাদা ফুলের শোভা ছাড়া আর কিছুই যেন চোখ চেয়ে দেখবে না শ্বশুরবাড়ীর পণ করেছে জগমোহন। লক্ষণ খারাপ।

ঘর থেকে কাঁপা কাঁপা গলায় হারাণ হাঁকে, আসে নাই? হারামজাদা আসে নাই? হায় ভগবান!

নাতিরে খোঁজে, ময়নার মা জগমোহনকে জানায়, বিয়ান থেইকা ছাখে না, উতলা হইছে।

ময়নার মা প্রত্যাশা করে যে নাতিকে হারাণ সকাল থেকে কেন ছাখে না কি হয়েছে হারাণের নাতির, ময়নার ভায়ের, জানতে চাইবে জগমোহন কিন্তু কোন খবর জানতেই এতটুকু কৌতূহল দেখা যায় না তার।

খাড়াইয়া রইলা ক্যান? বস বাবা, বস।

জগমোহন বসে। ময়নার পাতা পিঁড়ি সে ছোঁয় না, দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে উবু হয়ে বসে।

মুখ হাত ধুইয়া নিলে পারতা।

না, যামু গিয়া অখনি।

অখনি যাইবা?

হ। একটা কথা শুইনা আইলাম। মিছা না খাঁটি জিগাইয়া যামু গিয়া। মাইয়া নাকি কার লগে শুইছিল কাইল রাইতে?

শুইছিল? ময়নার মার চমক লাগে, মোর লগে শোয় মাইয়া, মোর লগে শুইছিল, আর কার লগে শুইব?

ব্রহ্মাণ্ডের মাইনষে জানছে কার লগে শুইছিল। চোখে দেইখা গেছে দুয়ারে ঝাঁপ দিয়া কার লগে শুইছিল।

তারপর বেধে যায় শাশুড়ী-জামায়ে। প্রথমে ময়নার মা ঠাণ্ডা মাথায় নরম কথায় ব্যাপরটা বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করে, কিন্তু জগমোহনের ওই এক গোঁ! ময়নার মাও শেষে গরম হয়ে ওঠে। বলে, তুমি নিজে মন্দ, অন্যেরে তাই মন্দ ভাব। উঠানে মাইনষের গাদা, আমি খাড়া সামনে, এক দণ্ড ঝাঁপটা দিছে কি না দিছে, তুমি দোষ ধরলা। অন্যে তো কয় না?

অন্যের কি? অন্যের বৌ হইলে কইতো।

বড় ছোট মন তোমার। আইজ মণ্ডলের নামে এমন কথা কইলা, কাইল কইবা যুয়ান ভায়ের লগে ক্যান কথা কয়।

কওন উচিত। ও মাইয়া সব পারে। শুধু গরম কথা নয়, ময়নার মা গলা ছেড়ে উদ্ধার করতে আরম্ভ করে জগমোহনের চোদ্দপুরুষ। হারাণ কাঁপা গলায় চেঁচায়, আইছে নাকি? আইছে হারামজাদা? হায় ভগবান, আইছে?. ময়না কাঁদে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। ছুটে আসে পাড়াবেড়ানি নিন্দাছড়ানি নিতাই পালের বৌ আর প্রতিবেশী কয়েকজন স্ত্রীলোক।

কি হইছে গো ময়নার মা? নিতাই পালের বৌ শুধায়, মাইয়া কাঁদে ক্যান?

তাদের দেখে সম্বিৎ ফিরে পায় ময়নার মা, ফোঁস করে ওঠে,—কাঁদে ক্যান? ভাইটারে ধইরা নিছে, কাঁদব না?

জামাই বুঝি আইছে খবর পাইয়া?

শুনবা বাছা, শুনবা। বইতে দাও, জিরাইতে দাও।

ময়নার মার বিরক্তি দেখে ধীরে ধীরে অনিচ্ছুক পদে মেয়েরা ফিরে যায়। তাকে ঘাঁটাবার সাহস কারো নেই। ময়নার মা মেয়েকে ধমক দেয়, কাঁদিস না। বাপেরে নিয়া ঘরে গেছিলি, বেশ করছিলি, কাঁদনের কি?

বাপ নাকি? জগমোহন বলে ব্যঙ্গ করে।

বাপ না? মণ্ডল দশটা গাঁয়ের বাপ। খালি জন্মো দিলেই বাপ হয় না, অন্ন দিলেও হয়। মণ্ডল আমাগো অন্ন দিছে। আমাগো বুঝাইছে, সাহস দিছে, একসাথ করছে, ধান কাটাইছে। না তো চণ্ডী ঘোষ নিত বেবাক ধান। তোমারে কই জগু, হাতে ধইরা কই, বুইঝা ছাখো, মিছা গোসা কইরো না।

বুইঝা কাম নাই। অখন যাই।

রাইতটা থাইকা যাও। জামাই আইলা, গেলা গিয়া, মাইনষে কি কইব?

জামায়ের অভাব কি। মাইয়া আছে, কত জামাই জুটবো।

বেলা শেষ হতে না হতে ঘনিয়ে এসেছে শীতের সন্ধ্যা। অল্প অল্প কুয়াশা নেমেছে। ঘুঁটের ধোঁয়া ও গন্ধে নিশ্চল বাতাস ভারি। যাই বলেই যে গা তোলে জগমোহন তা নয়। ময়নার মারও তা জানা আছে যে, শুধু শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া করে যাই বলেই জামাই গট গট করে বেরিয়ে যাবে না। ময়নার সাথে বোঝাপড়া, ময়নাকে কাঁদানো, এখনো বাকী আছে। যদি যায় জামাই, মেয়েটাকে নাকের জলে চোখের জলে এক করিয়ে তারপর যাবে। আর কথা বলে না ময়নার মা, আস্তে আস্তে উঠে বেরিয়ে

যায় বাড়ী থেকে। ঘরে কিছু নেই, মোয়ামুড়ি কিছু যোগার করতে হবে। খাক বা না খাক সামনে ধরে দিতেই হবে জামায়ের।

চোখ মুছে নাক ঝেড়ে ময়না বলে ভয়ে ভয়ে, ঘরে আস।

খাসা আছি। শুইছিলা তো ?

না, মা কালীর কিরা, শুই নাই। মায় কওনে খালি ঝাঁপটা দিছিলাম, বাঁশটাও লাগাই নাই।

ঝাঁপ দিছিলা, শোও নাই। বেউলা সতী!

ময়না তখন কাঁদে।

তোমার লগে আইজ থেইকা শেষ।

ময়না আরও কাঁদে।

ঘর থেকে হারাণ কাঁপা গলায় হাঁকে, আসে নাই ? ছোঁড়া আসে নাই ? হায় ভগবান!

থেমে থেমে এক একটা কথা বলে যায় জগমোহন, না থেমে অবিরাম কেঁদে চলে ময়না, যতক্ষণ না কান্নাটা একঘেয়ে লাগে জগমোহনের। তখন কিছুক্ষণ সে চুপ করে থাকে। মুড়িমোয়া যোগার করে পাড়া ঘুরে ময়নার মা যখন ফিরে আসে, ময়না তখন চাপা সুরে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। বেড়ার বাইরে সুপারি গাছটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে ময়নার মা। সারাদিন পরে এখন তার দু'চোখ জলে ভরে যায়। জোতদারের সাথে, দারোগা পুলিশের সাথে লড়াই করা চলে, অবুঝ পাষণ্ড জামাইয়ের সাথে লড়াই নেই! ·

আপন মনে আবার হাঁকে হারাণ, আসে নাই ? মোর মরণটা আসে নাই ? হায় ভগবান!

জগমোহন চুপ করেছিল, এতক্ষণ পরে হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করে শালার খবর।—উয়ারে ধরছে ক্যান ?

ময়নার কান্না থিতিয়ে এসেছিল, সে বলে, মণ্ডলখুড়ার লগে গোঁদলপাড়া গেছিল, ফিরতি পথে একা পাইয়া ধরছে।

ক্যান ধরছে ?

কাইল জব্দ হইছে, সেই রাগে বুঝি।

বসে বসে কি ভাবে জগমোহন, আর কাঁদায় না ময়নাকে। ময়নার মা ভেতরে আসে, কাঁসিতে মুড়ি আর মোয়া খেতে দেয় জামাইকে, বলে, মাথা খাও, মুখে দাও।

আবার বলে, রাইত কইরা ক্যান যাইবা বাবা ? থাইকা যাও।

থাকনের যো নাই। মা দিব্যি দিছে।

তবে খাইয়া যাও ? আখা ধরাই ? পোলাটারে ধইরে নিছে, পরাণডা পোড়ায়। তোমারে রাইখা জুড়ামু ভাবছিলাম।

না, রাইত বাড়ে।

আবার কবে আইবা ?

দেখি।

উঠি উঠি করেও দেরী হয়। তারপর আজ সন্ধ্যারাতেই পুলিশ হানার সেইরকম সোর ওঠে কাল মাঝরাত্রির মত। সদল বলে মন্মথ আবার আচমকা হানা দিয়েছে। আজ তার সঙ্গের শক্তি কালের চেয়ে অনেক বেশী। তার চোখ সাদা।

সোজাসুজি প্রথমেই হারাণের বাড়ী।

কি গো মণ্ডলের শাশুড়ী, মন্মথ বলে ময়নার মাকে, জামাই কোথা ?

ময়নার মা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

এটা আবার কে ?

জামাই। ময়নার মা বলে।

বাঃ, তোর তো মাগী ভাগ্যি ভাল, রোজ নতুন নতুন জামাই জোটে! আর তুই ছুঁড়ি এই বয়সে—

হাতটা বাড়িয়েছিল মন্মথ রসিকতার সঙ্গে ময়নার থুতনি ধরে আদর করে একটু নেড়ে দিতে। তাকে পর্য্যন্ত চমকে দিয়ে জগমোহন লাফিয়ে এসে ময়নাকে আড়াল করে গর্জ্জে ওঠে, মুখ সামলাইয়া কথা কইবেন!

বাড়ীর সকলকে, বুড়ো হারাণকে পর্য্যন্ত, গ্রেপ্তার করে আসামী নিয়ে রওনা দেবার সময় মন্মথ দেখতে পায় কালকের মত না হলেও লোক মন্দ জমেনি। দলে দলে লোক ছুটে আসছে চারিদিক থেকে, জমায়েৎ মিনিটে মিনিটে বড় হচ্ছে। মথুরার ঘর পার হয়ে পাণা পুকুরটা পর্য্যন্ত গিয়ে আর এগোনো যায় না। কালের চেয়ে সাত আটগুণ বেশী লোক পথ আটকায়। রাত বেশী হয়নি, শুধু এগাঁয়ের নয়, আশেপাশের গাঁয়ের লোক ছুটে এসেছে। এটা ভাবতে পারে নি মন্মথ। মণ্ডলের জন্য হলে মানে বুঝা যেত, হারাণের বাড়ীর লোকের জন্য চারিদিকের গাঁ ভেঙে মানুষ এসেছে! মানুষের সমুদ্রের, ঝড়ের উত্তাল সমুদ্রের, সঙ্গে লড়া যায় না।

ময়না তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়েই রক্ত মুছিয়ে দিতে আরম্ভ করে জগমোহনের। নব্বই বছরের বুড়ো হারাণ সেইখানে মাটিতে মেয়ের কোলে এলিয়ে নাতির জন্য উতলা হয়ে কাঁপা গলায় বলে, ছোঁড়া গেল কই ? কই গেল ? হায় ভগবান!

ধান

অন্ধকার উৎকর্ণ হয়ে আছে ধানের গোলাটা ঘিরে, মাঝরাত্রির চাঁদডোবা অন্ধকার। সন্তর্পণে পা ফেলে এগিয়ে গাঢ়তর ছায়ায় মিশে যাবার চেষ্টা করছে অর্দ্ধ-উলঙ্গ মূর্ত্তিটা, শ্বাসরোধ করে দু'চোখে অন্ধকার ভেদ করে আবিষ্কারের চেষ্টা করছে প্রহরীর গোপন উপস্থিতি। অ-্যন্ত ভয়ে উত্তেজনায় টান টান হয়ে গেছে অর্দ্ধ-উলঙ্গ দেহটা।

পাহারা নেই? এ দিনে ধানের গোলা, প্রাণের গুদাম, পাহারাশূন্য? এটা ধাঁধাঁর মত লাগে পাঁচুর কাছে। নিশ্চয় ঘুমিয়ে আছে পাহারাদার অন্তরালে আরামের ব্যবস্থা করে, নয় কর্ত্তব্যে ফাঁকি দিয়েছে ফুর্ত্তির জন্য কোথাও গিয়ে। মানুষ যখন ধানের জন্য উন্মাদ, গাঁঘেঁসা মরণ ঠেকাতে দিশেহারা, মরিয়া, গোলাভরা ধান তখন অরক্ষিত রেখে দিতে পারে শরৎ হালদার?

কাঁধের ঝোলা নামিয়ে রাখে পাঁচু, ঝোলা থেকে বার করে চকচকে দা, তারার আলোয় ঝিকমিক করে ওঠে তার ধার। গোলার যেটা পিছন দিক, দু'তিন হাত তফাতেই এক ইটের দেওয়াল, সেইখানে সেঁতসেঁতে শেওলায় জমানো আবর্জ্জনায় দাঁড়িয়ে সিমেণ্টের ভিত্তির আধ হাত উঁচুতে গোলার মাটি-লেপা চাঁচের বেড়া কাটতে সুরু করে। অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে, আওয়াজ বাঁচিয়ে ধীরে ধীরে সিঁদ দেয় সঞ্চিত জীবনের ভাণ্ডারে। ছোট খাট গর্ত্ত হলেই যথেষ্ট, সেই ফুটো দিয়েই শস্যকণা ঝুর ঝুর করে বেরিয়ে আসবে। তার থলি ভরে যাবে। উপোস-জ্বরের শাস্তি ঘটিয়ে কাল অন্নপথ্য করবে সে আর বুঁচি!

দেয়াল ভেদ হয়। ধান গড়িয়ে আসে না। ডান হাতটা পাঁচু সবখানি ঠেলে ঢুকিয়ে দেয় ভেতরে ছড়ে যায় কেটে যায় হাতের চামড়া। গোলার মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে ধান খোঁজে। দু'চারটে ধান পড়ে আছে মেঝেতে, গোলা ধানশূন্য!

হাত বার করে এনে হতভম্ব পাঁচু ভাবে, এ কেমন ধাঁধা, কিসের পরিহাস! কালও ধান ছিল গোলায়, কি করে কোথায় উধাও হয়ে গেল ধান? পাপী সে, চোরছেঁচর, তার স্পর্শেই কি শূন্য হয়ে গেল ধানের গোলা?

মণ্ডল সাঁতরা ভৌমিকরা ভোর ভোর গাঁ-শুদ্ধ লোক জুটিয়ে এনে শরৎ হালদারের ধানের গোলায় চড়াও হবে, টেনে বার করবে তার মজুত, সবার সামনে ওজন করে ন্যায্য দামে বেচে দেবে গাঁয়ের উপোসী মানুষদের—এ পরামর্শ চুপে চুপে শুনেছিল পাঁচু। খিদেয় খ্যাপা মানুষগুলি হানা দেবার আগে নিজের ঝুলিটা ভরে নেবার ফিকিরে এসেছিল। সব মিথ্যে হয়ে গেল!

নিজের কপালে জোরে চাপড় মারে পাঁচু। দু'চোখ তার ফেটে যায় জল আসার তাগিদে। তার ঝুলি নয় ভরলো না তার দুরদৃষ্ট, শ' দেড়শ' মানুষ যে হাঁ করে আছে কাল কিছু ধান পাবার আশায়, কাকে তারা অভিশাপ দেবে!

সোনা মণ্ডল আপশোষ করে বলে, রাতারাতি পাঁচশো মণ ধান সরিয়ে ফেলল, কেউ টের পেলে না? শুধু পরামর্শই হল, কেউ নজর রাখলে না? আমি নয় গেছিলাম কুটুমবাড়ী—

ঋষি পাঞ্জা বলে, কেন গেলে? নিশ্চিন্দি হয়ে তুমি কুটুম্বাড়ী যেতে পার, মোরা ঘুমোতে পারি না নিশ্চিন্দি হয়ে?

ঋষি তোকে আমি—আগুন বর্ষণ করে সোনা মণ্ডলের চোখ।

পরাণ ভৌমিক বলে, কেন? কেন ধমকাবে ওকে? দাম্ভিক মোরা সবাই নই? রাতারাতি পাঁচশো মণ ধান সরাবে কুথা দিয়ে কেমন করে তুমি ভাবলে। মোরা ভাবতে পারি না রাতারাতি কুথা দিয়ে কেমন করে পাঁচশো মণ ধান সরাবে?

তা বটে, হক্ কথা।—চোখের নিমিষে শান্ত অনুতপ্ত হয়ে যায় সোনা মণ্ডল, মোদের সবার খেয়াল করা উচিত ছিল হালদার মশায় মস্ত ঘুঘু। কিন্তুক্ কি ব্যাপারটা বল দিকি, এঁ্যা! কুথা সরালো, কেমন করে সরালো ধান?

এই কথাই ভাবে সবাই। ছেলে বুড়ো মুখ চাওয়া চাওয়ি করে, মূক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ধাঁধাঁ যাই হোক, ভুল যাই হয়ে থাক, শরৎ হালদারকে টেনে এনে ছিঁড়ে ফেলা যায়। ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলা যায় বুড়ী কচি মেয়ে পুরুষ যে আছে তার বাড়ীতে—আগুন দিয়ে ছাই করে

দেওয়া যায় তার বাড়ী। পাকা দালান তো তার একটা ভিটের তিন খানা ঘর, বাকী বাঁশ কাঠ খড়ের মহাল আগুন দিলেই দাউ দাউ করে জ্বলবে। সেই আগুনের আঁচে পুড়ে না যাক গলে যাবে পাকা দালানের লোহার সিন্দুকের সোনা।

কিন্তু তাতে তো আর ধান মিলবে না। সে হবে শুধু প্রতিহিংসা।

ফিরে চলে যাচ্ছিল সবাই আপশোষ বুকে নিয়ে, মিছামিছি হাঙ্গামা করার স্বভাব তাদের নয়, বাংলা দেশের মানুষ কখনও প্রমাণ ছাড়া শাস্তি দেয় না। শরৎ হালদারের কি দুর্মতি হল, কি খেয়াল চেপে গেল একটু বাহাদুরী করার, গোমস্তা সে পাঠিয়ে দিল তার প্রতিনিধি হিসাবে বজ্জাত লোকগুলিকে দু'চারটে ধমক ধামক দিতে।

ধান পেলে সোনা মণ্ডল? উল্লাসে উত্তেজনায় বিকৃত ব্যঙ্গের সুরে চেঁচিয়ে বলল নারায়ণ তার ফতুয়ার বোতাম আঁটতে আঁটতে, বলি ধান পেলে গোলায়?

ফিরে যাচ্ছিল, ফিরে যেত সবাই, এই উৎকট ধিক্কারে গুম খেয়ে গেল গাঁয়ের শ'দেড়েক পুরুষ। অসহ্য বিস্ময়ে তাকালো দু'চোখে জ্বলন্ত প্রশ্ন নিয়ে।

গোমস্তা নারায়ণের কি অত খেয়াল আছে, চিরকাল মানুষ ঠেঙিয়ে সে তিরস্কার দূরে থাক, পেয়েছে পুরস্কার।

আবার সে চেঁচায়, বলি গোলার ধান ন্যায্য দরে বাঁটোয়ারা করলে না সোনা মণ্ডল?

ধান কোথা গেল নারাণ? সোনা মণ্ডল প্রশ্ন করল জোরালো গলায়। এগিয়ে গিয়ে বাঁ হাতে সে চুল মুঠো করে ধরল নারায়ণের, ডান হাতে মুঠো করে ধরল তার বুকের ফতুয়া, টেনে আনল সবার মধ্যে।

ধান কোথায় গেল?

আমি—আমি—হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল নারায়ণ। দম আটকে শ্বাস টেনে বিহ্বল হয়ে ভয়ার্ত কান্না।

এক ধাক্কায় তাকে উঠানে ফেলে দিল সোনা মণ্ডল। মুখ বাড়িয়ে থুতু ফেলল তার মুখে। ধারালো দা' বাগিয়ে কোপ দিতে ছুটে যাচ্ছিল জোয়ান মজিদ, বাঁ হাতে সাপটে ধরে তাকে ও আটকাল।

বলল, দুৎ! ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করব না।

সুবল মশাল জ্বেলেছে। এগিয়ে গেছে হালদারের গোয়াল ঘরের চালায় আগুনের ছোঁয়াচ দিতে। সোনা মণ্ডল ছুটে গিয়ে মশাল কেড়ে নিল।

কি পোড়াবী? ঘরবাড়ী? ঘরবাড়ী কি শত্তুতা করেছে মোদের সাথে? ঘর পুড়বে মিছিমিছি, শত্তুর পালাবে, কাল মিলিটারী এনে গুলির চোটে ভুলিয়ে দেবে রাইকিশোরীর নামটা।

সোনা মণ্ডলের গালে একটা চড় বসিয়ে দেয় নগেন কুণ্ডু, তার আশা-ভরসা, টাকা খরচ ব্যর্থ হয়েছে। মুকুলের দিকে তাকিয়েই তার জ্ঞান ফিরে আসে, উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দেয় দিগ্‌ বিদিক জ্ঞান হারিয়ে, এঁদো ডোবার পাশ দিয়ে পড়ি-মরি ভাবে ছুটে অদৃশ্য হয়ে যায় আম-বাগানে। মুকুল আর বটুক তার পিছু তিনবার হাঁক দেয় সোনা মণ্ডল গলা চড়িয়ে চড়িয়ে, মুকল আর বটুক অনিচ্ছায় থেমে ফিরে আসে।

সোনালী তাজা রোদ উঠে গেছে ততক্ষণে। খানিক দূরে সরকারী সড়ক দিয়ে আওয়াজ তুলে তুলে ধুলো উড়িয়ে নন্দীপুরের বোঝাই বাসটা চলে গেল। আজ দেরী করেছে, সদর থেকে ভোর চারটায় ছেড়ে আরও আগে গাঁ ঘেঁষে বাসটা বেরিয়ে যায়, ওঠানামার যাত্রী না থাকলে থামেও না।

বাসটা যেন থেমেছিল এদিকে রাস্তাটা যেখানে বড়পাড়ার ঘরবাড়ীর আড়ালে। টিনের ছোট বাক্সটি হাতে ঝুলিয়ে উল্লাসকে আসতে দেখা যায়। মামলাবাজি ব্যবসা উল্লাসের, অনেক উকীল-মোক্তারের চেয়ে তার অনেক বেশী উপার্জ্জন। সম্প্রতি এগার জন চাষীর নামে একদিনে হালদার সতরটা মামলা সুরু করেছে, তাই নিয়ে বড়ই ব্যস্ত হয়ে আছে, গাঁ আর সদর করে বেড়াচ্ছে হরদম্।

জমায়েৎ দেখে সে তফাতেই থমকে দাঁড়ায়। হালদারের বাড়ীর সামনে ভিড় জমাটা শুভ চিহ্ন নয়। দিনকাল সুবিধে নয়।

কুক্ষণে অসময়ে বাস থেকে নেমেছিল উল্লাস, ক্ষুব্ধ ব্যাহত মানুষ-গুলির সামনে এসে পড়েছিল, তার বিরুদ্ধে যাদের বুকে বহুদিনের জমা করা পুঞ্জ পুঞ্জ ঘৃণার আগুন। সোনা মণ্ডলের গালে চড় মেরেও কুণ্ডু ছুটে পালিয়ে বেঁচে গিয়েছে, কারণ মানুষটা সে যেমন হোক সে তাদেরই মানুষ, সাথে এসেছিল একই উদ্দেশ্যে, তার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সঞ্চিত ছিল না যে হঠাৎ কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে একটা দোষ করলেই বারুদের মত ফেটে পড়বে। সবাই জানে, ওবেলাই হয়তো দেখা যাবে সোনা

মণ্ডলের দাওয়ায় বসে সে কলকে ফুঁকছে, মাপ চেয়ে মিটিয়ে নিয়েছে ব্যাপারটা।

কিন্তু উল্লাসের ওপর বড় রাগ তাদের, বহুদিন ধরে মনগুলি জর্জ্জরিত অভিশাপ হয়ে আছে। হঠাৎ গর্জ্জন করে ওঠে আড়াইশো লোক, তাতে তলিয়ে যায় সোনা মণ্ডল আর অন্য কয়েকজন ঠাণ্ডামাথা মানুষের প্রতিবাদ। চিরদিনের জন্য শেষ হয়ে যায় ফন্দি-ফিকিরের জালবোনা, মানুষের পর মানুষকে পথে নামানোর অধ্যবসায়, শিশির ভেজা ঘাসে চিৎ হয়ে উল্লাসের দৃষ্টিহীন পলকহীন চোখ মেলা থাকে আকাশের দিকে। বাতাসে উড়ে যায় ছিঁড়ে কুটিকুটি করা দলিল পত্র, নোটের তাড়াটা পর্য্যন্ত কেউ ছোঁয় না, আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলে।

জানালার ফাঁকে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে ঘামে সর্ব্বাঙ্গ ভিজে যায় শরৎ হালদারের, বন্দুক ধরা হাতটা পর্য্যন্ত থর থর কাঁপতে থাকে।

ফুঁপিয়ে কাঁদে মেয়ে বিন্নু, ছেলের বৌ রাধা গা থেকে গয়না খোলার ব্যস্ততায় আলগা অনন্তটা টানাটানি করে যেন খুলতে পারে না, হালদার-গিন্নী মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে থাকে সিঁন্দুর মাখা লক্ষ্মীর পটটার সামনে, দাঁতে দাঁতে চেপে মূক হয়ে থাকে হালদারের দুই যোয়ান ছেলে।

খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে কখন লোক গেছে থানায় খবর দিতে, এখনো এলনা নৃপেন দারোগা দলবল নিয়ে। এমনি বিপদে দয়া করে ছুটে আসার অগ্রিম মূল্য নিয়ে রেখেছে, তবু।

হালদারের জন্য জীবন দেয় উল্লাস, এই তার শেষ কাজ। কিন্তু জীবন দিয়েও যেন অপকার করে যায় শেষবারের মত। শূন্য গোলা দেখে ক্রোধে, ক্ষোভে, ফুঁসতে ফুঁসতে ফিরেই যেত ধৈর্য্যহারা মরিয়া মানুষগুলি, হালদারের বাড়ী চড়াও হত না। ধান তারা লুটতে আসেনি, কিনতে এসেছিল গায়ের জোরে—তার বেশী আর কিছু করার কথা মাথায় ছিল না। উল্লাসের অনেক দিনের পুরানো পাওনা ঝোঁকের মাথায় মিটিয়ে দিয়ে মনের গতি যেন ঘুরে গেছে তাদের। গোলার ধান কোথায় গেল, এ প্রশ্নের জবাব হালদারের কাছেই আদায় করার সাধ জেগেছে।

জবাব চাই, ধান কি হল। জবাব দিতে হবে হালদারকে।

উঠানে দালানের সামনে তারা ভিড় করে দাঁড়ায়। ডাকে, হালদার মশায়, হালদার মশায়।

দরজা জানালা ভেতর থেকে বন্ধ। কিছুক্ষণ কারো সাড়াশব্দ মেলে না। তারপর ধীরে ধীরে জানালার একটা পাট খুলে গিয়ে শিকের ফাঁকে দেখা যায় বড় মেয়ে বিন্নুর ভয়ার্ত্ত মুখ।

বাবা বাড়ী নেই।

বাড়ী আছে, লুকিয়ে আছে, গর্জ্জন করে ওঠে তারা, আসতে বলো হালদার মশায়কে, নইলে দরজা ভেঙ্গে ফেলব।

বন্দুক তোলে হালদার, বড় ছেলে ঠেকিয়ে রাখে। বলে, একটা বন্দুকে কি হবে? আরও ক্ষেপে যাবে সবাই।

বোনকে সরিয়ে সে জানালায় দাঁড়ায়। বলে, কি চাই সোনা মণ্ডল?

গোলার ধান কোথা গেল? মোরা কিনতে এয়েছি ধান।

ধান নেই, বেচে দিয়েছি।

কাকে বেচলে? কখন বেচলে?

জগৎ কুণ্ডুকে বেচে দিয়েছি। রাত্রে ধান নিয়ে গেছে।

বেচে দিয়েছ! গাঁয়ের লোক না খেয়ে মরছে, তুমি ধান বেচে দিয়েছ!

জানালার পাট ধীরে ধীরে বন্ধ করে দেয় বড় ছেলে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে জানালা নয়, দরজাই খুলে দিতে হয় পরাণ ভৌমিক আর সোনা মণ্ডলকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়ার জন্য। রাতারাতি পাঁচশো মণ ধান সরিয়ে নিয়ে গেছে সাতকুঁড়ার জগৎ কুণ্ডু, কিন্তু গাঁয়ের লোক কেউ টের পায়নি, এটা সহজে বিশ্বাস করতে চায়নি তারা। দালানের তিনটে কোঠা খুঁজে দেখার দাবী করেছে।

শুধু দু'জন ভেতরে আসবে—এই সর্ত্তে দরজা খুলেও দিতে হয়েছে।

ঘরে ফিরে পাঁচু কাপড়ে বাঁধা আধসেদ্ধ ভেজা চালগুলি টুকরিতে ঢেলে রাখে। বুঁচি খুসী হয়ে বলে, আ মর! কোথাকার কুড়োনো চাল?

পাঁচু হাসে। উনান থেকে ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে রেখে দালানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল হালদারের বড় বৌ, হাঁড়ি থেকে আধসিদ্ধ চালগুলি পাঁচু ছেঁকে তুলে কোঁচরে বেঁধে এনেছে।

গভীর রাত্রে লরী এসেছিল জগৎ কুণ্ডুর, দশজন লোক নিয়ে। সরকারী রাস্তায় থেমেছিল লরী।

ইঞ্জিন না চালিয়ে নিঃশব্দে লরীটা ঠেলে আনা হয়েছিল হালদারের বাড়ীর কাছে, হাতে হাতে গোলার ধান কিছুক্ষণের মধ্যে উঠে এসেছিল লরীতে, আবার ঠেলে লরী নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বড় রাস্তায়।

দিনের বেলায় প্রকাশ্যে কতবার এসেছে লরীটা, ধান-চাল নিয়ে গেছে গাঁয়ের লোকের চোখের সামনে দিয়ে, তখনো মরিয়া হয়ে ওঠেনি গাঁয়ের লোক পেটের জ্বালায়। লরীর চাকার অনেক দাগের সঙ্গে মিশে গিয়েছে গত রাত্রির আনাগোনার নতুন দাগ।

জগৎ কুণ্ডুর তিনটে আড়ত, একটা গাঁয়ে, একটা নন্দীপুরে, একটা সদরে। তার কোনটাতেই যায়নি ধান নিয়ে লরীটা, বড় সড়ক ধরে ক্রোশ দুই নন্দীপুরের দিকে গিয়ে বাঁয়ে মোড় ঘুরেছিল অন্য রাস্তায়, হাজির হয়েছিল তিন ক্রোশ তফাতে নদীর ধারে পলাশডাঙ্গায়।

ধান-চাল চোরা চালানের এখানে একটা ঘাঁটি আছে কুণ্ডুর!

জানে অনেকেই, এক রকম প্রকাশ্যভাবেই চোরা চালান চলে। গোপনতা শুধু এতটুকু যে, সরকারীভাবে ব্যাপারটা স্বীকৃত হয় না।

টিনের চালা, সিমেণ্ট করা মেঝে। অত্যন্ত অবহেলার সঙ্গে ধানগুলি মেঝেতে ছড়িয়ে ঢেলে ফেলা হয়। এক কোণে অল্প কিছু চাল-পড়েছিল মেঝেতে, চাল ও তুষের গুঁড়ো। বোঝা যায় গুদামে চাল জমা হয়েছিল, সম্প্রতি সরানো হয়েছে, এখনো মেঝে ঝাঁট দেওয়াও হয়নি। অলস স্তিমিত চোখে তাকায় নারায়ণ, শস্যের গন্ধ তার নাকে লাগে না, নাক ভোঁতা হয়ে গেছে। ছোট ঝাঁটাটি হাতে নিয়ে সাগ্রহ প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে রাজু, মা ও মেয়ে। ধান গুদাম-ঘরে তুলতে যে কটি দানা পথে মাটিতে ঝরে পড়বে, ঝেঁটিয়ে ওরা কুড়িয়ে নেবে। খেয়ে বাঁচবে।

ধান যারা আগে গুদামে তুলেছিল, তাদের একজন বোঝা থেকে কিছু ধান হাত বাড়িয়ে মাটিতে ছড়িয়ে দেয়, আড় চোখে চেয়ে হাসে। রাজু তার শীর্ণ মুখে খুসীর ভাব ফোটাতে চেষ্টা করে। মাটিতে ঝরে পড়া শস্যকণা কুড়িয়ে নেবার এক-চেটিয়া অধিকার দিয়েই তাকে কিনতে পেরেছে নারায়ণ। তার ওপর এই দয়া, খেলার ছলে আরও দুটো বেশী শস্য ছিটিয়ে দেওয়া!

ছোট ঘাট, খেয়া পারাপার হয়, কয়েকটি নৌকা আসে যায়, কয়েকটি ঘাটে বাঁধা থাকে, মেয়ে পুরুষ নাইতে বা জল নিতে আসে। সকালে ধানচালের গুদামটির গায়ে লাগানো কেরোসিনের দোকানের বারান্দায় চেয়ারে বসে নারায়ণ ঝিমোয়, বান্দা মেপে মেপে কেরোসিন বেচে। তেল দিতে যেন হাত ওঠে না তার, পয়সা নিয়ে দু'ফোঁটা তেলও যেন দেয় অনিচ্ছায়। সবাই পায় না তেল, পাওনা তেলের দশভাগের এক ভাগও পাবে না, তেল ফুরিয়ে যায়। এটা লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোকান, দশ টিনে দু'টিন এমনিভাবে বাঁধা দরে বেচে ঠাট বজায় রাখতে হয়। বাকীটা নির্ব্বিবাদে বেচা যায় চোরা দরে।

নৌকার মাঝি এসে দাঁড়ায়। হাই তুলে নারায়ণ বলে, দেশপুরের কলে পৌঁছে দিবি ধান।

মাঝি বলে, দিনে বোঝাই দিতে বাবু বারণ করেছে না?

দুত্তেরি বারণ করেছে, নারায়ণ ঝিমিয়ে ঝিমিয়েই বলে, তোল তুই। কি হবে? কোন্ শালা কি করবে?

তা ঠিক, কিছুই হয় না, কেউ কিছু বলে না, সবার চোখের ওপর বুক ফুলিয়ে চোরাই ধান চাল চালান দেওয়া যায়।

কিন্তু চিরদিন কি যায়? চিরদিন কি মানুষ মুখ বুজে থাকে, কিছু বলে না!

ওরা কারা আসছে দল বেঁধে? কেরোসিনের খদ্দের? কেরোসিনের খদ্দের তো এমন দল বেঁধে আসে না। সুধীর, কানাই, জৈমুদ্দীনদের দেখা যাচ্ছে। একটা কিছু হাঙ্গামা করতে আসছে। নারায়ণ সজাগ হয়ে ওঠে।

তোমার গুদোমে চোরাই ধান আছে।

তুমি কে হে বাবু? আমার গুদোমে কি আছে না আছে, তোমার তাতে কি?

সুধীরের মেজাজ বিগড়েই ছিল, সে চীৎকার করে বলে, আবার চোখ রাঙ্গায়! বাঁধো ব্যাটাকে, কোমরে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে চলো থানায়।

সুধীর বলে, থামো, থামো। দারোগা বাবু আসুক। ধান রয়েছে, আসামী রয়েছে, এতো আর চাপা দেওয়া চলবে না।

থানার দারোগা বিধুভূষণ এসে পৌঁছতে পৌঁছতে খবর ছড়িয়ে প্রকাণ্ড ভিড় জমে যায়। উৎসুক, উত্তেজিত হয়ে জনতা প্রতীক্ষা করে কি ঘটে দেখবার জন্য। এতকাল ধরে এমন খোলাখুলি-

তাবে এখান দিয়ে ধান চালের বে-আইনী চালান চলে আসছে যে, লোক প্রায় খেয়াল করতেই ভুলে গিয়েছিল কারবারটা আইনসঙ্গত নয়। নারায়ণের মুখ শুকিয়ে গেছে, চোখ তার পিট পিট করে। এ অঘটন তার কল্পনায় ছিল না। সুধীর কানাইরা যে দল বেঁধে এসেছিল, সেটা সে গ্রাহ্যই করে নি, থানায় খবর গেছে শুনে মনে মনে একটু হেসেই ছিল বরং। কিন্তু দেখতে দেখতে যে ভাবে চারিদিক ভেঙ্গে এসে জমা হয়েছে মানুষ, খুসীর উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে প্রতীক্ষা করছে পুলিশ এসে তাকে কি ভাবে বেঁধে নিয়ে যাবে দেখবার জন্য, তাতে ভড়কে গিয়েছে নারায়ণ। কিছু তার হবে না শেষ পর্য্যন্ত, সে জানে। তবু একটা অদ্ভুত আতঙ্ক চাপ দিচ্ছে হৃৎপিণ্ডে, দম যেন আটকে আসবে। জনতার এই ভয়ঙ্কর বিরোধী মূর্ত্তি সে জীবনে কখনো ছাখেনি।

বিধুভূষণও ভড়কে যায় ব্যাপার দেখে।

বলে, কি ব্যাপার, কি ব্যাপার, হয়েছে কি। ভিড় কিসের।

বলে, ধান? চোরাই ধান ধরা পড়েছে? তাই নাকি। তা এত ভিড় কেন?

বলে, কি হে পরাণ, ব্যাপারটা কি?

আমি কি জানি, নারায়ণ বলে, কর্ত্তা ধান পাঠাল—

আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে। শুনছি সব। প্রায় ধমক দিয়ে বলে বিধুভূষণ লোকটার মূর্খতায় সে চটে যায়। কর্ত্তাকে আবার টানবার চেষ্টা কেন এর মধ্যে? বিধুভূষণ যেন জানে না কে তার কর্ত্তা, কে ধান পাঠিয়েছে।

সুধীর কানাইদের বলে বিধুভূষণ, ওহে তোমারা ভিড় ভাগাও, তোমরাও যাও। ধরিয়ে দিয়েছো, এবার যা করার আমায় করতে দাও।

সুধীর কানাইরা নড়ে না। ভিড় এক পা পিছু হটে না।

সুধীর বলে, সবার সামনে ধান দেখুন, সাক্ষীদের নাম টাম লিখুন—

ব্যাটাকে গারদে পুরুন।—একজন চেঁচিয়ে ওঠে।

ধীরে ধীরে একটা সিগারেট ধরায় বিধুভূষণ, সুধীরদের দিকে, পিছনের জনতার দিকে দু'চার বার তাকায়, তারপর নারায়ণকে বলে, গুদামটা খোলো তো হে। কত ধান আছে?

দরজা খুলে একবার উঁকি দিয়ে দেখেই বাইরে থেকে তালা এঁটে সিল করে দেওয়া হয়, লেখালেখি হয় বিবরণাদি সাক্ষীর নাম ধাম, তারপর একজন পুলিশকে গুদামের সামনে মোতায়েন রেখে নারায়ণকে নিয়ে বিধুভূষণ চলে যায়।

ভিড়ের মানুষ তৃপ্ত হয়ে বাড়ী ফেরে।

সেইদিন জগৎ কুণ্ডু যায় সদরে, হাজিরা দেয় জোনসের বাংলায়। জোনস একা থাকে, তার মেম থাকে কলকাতায়। সহর ছেড়ে সে নড়ে না, টাকা চেয়ে পাগল করে তোলে জোনসকে। না দিয়ে উপায় থাকে না, বড় মুস্কিল হয় টাকার ব্যাপারে কড়াকড়ি করলে।

পরদিন দেখা যায় কেরোসিন তেলের দোকানের সামনে চেয়ারে বসে ঝিমোচ্ছে নারায়ণ। পুলিশের তত্ত্বাবধানে গুদামের ধানগুলি থানার কাছে এক চালা ঘরে চালান হয়ে যায়, সেঁতসেঁতে মাটির মেঝেতে জমা হয়। খড়ের চালার অনেকগুলি ফোকর দিয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি মারে মেঘম্লান আকাশের আলো।

সুধীর কানাইরা কয়েকজন দেখা করতে যায় বিধুভূষণের সঙ্গে, জিজ্ঞাসা করে, কি ব্যাপার হল?

বিধুভূষণ বলে, খোঁজ খবর রাখবে না কিছু, হাঙ্গামা বাধিয়ে বসবে। কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান আছে তোমাদের? লাইসেন্স আছে নারায়ণের, জগৎবাবু ওর নামে পারমিট করিয়ে রেখেছিলেন। নারাণেরও বুদ্ধি বেশী, আরে বাবা তুই লেজিটিমেট এজেন্ট সরকারের, জগৎবাবু তোর লাইসেন্স পারমিট সব করে রেখেছেন না রাখেন নি, সে খবরটাও তুই জানিস না?

ধানটা তা হলে সরান হল কেন?

তোমাদের জন্য, বিধুভূষণ অনুযোগের সুরে বলে, এ ধানটা নিয়ে হাঙ্গামা করলে তোমরা, ফের যদি হানা দাও নারাণের গুদামে, গোলমাল কর। আমার হেফাজতে রাখার হুকুম হয়েছে।

এ যুক্তি ভাল। দারুণ অসন্তোষ বুকে নিয়ে ফিরে যায় সুধীরেরা। মেঘ ঘনিয়ে আসে আকাশ কালো করে। বৃষ্টি নামে অজস্র ধারে। আবার রোদ ওঠে, আবার বৃষ্টি হয়। রাত্রে শেয়াল ঘুরে যায় ধান রাখা চালাটার চারপাশে। ভ্যাপসা একটা দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ক্রমে ক্রমে অসহ্য হয়ে ওঠে সে গন্ধ। তারপর একদিন সদরে চালান দেবার ব্যবস্থা হলে চালাটার দরজা খুলে দেখা যায়, ধানগুলি পচে গেছে।

সাথী

আবার মারে গগন, আরও জোরে মারে। এবার বাখারির ভোঁতা ধারেও পিঠের চামড়া কেটে রক্ত বেরিয়ে আসে। মরা ঘামাছিতে চামড়া কর্কশ সোহাগীর, স্থানে স্থানে দাদের চাপড়া।

নিষ্ঠুরতার নেশায় উন্মত্ততা এসেছে, থরথর করে সর্বাঙ্গ কাঁপে গগনের, দাঁতে দাঁতে ঠোকা-ঠুকি চলে অবিরাম, আরক্ত চোখে ঝাপসা দেখায় জগৎ। আরও মারবে, আরও! মারতে মারতে কখন তৃপ্তি আসবে গগন জানে না, মরে যাবে কিনা সোহাগী তাও জানে না, মেরে মেরে আজ সে ওকে টের পাইয়ে দেবে রোজগেরে স্বামীর কত জোর থাটে।

পরণের কাপড়খানা খুলেই খুঁটির সঙ্গে সোহাগীকে বেঁধেছে, মারার সুবিধার জন্য সামনের দিকটা খুঁটিতে লাগিয়ে। মুখ দেখতে না পাওয়ায় শুধু কান্না আর কাতরানি শুনে তেমন যেন জুত হচ্ছে না। কান্না একটু ঝিমিয়ে আসায় প্রাণপণ শক্তিতে পাছায় আঘাত করে রক্ত ঝরিয়ে গগন সামনে যায় সোহাগীর মুখখানা দেখতে।

ঘাড় কাত করে দাঁত দিয়ে খুঁটির বাঁশটা কামড়ে ধরেছে সোহাগী। তাই তার এমন কান্না নেই, গলা থেকে শুধু একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরিয়ে আসছে।

যন্ত্রণায় বিকৃত ভয়ার্ত বিহ্বল মুখ দেখে রাগ আরও চড়ে যায় গগনের। কড়া-পড়া চাষাড়ে হাতের প্রচণ্ড চড় বসিয়ে দেয় সোহাগীর গালে।

আর খাবি? আর খাবি চুরি কইরা?

বড় আশ্চর্য ঘটনা ঘটে তখন। কেঁদে ককিয়ে সোহাগী আবার মাপ চায় না, জানায় না আর সে মরে গেলেও চুরি করে খাবে না স্বামীর ভাগের অন্ন, বরং কাতরানি থামিয়ে আকাশে গলা চড়িয়ে ঘোষণা করে:

খামু। চুরি কইরা খামু। খুন কইরা খামু।

তার বেপরোয়া বিদ্রোহে একটু ভড়কে যায় গগন, থতমত লাগে।

খাবি?

খামু। ক্যান খামু না? ভাত না পাই, দা'ও দিয়া তোমারে কাইটা ব্যান্নুন রাঁইধা খামু।

এমন খিদে সোহাগীর এমন বিদ্রোহ! ভাত না পেলে স্বামীকে কেটে মাংস রেঁধে খাবে! তারপর সোহাগী হাউ হাউ করে কাঁদে। এতক্ষণ পায়ে ভর ছিল, এবার একেবারে গা এলিয়ে দেওয়ায় মর্ মর্ করে ওঠে পুরানো ঘুণ-ধরা বাঁশের খুঁটি। সুতরাং বাঁধনের কাপড়টা খুলে তাকে মুক্তি দেয় গগন। সোহাগী গায়ে কাপড় জড়াবার চেষ্টাও করে না, হুড়মুড় করে মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে মাটিতে মুখ গুঁজে থাকে।

চাঁচের বেড়ায় অসংখ্য ফুটো দিয়ে সকালের রোদ আর আলো সরু মোটা দীঘল হাত বাড়িয়েছে ঘরের ছায়াচ্ছন্ন গোপনতায়। এ যেন গভীর শোকাবহ অবস্থায় আনন্দভরা উৎসাহী প্রকৃতির মিতালির সঙ্কেত। সারা রাত মাঠে ধান পাহারা দিয়েছে গগন। ভোরে ধান কাটতে কাটতে উৎসুক চোখে বারবার তাকিয়েছে গাঁয়ের পথের দিকে, উপোসী রাতের জমাট খিদেয় টং ধরে আছে সমস্ত শরীর, কাস্তে চালাতে হাত আড়ষ্ট হয়ে আসছে—তবু যে কলের মত খেটে চলেছে সে শুধু এই ভরসায়—ভাত কটি নিয়ে এখুনি সোহাগী এসে পড়বে।

বেলা বেড়েছে, সোহাগী আসে নি। রাগ বাড়তে বাড়তে মাথা ঘুরে গেছে গগনের। কাস্তে দীনুর কাছে জমা রেখে ঘরে এসেছে ব্যাপার জানতে।

কাস্তেটা যে আনে নি হাতে করে, সেটা পরম ভাগ্য দু'জনেরি। রাগের মাথায় গোড়াতে সোহাগীর গলায় বসিয়েও দিতে পারত চকচকে কাস্তেটা, যে গলা দিয়ে তার ভাগের ভাত পেটে তল করেছে সোহাগী।

এবার দ্রুত ঝিমিয়ে আসে গগন, রাগের জ্বালা ক্ষোভের জ্বালা নিষ্ঠুরতার উত্তেজনা সব জুড়িয়ে আসে। ঝিম ঝিম করে মাথা। এক অকথ্য দুঃখের চাপ ঠেলে উঠতে চায় বুকের ভেতর থেকে, গলা ছেড়ে হাউ মাউ করে একচোট কাঁদতে পারলে সে বেঁচে যেত।

মাঠে ফিরে যাবে? পারবে খেটে যেতে পেটে শুধু জল বোঝাই নিয়ে? মাঠে যেতেই হবে। খাটতে পারবে কি পারবে না, কতটুকু

পারবে, মাঠে গিয়েই তা যাচাই করতে হবে। ধান কেটে তুলতেই হবে তাড়াতাড়ি। হয়ত সময় আছে শুধু আজকের দিনটি, আবার হানা দিয়ে ধান কেড়ে নেবার মত দলবল সংগ্রহ করতে তার বেশী সময় হয়তো লাগবে না জোতদার ভূপতির। ভূপতি হানা দেবার আগে ধান নিরাপদ করা চাই। লেঠেলকে ঠেকাতে প্রাণ যদি দিতে হয় তো দেবে, কিন্তু মিছামিছি প্রাণ দিয়ে সুখ নেই, প্রাণটা স্থায়ীভাবে বঁাচাবার উপায় ধানগুলি বাঁচানোর ব্যবস্থা করে নিয়ে তারপর নিশ্চিন্ত মনে মরা চলবে, তার আগে নয়।

এদিকে কি ফ্যাকড়া বাঁধল ভাখো। এমন করে মেরে এখন বৌটাকে ফেলে সে কেমন করে মাঠে যায়? ঘাটে গিয়ে যদি ডুবে মরে সোহাগী? যদি গলায় দড়ি দেয়! যেদিকে দু'চোখ যাবে চলে যদি যায় মনের ঘেন্নায়! কার জন্য তখন তাহলে সে ধান কাটবে মাঠের?

নে যা বেশ করছস্। ওঠ্।

উদাসভাবে বলে গগন! সোহাগীর সব অপরাধ মাপ করে ব্যাপারটা শেষ করে দেবার ভঙ্গিতে। সোহাগী নড়ে না, তার সাড়া মেলে না।

মাঠে যামু। কাপড়টা পর। ঝাঁপ খুলুম না?

সোহাগী নড়ে না।

এক ঘটি জল দে। জল দিয়া পেট ভরাইয়া খাটি গা যাই, করুম কি!

বড় অসহায় মনে হয় নিজেকে গগনের। সোহাগীকে নরম হবার শান্ত হবার জন্য যথেষ্ট সময় দেবার উপায় নেই, গরীব বেচারার জীবনে তাড়াহুড়ো তাগিদ পড়ে গেছে চারিদিক থেকে। তাড়াতাড়ি ঘটিবাটি বাঁধা দিয়ে চড়া সুদে দুটি চারটি ধানচাল কর্জ কর, নইলে উপোসী দেহটা ছেড়ে যাবে প্রাণপাখী। দিনরাত চোখ পেতে রাখো চারিদিকে, সতর্ক প্রস্তুত হয়ে থাকো, ধুঁকতে ধুঁকতে মরে যাবার দাখিল হয়েও তাড়াতাড়ি ধান কেটে তুলে সামলাও, কখন হানা দিয়ে কেড়ে নিয়ে যাবে জোতদার। মারধোর করার জন্য তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা কর বৌকে, উপোসের জ্বালার সঙ্গে শাসনের ঘেন্নায় সে পাছে কিছু করে বসে। একটা বেলা স্থগিত রাখার উপায় নেই কাজটা। সব কিছু ঝটপট চটপট এক সাথে করা চাই, কোনটার সবুর সইবে না। এতও কি মানুষের সয়?

মরণতো আছেই—গগন বলে. খেদের সঙ্গে, এমনেও মরুম ওমনেও মরুম। লাইঠাল পুলিশ নিয়ে আইবো, ধানতো ছাড়ুম না। লাঠির ঘায় মাথা ফাটব না তো গুলি বিধবো বুকের মধ্যি। মরুম ঠিকই, তুই এমন কইরা মারিস না!

মাথা একবার উঁচু করে আবার সোহাগী মুখ গোঁজে।

তাই কর তুই, ঝড়ের মত নিঃশ্বাস ফেলে গগন, দাও দিয়া কাইটা ব্যান্নুন রাঁইধা খা আমারে। মাঠে মইরা পচুম ক্যান শ্যাল শকুনে ছিড়া খাইবো, তর পেট ভরুক!

যা তা কইও না কইলাম! সবেগে উঠে বসে সোহাগী, মারছ ধরছ সইয়া গেছি, যা তা কইলে সমু না কইলাম!

খানিক পরে সোহাগীই জল এনে দেয় টিনের মগে। এক ঘটি জল যে চেয়েছিল গগন, সেটা নিছক অভ্যাস, ঘটি গেছে অনেকদিন আগেই।

যাবার জন্য গগন পা বাড়িয়েছে, সোহাগী বলে, ভাত নিয়া যামু'নে।

পাবি কই?

পামু। চাল যোগার করুম। মার খেতে খেতে যে ভাবে সোহাগী বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল যে, শুধু চুরি করে স্বামীর ভাগের ভাত খাওয়া নয়, ভাত না জুটলে গগনকেই দা' দিয়ে কেটে ব্যান্নুন রেঁধে খাবে, তেমনি বিদ্রোহের ভঙ্গিতে সে ঘোষণা করে, চুরি কইরা পারি ডাকাতি কইরা পারি চাল যোগার করুম। নন্দীগো ঘরে কাঁড়ি কাঁড়ি চাল—

দিব না। মাথা নাড়ে গগন।

দিব না? না দিলে খুন করুম, দা'ও দিয়া গলা কাটুম।

আম গাছটার পাশ দিয়ে রোদ এসে পড়েছে তার শীর্ণ ক্লিষ্ট মুখে, কি যেন জল জলে সে মুখেই, কিসের পণ। শেষরাত্রে কাঁপিয়েছিল, শীত এখন মিঠে। নতুন করে আজ একবার মুগ্ধ হয় গগন নতুনভাবে তার বৌয়ের চোখে চোখে চেয়ে। এদিক ওদিক থেকে সাড়া মিলছে মানুষের, রোগা গরুটির গলার দড়ি ধরে নিয়ে যেতে যেতে দাঁড়িয়েছে কাটু সেকের বৌ গরুটিকে পথে-পড়া নতুন খড় মুখে তুলে নেবার সুযোগ দিতে, তাকিয়ে আছে তাদের দিকে।

আস্তে আস্তে আবার ঘরে ঢুকে গগন ডাকে, শুইনা যাও।

সোহাগী কাছে এলে তার একখানা হাত ধরে গগন, জন্ম জন্মের দোষ ত্রুটি অপরাধ পাপের জন্ত মার্জ্জনা চাওয়ার মত এক অদ্ভুত আবেগের সঙ্গে বলে, শোনো তোমারে কই। আর মারুম না। গায়ে তোমার হাত দিমুনা যা কর তুমি, কোনদিন যদি তর গায়ে তুলি সোহাগী—

গায়েন

গান গেয়ে ছেলেবুড়ো মেয়েপুরুষকে এতকাল কাঁদিয়ে আসছে যে লোকটা, তার ফোকলা মুখে গালভরা হাসি দেখলে জগৎ যেন বদলে যায়। পাকা টুসটুসে খুসীর ফলটি ফেটে গেছে হঠাৎ, এখন থেকে পৃথিবীতে আর আনন্দের অভাব হবে না। এই বুড়ো বয়সে গায়ের চামড়ার রঙটাতেও যেন তার পালিশ আছে ঘন পুলকরসের।

সম্প্রতি কিছুকাল জের চলেছে বিষণ্নতার, মন খারাপের।

শিংমাছের ঝোল দিয়ে ভাত বেড়ে দেয় আমোদ, বলে, কাঁদছ কেন? হেথা হোথা গাইতে যাও, ফিরে এসো মুখটা হাঁড়ি। মারে নাকি ধরে ধরে?

মুখে হাসি ভাজে। হাতের গরাস নামিয়ে রাজেন সুর করে বলে,—

সাধে কি কেঁদে মরি, ছিঁড়ে দাড়ি,
মেয়্যার হয় না শ্বশুরবাড়ী,
জগৎজনা দেয় টিটকারি,
বুড়ো রাজেনের গলায় দড়ি—

মুখ ছোট হয়ে আসে আমোদের, চোখ হয় বড় বড়। এতদিনে তবে জানা গেল—গায়ন সেরে ফিরে এসে রাজেন দাসের মন গুমরিয়ে থাকার কারণ। আর কোন খুঁৎ পায়নি, বড় মেয়ে ঘরে রাখার ছুতোয় এবার সবাই টিটকারী জুড়েছে, অপদস্থ করতে চাইছে রাজেনকে। কে করছে, কারা উদ্যোগী, জানে আমোদ। এখনো এই বুড়োর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যারা মাথা তুলতে পারে না, এই বুড়োর আসরে লোক ভেঙে পড়ে, কিন্তু যাদের আসর খাঁ খাঁ করে শ্রোতার অভাবে।

বিদেয় কর। মোকে বিদেয় কর শীগ্‌গির। বলে আমোদ মনের দুঃখে কাঁদে।

কি যন্ত্রনা, সে কথা নয়। রাজেন বলে ভড়কে গিয়ে, মনে কথা এল, গেয়ে দিলাম, একটু তামাসা হল নিজের সাথে—তোর কথা মোটে নয়। তবে কিনা চিন্তা একটা জেগেছে। ভাবি কি, এবার বুঝি মোর বিদেয় নেবার পালা, ক্ষমতা কমে আসছে।

ইস্।

হাঁ। আসর তেমন জমাতে পারি না, উসখুস্ করে লোকে, ইদিক উদিক চায়, খুক খুক কাসে, সিকনি ঝাড়ে। না বলে উড়িয়ে দিলে চলবে কেন, চোখে দেখি টের পাই।

দু'চার গ্রাস ভাত খায় রাজেন।—মোর হয়ে এয়েছে নাকি কে জানে।

বলো নি ওকথা।

না বললে চলছে কিসে? তিন কুড়ি তো হয়ে এল বয়েস।

শ্রোতার হৃদয়ের সঙ্গে যোগ হারিয়ে ফেলছে রাজেন দাস, কি ভয়ানক কথা এটা। জগৎ যেন স্তব্ধ হয়ে শুনতে চায় এটা কি ব্যাপার, অরণ্য নাকি খুঁজে পাচ্ছে না বাতাস, সাড়া তুলতে পারছে না মর্মরধ্বনির? রাজেন দাসের গানে সাড়া দিচ্ছে না মানুষ? যতই অসম্ভব হোক, কিছুদিন থেকে আসর সত্যই জমাট বাঁধছে না রাজেনের। গোলার হাটে হাজার মানুষ, গঞ্জের মেলায় অগুণতি লোক, নন্দী বসুর উৎসবে সদর ঝাঁটিয়ে জড়ো করা ছেলেবুড়ো, মূক হয়ে শুনে গেছে আগাগোড়া, শুধু শুনে গেছে। অভিভূত হয়ে থমথম করে নি জনতা, আবেগে উত্তাল হয়ে ওঠে নি, বিনা সর্ত্তে সমবেত ভাবে তার হাতে তুলে দেয় নি অশ্রু নিয়ন্ত্রণের শেষ ক্ষমতা। একবার নয়, একদিনের একটি আসরে নয়, এমনি ঘটে আসছে আজকাল।

রাজেন টের পায়। এই করেই তার জীবন কাটল, পাতলা কটা হয়ে এল ঘন কালো চুল, ভাঁটা ধরল দেহের শক্তিতে। জনতা তার

চিরদিনের প্রেয়সী, কাঁধে ঘুরিয়ে উড়ুনি কোমরে বেঁধে কোঁচা ঝুলিয়ে বরবেশে সবার মধ্যে দাঁড়ালেই সে বক্ষলগ্না প্রিয়ার মত অনুভব করে সমাবেশের হৃৎস্পন্দন, শুনতে পায় মনোরঞ্জনের ফরমাস, জানতে পারে হাসি কান্নার আবেগ, আবেশ, বিহ্বলতার গভীরতা। কবে গায়নে শুধু একঘেয়ে পচা নোংরামির রস পরিবেশন বন্ধ করেছিল গুরুর সঙ্গে বিদ্রোহ করে, গাইতে সুরু করেছিল পুরাণ-কথা নিজের মত লিখে নিয়ে, মাঝে মাঝে তারই মধ্যে স্বদেশিয়ানার বুকনি ঢুকিয়ে দিতে দিতে কবে পুরাণকথা ছেড়ে চলে এসেছিল দেশের কথায়, সব তার স্মৃতিতে জড়িয়ে গেছে। কত রাত কত চোখের কত জলে সে বসুমতী ভিজিয়েছে দেশ-মায়ের দুঃখের কাহিনী গেয়ে! পুলিশ ধরে জেলে দিয়েছে তাকে, জরিমানা করেছে।

কবি-জীবন তার সার্থক হয়েছে এই বুড়ো বয়সে, ধন্য হয়েছে চরম রূপে, বন্যা আর দুর্ভিক্ষের গায়ন করে। প্রথম বন্যা নিয়ে গেয়েছিল গোসার হাটে, ভয়ে ভয়ে। একেবারে চলতি ব্যাপার, তখনো মুছে যায় নি বন্যার চিহ্ন দেশ থেকে বা মানুষের মন থেকে, জের থামে নি সর্ব্বনাশের, একেবারে কাঁচা ঘা, জমবে কি গান? মানুষ তো চটবে না তাদের মারাত্মক দুর্ভাগ্য নিয়ে ছড়া গাঁথার বাহাদুরীতে, কাঁচা ক্ষতে খোঁচা দিয়ে আসর জমানোর চেষ্টার পাগলামিতে? গান সুরু করার পরেই কোথায় ভেসে গিয়েছিল ভয়-ভাবনা, দ্বিধা-সঙ্কোচ, পাগল হয়ে মানুষ শুনেছিল মাঝ রাত্রি পার করে, কেঁদেছিল মানুষ শিশু ভেসে যাওয়া মানুষ মায়ের সজল চোখে বাছুর-মরা গাভীর গলায় হাত বুলানোর বর্ণনায়, হেসেছিল মানুষ ভুঁড়িওলা নায়েববাবুর তৃতীয় পক্ষের আদরিণী বৌয়ের ধাক্কায় খাট থেকে মেঝের বন্যার জলে পড়ে হাবুডুবু খাবার কল্পনায়, ক্ষোভে নিঃশ্বাস ফেলেছিল মানুষ সরকারী রিলিফের নির্লজ্জ অব্যবস্থায়। সাড়া পড়ে গিয়েছিল চারিদিকে।

গঞ্জের মেলায় প্রথম গেয়েছিল দুর্ভিক্ষ ধরে, বিরাট আসরে, জনসমুদ্রে। মাঠের ধান কোথায় গেল, মানুষের খাবার কে সরালো, অসহায় মানুষ কি ভাবে কেঁদে ককিয়ে উপোস দিয়ে উজার হল, মায়ের বুকে শিশু মল, বাপ মেয়ে বেচল, স্বামী বৌ বেচল, সাদা রাজার রাজ্য কেমন ছেয়ে গেল সাদা কঙ্কালে। রাত ভোর করে এনেছে রাজেন দাস, পাঁচ সাত হাজার মানুষের হৃদয়ে যেন ঝড় বইয়ে নিয়ে গেছে দুঃখের, হতাশার—চোখ শুকনো থাকতে দেয় নি একজনেরও।

তিরিশ বত্রিশ বছরের গায়ন-সাধনার চরম পুরস্কার, পরম সিদ্ধি। বড় সে ছিল, সেরা সে ছিল কবির মধ্যে—একমাত্র, অদ্বিতীয় কবি বলে তারপর লোকে মেনে নিল তাকে। আর কেউ নেই, অন্য সবাই তুচ্ছ, প্রসাদ পাবার যোগ্য শুধু রাজেন দাসের। সাফল্যের নেশায় নিজেও যেন কেমন মাতাল হয়ে গেল রাজেন। সেরা কবি গায়ক হয়েও দুঃখ তার ঘোচেনি কোনদিন, অনটন কাটিয়ে স্বচ্ছলতার স্বপ্নই শুধু দেখেছে সে চিরকাল: এমনি অদ্ভুত কল্পনাতীত জনপ্রিয়তার মধ্যেই দারিদ্র্য দূর করার স্বপ্ন। তা জনপ্রিয়তার স্বপ্নটা সফল হল, খেয়াল হল না কিছু টাকা পয়সা করার কথাটা। যে যা দেয়, যখন যা পায়, তাই নিয়ে খুসী হয়ে আসর মাতিয়ে বেড়াতে লাগল দুর্ভিক্ষের কথায়, চাষীর দুঃখে।

এমনি রাজেন দাসের প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া হয়েছে একজন' হরিখালির নরহরি। শিষ্য সে হলেও হতে পারত রাজেন দাসের, সবে সে প্রৌঢ় বয়সে পা দিয়েছে, কিন্তু শিষ্য সে নয়। গুরু তার কালিগঞ্জের ভূতনাথকেও বলা যায়, গাংপোতামার ভূষণকে বললেও অন্যায় হবে না, আটৌনার বিভূতির সঙ্গেও নাকি তাকে দেখা গেছে দু'এক বছর।

বাপের ঠিক নাই, গুরুর ঠিক থাকে?

রাজেন বলে দাওয়ায় সমাগত বন্ধু, ভক্ত আর শিষ্যদের। বলে ছড়া কেটে দেয় ছ'আট লাইন বেঠিক বাপের ছেলের কেন বার বার গুরু ধরে গুরু ছাড়ার ব্যারাম হয়, তারই ব্যাখ্যায়। অনায়াসে গড়গড় করে ছড়া বলে যায় রসালো এবং ঝাঁঝালো, দ্রুত তালের সুর আর ছন্দ ঠিক রেখে, শেষ দু'লাইন দুলে দুলে রয়ে রয়ে রসায়:

যখনি বলে গুরুকে বাপ,
তখনি ভাবে কে মোর বাপ।

গাইছে কিন্তু বেশ, পুরানো ভক্ত শশী বলে বাপঘটিত গুরুমারা রসিকতার রসটা মরে এলে, বেশ একটু তোলপাড় করেছে। বড় ছেলেটা শুনে এল সেদিন হাটতলার পয়লা বোশেখের সভাটায়—সুতো কলের লোকেরা করেছিল। বলল কি যে, বেশ গাইছে। তেজে গাইছে, জোরদার গান, বলচে নাকি যে ফের মন্বন্তর এলে কেউ মরো না, কাঁদাকাটা করো না, ফ্যান-চেও না,

কদম কদম বাড়িয়ে গিয়ে যার গুদামে চাল আছে তাকে গাছের ডালে ফাঁসি দিয়ে—

রসকস নেই, বাজে। সজনী বলে। তার শীর্ণ মুখে বার্দ্ধক্যের ছাপ পড়বার আগে নেমে এসেছে রোগের মরণের আবির্ভাব ঘোষণার মত কালিমা। ধুঁকে ধুঁকে সে বলে, আমি শুনে এয়েছি পরশু। সদর থেকে ফিরছি সাঁঝের বেলা, মামলাটার তারিখ ছিল, তা দিনভোর টালবাহনা করে শুনানী হল কচু, ফের তারিখ পড়ল সাতাশে, হাকিমগুলো মরে না? ধলাঘাটে নেমেছি ফেরি ইষ্টিমার থেকে সাঁঝ পেরিয়ে, ভাবছি যে তিন কোশ পাড়ি দেব না রাতটা কাটিয়ে দেব মাথা গুঁজে হেথা যেথা পারি, দেখি যে লোকে লোকারণ্য ঘাটের পাশে গুয়ারবাগান মাঠটা। কি ব্যাপার? না, নরহরির কবিগান। বাইরে চাঁদ অস্ত যাওয়া তক্, চারটে ঢোলক, ছুটো ব্যায়লা, একটা বাঁশী, সাগরেদ বুঝি জন আষ্টেক—গাইলে বেশ। তা রসকস নেই। শুধু ওই এক কথা, যে মরে সে মরে, তার পাত্তা মেলে না, চুপচাপ মরা পাপ। মরো না, মারো। যে মারতে চায় তোমায়, তুমি তাকে মারো।

উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল রজনী, রোগ যন্ত্রণা দুর্বলতা সব ভুলে যেন গায়ন সুরু করে দিয়েছে। চারিদিক চেয়ে সে লজ্জিত হয়ে থেমে যায়।

গোঁয়ার।—অসন্তুষ্ট রাজেন বলে, গোঁয়ার গোবিন্দ। গায়নের বোঝে ছাই। এতো বাবু বক্তিমে নয়, হৈ হৈ রৈ রৈ করে গালগলা ফুলিয়ে চেঁচিয়ে গেলেই হল। এ রসের ব্যাপার।

তবু ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে বুকটা। মনে মনে সে ভাল করেই জানে, দশজনে যা চায় তাই আসল, আর সব মিছে। তার ভাল বোঝায় কিছু আসে যায় না। চালার জীর্ণ টিনে এক ঝাঁক পাখী উড়ে এসে বসে, নখের আঁচড়ের সঙ্গে কিচির মিচির আওয়াজ তুলে ঘরের বিষণ্ণ আবহাওয়া মুখরিত করার চেষ্টাই যেন সুরু করে দেয়। হঠাৎ উড়ে যায় কোথায়। ঘরে বসে সে কি বুঝে আসেনি শুনতে পায় না অসংখ্য মানুষের অস্ফুট গুঞ্জন, চিরদিন কি সহজে বুঝে আসে নি সে ভাষা? কোথা থেকে কি নতুন মানে আসতে পারে তার দেশের লোকের প্রাণের ভাষায় সে যার মানে বুঝতে পারে না?

কদমপুরে বায়না আছে কাল। রাজেন বলে আচমকা।

কি ধরবে? আমোদ শুধায় সাগ্রহে।

ভাবছি কি, রাজেন যেন পরামর্শ চায় মেয়ের কাছে, মন্বন্তরের পুরান গায়নটা ধরি। টাকা সের চাল হয়েছে, উপোস সুরু হয়েছে, ফের দুভিক্ষ লাগবে বলছে সবাই। দুটো চারটে কথা অদল বদল করে নিলে লাগসই হবে মনে করি—নাকি?

আমোদ উৎসাহ বোধ করে। দীপ জেলে টিনের পুরানো বাক্সটা খোলে। খাতার কাগজে বাক্সটি ঠাসা। রাজেন দাসের সারা জীবনের গানের ভাণ্ডার—জীর্ণ হয়ে হয়ে ছিঁড়ে গলে যাবার উপক্রম করেছে, কিছু কাগজ পোকায় কেটে নষ্ট করে দিয়েছে।

হাতে তৈরী মোটা হলদে কাগজের খাতায় মন্বন্তরের গানের খসড়া রাজেনের হাতের গোটা গোটা হরফে লেখা। এটা অবলম্বন করে গান চলে, আসরে গাইতে গাইতে আসে অনেক স্বতঃস্ফূর্ত্ত কথা, অনেক নতুন মিল নতুন পদ——সেইখানেই বাহাদুরী কবি গায়কের। আমোদ পড়ে পড়ে শোনায়, মাথা নেড়ে নেড়ে রাজেন শোনে মশগুল হয়ে, তাকে ঘিরে সত্য হয়ে উঠতে থাকে বিরাট জনসমাবেশ, অদল বদল নতুন কথা আর পদযোজনা চলতে থাকে মনের মধ্যে, গত দুভিক্ষের এই মর্ম্মান্তিক রূপ আজকের শ্রোতাদের সামনে ধরার মোট কৌশলটা ঠিক হয়ে যায়। নতুন একটি প্রস্তাবনা জুড়ে দেবে। তাতে থাকবে আবার দেশব্যাপী দুভিক্ষের ছায়াপাতের কথা। তারপর এ গানে যা কিছু ঘটেছে বলে বর্ণনা আছে, সে সব ঘটবে বলে সামনে ধরা। লাখ মানুষ কিভাবে মরছে সে বর্ণনা আছে এ গানে, তাকে বদল করে, লাখ মানুষ কিভাবে মরতে যাচ্ছে, সেই বর্ণনায় পরিণত করা। হৃদয় মুচড়ে যাবে মানুষের। আসর কাঁদবে।

চোখ জলজল করে রাজেনের, উৎসাহে সে সিধে হয়ে বসে।

আসর কিন্তু কাঁদে না। মন দিয়ে শোনে। শুধু শোনে।

রাজেনের নামে পাঁচ ক্রোশ দূরের গাঁ থেকে লোক এসেছে কবিগান শুনতে, কদমপুরের হাই-স্কুলের লাগাও মাঠ ভরে গিয়েছে। এখনো গলায় যে জোর আছে রাজেনের, আসরের শেষ প্রান্তের লোকটিও শুনতে পাচ্ছে তার প্রতিটি কথা। শোনার যে অসীম আগ্রহ নিয়ে মানুষ আসে তা যেন আশীর্ব্বাদের মত, গোড়াতে অল্পেই জমে যায়

আসর—নিজের আগ্রহ আর প্রত্যাশা দিয়েই নিজেদের মুগ্ধ করে ফেলে শ্রোতারা। প্রথমে জমজমাট হয়ে উঠেছিল অসহায় মানুষের নিরুপায় মরণের সকরুণ ভূমিকা আর মানুষরূপী দানবের খেলার ছলে সেই মারণযজ্ঞ আরম্ভের বর্ণনা, সুরে ও কথার বাঁধুনিতে আরও মুগ্ধ করেছিল সমবেত হৃদয়মন, সভা গম গম করছিল ঔৎসুক্যে, নড়ে চড়ে ভাল করে জেঁকে বসেছিল সবাই। খুসী হয়েছিল রাজেন, পুরোমাত্রায় আত্ম-বিশ্বাস ফিরে পেয়েছিল, এ তার চেনা লক্ষণ। আসরকে সে হাতের মুঠোয় পেয়েছে। এখন খুসীমত কাঁদাতে কাঁদাতে যা খুসী করতে পারে। সভার এই ঘন দানা বাঁধা ঔৎসুক্য আরও নিবিড়ভাবে এ রস পাবার জন্য, যার স্বাদ সে দিয়েছে।

কিন্তু কেমন যেন ওলোটপালোট হয়ে যায় হিসাব নিকাশ, ধীরে ধীরে বিগড়ে যেতে থাকে সভার মতিগতি। অস্থিরতা বাড়ে, অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে রাজেনের মর্ম্মান্তিক বর্ণনা। আধবুড়ো একজন উঠে দাঁড়ায় হঠাৎ, মুখে তার খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি, বিস্ফারিত চোখ, সর্ব্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপছে। তীব্র তীক্ষ্ণ আর্ত্ত কণ্ঠে সে বলে, রাজেন দাস! বলি ও রাজেন দাস! তাতো বুঝলাম, সর্ব্বনাশ তো হচ্ছে, কি করি তার উপায় বলো! বাঁচি কিসে বাৎলে দাও!

এ এক হিসাবে জয় রাজেনের, তার শক্তির পরিচয়। কিন্তু এতো চায় নি রাজেন দাস। মানুষকে আবেগে পাগল করার শক্তি তার চিরদিনই আছে—অন্য কবিওয়ালারও কম বেশী আছে। তাতেই তো রাজেন দাসের আসল সার্থকতা নয়। আবেগে পাগল হবে, হৃদয়মন ভরেও যাবে, তবে না যথার্থ আসর জমল। এ আসরের তৃপ্তি নেই, যা চায় তা পায় নি আসরের লোক, তাদের প্রাণ ভরে নি। আরও কিছু চায় তারা রাজেন দাসের কাছে। কি চায়?

হৈ চৈ ওঠে চারিদিকে। কেউ বলে হাঁ হাঁ, কেউ বলে, বসে পড়, বসে পড়। ধীরে ধীরে যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে এদিক ওদিক তাকায় লোকটি, তারপর বসে পড়ে। রাজেনের মনে পড়ে তার ঘরের দাওয়ায় পুরানো ভক্ত শশীর ব্যবহারের কথা। নরহরির গায়নের কথা বলতে সেও এমনি আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ যেন চেতন ফেরায় এদিক ওদিক চাইতে চাইতে লজ্জা পেয়ে এমনি ভাবে বসে পড়েছিল।

আসর আর তেমন জমে না। যে জমাবে আসর প্রাণের ছোঁয়াচ দিয়ে, তার প্রাণেই উদ্বেগের আলোড়ন!

সকালে ম্লান মুখে বাড়ী ফেরে রাজেন, জ্বরের রোগীর মতো চেহারা করে। এক রাত্রে পায়ের তলা থেকে তার যেন মাটি সরে গেছে। অসম্মান করেনি কেউ, তার কবিত্ব-শক্তির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েই আছে চারিদিক, আবার তার গায়ন থাকলে এমনি দূর থেকে লোক এসে ভিড় করবে আসরে, তবু বিস্বাদ হয়ে গেছে জীবন রাজেনের। চরম পরাজয়ে হিম হয়ে গেছে বুক!

ভেবোনা বাবা, মনে কষ্ট কোরো না। নতুন গান বাঁধ!

কি গান বাঁধব?

নরহরিটরি পারে তোমার সাথে? অন্যভাবে সান্ত্বনা দিয়ে বলে আমোদ, ভারি খোয়মতা! করুক যত পারে শত্তুরতা, নিন্দে করে বেড়াক। তোমার কাছে কল্কে পেতে দেরী আছে। নতুন গান বাঁধো—

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে খিঁচড়ে ওঠে রাজেন, নতুন গান বাঁধো! নতুন গান বাঁধো! এ তোর ভাত বেগুন রাধা কিনা, বাঁধলেই হল। ভেতর থেকে গান না এলে বাঁধব কি?

বোবা বৌ বিছানা নিয়েছে ক'বছর, মেয়ে ছাড়া গায়ের ঝাল ঝাড়বার আর কেউ নেই। সেই কবে অতল দয়ার রূপে প্রেম এসেছিল কবির খেয়ালে, নটবরের বোবা মেয়েটাকে বিয়ে করেছিল রাজেন, দুটি ছেলে দুটি মেয়ের সংসার। বড় ছেলে কিছু লেখা পড়া শিখে চাকরী করছে বিদেশে, খবর করে না। আরেক ছেলে গোল্লায় গেছে। এক মেয়ে গঞ্জনা খেয়ে মরছে শ্বশুরবাড়ী। এমন দেশজোড়া নাম তার কবি বাপের, সে তুলনায় অনেক প্রত্যাশা করে কিছুই তারা পেল না। আরেক মেয়ে ঘাড়ে ঝুলছে। দু'বিঘে জমিজমা হল না, দুটো পয়সা জমল না, পুরোনো জীর্ণ রয়ে গেল ঘরবাড়ী। কি হল? কি হল রাজেন দাসের জীবনে? কিছুই সে করতে পারল না কোনদিকে।

তেমন জমেনি শুনলাম মদনপুরে? শশী বলে আপশোষ জানিয়ে। শুনে বুক পুড়ে যায় রাজেনের।

বয়স তো হলো।—আপশোষ জানিয়ে বলে সজনী।

রাজেন উঠে যায়।

সেদিন খবর আসে, গোলায় হাটে নরহরির গান। ক'দিন ছটফট করছিল রাজেন, খবর শুনে গুম খেয়ে যায়। গানের খলড়ার টিনের তোরঙ্গটি খুলে চুপ-চাপ বসে থাকে বেলা দুপুর তক্‌। তারপর হঠাৎ উঠে তাড়াতাড়ি নেয়ে খেয়ে নেয়, ফোকলা মুখে পান চিবুতে চিবুতে জামা গায়ে দিয়ে পায়ে আঁটতে থাকে ক্যাম্বিসের জুতো।

বোবা বৌ হাতের ইসারায় কাছে ডাকে, ইসারায় কি যেন বলে।

আচমকা হাসি ভাঙে রাজেনের মুখে।

আনব গো আনব। তোমার তামাক পাতা আনব।

যাচ্ছ কোথা? আমোদ সুধায়।

যাচ্ছি কোথা? নরহরির গান শুনতে যাচ্ছি।

তুমি যেচে যাচ্ছ ওর আসরে!

শুনে আসি। দেখে আসি।

নরহরির আসরে আচমকা রাজেনের আবির্ভাব সত্যই অঘটন, চারিদিকে সাড়া পড়ে যায়। সাধারণ একজন শ্রোতার মতই দশজনের মধ্যে বসে পড়তে যাচ্ছিল, কর্ত্তা ব্যক্তি ক'জন এগিয়ে এসে আদর করে ডেকে নিয়ে গিয়ে সম্মানের স্থানে বসিয়ে দিল। একজন তখন হারমোনিয়মে সাধারণ গান ধরেছে।

নরহরি মাটি পর্য্যন্ত মাথা নামিয়ে ভূতপূর্ব্ব গুরুকে প্রণাম জানায়, কিন্তু কাছে আসে না, কথা বলে না। গুরু-শিষ্য সম্পর্ক হলেও তারা পরস্পরের নামে টিটকারী দেয়, পরস্পরকে ছোট করে। তবে গুরু গুরুই, গাল দিতে হলেও তাকে প্রণাম জানিয়েই গাল দিতে হবে!

গানের সুরুতে নরহরি প্রণাম জানাল ছড়ায়—

হাতে ধরে গান শেখালে
দিও না অভিশাপ।
দুটি পায়ে প্রণাম জানাই,
যে গুরু সে বাপ।

কবি-গানের মন্থরগতি, ধীরে ধীরে নানা আঁকা-বাঁকা পথে নানা বিপথে নানা বাহুল্য-বৈচিত্র্য সংগ্রহ করতে করতে এগিয়ে চলে, আস্তে আস্তে আসর জমে। নরহরি প্রথমে আরম্ভ করে দুর্দ্দিন ঘনিয়ে আসার গান—মনে মনে রাজেন বলে, চোর! গুরুমারা বিদ্যাই শিখেছ বটে তুমি! দুঃখের দিনের ছবি ভয়াবহ হয়ে উঠতে না উঠতে পাশ কাটিয়ে নরহরি গায়: কোমর বাঁধো ভাই!

একটু থতমত খেয়ে ভুরু কুঁচকে চেয়ে থাকে রাজেন।

করুণ হয়ে ওঠে নরহরির মরণের গান, হৃদয়ে মোচড় দেয় তার রসালো, ঝাঁঝালো পদগুলি, কিন্তু চোখে জল আনে না, কাঁদায় না। অসহায় হতাশায় ফেটে যাবার উপক্রম করে না বুক। ক্রোধে, ক্ষোভে তপ্ত হয়ে ওঠে নিঃশ্বাস, হাতগুলি যেন এগিয়ে এগিয়ে যেতে চায় নরহরির ডাকেই সায় দিয়ে শিশুখেকো মেয়েখেকো মানুষখেকো রাক্ষসগুলির টুঁটি ধরে টেনে ফাঁসি লটকে দিতে—

ছাড়ো মিছে আশ
রাজার সেপাই দেয় কিরে ভাই
(মুখে) তুলে ভাতের গ্রাস।

বারংবার উন্মাদনা ফেটে পড়ে সভায়। মুখ টান টান। চোখে চোখে আগুনের ঝিলিক।

সহকারীকে সুর ধরিয়ে দম নিতে বসতে যাবে নরহরি, রাজেন তাকে জড়িয়ে ধরে বুকে। বলে, নরহরি তুই মোর গুরু! তোকে প্রণাম করি! তুই মোর গুরু!

হাত বাড়িয়ে সে পা ছুঁতে যায় নরহরির। নরহরি ঠেকিয়ে রাখে। ওরে বাপরে, অপরাধ হবে, পা ছুয়োনা বাপ। মরে যাব!

তবে বল মোর মেয়াকে লিবি? তোকে ছাড়া আর কারো হাতে মেয়া দেব না!

দু আঙুল কানে ঢুকিয়ে নরহরি বলে, বোলো না বাপ। শুনতে নাই, তোমার মেয়া আমার বুন।

নব আল্‌পনা

শ্রীমতী ছিপছিপে কিন্তু কী সুকোমল। রোগা থেকেছে তবু চর্বি জমিয়েছে। দেহ চর্চ্চার বিশেষ প্রতিভায় এটা সম্ভব। খাদ্য কণ্ট্রোলের বিশেষ কায়দায় না মুটিয়েও মেদবহুলতার স্নিগ্ধ লাবণ্য ধরে রাখা যায়। কাজটা কঠিন, সাধনাসাপেক্ষ হলেও, থিয়োরিটা সোজা। যে মোটায়, তার শরীরে শুধু চর্বিই গাদা হয় না, হাড় মাংসও বাড়ে। সুতরাং হাড় সরু রেখে মাংস কম বাড়িয়ে কিঞ্চিৎ চর্বির সমাবেশ ঘটিয়ে একটা সামঞ্জস্য সাধন করতে পারলে, রোগা ছিপছিপে থেকেও সিঁটকে যাবার দরকার হয় না, শুকনো দেখাবার কারণ ঘটে না, স্নিগ্ধ মোলায়েম লাবণ্য বজায় থাকে।

তবে, ঠিকমত খাদ্য চাই, বাছা বাছা বিশেষ খাদ্য, বা সময় মত পরিমাণ মত খেলে হাড় মাস চর্বি কোনটাই যে প্রায় শুধু বাড়বে না তা নয়, কমবেও না এবং তিনেরই পরিমাণগত সামঞ্জস্য অক্ষুণ্ণ থাকবে। নইলে রোগা হবে, কর্কশ দেখাবে। অথবা ঠাম হারাবে।

যেমন চুণো আর শ্রীমতীর মেজবৌদি। চলতে ফিরতে ললিতার সর্ব্বাঙ্গে লাবণ্য দোল খায় আর সেই গর্ব্বে ফেটে পড়া ওর চলনে মেয়ে মাত্রের গা জ্বলে। শ্রীমতীর মেজদাও নির্লজ্জের মত ওকে নিয়ে আত্মহারা।

চুণো পাড়ার বস্তির মেয়ে। হ্যাঁ, শ্রীমতীদের পাড়াতেও বস্তি আছে। চুণো রোগা, ক্যাংটা। নিছক খেতে না পেয়ে রোগা, ইচ্ছে করে কম খেয়ে নয়। তাই দেহের গঠনের লাইন যদিও তার অদ্ভুত, শ্রীমতীর লাইনগুলিকেও হার মানাতে পারে, ধুলোমাখা ছিবড়ের মলিন বস্তির দারিদ্র্যজাত রুক্ষতা সব নষ্ট করে দিয়েছে।

শ্রীমতী ভাবে, লাবণ্য দিয়ে ও মেয়েটা করবে কি, কি কাজে লাগবে।

চুণোর স্বপ্ন অদ্ভুত, এলোমেলো কিন্তু জমজমাট —ভিড়ের মত জমজমাট, রাস্তার ভিড়, পূজা-মণ্ডপের ভিড়, মহরমের ভিড়, মেলার ভিড়, শোভা-যাত্রার ভিড়। চলে ফেরে জমাট বাঁধে তবু তারই মধ্যে উল্টেপাল্টে ভাঙ্গে ও গড়ে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়। গোবর মাটিতে নিকানো মেঝে শুকিয়ে শুকিয়ে এসে যখন ছোট বড় অনেক ভাগ হয়ে যায় শুকনো ভিজে মেটে রঙের ছোপে, ন্যাতার টানে আঁকা রেখাগুলির সাথে যেন তৈরী হয় কটি সাদা-মাটা ছবি, কুঞ্জর ঝাঁকড়া চুলের নীচে চিবুকটা ব্যাতালো হয়ে মনে হয় যেন চোখ টিপে তাকে তামসা করে ভেংচাচ্ছে—মজা লাগতে লাগতে চারিদিকে স্পষ্ট হয়ে ঘিরে ধরে আসে অসংখ্য অসম্পূর্ণ মূর্ত্তি। কুমোর বাড়ীর পোড়ানো মাটির পুতুলে আসল মানুষ দেখার অভ্যাস চুণোর। মূর্ত্তি প্রতিমূর্ত্তি ছাড়া সে স্বপ্ন ভাবতে পারে না।

বাজারের বড় মোড়টার পাশে কয়লার টুকরি সাজিয়ে বস্তির মেয়েরা বসে থাকে। চুণো গিরির পাশে তার গা ঘেঁষে বসে। উৎসুক হয়ে প্রতীক্ষা করে চশমা পরা বেঁটে বাবুটা কখন এসে দাম না শুধিয়েই থলে বাড়িয়ে বলবে, চার ঝুড়িই ঢেলে দে। আজ কত নিবি?

দু'চার আনা বেশী দিয়েই চলে যায়। লোকটা এক নম্বর বোকা আর এক নম্বর বজ্জাত। চুণো জানে, বস্তির কোন মেয়ের কাছেই এদের চাল-চলন অজানা থাকে না। মনটা তার ভিজিয়ে রাখছে, দরকার মত ইসারা করবে। মনে মনে লোকটা ভাবছে সে কত যে ভাল ভাববে বাবুকে, গলে জল হয়ে থাকবে বঁড়শী ছাড়া আলগা টোপ গিলে গিলেই।

চড়া দাম হয়েছে কয়লার টুকরির, ভারি চড়া। আট ন'আনা টুকরি—ওপরের টুকরিতে দুটি কয়লা বেশী আছে, এক টুকরি যে কিনবে তার ওটা মিলবে না। তলার কম কয়লার টুকরি একটা নিতে হবে। অনেকেই কয়লা কিনতে চায়, দর শুধিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে হতাশভাবে, চলে যেতে পারে না শুধু এই জন্য যে, ঘরে এক টুকরো কয়লা নেই, আজ যদি বা চলে যায় কোনরকমে, কাল ভোরে আঁচ পড়বে না উনানে, ভাত চড়বে না।

কিনতেও পারে না, চলে যেতেও পারে না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনে মনে হিসাব করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই মুখোমুখো সমস্যার হিসাব—আট আনার কয়লায় যে দু'বেলার বেশী তিন বেলা চলবে না অথচ এদিকে আবার, কয়লা ছাড়া যে ভাত

সিদ্ধ হবে না, কয়লা না কিনলে আট আনা দিয়েই! মীমাংসা কি?

আড়তদার নন্দীবাবু বলেছে: লেবে লেবে, আট আনা কি বার আনা দিয়ে লেবে! সহরে কয়লা নেই। গলিতে ঢুকে বাঁয়ে দরজা বন্ধ আড়ত। পিছনের খিড়কি দিয়ে খুঁজি পথে টুকরি ভরে আনে তারা, উঠানে বসে কয়লার বড় চাপ ভেঙ্গে টুকরো করে। খুঁজি পথে তাদের আনাগোনা দেখা যায়, বাবুরা ছাখে, পুলিশ ছাখে, সবাই ছাখে!

সামনে টুকরি সাজিয়ে, ক্রেতা যে আসছে খেয়াল রেখে চুণো স্বপ্ন ছাখে, সামনের ওই খাবারের ছুটো দোকান বাদে মুড়ি মুড়কি গুড় বাতাসার দোকান, পাশ দিয়ে বস্তিতে ঢোকার গলি। খিঞ্জি করা ঘরগুলির মধ্যে তাদের একখানি ঘর, আবছা আঁধারে চুনো একলাটি বসে। তার মা গেছে ঝি-এর কাজে, ভাই গেছে কারখানায়। কুঞ্জ যদি আসে কাগজের ঠোঙায় তেলে ভাজা চপ আর পাঁপর নিয়ে, নোন্‌তা রুটি বিস্কুট নিয়ে। ঘরে ঘরে গাদা মানুষ, দাওয়ায় উঠানে বসে দাঁড়িয়ে অনেক মানুষ, কিন্তু না, কুঞ্জকে কেউ ছাখে নি। সবার চোখের সামনে দিয়ে কুঞ্জ ঘরে ঢুকল তবু কেউ ছাখেনি, দেখেছে তবু ছাখে নি, কি যেন অবাক রকম ম্যাজিক। একহাতে ঠোঙাটা তুলে দিতে দিতে আরেক হাতে যদি কুঞ্জ ধরে তাকে, সে যদি বলে, থামো, আগে খেয়ে নিই, বড্ড আমার খিদে, ঘর আর দাওয়ায় মানুষ যদি ভাণ করে যে কেউ আসে নি চুণোর ঘরে, শুধু কুঞ্জ এসেছে খাবার নিয়ে, আহা মেয়েটা খাবার খাক, কুঞ্জর দেওয়া খাবর খাক। ভালো মানুষ যদি হয়ে যায় সবাই গিরির মা, নকুড়ের বৌ, আন্দি, মালতি, সতীশ ভূষণেরা, চুনোর খিদে পেয়েছে বলে মমতায় চোখ মুখ কান বন্ধ রাখে—

না, চুণোর স্বপ্ন দেখা হয় না, সব ভিড় হয়ে যায়। কোথায় যায় কুঞ্জ আর তার খাবারের ঠোঙা। ফাঁকা ঘরের নিরালা অবসর, চেঁচামেচি বকাবকি মারপিট সুরু হয়ে যায় তার জাগ্রত স্বপ্নে—সারা শরীরটা মেলে ধরে সবার চোখের সামনে স্নান পর্য্যন্ত যাকে করতে হয়, কথা ঠেলাঠেলি ঝগড়া করে সে ভাববে কি করে নিভৃত অন্তরালের কথা! যা নিরাপদ, দু'দণ্ড টেঁকসই!

মিথ্যা স্বপ্ন ভেঙে যায়, সুরু হয় চুণোর আসল স্বপ্ন। ওই হাট বাজার শাসন গালাগালি হট্টগোলে জড়ানো কল্পনাই যেন তার জন্যে, নিত্যকার ঘটনাই যাত্রা থিয়াটারের মত রোমাঞ্চকর হয়ে উঠে। কুঞ্জ এসেছে বৈকি তার কাছে, মস্ত এক ঠোঙা খাবার নিয়েই এসেছে। সকলে দেখেছে, জেনেছে—হৈ চৈ করে উঠেছে। কি এসে যায় তাতে? কুঞ্জর গায়ে জোর নেই! কুঞ্জ আড়াল করে দাঁড়িয়েছে তাকে। কুঞ্জ দাঁতে দাঁত ঘষছে রাগে, ভাইকে ঠেলে দিয়েছে উঠোনের নর্দমায়, এক ধাক্কায় হটিয়ে দিয়েছে মাকে। চকচকে ছোরা বার করে কুঞ্জ বলছে, আয় শালা, আয় শালী, কে আছিস আয়!

চুণো হাত ধরেছে কুঞ্জর। চকচকে ছোরা ধরা হাতটা ধরে সামলাবার চেষ্টা করছে কুঞ্জকে!

উঃ! যদি হত!

চশমা পরা বেঁটে বাবুটি মন্থর পদে এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়ায়।

কিরে, কয়লা দিবি নাকি?

নে যাও।

আজ থলি আনতে ভুলে গেলাম। এক কাজ করবি, পৌঁছে দিয়ে আসবি? কাছেই বাড়ী, বেশী দূর নয়। চুণো নির্বোধের মত চেয়ে থাকে। মনে মনে বলে, বাড়ীর মানুষ বুঝি তোমার কোথাও গেছে আজ, খালি বাড়ী পড়ে আছে।

পয়সা বেশী নিস না হয়! কিন্তু চুণো তো উঠতে পারবে না আজ এখান থেকে। আরেক দিন দরকার হলে পৌঁছে দিয়ে আসবে, আজ নয়।

একটা ছেঁড়া বস্তায় বেঁধে দি?

থাক্, আজ কয়লা নেব না।

আকাশে তখন মেঘের ঘনঘটা।

নটুক যখন গাড়ী চাপা পড়ল সরকারী রেশন-শপের সামনে গুরুভার গাড়ীটা তরুণ বটগাছটার তলায় শিবলিঙ্গ ভেঙে ছিটকে ফেলে দুশো গজ দূরে সামনে মানুষের বাধা পেয়ে বাঁয়ে মসজিদের রেলিং ভেঙে থামল। ভিড় বলা যায় না মানুষের বাধাকে, পঁচিশ ত্রিশজনের বেশী ছিল না।

তাকেই দুর্ভেদ্য বলে মেনে না নিলে অনায়াসে বাধা ছিন্ন ভিন্ন করে বেরিয়ে যেতে পারত গাড়ীটা। পরে কি হত সে পরের কথা। তবে ষ্টিয়ারিং ছিল কালো আব্বাসের হাতে, মার্কিন সোলজারটার হাতে ছিল ষ্টেনগান। আব্বাস কালো মানুষের দেয়াল ভেদ করে ট্রাক চালাতে শেখে নি। জনতা আগুন দেয় গাড়ীতে, ধরে নামায় ইউনিফর্ম পরা

ঢ্যাঙা সাদা মার্কিন সৈনিক আর উর্দিপরা আব্বাসকে।

আব্বাস খাঁ নীরবে বিনা প্রতিবাদে নিজেকে জনতার হাতে সঁপে দেয়, চোখের পলকে মাথার টুপি খুলে ছুঁড়ে ফেলে দেয় ছোট্ট জনতার পায়ের নীচে আর অন্য জন উগ্র মার্কিনী স্ল্যাং আউড়ে তড়কে দেবার চেষ্টা করে ভীরু নেটিভগুলোকে। বড় একটা কয়লার চাপ এসে লেগে মাথাটা একটু ছেঁচে দেয়।

দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে (তেতালা ও একতালা মোটা ভারি ভাড়ায় আজকালের মধ্যে বেদখল হয়েছে শ্রীমতীর প্রতিবাদ সত্বেও) শ্রীমতী এ দৃশ্য ছাখে, ঘটনার প্রায় গা-ঘেঁসা ডাইনের গলিপথটায় কঠায় বসানো ডাষ্টবিনের ধারে হোটেল খানায় ছাইগাদা ঘেঁটে ঘেঁটে পোড়া কয়লা খোঁজা বন্ধ রেখে চুণো ছাখে সোজা চোখের সামনে।

উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপে শ্রীমতী, কোমল হাতের তালুতে, রেলিঙটা আগুনের মত গরম লাগে এত জোরে সে আঁকড়ে ধরে রেলিংটা। চুণো শুধু চেয়ে থাকে বিস্ফারিত চোখে।

হোটেলখানায় সাজানো শিক কাবাব, পাশে রুটির স্তূপ, একটা ছোকরা পেঁয়াজ কেটে কুঁচো করে জমিয়েছে মাটিতে, মাংসের গরম ডেকচি থেকে উঠছে সাদা বাষ্প। হৈ চৈ হাঙ্গামা সুরু হয়েছে, খাবলা মারা যায় না মাংস রুটিতে?

নটুক চুণোর ভাই। মায়ের পেটের ভাই, তবে এক বাপের ব্যাটা কিনা তা নিয়ে ঘোঁট আছে বস্তিতে। নটুক ফর্সা, প্রায় মেমের বাচ্চার মত সাদা। আতুরে তাকে প্রথম কাঁদন কাঁদাতে গিয়ে চুণোর পিসী এক আছাড়ে একটা পা তার ভেঙ্গে দিয়েছিল। আরেক আছাড়ে কি হত কে জানে। বিয়োনোর ব্যথা বেদনা ভুলে নটুকের মা সেঁক তাপের আগুনের মালসাটা ছুঁড়ে দিয়েছিল পিসীর গায়ে।

জন্ম-কাঁদনের আছাড়ে খোঁড়া না হলে হয় তো আজ গাড়ী চাপা পড়ত না নটুক।

চুণো বড় ভালবেসেছিল ভাইটাকে। রাঙা সুন্দর ভাই, তাতে খোঁড়া অসহায়, চাপা যে পড়েছে সে তারই ভাই চুণো, এটা টের পেতে পেতে মিলিটারী এসে গেছে, একদল মার্কিন সৈন্য, দীর্ঘ উদ্ধত, তকতকে পোষাক, চকচকে বুট, বেঁটে বেঁটে বন্দুক। সঙ্গে আরেক লরী গুর্খা। দোকান পাট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আগেই, দুয়ারে দুয়ারে আগল পড়েছিল, রাস্তাও সাফ হয়ে যাচ্ছিল মিলিটারী আবির্ভাবের পর দেখতে দেখতে—সামরিক শক্তির প্রতি, বজ্রধারীদের প্রতি নিরস্ত্র ক্ষুব্ধ মানুষের কত বড় সম্মান দেখানো! শিবমন্দির চূর্ণ করা, মসজিদের দেয়াল ভাঙ্গা কেউ ধরে নি, অকারণে একটা জীবন নাশের বিনিময়ে শুধু অজ্ঞান করেছে হত্যাকারীকে আর পুড়িয়েছে একটা গাড়ী—তাদেরই দেশের সম্পত্তি। শুধু এইটুকু, সামান্য বচসায় হাতাহাতি থেকে ঘরে আগুন লাগে, তার তুলনায় কত সামান্য তুচ্ছ ব্যাপার। তবু সকলে তাদের পথ ছেড়ে চলা ফেরার অধিকার খর্ব্ব করে স্বেচ্ছায় মিলিটারীকে সম্মান দেখিয়ে তাড়াতাড়ি সরে যেতেই চেষ্টা করছে। কেন যে এই অনুকূল সম্বর্দ্ধনায়, এই প্রত্যক্ষ সক্রিয় শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে মন ওঠে না, সৈন্যেরা পলায়নপরদের নিয়েই তাণ্ডব সৃষ্টি করে, ফট্ ফট্ গুলি ছেড়ে কয়েকজনকে ছিটকে ছিটকে রাস্তায় না শুইয়ে, দোকানে বাড়ীতে দরজা ভেঙ্গে ঢুকে লণ্ডভণ্ড না করে, যাকে সামনে পায় তাকেই আথালি পাথালি না মেরে সাধ মেটে না! ওরা কি জানে যে, ওই সম্মান দেখানো টিটকারি, পালানোটা ব্যঙ্গ? জানে কি যে রাইফেল ষ্টেনগানধারী তাদের মর্য্যাদাই যদি এরা জানত, সম্মানবোধ থাকত, ট্রাক বোঝাই হয়ে তারা আসবে জেনেও তা হলে কখনো ট্রাক পুড়িয়ে দিত না। এতদিনেও কি নিরস্ত্র জনতার চালচলন আচার ব্যবহারের মানে স্পষ্ট হতে বাকী আছে! ছত্রভঙ্গ হয়ে সবার ছুটে পালানো তাদের ভয়ে নয়, যাদের হাত খালি তাদের মধ্যে যে উৎকট তামাসা বোধ আছে, হাস্যকর বীভৎসতা আছে, অস্ত্রধারী তাদেরই শোচনীয় ভীরুতা আর আতঙ্কের প্রমাণ আছে, সেটা স্পষ্ট করে তোলার জন্যই জনতা পালায়। পাগলা কুকুর, খ্যাপা হাতী দেখেও এমনি পালানোর ব্যঙ্গই তারা করে।

তা, এটা চুণোও জানে বোঝে।

বীরপুরুষরা এয়েছে—রুক্ষ এলো চুল মাথায় খোপার মত প্যাঁচাতে প্যাঁচাতে চেয়ে চুণো মুখ বাঁকিয়ে বলে, মরদরা এয়েছে! মরে না ব্যাটারা!

বস্তির হিজিবিজি গলি ঘুজি দিয়ে পাক খেয়ে ঘুরে সে এগিয়ে যায় অন্য মোড়ের দিকে, যেখানে রাস্তায় পড়ে আছে নটুকের রক্তাক্ত ছ্যাঁচা দেহটা, মলিন পিচে রক্তের দাগ, ছিটকানো রক্তের ফোট ফোট চিহ্ন। আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখতে হয় চুণোকে। খাঁ খাঁ করছে রাতের শ্মশানের

মত্ত মেঘলা সকালের রাজপথ। ভাঙা শিবলিঙ্গের বটগাছটার তলে শুধু কয়েকজন সৈন্য পরামর্শ করছে। লোহা লক্কড়ের দোকান বুঝি বন্ধ করার সময় পায় নি, তারপর বুঝি আর বন্ধ করতেও দেয় নি, তক্তপোষটা দোকানের সামনের দিকে টেনে এনে তারা বসল।

টিপি টিপি বিষ্টি নেমেছে।

বাড়ী যা, অন্ধকার ঘরে সন্তর্পণে কানে কানে কুঞ্জ বলে চুণোকে, এরপর যেতে পারবি নে।

চুণো মাথা নাড়ে, কথা কয় না। মোড়ের মাথায় কুঞ্জর শুখো' এবং বিড়ি পাতা বেচার ছোট ঘর, সামনের কপাট বলতে টিনের ঝোলানো ঝাঁপ, ভেতর থেকে টেনে টুনে বন্ধ করেছে। টিনে ফাঁক আছে ছোট ছোট, তার একটাতে একটা মোটে চোখ রেখে রাস্তায় শোয়া নটুককে দেখা যায়। পাশের এই ঘুপচি জানালাটার পাট একটু ফাঁক করে তাকালে দুচোখেই পড়ে নটুককে, আরও স্পষ্টভাবে। যদিও তাকাতে হয় চোখ একটু বাঁকিয়ে।

কুঞ্জ ভাবে বন্ধ দোকানের জানালা দিয়ে কেউ চুপি চুপি উঁকি মারছে এটা যদি নজরে পড়ে যায় ফাঁকা রাস্তা আর নটুকের দেহটার পাহারায় রত ওদের। যদি দোকান ভেঙে বা পাশের খিড়কীর দুয়ার ভেঙে ভেতরে আসে চুণো আর অন্য যে মেয়েছেলে আছে বাড়ীটার বসবাসের অংশটাতে তাদের গন্ধ পেয়ে। কুত্তার মত ওদের নাক, বাতাসে গন্ধ খোঁজে লুটের যোগ্য মেয়েছেলের।

পিঠে হাত রাখে চুণোর, বলে, কি করিব? বন্ধ করে দে জানলা। ঘর যা বরং।

চুণো আবার মাথা নাড়ে। তার রুক্ষ চুল আলগা বাঁধন খুলে এলিয়ে পড়েছে।

ঘরের আবছা আঁধারেও টের পাওয়া যায় চোখে তার জল নেই, জানালার ফাঁকটুকু দিয়ে যে আলো আসছে, মেঘলা সকালের ম্লান আলো, তাতে জ্বল জ্বল করছে তার দুটি চোখ।

এ ভারি অন্যায়। ছি!—শ্রীমতী ক্রুদ্ধ স্বরে প্রতিবাদ ঘোষণা করে, মিশনের সঙ্গে বৈঠক চলছে ওদিকে, এদিকে এমন সব কাণ্ড, এমন অত্যাচার।

তারপর সে বলে, যাক গে, মিলিটারী এসে গেছে, এবার যাওয়া যাবে। চলো যাই।

সে আর তার সঙ্গীকে নিয়ে মোটরটা যখন সামনে দিয়ে যায়, এক মুহূর্তের জন্য নটুকের দেহটা আড়াল হয়ে যায় চুণোর চোখ থেকে।

ইস্! শ্রীমতী তার সঙ্গীকে বলে নটুককে এক পলক দেখে।

ব্রিজ

শ্রাবণের শেষ বেলা।

যে ট্রেনটি ধীরে ধীরে হাওড়া ষ্টেশনে ঢুকে থেমে দাঁড়িয়ে সশব্দে রুদ্ধ বাষ্প ত্যাগ করল, তার আগমন ভারতের অপর প্রান্ত থেকে। তেরশ' মাইলের বেশী পাড়ি দিয়েছে ঘর্মাক্ত উলঙ্গ কালা মানুষের হাতে পাতা লোহার লাইনে চাকা গড়িয়ে।

দশ ঘণ্টার বেশী লেট। এরকম হচ্ছে ছেচল্লিশের অব্যবস্থা, অরাজকতায়। এ ট্রেণটি এত বেশী লেট হবার বিশেষ কারণ ছিল। মাঝপথে মধ্যভারতের বিখ্যাত এক শিল্পকেন্দ্র সহরের ষ্টেসনে গাড়ীটা অনেকক্ষণ আটকে ছিল।

সে এক কাণ্ড বটে।

সহরে সাদা সৈন্য লাগিয়ে কুলি-বিদ্রোহ দমনের হাঙ্গামা চলেছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও কিছু কিছু সুরু হয়েছিল ওই সঙ্গে। সহরের প্রান্ত-ঘেঁষা ষ্টেশন, হাঙ্গামার এলাকা থেকে টোঙ্গাতে প্রায় ঘণ্টাখানেকের পথ। ষ্টেশনে গোলমাল ছিল না। থাকার মধ্যে ছিল ডজন খানেক বিদেশী সৈনিক, নিরিবিলি কিঞ্চিৎ মদ্য পান করছিল—স্ত্রীলোক ছাড়াই। আশেপাশে কাছাকাছি সাধারণ লোক, রেলকর্মচারী আর কুলি-মজুরের সপরিবারে বসবাস, রেলওয়ে কোয়ার্টারে, ভাড়াটে বাড়ীতে, বস্তিতে। সুতরাং স্ত্রীলোক কম ছিল না চারিদিকে, কুলি-রোজগারীদের মা বৌ মেয়ে বোন। বিদেশী সাদা সৈনিক, এদেশে

মহাপুরুষাধিক। যুদ্ধের সময় রুটির টুকরো দিয়ে তারা দেশী মেয়ে কিনেছে চিরদুর্ভিক্ষের দেশে, তাদের জন্য গরুছাগল হাঁসমুর্গী রসদ সরবরাহের মত গড়ে উঠেছে উপোসী উচ্ছন্ন গাঁয়ের মেয়ে বৌ সরবরাহের ব্যবসা। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাক, তাদের দাবী অধিকারের জের তারা টেনে চলতে চায় সমানে। তারা খাবে নিরামিষ মদ আর শত শত উপভোগ্যা স্ত্রী-জাতীয়া জীব আশেপাশে কালা বাপ ভাই স্বামীর আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোবে—এ অসহ্য, নিদারুণ অসঙ্গতি।

অতএব তারা স্ত্রীলোক চেয়েছিল। বেশী, নয় দু'চার জন। একজন হলেও তাদের দশ বার জনের চলে যায়—যুদ্ধের সময় অমন অনেকবার তারা চালিয়ে নিয়েছে। তাদের ট্রেইনিং আছে, মত্ত অবস্থাতেও কিউ দেওয়ার নিয়ম মেনে নিজের পালার জন্য ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে পারে। দুঃখের বিষয়, মেয়েটা হয় তো মরে যায়। তা' দেহ যতক্ষণ পচে গলে না যায়, উষ্ণ থাকে, ততক্ষণ তা দেহই থাকে। তাজা রক্তে সিঞ্চিত দেহ।

কিন্তু এদিকে ইতিমধ্যে কি যেন হয়েছে এদেশের অহিংস মানুষেয়।

নিরস্ত্র বাপভাই স্বামী-পুত্রগুলি হয়ে উঠেছে দিগ্‌বিদিগজ্ঞানশূন্য। সশস্ত্র দেবতাদের পর্য্যন্ত গায়ে হাত দিতে দেয় না, বাধা দেয় মরণ পণ করে, মরতে!

গাড়ীটা গিয়ে পড়েছিল ষ্টেশনের এই মারামারির মধ্যে। গাড়ীর অর্ধেক যাত্রী ঝাঁপ দিয়ে পড়ে হাঙ্গামায়। তারপর যথা নিয়মে চলে গ্যাসবোমা ও গুলি। বেশীর ভাগ আহত যাত্রী গাড়ীতেই এসেছে। কিছু হতাহত পড়ে আছে সেই ষ্টেশনে অথবা হাসপাতালে।

কলকাতার দাঙ্গাহাঙ্গামার খবর এগিয়ে গিয়ে ট্রেনটির নাগাল ধরেছে। ভোরের দিকের ষ্টেসন থেকে যাত্রীরা কুড়িয়েছে শুধু গুজব—খানিক বেলায় ষ্টেশনে পাওয়া গিয়াছে খবরের কাগজ।

জগতে কি শুধু দাঙ্গাহাঙ্গামাই চলছে চারিদিকে? অথবা সেই মধ্যভারতের ষ্টেশনের হাঙ্গামাই শূন্যে উড়ে এসে ছড়িয়েছে কলকাতায়।

আহত যাত্রীদের উত্তেজনাই সব চেয়ে কম দেখা যায়। এমন ভাবে ক্লিষ্ট হাসি হেসে তারা কথা বলে, মাথা নাড়ে, যেন বলতে চায়, জগতের অবস্থা যে কি, তারাই তো তার জীবন্ত প্রমাণ। ভিড়ের গাদাগাদি আর অনবরত ঝাঁকুনিতে যাদের সবচেয়ে বেশী কষ্ট হবার কথা, তাদের সহ্যশক্তি যেমন সবচেয়ে বেশী দেখা যায়, অভ্যাস আর অভিজ্ঞতার ফলে, একটা হাঙ্গামায় আহত হয়ে এদের সব রকম দাঙ্গাহাঙ্গামা সম্পর্কে অবজ্ঞা জন্মে গেছে।

নতুবা সহরের বিবরণ যেমন ভয়ঙ্কর, তাতে গাড়ীর কামরায় কামরায় ভয়ার্ত্ত কলরব সুরু হওয়া উচিত ছিল।

কিন্তু বহুরূপী আতঙ্ক আর কত উত্তেজনা যোগাবে, কত ভীত করবে মানুষকে? বেশী বাড়াবাড়ি করলে শিশুও চিনে ফেলে ভয়ঙ্করকে। একটানা রূপান্তর খেলার সামিল হয়ে গেছে, রোগ দুর্ভিক্ষের নিত্য লীলার মত। অন্তত এ গাড়ীর একজন মাঝবয়সী মানুষ তো আর কোনদিন শঙ্কিত হবে না, স্থায়ী রেখায় কপালের চামড়া ভেঁজে কোনদিন আলোচনা করবে না দেশের আজ দুর্দ্দিন। তার দেহযন্ত্রটি বুঝি ট্রেনের সকলের চেয়ে দুর্বল ছিল, শিশু আর বুড়োদের চেয়েও। শুধু ভিড়ের চাপে গরমে তৃষ্ণায় আর বাতাসের ঘাঁটতিতে সে শেষ হয়ে গিয়েছে। মরে গিয়েও পড়ে থাকার স্থান জুটেছে প্রায় লাগেজেরই দুমড়ে মুচড়ে পড়ে থাকার মত। হাত পা ছড়িয়ে মরার যায়গারও অভাব।

হাওড়ার নতুন ব্রিজ সে আর দেখবে না। তার সাথী ক্লিষ্ট আরক্ত চোখে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল। ব্রিজটি দেখে মুহূর্ত্তের জন্য তার এসেছিল বিস্মরণ। হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে মুখ ফিরিয়ে সাথীকে জানালা দিয়ে ব্রিজটি দেখার কথা বলতে গিয়ে প্রচণ্ড আঘাতে ঝাঁকি খেয়ে আধ-নোয়ানো মাথাটা তার থমকে গিয়েছিল।

ব্রিজ পার হয়ে সহর।

ব্রিজের ঝকঝকে পেণ্ট-মাখা বিরাট কাঠামো থেকে শেষ বেলার পড়ন্ত রোদ ঠিকরে পড়ছে অসংখ্য চোখে। গুলুর চোখে বিনয়হীন শক্ত বিস্ময়। ধুত্তেরি এটা কি কাণ্ড করেছে! কি জন্যে কে জানি বাবা! কত লোক খেটেছে? ইস্! আগে যদি শিখতো লোহা লক্করের কাজ তো নির্ঘাত এটা তৈরীর কাজে লেগে যেতো চড়া মজুরিতে। চড়া মজুরি দিত কিনা সেটা জানা নাই বটে। দিত না। উঁ হুঁ, দিত না। এতো পুল বটে একটা, হোক যত মস্ত আর অবাক মত, আকাশ ছোঁয়া, আকাশটার মত চকচকে। সোন নদীর যে পুল

হল সেটাও পুল্। বল্টু এঁটে বল্টু এঁটে কি মজুরি মিলেছে? এ শালার পুল বানাতে পয়সা যদি দুটো বেশী মিলতো তো শালায় শহরে চড়া দরে ভাত খেতে তা পুষিয়ে যেত। হা, পুল বানিয়েছে গ্যাখো।

গ্যাখো, বিমীর চোখ এদিক পর্য্যন্ত শানায়, চুড়ি কটা বেচে এলাম, হাবাতেরা রূপো দিয়ে পুল বানিয়েছে গ্যাখো!

অনাথের আনাড়ি চোখ থেকে ব্রিজের ঝলমলে আলোর জোয়ার রাস্তা মাটি সবুজ বনের ছোপ যেন ধুয়ে মুছে নিয়ে যাবে, ঘুমিয়ে স্বপ্নেও যা ভাবা যায় না কখনো, রূপকথায় রাজপুরী আর ময়দানবের তৈরী সভা মিলে মিশেও হয়ে থাকে ধানের মরাই ঘেঁষা কোঠাবাড়ি আর ওই ইষ্টিশন। এটা হবে বুঝি বিলেত দেশটার সদর গেট, না কি বল? কামুন মা যে ফিরে গিয়ে গল্প করিছিল কালীঘাটে ধন্না দিতে এয়ে সে গপ্পের সদর গেট হবে বুঝি। কত্তাবাড়ীর গেট কতটুকু, তাতে হাতী বাঁধা রয়। আয়গো বড়কত্তাবাড়ীর বেটাছেলে পরীসাজা মাগীরা, এয়ে চোখ চেয়ে দেখে যা গেট কাকে বলে।

লক্ষ্মীর চোখে সব-সওয়ার পুরু পর্দা, কিছুই তাতে চমক লাগায় না। মস্ত বড় পুল, চকচকে পুল। মরণ জানে কার কি কাজে লাগে। রাজরাজড়ার সখ হবে বুঝি। হোকগে যাক বাবা, যার সখ সে পুল বানাক, তার সগ্গে ওঠার সিঁড়ি তো লয়।

সুদর্শনের অনেকদিনের বিরহী চোখে অনেক সায় আর অনেক সমর্থন। হাঁ, একেই বলে ব্রিজ। নির্ঘাত। ইস্পাতের আশ্চর্য অদ্ভুত সংগঠন, সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরীর উপযোগী তোরণদ্বার। নতুন সভ্যতার জয় ঘোষণা। এতদিনে দেশটা যে একটু এগিয়েছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বেমামী স্পর্ধায় জমকালো এ সৃষ্টি কি প্রখরতর হয়েছে ঝকঝকে সাদা রঙে—সত্যই উদার ক্ষমাশীল এদেশ। এত ক্ষমা ভাল নয়। দেশটা থাকবে ভাঙ্গা বাঁশের সাঁকোয় আটকে, সে দেশের বুকে বিজ্ঞানের এমন আধুনিকতম কীর্তি সৃষ্টি করবে খেয়ালের বশে। চারখার সঙ্গে সাঁকো মানায়, বেশ মানায়। এ ব্রিজ মানায় কি? সুদর্শন বার বার সহরে আসে, প্রতিবার ট্রামে বাসে ব্রিজ পার হতে গেলেই সে সমস্ত চাকার শব্দে অবিরাম ধ্বনি শোনে, হায় এ দেশ।

সত্যি, এটা কি দেশ? বুকের শিশুটাকে সুদর্শনের হাতে তুলে দিয়ে ব্লাউজের নীচেকার আঁটো জামাটার বোতাম খুলতে খুলতে সুন্দরী জলভরা চোখে ব্রিজের চোখ ঝলসানো রূপকে ঝাপসা করে নিতে থাকে, এ দেশের কিছু হবে না। অমন ব্রিজ বানিয়েছে, এক ফোঁটা দুধের ব্যবস্থা রাখেনি। মায়েরা যদি সবার সামনে বুক খুলে বাচ্চাকে দুধ দেয়, সবাই হাঁ করে চেয়ে থাকে, এমন ব্রিজের দরকার। গ্যাখনা বাপু, অমন ব্রিজটা রয়েছে সবাই গ্যাখ না বাপু ব্রিজটা, সবাই মিলে আমার দিকে তাকিয়ে আছিস কেন? ব্রিজ দেখে কি চোখ ভরে না—অমন সুন্দর ব্রিজ!

শুধু ট্রাম চলছে? বাব্বা, ভাগ্যে ট্রাম ছিল! সেবারেও সব বন্ধ ছিল, ভাগ্যে ট্রাম চলছিল তাই কোনমতে বাড়ী পৌছলাম।—কাঁধের আঁচলটা কৃষ্ণা কোমরে জড়িয়ে বাঁধে, মুকুলের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে প্রস্তুত হয়। আবার সেই আগের বারের মত ট্রামে যেতে হবে, সহরে দাঙ্গা হাঙ্গামা। সেবার ট্রামে যাওয়া মনে আছে। চারিদিক থেকে সর্বাঙ্গে পুরুষের চাপ কিন্তু কি সুন্দর চওড়া ব্রিজ!

আগেও ব্রিজ ছিল, মুকুল ব্যথিত চোখে চওড়া উঁচু নতুন ব্রিজের উজ্জ্বল স্থবিরতা গ্যাখে।

আগের ব্রিজটার চিহ্নও কি রাখতে নেই? ছিঃ! চোখের ভর্ৎসনায় নতুন ব্রিজের বিরাটত্বকে উড়িয়ে দিতে না পেরে কলেজে ছেলে পড়ানোর ব্যবসায়ে ক্লান্ত নৃতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার দে মাথা হেঁট করে।

চওড়া ব্রিজ, বুক বেয়ে বিরামহীন মানুষ আর যানবাহনের দুমুখী স্রোত, মাঝখানে ডবল ট্রাম লাইন, দুপ্রান্তে চওড়া ফুটপাথ। চলাচলের নতুন ঐশ্বর্যে এর মধ্যে মানুষ ভুলে গেছে ভারতের সেই অন্যতম দ্রষ্টব্য বিস্ময়—ভাসমান ব্রিজটিকে। দু'দিন আগেও যা ছিল পারাপারের সম্বল। মফস্বলের মানুষ হাঁ করে দেখত গঙ্গায় অনড় অচল সেতুটিকে। গাড়ী আস্তে চলতে বলে মিসেস দে তাকাত নদীর দিকে। সত্যই কি নেই সেই বহু পরিচিত কর্দমাক্ত পুরানো পুলটি? সেই পুরানো নোংরা নীচু পুল?

পাশে থাকলে সেদিকে চেয়ে চেয়ে এই ব্রিজ দিয়ে চলা কত সার্থক হত! তাদের নয় সাধ্য ছিল না নতুন জমি কেনার, পুরানো ভাঙ্গাচোরা বাড়ীটা ভেঙ্গে ফেলে নতুন বাড়ী তুলতে হয়েছে, একখানা ইটও রাখতে পারে নি ভাঙ্গা বাড়ীটার। এতো

গবর্ণমেন্টের ব্যাপার, অভাব কিসের? পাশের দিকে পুরানো পুলটা নয় পড়েই থাকত। যে বোটগুলি বুকে ধরে রাখত পুরানো পুলটি, তার দুটি পড়ে আছে পুরানো জঞ্জালের মত নদীর এক প্রান্তে। এখন সমস্যা জাগে। সংশয়।

ওয়াজেদের চোখে ঐতিহাসিক বিদ্যার পুরু চশমা, বাইফোকাল। ব্রিজে ঝলসানো আলো যেন ধাঁধা লাগায়। পুরানো দিনের জীর্ণ সেতু বাতিল হয়ে গেছে মানুষের মনে উন্নত আধুনিক নতুনকে পেয়ে; ভাবলে বিস্ময় জাগে, গর্বে রোমাঞ্চ হয়। পুরানো পিছিয়ে-পড়া ধর্মোন্মাদ এই দশ কত সহজে আধুনিকতম সভ্য দেশের মতই মাত্র দুদিনের একটু বিস্ময় বোধ করে কত সহজে কি অনায়াসে গ্রহণ করেছে বিজ্ঞানের রূপধরা বিরাট প্রগতিকে।

বাংলার রাজধানী। বিদেশীর পররাজ্য হোক, তবু তো তার রাজধানী থাকে। ষোল শ' নব্বুই খৃষ্টাব্দে জব চার্ণকের ভিত্তি পত্তন। হুগলীর ফৌজদার সায়েস্তা খাঁর দাপটে সদলবলে পলাতক জব চার্ণকের কেন যে পছন্দ হয়েছিল তুচ্ছ নগণ্য সুতানটি গ্রামটিকে, ইতিহাস তা জানে কিন্তু বলে না। বলে না বোধ হয় দিল্লীর বাদশা ফারুক শার খাতিরে, জব চার্ণকের পছন্দের ভবিষ্যৎ যার অজানা ছিল। ইতিহাস শুধু জানার ভান করে সতেরশ চৌদ্দ খৃষ্টাব্দে ১৩ই মে ইংরেজ বণিকরা ফারুক শা'র কাছে ত্রিশটি গ্রামের ইজারা প্রার্থনা করে দরখাস্ত দাখিল করেছিল। ত্রিশটি গ্রাম। ইজারা। দরখাস্ত।

জাহানারার কাজলা চোখে সাদা ব্রিজে ঠিকরানো পড়ন্ত রোদের চেয়ে ঝলমলো আলো খেলতে পারে।—ছোড়দো তুমারা হিষ্টিরি ঔর লেকচার। হিষ্টিরিয়া হোগি।

পিটার রবসনের কটা স্থির চোখে সব আলো সব রক্ত বিয়রের সাদা ফেণা আর সোনালী স্বচ্ছতা। ইয়েস, ইয়েস। এ তার কল্পনা, তারই পরিকল্পনা। এদেশের পরম পরিণতির সিম্বল। জানো বিল্লীদাস, হোয়াইট ক্লাবে আমার ঘরের জানালা দিয়ে ব্রিজটা গড়ে উঠতে দেখেছি আর ভেবেছি This is no compeition with Tajmahal, it's the fulfilment। জানো ডিয়ার বেটি, এদেশে… ডিয়ার বেটির পাতলা চোখে শুধু আমেরিকার আকাশেই সূর্য্য উঠেও আমেরিকার ব্রিজেই আলো ঝলসায়, সে বলে, তুমি যদি ওয়াশিংটনে যেতে—

যাওয়া ভাল, আসা ভাল, তাতে দিল খুশ থাকে। রূপেয়াসে নফা, বাস। হাতে হাত মিলাও, আসল ওই। বিল্লীদাস সত্যসত্যই বেটির মার্কিনী হাতে হাত মেলায়, রবসনের ইংরাজী হাতও বাদ দেয় না। এ ব্রিজ কুছু না। আমেরিকার প্রোডাকসন কত। প্রোডাকসন চালু রইলে এমন কত ব্রিজ আপনাসে গজাবে।

ব্রিজ পারাপারে ভয় নেই। ব্রিজের এমাথা ওমাথা চলাচল করার তো মানে নেই, ব্রিজটারও সে মানে নয়। পেরিয়ে কোথাও যেতে হবে, এপারে ওপারে কোথাও যাওয়া আসার জন্য ব্রিজ। ওপারে সহরটাতে ভয়, বিপদ। তাই এমন মস্ত ঝকঝকে নিরাপদ ব্রিজ থাকতেও হাজার হাজার মানুষ ওপারে না গিয়ে ষ্টেশন কামড়ে পড়ে আছে, কম্বল সতরঞ্চি বিছিয়ে গাদাগাদি করে। অসংখ্য মুখর কণ্ঠ মিলে আটকানো ঝড়ের আওয়াজ। মিশ্র ভাপসা একটা দুর্গন্ধ বাতাসকে পর্য্যন্ত ভারি করেছে। ট্রেণের কামরার সঙ্গে প্ল্যাটফর্মের, ষ্টেশন এলাকার কোন পার্থক্য নেই। নবাগত ট্রেণের উগড়ে দেওয়া যাত্রীরা ঘোলা জলে কাদা জল মেশায় মত ষ্টেশনের ভিড়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

ব্রিজ পেরিয়ে যেতে হবে। ব্রিজের ওপারেই ঘরবাড়ী আশ্রয় সংসার জীবন। প্রাণ হাতে করে নিয়ে যাওয়ার খানিক আশা আছে যাদের, তাদের অন্তত যেতে হবে। যাদের তাও নেই, তারাই পড়ে থাক।

ঝকঝকে প্রাইভেট গাড়ীগুলি যায় সবার আগে। গাড়ীর পেন্টে আঁচড়ের দাগ পড়ে নি।

তোমাদের ভয় কি? বিল্লীদাস রবসন বেটিকে অভয় দেয়, একদম দাঙ্গার মাঝে হেঁটে যাও, কেউ কুছু বলবে না। তোমাদের সাথে ঝগড়া কার?

জাহানারার চোখ ঝলসে ওঠে, ছোড়দো তুমারা হিষ্টিরি, উল্লুক। ভলান্টিয়ারকো পুছো কেইস্যা যানা হ্যায়। তুম কোন্ হো বাতাও।

ওয়াজেদ মাথা নামিয়ে সায় দেয়। তাই ভাল। এই ব্রিজের কোন ঐতিহাসিক মানে হয় না।

কৃষ্ণা বলে, আমায় যদি গাউন পরাতে তবে ঠিক হত, অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যেত। তুমি একা হলে তোমার সায়েবী পোষাক কাজে লাগত,

আমার সঙ্গে দেখে সবাই চিনে ফেলবে না? একটু কায়দা করে কাপড়টা পরে নেব যাতে চেনা না যায় আমি ঠিক—?

মুকুন্দ ক্ষোভের সঙ্গে বলে, মানুষ সত্যি আর মানুষ নেই।

সুন্দরীর কাঁদো গলায় একটু ঝাঁজ এসেছে, হাঁ করে দাঁড়িয়ে না থেকে ডাকো না বাবু ভলান্টিয়ারদের খোঁজ করে? যদি কোন উপায় হয়?

সুদর্শন মাথায় ঝাঁকি দিয়ে বলে, কারা সত্যি ভলান্টিয়ার, কারা ডাকাত, তাই যদি জানতাম—

অনাথের হাত ধরে টানতে টানতে লক্ষ্মী বলে, আ মর ছোঁড়া, আয় না চট করে। বাবুরা লরী করে পৌছে দেবে বলছে, লরী যে বোঝাই হল, জায়গা পাবি না যে, ছুটে চল। সগ্‌গে যাবার আলাদা ঢের কম বাপু, তা মোর মরণ নেই।

পোঁটলাটা ঘাড়ে তুলে গুদু বলে চ'যাই। পা চালাই।

পুটুলিটা বগলে নিয়ে বিমী বলে, চ।

সমাপ্ত


বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির